ঈশ্বরের
বাগান
অতীন
বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈশ্বরের বাগান

(প্রথম খণ্ড)

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

॥ লেখকের কিছু কথা ॥

সোনা ট্রিলজির প্রথম পর্ব 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'। দ্বিতীয় পর্ব 'অলৌকিক জলযান'। শেষ পর্ব 'ঈশ্বরের বাগান'। প্রথম পর্বে যে সোনা, দ্বিতীয় পর্বে— ছোটবাবু, শেষ পর্বে—অতীশ দীপঙ্কর। তিন পর্বে একই ব্যক্তিসত্তা ভিন্নতর সত্যে উদ্ভাসিত। যেমন একই শক্তি মহাজাগতিক নিয়মণে নানা ব্যঞ্জনার নিত্য প্রকাশিত। তিনটি পর্বই স্বয়ংসম্পূর্ণ। নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজের পটভূমি—প্রকৃতি। অলৌকিক জলযানের পটভূমি—অনন্ত অসীম সমুদ্র। আর ঈশ্বরের বাগান, নগর জীবনের এক নীরস ইঁট কাঠের গদ্যময় জগৎ। শৈশব, বয়ঃসন্ধিকাল পার হয়ে সোনা এখন ঈশ্বরের বাগানে অতীশ দীপঙ্কর—এক পরিণত মানুষ। পৃথিবীটা তার কাছে এখন প্রকৃতির মতো নিরন্তর সুষমামণ্ডিত নয় অথবা সমুদ্র এবং আকাশের মতো উদার নয়। নগর জীবনে সে শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। ঈশ্বর এবং প্রেতাত্মা দুই তাকে নিয়ত তাড়া করছে।

পাগল হাঁকছে ভূ-ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর। পাগল হাঁকছে—ছবি গণ্ডারের এক ঝুলে থাকে সদর দেউড়িতে। এইসব হাঁকডাক কোন এক অদৃশ্য গোপন অভ্যন্তর থেকে ভেসে আসছিল। সে সদর দেউড়িতে এসে এমন সব শব্দে থমকে দাঁড়াতেই দেখল সত্যি সত্যি মাথার ওপরে একটা গণ্ডারের ছবি, একট দেড় হাত গণ্ডারের ছবি, নাকটা লম্বা হয়ে ঝুলে আছে—নীল রঙের ছবি, তেড়ে ফুঁড়ে যাচ্ছে আর বাতাসে ওটা পতপত করে উড়ছে। দেউড়িতে এক সিপাই —লম্বা ততোধিক তালপাতার সামিল। হাতে জীর্ণ একটা একনলা বন্দুক। মরচে-পড়া। খাকি পোশাক গায়ে, মাথায় লম্বা টুপি জোকারের মতো। বুট-জুতোর একটা ফিতা বাঁধা। অন্যটা হাঁ হয়ে আছে। লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছিল। এই সকালে, এখন আর কটা হবে, নটাও বাজেনি, অথচ লোকটা বসে নেই, শুয়ে নেই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমাচ্ছে। চোখ কোটরাগত, বহুদিনের উপবাসে এমন একটা ভঙ্গী মানুষের মুখে থাকে।

সে বলল, এটা রাজবাড়ি?

সিপাই চোখ খুলে দেখে হাই তুলল। বন্দুকটা নিয়ে সটান এটেনসান, তারপর খুব তাচ্ছিল্য—যেন কিছুই আসে যায় না, কে কখন যায় আসে খবর রাখার কথা না তার। এই লোকটা তাকে রাজার বাড়ি সম্পর্কে প্রশ্ন করছে—বেয়াদপ আর কাকে বলে! চোখ নেই! সামনে অতবড় পাথরে লেখা কুমারদহ রাজবাটী। লোকটা কি লেখাপড়া শেখেনি? তারপরই হুঁশ ফিরে আসার মত—অর্থাৎ একটা আহাম্মক লোকের সঙ্গে এতবড় মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ কথা বলতে পারলে না, বরং ধিক্কার দিতে গিয়ে ভাল করে তাকাতেই অবাক। এক উঁচু লম্বা সৌম্যকান্তি যুবক দেউড়িতে দাঁড়িয়ে। মুখে বড়ই ভালমানুষের ছাপ। সে রাজার বাড়িতে ঢুকতে চায়।

তখনই সৌম্যকান্তি যুবক লক্ষ্য করল বিশাল পেল্লাই দেউড়ির এক কোণে ছোট্ট চৌকো মতো ফুট তিনেকের দরজা। কুকুর-বেড়াল লাফিয়ে ঢুকতে পারে। দুজন মানুষও ঢুকে গেল। ঘাড় মাথা হেঁট করে ঢুকে যাচ্ছে তারা। এই তবে সেই দরজাটা, যা দিয়ে মানুষ এই বাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে। সে ভাবল, কি করবে? মাথা হেঁট করে ঢুকবে, না সোজা মাথায়

অপেক্ষা করবে। আর তখনই তালপাতা ঘটাং ঘটাং করে কি সব খুলে ফেলছিল, টেনে নিচ্ছিল জোরে দেউড়ির এক কপাট। সে তার জান কবুল করে কোনরকমে একটা পাট কিছুটা ঠেলে দিতেই হাঁ হয়ে গেল রাজার বাড়ি। যুবক ভিতরে ঢুকে সিপাইকে বলল, রাজেনবাবুর সঙ্গে দেখা করব।

এত ভাল কথা নয়—বাড়ির হালচাল জানে না মানুষটা। এই বাড়ির মধ্যে কার বুকের পাটা আছে, নাম নিয়ে কথা কয়। যুবকের কথায় সিপাই খুবই হকচকিয়ে গিয়েছিল। বলল, কুমার বাহাদুর?

সে সহসা ভুল হয়ে গেছে মতো বলল, কুমার বাহাদুর।

সিপাই এতক্ষণে কিছুটা আশ্বস্ত হল যেন। হাত তুলে বলল, সামনে যান। বাবুরা আছে বলে দেবে সব।

যেন বাবুরা তাকে প্রথম এ-বাড়ির সহবত শেখাবে। এখানে এলে এমনিতেই রাজার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার কথা না। কত বড় আহাম্মক আর কিছুটা গেলেই টের পাবে। মনে মনে কিঞ্চিত শঙ্কা। সেখানে গিয়ে না আবার বলে ফেলে, রাজেনবাবু। তোবা তোবা সে কান ছুঁল। এরকম এ বাড়িতে কেউ ভাবতেও ভয় পায়। লোকটা এত সুন্দর দেখতে। এমন উঁচু লম্বা, মুখে চোখে আশ্চর্য আচ্ছন্ন এক ভাব, যেন এত সবের মধ্যেও কি সব গভীর ভাবনা মানুষটার মধ্যে কাজ করছে। সিপাই সাদেক আলি একটু এগিয়ে গিয়ে বলবে ভাবল, হুজোরের নাম লেবেন না বাবু। সম্মানে লাগে। কিসে কি বিপদ আসবে কে বলতে পারে। কিন্তু কিছুটা গিয়েও যুবককে দেখতে পেল না। গাড়িবারান্দার পাশে বড় বড় থামের আড়ালে পড়ে গেছে। তার অতদূরে যাওয়া আর সম্ভব না। খোঁজা সম্ভব না। অষ্ট প্রহর দেউড়ি আগলানো তার কাজ। এদিক ওদিক হলেই কৈফিয়ত তলব।

আসলে নবীন যুবক যায়, কেউ হাঁকে, সেই কোন গোপন গভীর অদৃশ্য অন্তরাল থেকে হাঁকে, নবীন যুবক যায়। সে হেঁটে যায় চারপাশ দেখে। দেউড়িতে দাঁড়িয়ে ভেবেছিল, বড় ভগ্ন প্রাসাদ। রাজার বাড়ি ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু ভেতরে যত ঢুকছে জেল্লা বাড়ছে। বাঁদিকে বড় লন। সবুজ ঘাস, কিছু বিদেশী ফুলের গাছ, ঝাউগাছ, পাম-ট্রি, ছোট্ট জলাশয়। সেখানে শালুক এবং পদ্মপাতা তারপরই লতানে গুচ্ছ গুচ্ছ সবুজ পাতার প্রাচীর। বাড়িটা কত বড় ভেতরে! যেন শেষ নেই। ডানদিকে পথ, বাঁদিকে পথ। একটা দোতলা বাড়ি কতদূর চলে গেছে পাশ দিয়ে। সে গাড়ি-বারান্দায় উঠে

যেতেই এ-সব দেখল। তবু সব কিছু পুরানো। প্রাচীন এবং একটা সোঁদা গন্ধ। গাড়ি-বারান্দায় উঠতেই সে এটা টের পেল। গাড়ি-বারান্দা পার হলে লম্বা আর একটা বারান্দা—বিশাল চত্বর জুড়ে যেন। কোণায় কোণায় গোল শ্বেত-পাথরের টেবিল, কারুকাজ করা চেয়ার। দেয়ালে বড় বড় আয়না। যুবক সেই আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে বুঝল, চোখেমুখে ক্লান্তি জমেছে। রাত জেগে গাড়িতে আসায় এটা হয়েছে। তখনই কেউ দরজায় উঁকি মেরে বলল, কাকে চাই ?

যুবক বলল, রাজেনবাবুর সঙ্গে আজ দেখা করার কথা।

লোকটা যেন কি বুঝে ফেলল, আরে এত সেই লোক—যে আসবে আসবে কথা হচ্ছে। ভালমানুষ সত্যবাদী এবং যাকে দিয়ে কুমার বাহাদুরের অনেক উপকার হবে। পলকে চিনে ফেলে বলল, বসুন বাবু। হুজুর এখনও নামেন নি। তারপরই কি ভেবে বলল, দাঁড়ান। লোকটা জাদুকরের মতো অন্তর্হিত হয়ে গেল। এবার সে একা এল না। আরও একজন সঙ্গে। সঙ্গের বাবুটি বলল,—কুমার বাহাদুরের কাছে যেতে চান ?

—তেমনই কথা আছে।

—কোত্থেকে আসছেন।

—অনেক দূর থেকে।

—নাম ?

—অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক।

—মানে আপনি আমাদের নতুন। বাবুটি আর কথা শেষ করতে পারল না। দন্তপাটি নিমেষে বের করে দিল। কিছুটা কুঁজো হয়ে গেছে অল্পবয়সেই। যুবক চোখ তুলে লোকটিকে দেখে রাজেনবাবুর কথাবার্তার সঙ্গে কি যেন মিল খুঁজে দেখার চেষ্টা করল। যখন কুঁজো হয়ে গেছে তখন বুঝতে বাকি থাকল না, রাজেনবাবুর বড় বিশ্বাসীজন।

—ওরে সুরেন। কোথায় গেলি বাবা।

ও-পাশের একটা ঘর থেকে সুরেন হাঁকল, আজ্ঞে যাই বাবু।

এবার অতীশের দিকে তাকিয়ে বলল, বসুন। এখনও নামার সময় হয়নি। ও সুরেন, কি করছিস ?

—আজ্ঞে যাই।

অন্যপাশের টেবিলগুলিতেও কিছু দর্শনার্থী।

বাবুটি বলল, ভিতরে এসে বসুন।

যুবক বলল, বেশ হাওয়া দিচ্ছে।

সুরেন কোথায় গেল কে জানে। সেই খবর দেবে কুমার বাহাদুর নেমেছেন কি না। সেই এখন তার কাণ্ডারী। সে লোকটি হারিয়ে গেলে যা বিরাট প্রাসাদ তার পক্ষে রাজেনবাবু ওরফে কুমার বাহাদুরকে খুঁজে বার করা কঠিন হবে।

বাবুটি বলল, পথে কোন কষ্ট হয়নি ত ?

—ঘুম হয়নি। গরম।

—তাহলে খুব কষ্ট গেছে। ওরে সুরেন বাবা, তোর হল ?

—আজ্ঞে যাই।

অতীশ এই কথাগুলিতে মজা পাচ্ছে। সুরেন ভেতর থেকে যাই করছে, আর বাবুটি অনবরত হেঁকে যাচ্ছে, তোর হল ?

শেষপর্যন্ত যা হল তাতে অতীশ আরও মজা পেল। হল অর্থাৎ এক কাপ চা এবং দুটো বিসকুট। এই হতে এতক্ষণ সময়! এ-বাড়িতে একসময় দানধ্যান পূজা-পার্বণ দোল দুর্গোৎসব বাই-নাচ, সঙ্গীত সম্মেলন এবং রাজা-বাদশা-মহাত্মারা পায়ের ধুলো রেখে গেছেন কত। সে এখন এই বাড়ির বিশাল বারান্দায় বসে এক-কাপ চা দুটো ক্রিমকেকার খাচ্ছে।

খেতে খেতে তার ওপরের দিকে চোখ গেল। বড় বড় তৈলচিত্র। কবেকার কে জানে। অধিকাংশ ছবি উলঙ্গ যুবতীদের। বিদেশিনী। সঙ্গে সঙ্গে কোথায় কোন সুদূরের এক বাসভূমি তার চোখে ভেসে উঠল। সমুদ্র বেলায় সে আর কেউ দাঁড়িয়ে আছে। অথবা কোন ভাঙা জাহাজের মাস্তুলে সে, দূরে সমুদ্রগর্ভে অতিকায় সেই ক্রস। কখনও ঢেউয়ে ভেসে উঠেছে কখনও ডুবে যাচ্ছে। মাস্তুলের ডগায় সে লম্ফ জ্বালিয়ে নেমে আসছে। এইসব স্মৃতি মনে হলেই তার ভেতরে হাহাকার বাজে। কত বছর আগেকার এক দৈব ঘটনা তাকে এখনও তাড়া করে বেড়াচ্ছে। এবং সেই আচ্ছন্ন ভাবটা আবার তার মধ্যে ঢুকে গেলে সে কেমন আনমনা হয়ে গেল। সে চুপচাপ বসে দেয়ালের ছবি, দূরের দিগন্ত বেলা অথবা নীল সমুদ্রে সেই অতিকায় পাখির আর্ত চিৎকারে মুহ্যমান হয়ে পড়ল।

—বাবু।

অতীশ চোখ তুলে তাকাল।

—আসুন।

সে উঠে গেল ভিতরে। ঘরটা ফাঁকা। ডানদিকে কাঠের পার্টিসান দেয়া দেয়াল। পাশে দরজা। ভেতরে কিছু বাবু। টেবিলে দলিল দস্তাবেজের পাহাড়। তারা মনোযোগ দিয়ে কি-সব দেখছে। সেই ঘরটা অতিক্রম করতেই সে বড় একটা হলঘরে পড়ল। সেই ঘরটাও চিত্রিত তেলরঙের ছবিতে সাজানো। কোথাও একটা লোক উবু হয়ে কি যেন করছে। ভাল করে লক্ষ্য করতে গিয়ে বুঝল লোকটার সম্বল বলতে একটা বালতি কিছু জল এবং ন্যাতা। সে টেনে টেনে ঘর মুছে যাচ্ছে।

বাইরে থেকে সে ভাবতেই পারেনি ভেতরে এখনও সেই জাঁকজমক আছে। হাতীশালায় হাতী ঘোড়াশালায় ঘোড়া। সব কিছু এখানে বড় বেশি মহার্ঘ মনে হচ্ছিল। ঘরটার মাঝখানে, কাশ্মীরী কার্পেট, সোফা, মাথায় রকমারি কাঁচের ঝালর। দুপাশে সেই বড় বড় বেলজিয়াম কাঁচের আয়না। একটি ঘড়ি লম্বা কালো রঙের। চারপাশটা সোনার জলে কাজ করা। থেকে থেকে বাজছে। ঠিক যেন জলতরঙ্গ বাজনা। ঘড়িটার দিকে তাকাতেই সুরেন বলল, দাঁড়ান। সুরেন চবর চবর করে পান চিবুচ্ছিল। মুখের গহ্বর আগুনের মতো লাল।

সে দাঁড়াল।

সামনে আবার একটা লম্বা ঘর। দেয়াল জুড়ে বুক-সমান উঁচু লম্বা চেয়ার। কালো রঙের। বেতের বুনন। এখানে দাঁড়ালে সে পর পর আরও সামনে তিনটে অতিকায় দরজা দেখতে পেল। কতবড় এই বাড়ি একবার পেছনে না তাকালে যেন বোঝা যাবে না। সে পেছনে তাকালে বুঝল, ওদিকের দরজাটা কেউ বন্ধ করে দিয়ে গেছে। এখান থেকে একা পালাতে চাইল সে আর পালাতে পর্যন্ত পারবে না।

সুরেন পরেছে একটা খাটো কাপড়। গায়ে রাজবাড়ির ছাপ মারা খাকি উর্দি। বোতামেও রাজবাড়ির ছাপ। খোঁচা খোঁচা দাড়ি গালে। মাঝারি হাইট। চোয়ালে মাংস কম। এক সময় শক্ত মজবুত ছিল মানুষটা, এখন সে-সব নেই। হাতের রগ ভেসে উঠেছে। চোখে-মুখে সব সময় কেমন শঙ্কা। সে সুরেনের দিকে তাকিয়ে থাকলে বলল, ওখানটায় গিয়ে বসুন। এখুনি নামবেন।

সেই উঁচু মতো লম্বা চেয়ারটায় সে উঠে গিয়ে বসল। সামনে বিলিয়ার্ড টেবিল। লালরঙের সিল্ক কাপড়ে সবটাই ঢাকা। কোণায় একটা রিংয়ের মধ্যে

ছোট বড় মাঝারি স্টিক। এ-ঘরে রাজেনবাবুর পূর্বপুরুষদের তৈলচিত্র। নিচে বড় লাটের সঙ্গে গ্রুপ ছবি। রাজেনবাবুর প্রপিতামহের আমলে বড়লাট এ বাড়িতে পদার্পণ করেছিলেন বলে একটা ব্রোঞ্জের মূর্তি কোণায় সযত্নে এখনও রাখা। তার নিচের ছবিটা যেমন ছোট তেমনি বিদঘুটে। একটা কালো কোট ছবিটাতে ঝুলছে। খালি কোট, ভেতর থেকে একটা হাত ফুটে বের হচ্ছে। কাঠের বেড়া ফাঁক করে হাতটা নিচে জলে কিছু যেন খুঁজছে। ছবিটা ভাল করে দেখার জন্য অতীশ নিচে নেমে গেল। কেউ নেই। সুরেনও না। কেমন এক নিঃসঙ্গপুরী, বাইরে ট্রাম-বাসের শব্দ কান পাতলে শোনা যায়। আর মনে হচ্ছিল আর একটু গেলেই অন্দর মহল—সেখানে রাজেনবাবুর পিতৃপুরুষদের কেচ্ছা-কাহিনীর কূট-গন্ধ এখনও নাক টানলে পাওয়া যাবে। বিলিয়ার্ড টেবিলের অদূরেই পিয়ানো। ঢাকনাটায় ময়লা জমে আছে। একসময় এই ঘরটা ময়ফেলের জায়গা ছিল বোঝা যায়। সাহেব-সুবোরা আসত। মেমসাবরা আসত। সারা রাত খানাপিনা চলত। কতকাল আগে সে-সব পাট উঠে গেছে বোধহয়। মানুষ মরে গেলে সাদা চাদর ঢেকে দেবার মতো বিলিয়ার্ড টেবিল, পিয়ানো সব ঢেকে রাখা হয়েছে এখন।

সে এই প্রথম এখানে। রাজেনবাবুর বাইরে একটা পোশাকী ভালমানুষের চেহারা আছে। তার সঙ্গে কথাবার্তায় সেদিন এমন মনে হয়েছিল। আর দশটা সাধারণ মানুষের মতোই তাকে অতীশের খুব ভাল লেগেছিল। কিন্তু যত বাড়ির অভ্যন্তরে ঢুকছে, তত এক সংশয় দানা বাঁধছে। ওর কিছুটা ভয় ভয়ও করছিল। রাজেনবাবুর বাড়ির ভেতরের হালচাল ওর কাছে কিছুটা অস্বাভাবিক লাগছে। এ-সময় এক ধু-ধু মরুভূমির বুকে কোনো এক জরদ্গব পাখি তার চোখে ভেসে উঠল। এই এক ল্যাঠা তার। সে অনেক কিছু দূরে অদূরে দেখতে পায়। পাখিটা ঠোঁট গুঁজে বসে আছে। একটা মরুভূমির কাঁকড়া গোপনে হেঁটে আসছে। টুক করে গলায় থাবা বসাবে। সে সহসা হাত তুলে কাঁকড়াটাকে তাড়াতে গেল। এবং ছবিটাতে হাত লাগায় জলটা যেন নড়ে উঠল। সে ভাবল, এটা কি করতে যাচ্ছে সে!

তারপরই মনে হল ছবির জলটা নড়ে কি নড়ে না, সে প্রায় ছবির মধ্যে মুখ গুঁজে দেখার মত দাঁড়িয়ে থাকল। এবং বুঝল মনের ভুলে সে এ-সব দেখে ফেলে —এটা তার সেই কবে থেকে যে হয়ে আসছে। ছবিটা থেকে ভয়ে ভয়ে সে দূরে সরে দাঁড়াল। আজীবন এই এক ভয় সে বয়ে বেড়াচ্ছে। তখনই মনে

হল ও-পাশের কোন অদৃশ্য অন্ধকার সিঁড়িতে কেউ নেমে আসছে। সে দ্রুত তার নির্দিষ্ট জায়গায় ফিরে এসে বসে পড়ল। এটা তার নির্দিষ্ট জায়গা। এখানে সুরেন তাকে বসতে বলে গেছে। তার এদিক ওদিক যাবার নিয়ম নাও থাকতে পারে। আসলে সে সেই সরল ভীতু স্বভাবের মানুষ। ভেতরে কখনও কখনও যে গোঁয়ার মানুষটা উঁকি দেয়, তা নিতান্ত ফেরে-পড়ে গেলে।

বাড়িটাতে সোজা টানা লম্বা দরজা একের পর এক। একটা পার হলে আর একটা। যেখানটায় বসেছিল, সেখান থেকে ডাইনে বাঁয়ে দু-দুটো দরজা চোখে পড়ছে। সেই লোকটা এখনও ঘরের মেঝে মুছে যাচ্ছে। প্রচণ্ড ঘাম হচ্ছিল তার। মারবেল পাথরের মেঝে সে ঘষে ঘষে চকচকে করে তুলছে। এই একমাত্র মানুষ তার কাছাকাছি। সিঁড়িতে তখন আর শব্দ হচ্ছে না। পাশের ঘরে সরে যাচ্ছে। সে উঁকি দিয়ে দেখল রাজেনবাবু, সাদা শার্ট, গলায় টাই, সাদা জিনের প্যাণ্ট—বড় গম্ভীর।- কোন দিকে না তাকিয়ে তিনি দেয়ালের আড়ালে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। আর তার ঠিক পিছু পিছু ফতুয়া গায়ে একজন মাঝবয়সী মানুষ কাঠের একটা ছোট্ট বাকস নিয়ে রাজেনবাবুকে অনুসরণ করছে। অতীশের মনে হল, এবারই সেই হা হা হাসি শুনতে পাবে। আরে এস এস। কটায় এলে। সব ঠিক ত। কারণ অতীশের ধারণা তার আসার খবর রাজেনবাবু পেয়ে গেছে। এত অন্তরঙ্গ কথাবার্তার পর তাকে আর দশটা মানুষের মতো দেখতে না পারারই কথা। সেই বাকসধারী লোকটা তখন পাশের দরজা দিয়ে বের হয়ে এল। হাতে বাকস নেই। ভেতরে কোন ঘরে রাজেনবাবু আর তার বাকস বুঝি রেখে এল। মাঝবয়সী লোকটা একা এদিকের দরজায় আসতেই কুর কুর করে দৌড়ে এল সুরেন।

মাঝবয়সী মানুষটা এত্তেলা দিল—কুমার বাহাদুর নেমেছেন। তার আগে মহারাজাধিরাজ গণ-নারায়ণ বীর বিক্রম এমন সব কিছু কি হাবিজাবি কথা— এবং অতীশের বুঝতে দেরি হল না, জমিদারী চলে গেলেও ঠাঁট বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন রাজেনবাবু। তার ফিক করে হাসি পেল।

খবর পেয়ে সুরেন কোথায় আবার কুর কুর করে দৌড়ে গেল। তাকে কেউ কোন আমলই দিচ্ছে না। মাঝবয়সী মানুষটা তার দিকে ফিরেও তাকাল না। সে সোজা দরজাগুলির একটা দিয়ে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। এবং দেখতে দেখতে মনে হল সারি সারি ক'জন নানা বয়সী মানুষ। পাটভাঙা ধুতি, পায়ে পামশু। পাশের অফিসটাতে ওদের সে উবু হয়ে বসে থাকতে দেখেছিল। ওরা

ঘরটায় ঢুকে প্রথম একে একে জুতো খুলে ফেলল। অতীশের বড় বেশি কৌতূহল—কোথায় এরা যায় দেখার বড় বাসনা। দেখলে মনে হবে ঈশ্বর দর্শনে যাচ্ছে। সে গুটি গুটি নেমে গেল। দেখল বড় কাঠের দরজা খুলে সবাই একে একে প্রণিপাত করছে। তারপর বের হয়ে আসছে। টের পেলে অধম্ম হতে পারে—অতীশ তাড়াতাড়ি দেয়ালের ছবিতে মনোযোগ দিল।

পাশ থেকে তখনই সেই বাবু, বাবা স্বরেন তোর হল—সেই বাবু কালো আবলুশ কাঠের রং, চুল কাঁচাপাকা, চাঁচা মুখ, তেমনি দাঁত বের করে হাসল। বলল, এই হয়ে গেল। এবারে আপনাকে ডেকে পাঠাবেন কুমার বাহাদুর। আর একটু অপেক্ষা করুন। খবর দেওয়া হয়েছে।

অতীশ ভারি বিভ্রমের মধ্যে পড়ে গেল। সবাই জুতো খুলে ঘরে ঢুকছে। বের হচ্ছে। তার পায়ে শু। কালো টেরিকটনের প্যাণ্ট সে পরে আছে। ফুল ফল আঁকা হাওয়াইন শার্ট গায়ে। সে জুতো খুলে ঢুকবে কি ঢুকবে না, জুতো খুলে ঢুকলে রাজদর্শন বড়ই পুণ্য কাজ, প্রায় ঈশ্বর দর্শনের শামিল—নেহাত দৈব বলে এই ঘরানার একমাত্র উত্তরাধিকারের সঙ্গে তার যোগাযোগ। অত সহজে হেলায় নষ্ট করার মতো আহাম্মক সে নয়। কিন্তু তখনই তার ভেতরের গোঁয়ার মানুষটা ফুঁসে উঠল। এই গোঁয়ার মানুষটাকে অতীশ বড় ভয় পায়। গোঁয়ার মানুষটার মাথা গরম হলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ঘিলু ফেটে যায়। রক্ত ঝরে। খুনখারাপি করতে দ্বিধা করে না। সে জুতোর ফিতা আলগা করে দাঁড়িয়ে থাকল। কিন্তু পা থেকে জুতো খুলতে সাহস পেল না।

স্বরেন আবার কুর কুর করে হাজির। বলল, আজ্ঞে আপনি অতীশবাবু?

অতীশ বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—হুজুর ডেকেছেন।

সে দরজার কাছে যেতেই স্বরেন হা-হা করে উঠল। অতীশ পেছন ফিরে তাকাল। দেখল স্বরেন কাঠ হয়ে গেছে। চোখ ওর পায়ের দিকে।

অতীশ কিছু বলল না। আসলে অতীশের ভেতরে সেই রাগী মানুষটা এখন একটা দৈত্যের মতো সব অগ্রাহ্য করতে চাইছে। সে দরজা ঠেলে গট গট করে ঘরে ঢুকতেই রাজেনবাবুর অন্তরঙ্গ সেই ডাক—আরে এস এস। কি রকম আছ? রাস্তায় কোন অসুবিধা হয়নি ত! কটার গাড়িতে এলে?

সঙ্গে সঙ্গে অতীশের রাগী মানুষটা ভোঁ করে কোথায় ছুটে পালাল। সে

আবার সেই অতীশ দীপঙ্কর'। সোজা সরল মানুষ। বলল, আর বলবেন না, বড় বেশি নিয়ম-কানুন বাড়িতে। সব ঠিক বুঝি না দাদা।

—ও ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে। এ-জন্য ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই।

অতীশ সোজা হয়ে বসল। না, সেই এক অন্তরঙ্গ কথাবার্তা। বড় সহজে দাদা মানুষকে কাছে টেনে নিতে পারেন। এটা একটা মানুষের বড় গুণ। অতীশ এতক্ষণ অযথা ভয় পেয়েছে। এবং মনে হল নতুন কাজে সে এভাবে সবসময় একটা শঙ্কা বোধ করে আসছে। আগে সে কম বয়সের ছিল, এখন বয়স হয়েছে অথচ সেই এক শঙ্কাবোধে সে পীড়িত হচ্ছিল। এটা ভারি দুর্বলতা জীবনে। সে নিজেকে সাহসী করে তোলার জন্য বলল, ঠিক বুঝতে পারছি না আপনার এখানে আমাকে কি করতে হবে।

ঘরে ভারি সুঘ্রাণ। যেন কেউ এইমাত্র কিছু স্প্রে করে দিয়ে গেছে। গোল অতিকায় মেহগনি কাঠের টেবিলের ও-পাশে রিভলবিং চেয়ারে কথা বলতে বলতে রাজেনবাবু ঘুরে ফিরে যাচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে কান চুলকাচ্ছেন পেনসিল দিয়ে। কাচের রং-বেরংয়ের দোয়াতদানি, নানা সাইজের বিদেশী কলম। একটা লাল পেন্সিল। এক পাশে ডাঁই-করা কাটা এনভেলাপ। তিনি কথা বলতে বলতে কাজ সারছিলেন। চিঠিপত্র দেখছিলেন। দরকার মতো জায়গায় জায়গায় লাল টিক-মার্ক। মাঝে মাঝে বেল টেপা। উর্দি-পরা সুরেন হাজির। এটা ওটা এগিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। অতীশের কথায় কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। বললেন, ও তেমন কিছু না। আমার একজন ভালমানুষের দরকার। জান তো সৎ মানুষের বড় অভাব আজকাল। তোমার কথা আমি গোবিন্দের কাছে শুনি প্রথম। তোমাকে দেখি বঙ্গসংস্কৃতিতে। গোবিন্দই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল—নিশ্চয়ই মনে পড়ছে সব।

অতীশ বলল, মনে আছে।

—আজকাল অকপট কথাবার্তা কেউ বলে না। তোমার কিছু কথাবার্তা আমার কাছে ভারি অকপট মনে হয়েছিল।

অতীশ বলল, আপনি একবার শুনেছি বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলেন, একজন সৎ-মানুষ চাই। ভাল মানুষ। বেঁচে থাকার সব রকমের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে।

—তুমি দেখেছিলে বিজ্ঞাপনটা।

—দেখিনি। গোবিন্দদাই বলেছেন। তিনিই আপনার কাছে চলে আসতে বললেন, কলকাতায় না এলে মানুষের নাকি কপাল খোলে না।

—তালে এটা বিশ্বাস কর?

অতীশ এখানে এসে, কি জবাব দেবে বুঝতে পারল না। সে স্কুলে চাকরি করত। বেশ ছিল। তখনই ঘুণপোকার মতো মাথায় কিটকিট করে অদৃশ্য এক চক্র ঢুকে যাচ্ছে। সে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল। কে যেন কোন সুদূর থেকে বলছে, ছোটবাবু মনে রাখবে, ইউ হ্যাভ এ গুড সোল। লার্ন টু বি ওয়াইজ। ডেভালাপ গুড জাজমেন্ট অ্যাণ্ড কমনসেন্স। সমুদ্র তোমাকে অযথা তবে ভয় দেখাতে পারবে না। জল, খাবার ফুরিয়ে গেলে মরীচিকা দেখবে সব অদ্ভুত রকমের। ভয় পাবে না। দেন প্রেজ দ্য লর্ড।

রাজেনবাবু বললেন, তুমি কিছু বলছ না কেন?

সংবিত ফিরে পাবার মতো অতীশ তাকাল। বড় বড় চোখ—কেমন অসহায় ছেলেমানুষের মতো চোখ দুটো এবং সে মাথা নিচু করে বলল, জীবনে খুব বড় হতে চাই না। সৎভাবে বাঁচতে চাই। আমায় শুধু এ সুযোগটুকু দেবেন। স্কুল আমাকে সে সুযোগটুকু পর্যন্ত দিতে চায় নি।

—আলবাৎ। তুমি কি ভয় পাচ্ছ! তোমার সঙ্গে সবার আলাপ করিয়ে দেব। এরা আমার বিশ্বস্ত লোক। তুমি খুশী হবে।

অতীশ বলল, শহর আমার এমনিতে ভাল লাগে না। বেশ ছিলাম। জানেন আমার স্কুলের সামনে ছিল রেল-লাইন, তারপর দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। স্কুল ছুটির পর কতদিন একা একা কতদূরে চলে গেছি। গাছপালার মধ্যে আলাদা একটা মজা আছে।

—থাকতে থাকতে এই শহরও একদিন ভাল লেগে যাবে।

অতীশ আর কি বলবে ভেবে পেল না। চাকরিটা সে প্রায় বলতে গেলে দুম করেই ছেড়ে দিয়েছিল। চাকরি ছাড়ার আগে কে যেন কেবল সুদূর থেকে বলত, ফলো ওনলি হোয়াট ইজ গুড।

অতীশের এমনই হয়। নতুন কাজে ঢুকলেই এমন হয়। কে যেন দূর থেকে তাকে বারবার সতর্ক করে দেয়। কবে সেই যে মানুষটার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল তারপর থেকে বিচলিত বোধ করলে, শুনতে পায় তিনি দূর অতীত থেকে বলে যাচ্ছেন, কেউ আমাদের ডাঙায় পৌঁছে দেয় না ছোটবাবু। নিজেকে সাঁতরে পার হতে হয়।

রাজেনবাবু বললেন, আমাদের একটা কারখানা আছে। আমার বাবার ঠাকুরদা কারখানাটা করে গেছিলেন। জানই ত জমিদারদের ওসব পোষায় না। বাবা-দাদাদেরও পোষাত না। এই শখ আর কি। কিন্তু এখন ত আমাদের শখ নয়। এটা প্রফেশান বলতে পার। তাই জায়গায় জায়গায় ঠিক ঠিক লোক বসিয়ে দিচ্ছি।

অতীশ বলল, কি করতে হবে।

—দেখাশোনা।

ঠিক বুঝতে না পেরে বলল, আমি ওসব ভাল বুঝি না। ওখানে কি হয়?

—কনটেনার। টিন কনটেনার। দেখলে সব বুঝতে পারবে।

—ওগুলো কোথায় যায়।

রাজেনবাবু হেসে ফেললেন। অনভিজ্ঞ। জানে না। কিন্তু ঐ যে বলে না, চোর-ছ্যাচোড়ের হাত থেকে কেড়ে নিতে না পারলে, ঠিক মানুষ বসাতে না পারলে কাজ হবে না। সময় এবং চর্চা সব ঠিক করে দেয় মানুষকে। রাজেনবাবু তক্ষুনি বেল টিপলেন, যেন যা বলার ছিল শেষ। সুরেন হাজির। কি বলতেই কেউ আর একজন ঘরে ঢুকল। রাজেনবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবেন। আজ থেকেই কাজে লেগে যাও। থাকার কোন অসুবিধা হবে না। মেস বাড়ি আছে। সেখানে খেতে পার। স্কুলে যা পেতে তার চেয়ে বেশিই পাবে। কি ঠিক! পরে কোম্পানির উন্নতি হলে তোমারও উন্নতি।

অতীশ এ-রাজেনবাবুকে যেন চিনতে পারল না। ব্যস্ত, তক্ষুনি যেন কোথাও জরুরী কাজে উঠে যাবেন—কেমন গম্ভীর কথাবার্তা। তার সরল সহজ মানুষটা বিচলিত বোধ করল। এবং ভেতরে অস্বস্তি। তবু হাতের কাছে কাজ, সে ছেড়ে দিতে পারে না। তার এখন যেভাবে হোক আবার ঝুলে পড়া দরকার। কলকাতায় এটা ১৯৬৪ সাল। সে বহু দেশ-বিদেশ করে, স্কুলের জীবন সাঙ্গ করে এক রাজার বাড়িতে হাজির। জীবনের নতুন পালা।

কথাবার্তা সারতে সময় বেশি লাগল না। প্রাইভেট অফিসের নধরবাবু তাকে সঙ্গে নিয়ে একটা এক কামরার ঘর দেখালেন। আপাতত এখানেই থাকা। পাশে বাথরুম—সামনে লম্বা বারান্দা। দোতলায় নিচের ঘরগুলিতে বচসা চলছিল—ওপরের ঘরগুলির চার নং ঘরটা তার জন্য বরাদ্দ। অন্য সব ঘরগুলোয় তালা মারা। দেয়ালের প্লাস্টার খসে পড়ছে। দেয়ালে ফাটল বড়

বড়। যে কোন মুহূর্তে সব ভেঙে পড়তে পারে। সে বুঝতে পারল তার কপালই এমন। লঝঝড়ে। সে ঘুরে ফিরে দেখতে চাইল, কোথায় কতটা রেলিং ভাঙা, কোথায় কখন ফাটল আরও প্রশস্ত হতে হতে আকাশ দেখা যেতে পারে, এবং তখনই সে বিস্মিত হল দেখে, শেষ ঘরে কেউ বসে আছে। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। আশ্চর্য সুপুরুষ। তার পাগল জ্যাঠামশাইর মতো চুপচাপ। দেয়ালের দিকে নিথর চোখ। জানালায় সে, নতুন লোক—কিছু আসে যায় না যেন। তারপরই সে কেমন বিমূঢ় হয়ে গেল—দরজার বাইরে থেকে তালা মারা। 'লোকটাকে আটকে রাখা হয়েছে তবে!

এই রাজবাড়ির কেতাকানুন ঠিক সে জানে না। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক কিনা তাও সে জানে না। তাড়াতাড়ি সে সরে যাবার সময়ই ডাকল, হেই নবীন যুবক।

অতীশ ঘুরে দাঁড়াল।

—হেই নবীন যুবক তালাটা খুলে দেবে?

অতীশ বুঝল পাগল মানুষ। আটকে রাখা হয়েছে। সে চলে যাচ্ছিল। আবার ডাক—হেই নবীন যুবক দরজাটা খুলে দাও। ভগবান তোমার ভাল করবেন।

কথাবার্তা খুবই স্বাভাবিক। তার বলতে ইচ্ছে হল, আপনাকে কে আটকে রেখেছে?

—ঈশ্বর। তিনি মাথার ওপরে হাত তুলে দেখালেন।

অতীশ ভাবল বারে বা, এত প্রায় অন্তর্যামী। লোকটা মুখ দেখলে মানুষের ভেতরটা দেখতে পায়। তার কৌতূহল হল। বলল, পাশের ঘরগুলিতে কারা থাকে!

—বাবুরা থাকে।

তখনই অতীশ লক্ষ্য করল বারান্দার ওপর আর একটা দরজা বসানো। দরজাটা দিয়ে এই মানুষটির ঘর একেবারে আলাদা করে রাখা হয়েছে। দরজা খোলা রেখে গেছে কেউ ভুলে। সে এ জন্য এদিকটায় ঢুকতে পেরেছে। পৃথিবী থেকে লোকটাকে গোপনে রাখার জন্য বড়ই সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। লোকটার কি অপরাধ জানার ইচ্ছে হল তার। নীচে দেখল নধরবাবু হন্তদন্ত হয়ে আসছেন। হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়ি ভেঙে দোতালায় উঠলেন, ওকি করছেন অতীশবাবু। দরজা খুলল কে? ওখানে না, ওখানে না। সঙ্গে সঙ্গে বড়

একটা তালা ঝুলিয়ে চলে গেলেন। এবার বারান্দা থেকে সোজা পুবের দিকে তাকালে বড় তালাটাই কেবল চোখে পড়ে। ওখানে একটা আলাদা ঘর, কার বাপের সাধ্যি আছে আর টের পায়।

বিকেলের দিকে অতীশ নিজের ঘরে শুয়েছিল। একটা তক্তপোশ চাদর তোষক বালিশ রাজবাড়ি থেকেই এসেছে। সবই নধরবাবু ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বলে গেছেন, আজ বিশ্রাম করুন। কাল খবর দেব। রাতের খাবার ঘরেই আসবে। চা আসছে। কিছু দরকার হলে বলবেন। কোন সংকোচ করবেন না। নিজের বাড়ি মনে করবেন॥ একই পরিবারের লোক ভাববেন। তবে আর কোন কষ্ট থাকবে না। আমি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ওদিকের কোয়াটার-গুলোতে থাকি। নিচের তলায় আমার ঘর। বলে তিনি চলে গেছিলেন। তারপর এলেন আরও একজন প্রবীণ মানুষ। লম্বা, বেশ সৌখিন। কানে আতর মাখানো তুলো গোঁজা। মাথায় প্রশস্ত টাক। বিছানায় বসে বললেন, তোমার বাবা আমাকে চেনেন। আমার নাম রাধিকাবাবু।

অতীশ রাধিকাবাবুর নাম শুনেছে। কুমার বাহাদুরের বাবার আমলের লোক। তিনি বললেন, যে ক'দিন ঠিকঠাক না হয়ে বসছ, সে ক'দিন আমার বাড়িতে ডালভাত খাবে। কাল থেকে মনে থাকে যেন। এরপরই এল গোলগাল চেহারার একজন মানুষ। বলল, আমার নাম রজনীবাবু। একে একে অনেকেই এল, পরিচয় দিল, কুমারবাহাদুরের কোন কোন কনসার্নে কে আছে, কি করে এবং দুটো চারটে উড়ো কথাও বলে গেল। মশাই, স্কুলে ছিলেন বেশ ছিলেন। এখানে মরতে এলেন কেন? সে ঠিক বুঝল না কি জবাব দেবে। তারপরই সে শুয়ে পড়েছিল। নতুন জায়গায় এলেই তার মন খারাপ হয়ে যায়। মুখচোরা মানুষদের যা হয়। প্রায় লাইনবন্দী হয়ে লোক এসে দেখা করে যাওয়ায় কিছুটা ঘাবড়েও গিয়েছিল। এত খাতির! তারপর সে দেখল, একজন লাঠি হাতে লোক সেই আটকে রাখা মানুষটাকে নিয়ে তার দরজার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। মানুষটা তার জানালায় এসে নড়তে চাইল না। অতীশ কেন জানি সম্ভ্রমবোধে নিজেই উঠে গেল। মানুষটা সহসা কানের কাছে মুখ এনে কি বলতে চাইল—সবটা সে শুনল না। খুন-টুনের কথা। নবীন যুবক তুমি খুন হয়ে যাবে এমন কথাটথা। সবটা শোনার আগেই লোকটা ঠেলতে ঠেলতে সেই মানুষটাকে সিঁড়ির দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকল। অতীশ দরজা থেকে নড়তে পারছে না। কেমন আড়ষ্ট ভাব। সুদূরে তখন কেউ

যেন হেঁকে যাচ্ছে, হাই ছোটবাবু ভয় পাচ্ছ কেন! স্ট্রাগল ইজ দ্য প্লেজার। গো অন।

রাতেই অতীশ ভেবেছিল, স্ত্রীকে চিঠি লিখবে। ওর ধারণা ছিল, নির্মলা তার এটাচিতে খাম রেখে দিয়েছে। কারণ কোথাও গেলে নির্মলার এটা স্বভাব। পৌঁছেই একটা চিঠি। সময়মত চিঠি না পেলে নির্মলা ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু এটাচিটা খুলে দেখল, খাম অথবা পোস্টকার্ড কিছুই রাখেনি। নির্মলার এত বড় ভুল হয় না। পরে মনে হল, নির্মলা ওকে ছেড়ে থাকতে হবে ভেবে খুব ভেঙে পড়েছিল। কারণ বিয়ের পর সে অতীশকে ছেড়ে বেশিদিন থাকে নি। কলকাতায় অতীশ যাচ্ছে। সেখানে কি কাজ কি মাইনে, কিছুই জানা নেই। সেখানে এমন মাইনে আশা করে না যাতে করে বাসা ভাড়া করে থাকতে পারে অতীশ। বাসার খরচ চালিয়ে এমন উদ্বৃত্ত আয় অতীশের হবে না, যাতে করে বাবা-মা ভাই-বোনেদের ভরণপোষণ করতে পারে। ফলে নির্মলা ভেবেছিল, অতীশ প্রবাসী হয়ে গেল। তার সঙ্গে মাঝে মধ্যে এবার থেকে কখনও কখনও প্রবাসী মানুষের মতোই দেখা হবে। এই বেদনাবোধে সে ক'দিন থেকেই পীড়িত হচ্ছিল এবং ভুলটাও তার সে-জন্য হয়েছে।

চিঠিটা লেখা খুব জরুরী ভাবল। চিঠিটার জন্য নির্মলার অপেক্ষা কি গভীর সে এ-মুহূর্তে টের পাচ্ছে। নধরবাবু তাকে সাহায্য করতে পারে। সে নধরবাবুর কাছেই একটা খাম পেয়ে গেল। এবং ঘরে এসে প্রথমেই লিখল, কল্যাণীয়াসু—এখানে মঙ্গলমতো পৌঁছেছি। আজ থেকেই কাজে বহাল হলাম। মাইনে স্কুলে যা পেতাম আপাতত মনে হচ্ছে তার চেয়ে বেশিই হবে। মূল প্রাসাদ সংলগ্ন একটা দোতলা বাড়িতে এক কামরার ঘর দিয়েছে। সেখানে আছি। কোন অসুবিধা নেই। তারপরই লেখার ইচ্ছে হল, কিছু কিছু ঘটনা চোখে খুব ঠেকে। কিন্তু এটা লেখা যুক্তিযুক্ত ভাবল না। নির্মলার স্বভাব এক-টুকুতেই ভেঙে পড়া। তখন ওর শরীর ভেঙে পড়ে। বিয়ের আগে নির্মলা ভারি সুন্দর ছিল দেখতে। চোখে মুখে বালিকাসুলভ হাসি লেগেই থাকত। কিন্তু একজন স্কুল শিক্ষকের পক্ষে আর্থিক নিরাপত্তা তত প্রবল ছিল না বলে তাকে প্রায়ই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলত। আর বিয়ের বছর চার না যেতেই পেটে মিন্টু টুটুল হাজির। তখন নির্মলার এমনও মনে হয়েছে অতীশ অবিবেচক। অতীশ বাইরের বারান্দায় অনেকদিন চুপচাপ সন্ধ্যায় নির্জনে বসে থেকেছে

সেজন্য। বারান্দা থেকে গাছপালার ফাঁকে কিছু নক্ষত্র দেখা যেত আকাশে। অনেক দূরের নক্ষত্র দেখতে দেখতে সে এক রহস্যময় জগতে ডুবে যেত। সেই জগৎ স্বপ্নের মতো। কোনো দূরাতীত স্বপ্ন তাকে তাড়না করে বেড়ালে, নির্মলা বলত, এই অন্ধকারে চুপচাপ কেন। আমি তোমাকে কিছু বলেছি! তুমি রাগ করেছ?

অতীশ নির্মলার কথায় বলত, না না। এমনি বসে আছি।

নির্মলা বলত, তুমি মাঝে মাঝে এত কি ভাব বলত!

—কৈ ভাবি!

—বাবা কখন থেকে প্রসাদ নিতে ডাকছে।

—বৈকালি হয়ে গেছে?

—কখন! কাঁসিঘন্টা বাজল শুনতে পাও নি। কোথায় চলে যাও বলত!

অতীশ বুঝল সে ধরা পড়ে গেছে। সে বলল, গল্পের একটা চরিত্র ভারি কূট খেলা খেলছে। ঠিক ধরতে পারছি না।

অতীশ সমুদ্র থেকে ফিরে আসার পর পত্রপত্রিকায় ছোট্ট একটা খবর বের হয়েছিল। সেই খবর থেকেই অতীশ কোন কাগজের সম্পাদকের নজরে পড়ে গেছিল। একটা লেখা লিখেছিল, সুনাম পেয়েছে। দুটো একটা লেখা লিখলে সযত্নে ছাপা হয়ে যায় বলে বাড়তি কিছু পয়সা আসে। ফলে চর্চা করে লেখার। এমন কথায় নির্মলা আর কোন অভিযোগ তুলতে পারত না। সে বলত, এস খাবে। বাবা তোমার জন্য বসে আছেন।

তারপরই কেন জানি মনে হল তার, অসীম অনন্ত আকাশের নিচে জীবন বয়ে যায়। তার জীবন বয়ে যাচ্ছে, ভাঙা হাল ছেঁড়া পাল নৌকায়। কখনও হাওয়া বয়, পালে হাওয়া লাগে। মনে হয় জীবন বড়ই মনোরম। কখনও হাওয়া থাকে না, পালে হাওয়া লাগে না—নিঝুম চারপাশ, বড়ই গুমোট। চাকরি ছেড়ে দেবার পর এমন মনে হয়েছিল তার। আবার পালে বাতাস লেগেছে—নিরুদ্দিষ্ট যাত্রা—কারণ সে জানে না, কোথায় কিভাবে সে শেষপর্যন্ত কোন ঘাটে নোঙর ফেলবে। সে এ-জন্য তার চিঠিতে চাকরি পাবার কথাটা খুব উৎসাহের সঙ্গে প্রকাশ করতে পারছে না। দ্বিধা আছে এখনও। তারপর সেই মানুষটার ফিসফিস কথাবার্তা—তুমি খুন হয়ে যাবে নবীন যুবক—ঘরের চারপাশটা সে দেখল, বড়ই জীর্ণ আবাস। অনেকদিন এদিকটায় কোন সংস্কার হয়নি। দেয়ালের কোথাও ইট বের হয়ে আছে। ছাদের কড়ি বরগা

আলগা। চাপা পড়তে পারে—আসলে কি এই ঘরটায় তাকে থাকতে দিয়েছে বলেই মানুষটা তাকে এভাবে সতর্ক করে দিয়ে গেল! সে ভাবল, কালই কুমার বাহাদুরকে বলবে, একটা ভাল থাকার ঘর দিন। ভয় করে। যে কোন সময় ধসে পড়তে পারে সব। এ-সব কিছুই চিঠিতে লেখা চলে না। আর কি লিখবে বুঝতে পারছে না। বাবা-মার খবর, ঠিকমত পত্রের জবাব, টুটুল এবং মিন্টুর খবর নিতে পারে। সেত শেষ লাইনে এগুলি লিখবেই। নির্মলাকে আরও কিছু লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে। আসলে এত ছোট চিঠি পেলে নির্মলা দুঃখ পাবে। সে লিখল, নির্মলা আমি-ফেমিলি কোয়ার্টার পাব মনে হচ্ছে। পেলে, এখানকার কোন স্কুলে যদি কোনরকমে ঢুকিয়ে দিতে পারি তবে খুব অসুবিধা হবে না। আমার টাকায় এখানকার খরচ, তোমার টাকায় ওখানকার খরচ। তুমি নিজেও জান, তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পার না। এক রববারের ছুটিতে চলেও যেতে পারি। কবে যাব লিখব না! গিয়ে অবাক করে দেব! আর কি লিখব। লিখতে পারে! প্রাসাদের কথা লিখলে চিঠিটা বেশ বড় হয়ে যাবে। সে লিখল সব ঘুরে ফিরে দেখলাম। কলকাতার ওপর এমন খোলামেলা জায়গা আশাই করা যায় না। একটা খুদে সাম্রাজ্য বলতে পার। প্রাসাদের চারপাশে বিরাট জেলখানার মতো পাঁচিল। বাইরে থেকে মনে হবে, কেউ থাকে না বাড়িটাতে। ভেতরে ঢুকলে টের পাওয়া যায় সব। বড় বড় দুটো পুকুর, খেলার মাঠ, গোয়ালবাড়ি, বেয়ারা বাবুর্চি খানসামাদের থাকার জন্য একটা ছোটখাট পাড়া আছে। ছোট ছোট ঘর—বস্তির মতো কিছুটা। বাবুদের জন্য মাঝারি সাইজের ঘর। কিছুটা ছিমছাম। প্রাইভেট সেক্রেটারির জন্য আলাদা দোতলা বাড়ি। গাছপালা ফুলের বাগান। সবই আছে—তুমি থাকলে আরও ভাল লাগত নির্মলা। তারপরই কেন যে লিখল, আমি সাঁতার কাটছি। পারে উঠব বলে সাঁতার কাটছি। কতদিন থেকে সাঁতার কাটছি। ঠিক একদিন তীর দেখতে পাব। আর তখনই মাথার মধ্যে ঠুক ঠুক করে কে যেন তার পেরেক পুঁতে দিচ্ছে।

—না ছোটবাবু সামনে কিছু দেখা যাচ্ছে না।

—কিছু না?

—না।

—পাখিটা?

—এলবা এলবা! ছোটবাবু চিৎকার করে ডাকতে থাকল, হোয়েআর ইউ

আর। নট ইন দা স্কাই, নট আপন দা সি—হোয়েয়ার ইউ আর? অতীশ চিঠি লেখা বন্ধ করে দিল। ছোটবাবু তুমি কে, তুমি কেন আবার আমার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছ! তোমাকে আমি কবে কোথায় রেখে এসেছি ঠিক মনে করতে পারছি না। আসলে মনে করতে পারছি না, না মনে করতে আর চাই না। তুমি মাঝে মাঝে এমন বিড়ম্বনায় ফেলে দাও কেন? কেমন আচ্ছন্ন বোধ করি। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, আমার একসময় একজন ছোটবাবুর জীবন ছিল। তারপরই কেমন অসহায় চোখে তার দিকে কে যেন তাকিয়ে থাকে। সেই চোখ দুটো কবেকার দেখা যেন—মাথার মধ্যে স্মৃতি কুট কামড় লাগালে সে অস্থির হয়ে ওঠে। এবং সে জানে, তবে সারারাত তার আর ঘুম হবে না। শুধু এ-পাশ ও-পাশ করবে। একা থাকলে এসব বেশি মনে হয়। পাশে নির্মলা থাকলে, মিণ্টু টুটুল থাকলে, বাবা মা থাকলে সেই স্মৃতি সহজেই সে ভুলে থাকতে পারে। এবং বিড়ম্বনার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই অতীশের মনে হল, নির্মলাকে পাশে দরকার। তা না হলে সে পাগল হয়ে যেতে পারে। বংশে এটা আছে। এবং সেই শৈশবের কোন পাগল মানুষের জীবন, তার জীবনে এসে ধীরে ধীরে ভর করার একটা চক্রান্ত করছে।

কারণ কখনও মনে করে কোন সমুদ্রগামী জাহাজের সে নাবিক, কখনও মনে হয়, গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে সে পথ হাঁটছে। আবার কখনও দেখতে পায় নীল আকাশ, বিশাল সমুদ্র, একটা অতিকায় পাখি, নিরিবিলি আকাশ, সব শেষে একটা সামান্য বোটে সে আর এক বালিকা। কখনও মরীচিকার মতো সমুদ্রের অপদেবতারা তার পিছু নেয়। সেইসব অপদেবতারা যেন এখনও তাড়া করে বেড়াচ্ছে। জলে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, ছায়া ছায়া মূর্তি, সব কঙ্কালের মতো আকাশে ভাসমান। একে একে নেমে আসছে তারা। হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে চাইছে। আর এলবার ডাক, এলবা যেন সেই অপদেবতাদের প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য মাঝে মাঝেই হাঁকছে—আমাকে অনুসরণ কর। একদিন না একদিন মাটি দেখতে পাবে। মাটি দেখতে পেলেই অপদেবতারা আর ভয় দেখাতে পারবে না।

অতীশ একসময় দেখল, খাম খোলা, চিঠি লেখা বন্ধ। অন্য এক যুবক এসে তাকে বলছে, কি কেমন আছ? সে কে? দেখতে পেল, সে আর কেউ নয়, সেই ছোটবাবু। তার আগেকার স্মৃতি।

ছোটবাবু বলল, আমি মরে গেছি ভেব না।

অতীশ বলল, জানি।

—তুমি পাপ কাজ করেছ।

অতীশ বলল, না না আমি কোন পাপ কাজ করিনি।

—তুমি খুন করেছ। কেউ সাক্ষী নেই। কেবলমাত্র আমি এখনও সাক্ষী।

অতীশ বুঝল, আজ তাকে ছোটবাবু আবার জ্বালাবে। সে বাথরুমে ঢুকে চোখে মুখে জল দিল। ঘাড়ে জল দিল। ভাবল স্নান করলে ভাল হয়। সে তারপর স্নান করে নিল। এবং সে বাইরের দিকে তাকাল। গাড়িবারান্দার বড় আলোটা জ্বলছে। ঘরে ঘরে আলো। মানুষজন অনেক থাকে এ বাড়িতে। রাত খুব বেশি হয়নি। গাঁয়ের মতো ন'টা বাজলেই যে বেশি রাত ভাবা সেটা এখানে অচল। বরং যেন সারাদিন সব মানুষের খাটাখাটনির পর এখন একটু হৈ-চৈ করা। পাশের ঘরে কারা তাস খেলছিল। এদের কাউকে সে এখনও ভাল চেনে না। তাস খেলায় তার কোন আকর্ষণও নেই। সে খেলাটা কখনও শেখার চেষ্টা করেনি। আজ কেন জানি প্রথম মনে হল, এমন একটা আকর্ষণ জীবনে তৈরি করা দরকার। এখন এই খেলাটা জানলে কত কাজে লাগত। আর যাই হোক ছোটবাবু অসময়ে এসে তাকে বিব্রত করতে পারত না।

সে তাড়াতাড়ি চিঠিটা নিয়ে আবার বসল। বুঝতে পারল জীবনে এমন অনেক সময় আসে যখন আর এক লাইন বেশি ভাবা যায় না। সে চিঠিটা সংক্ষিপ্ত করল। খুব ছোট চিঠি। এবং খামে ভরে ঠিকানা লিখে বের হয়ে গেল। এখন তার চারপাশে কিছু মানুষজন দরকার। অন্তত রাস্তায় বের হয়ে যদি হাঁটতে হাঁটতে দোকানপাট দেখতে দেখতে আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে।

ছোটবাবু বলল, পালাচ্ছ কেন?

—কৈ পালাচ্ছি!

—পালাচ্ছ না! কিন্তু যাবে কোথায়?

—কোথাও না।

—খুব সাধুজন হয়ে গেছ না!

অতীশ বলল, দেখ ছোটবাবু আমি নিজেকে সাধুজন ভাবি না। তবে আমি খারাপ মানুষ না। ভাল থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। স্কুলে তুমি দেখলে ত কেমন চক্রান্ত করছিল তারা।

—তোমার জন্য ওদের অসুবিধা হচ্ছিল। ওরা তা সহ্য করবে কেন?

—তাই বলে মিছিমিছি আমাকে ভাউচার সই করে দিতে হবে। যা নয় তাই লিখতে হবে!

—লিখলেই পারতে। চাকরি ছাড়ার কি হল!

অতীশ বলল, ওদের সঙ্গে পেরে উঠছিলাম না।

—এখানে পেরে উঠবে?

—আমি জানি না ছোটবাবু।

সিঁড়িটা অন্ধকার। অতীশ পা টিপে টিপে নামছিল। সিঁড়িতে তবে কেউ আলো জ্বেলে দেয় না। হয়ত দেওয়া হয়, কেউ নিয়ে যায়। সে পা টিপে টিপে নামছিল। ছোটবাবু এখনও গা ঘেঁষাঘেঁষি করে আছে। প্রায় তার শরীরের সঙ্গে লেপ্টে থাকার মতো। যখনই কোন অনিশ্চিত জীবনে সে পা দেয়, তখনই ছোটবাবুর যেন পোয়াবারো। আবার পাওয়া গেছে। সে নামতে নামতে বলল, কতক্ষণ থাকবে? দেখি কতক্ষণ থাকতে পার। আমি গেলে তিনি খুব খুশী হবেন। রাধিকাবাবুটি খুব কুমারবাহাদুরের বিশ্বাসীজন। এ-রাজবাড়িতে পাকশালায় প্রথম কাজ নিয়ে এসেছিল কুমারবাহাদুরের বাবার আমলে। সেই মানুষ এখন রাজবাড়ির অফিস সুপার। খুব প্রতাপ মানুষটির। তিনি নিজে এসে ঠিকঠাক হয়ে না বসা পর্যন্ত বাসায় খেতে বলেছেন। খুব আপনজনের মতো ব্যবহার। এ-সব ভেবে সে নিচে নামল। সামনে সবুজ লন, সারি সারি কামিনীফুল এবং গন্ধরাজ ফুলের গাছ। কিছু ফুলের গন্ধ আসছিল। সে দাঁড়িয়ে গা ঝাড়া দিল। কাউকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল। দেখলে কেউ ভাববে মানুষটার জামার মধ্যে পোকা ঢুকে গেছে। সে গোপনেই এসব করে থাকে। কারণ তার জানা আছে সবার সামনে সে এটা করলে তার মধ্যে কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার আছে টের পাবে। আর তখনই অন্ধকার ছায়া থেকে কে যেন উঠে এসে বলল, না না জামা ঝাড়বে না। ওখানে কিছু নেই। আরে সেই লোকটা। যেন বিয়েবাড়ি থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছেন। পরনে আদ্দির পাঞ্জাবি পাটভাঙা ধুতি। হাতে বেলফুলের মালা। একা। সঙ্গের সেই লাঠিয়ালটিও নেই। পায়ে শুঁড়চকচক করছে। খুবই দিলদরিয়া মেজাজ। মুখ কামানো।

অতীশ বলল, আপনি!

—এই ভ্রমণ সেরে এলাম।

—কোথায় গেছিলেন।

—রাজবাড়ি।

—এটাই তো রাজবাড়ি।

—ধুস। বলে, ছোটবাবুর হাত চেপে ধরল। বলল, নবীন যুবক, একা থাকতে ভয় পাচ্ছ!

—না না। রাধিকাবাবুর বাসায় যাব বলে বের হয়েছিলাম।

মাথার ওপরে আলো আছে একটা। অতীশের চোখমুখ স্পষ্ট। সে ভাল করে অতীশের মুখটা দেখল। বলল, না না এ-ভাবে ভয় পাওয়া ঠিক না। আমি এভাবে ভয় পাই না। আমার সঙ্গে এস। ভয় পেলে মানুষের জীবনে করার কিছু থাকে না। আমার মতো তোমাকে তখন ভূতে পেয়ে বসবে।

লোকটা তার হাত ধরেই আছে। যেন কত চেনাজানা মানুষ। নির্বান্ধব শহরে বড়ই বান্ধব। হাত ছাড়ছে না। গা থেকে আশ্চর্য সুবাস উঠছে। অতীশ কি করবে ভেবে পেল না। কি বলবে বুঝতে পারল না।

—দাঁড়িয়ে থাকলে কেন, এস।

—কোথায়?

—কেন, আমার ঘরে। তখন উঁকি দিয়েছিলে, এখন ভাল করে দেখে যাও।

—আপনার ওখানে যেতে বারণ।

—কে বারণ করেছে।

নাম বলতে অতীশ ইতস্তত করছিল। তারপর মনে হল, তখন এই বাবুটি তো লোকটিকে দেখেছে। তার সামনেই সতর্ক করে দিয়ে গেছে অতীশকে। সে বলল, কেন দেখেন নি!

—অ হ, নধর। সেই ইতর লোকটা। রাজার খায়, রাজার দাড়ি উপড়ায়। ওর কথা তোমাকে শুনতে কে বলেছে।

—না, উনি তো…।

—আরে কিছু না। এ-বাড়িতে কার তেজ কত, কখন কতটা থাকে কেউ কিছু বলতে পারে না।

অতীশ ভেবে পেল না এমন কেন হয়। দুপুরে এই লোকটাকেই আটকে রাখা হয়েছিল। এখন এই লোকটা ভীষণ তেজের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। মাথায় কোন গণ্ডগোল নেই। একেবারে সংসারী মানুষের মতো কথাবার্তা।

—আরে এস এস। নবীন যুবক, তুমি অত কি ভাবছ। সংসারে যত ভাববে তত মরবে।

অতীশ অগত্যা লোকটাকে অনুসরণ করল। সিঁড়ি পার হয়ে দোতলায় উঠতেই দেখল, চুনট করা শান্তিপুরী ধুতি পরনে। যেন কেউ তাকে সাজিয়ে দিয়েছে।

লোকটির কি তবে কারাদণ্ড হয়েছিল। রাজবাড়িতে গোপনে কি সেই আগেকার বিচারের বিধি ব্যবস্থা আছে! নির্দোষ প্রমাণিত হবার পর পুরস্কার মিলেছে! স্বৈরাচারী রাজরাজড়াদের এমন কত খামখেয়ালীর কথা সে বইয়ে পড়েছে। কে জানে এই যে এখানে দুম করে চাকরিটা সে পেয়ে গেল, সেটাও কোনো খামখেয়াল কিনা। সে ভয়ে ভয়ে অগত্যা তাকেই অনুসরণ করতে থাকল। এই মানুষটাকেই এ-বাড়িতে স্বাধীন মনে হল তার। সে তার খুশিমতো চলে। পছন্দ না হলে, তালা দিয়ে রাখে, পছন্দ হলে বেশভূষায় সাজিয়ে দেওয়া হয়। আজ এমন কি ঘটেছে যার জন্য মানুষটির কপাল খুলে গেল! অতীশের কিছুটা কৌতূহল, সেই দুপুর থেকে এই লোকটা তাকে অজস্র চিন্তা ভাবনার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। তাকে বলে গেল কেন, তুমি খুন হয়ে যাবে নবীন যুবক।

ওরা যেতেই তাস খেলার কেউ একজন বলল, ঐ যায়। আর একজন বলল, ও মানসদা ছুটি মিলেছে বুঝি!

—তাস খেলছ খেল। বাজে কথা বল কেন?

লোকটির নাম তবে মানস। সে বলল, মানসদা আপনার ঘরে যাওয়া আমার ঠিক হবে?

—আমি তোমাকে খেয়ে ফেলব ভাবছ।

—না তা না···

ওরা তখন দরজার কাছে এসে গেছে। মানসদা দরজায় দাঁড়াতেই একজন নফর লোক তাকে কুর্নিশ করল। সে মানসদার ঘরদোর সব সাফ করে দিচ্ছে। ঝাড়পোঁচ করছে। ধুলো উড়ছিল। মানসদা অতীশকে বলল, নাকে রুমাল দাও। শহরের ধুলো গাঁয়ের ধুলো এক মনে কর না, এখানকার ধুলোতে সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু খুব বেশি থাকে।

প্রায় বস্তাখানেক ছেঁড়া কাগজের টুকরোর একটা ডাঁই। এই ঘরে এত ছেঁড়া কাগজ আসে কি করে! অতীশ একটুকরো ছেঁড়া কাগজ তুলতেই দেখল, ওতে গুড়ি গুড়ি লেখা। পিঁপড়ের মতো, আলোটা জোর নয় বলে সে পড়তে পারছে না। মানসদা কেমন ক্ষেপে গিয়ে ওর হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিল, তুমি বড়ই আহাম্মক দেখছি এ-সব পড়তে হয় না। অনেক গূঢ় কথা

লেখা আছে। এমনিতেই মাথা খারাপ করে ফেলেছ, এ-সব পড়ে আরও মাথা খারাপ হয়ে যাক আর কি! এই বেটা, বাঙ্গাল ভূত, কাগজগুলি নিচে নিয়ে পুড়িয়ে দিবি।

—তাই অর্ডার আছে হুজুর।

মানসদা কেমন ভূত দেখার মতো অতীশকে দেখল। ছোঁড়াটা মরবে। তারপর মুখ চেপে দিল হাতে। একটা কথা না আর। তোমাকে ঢুকতে দিয়েছি এ-ঘরে। মনে রাখবে, অনেক জন্মের পুণ্যফল এটা। তুমি জান না, কতটা তোমার অধিকার! তারপর পা টপকে শুচিবাই মানুষের মতো নিজের খাট পর্যন্ত গেলেন। সোফা আছে, সেণ্টার টেবিল আছে, পাখা আছে, ঘরের ক্নাটিলে কিছু লেখা গোপনে ঢুকে যাচ্ছিল, অতীশ সেই লেখা দেখতে গেলেও টেনে আনল। বলল, বোস। ঠিক হয়ে বোস। অন্যের গোপন লেখা দেখতে হয় না। অনেক দেশ-টেশ ঘুরেছ শুনেছি—এ আক্কেলটা হয়নি কেন?

তারপর সোফায় বসে ওপরের দিকে চাইলেন। গুনগুন করে গানের কলি ভাঁজলেন একটা—ও ফুলবনে যেও না ভোমরা। তোমার কেমন লাগছে সুরটা। খাওয়া হয়েছে? অসুবিধা হলে বলবে।

এতগুলো প্রশ্নের একসঙ্গে জবাব দেবে কিভাবে! সে বলল, বেশ ভাল ঘর। বড়। একজনের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু অতীশ বিস্মিত, এই মানুষটি প্রায় তার সব জানে। সে বলল, বিদেশ টিদেশ ঘুরেছি আপনাকে কে বলল?

এটা রাজার বাড়ি। নবীন যুবক, তোমার নাম অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক। স্কুলে হেডমাস্টার ছিলে। পোষাল না। ছেড়ে দিলে। এখানে সব চাউর হয়ে যায়। এখানে কিছু গোপন থাকে না। কত পাপ এ-বাড়িতে, সবাই মনে করে বড়ই গোপন—কাকপক্ষীতেও টের পায় না! তারপর থেমে থেমে বললেন, নবীন যুবক, ঈশ্বরের বাগানের চেহারাটাই এই। এত ভাব কেন?

নফর লোকটা ছেঁড়া টুকরো কাগজগুলো এখন বারান্দায় বস্তাবন্দী করছে। পরনে খাকি হাফ-প্যাণ্ট হাফ শার্ট। ছেঁড়া। জায়গায় জায়গায় ছিট কাপড়ে তালি মারা। সে তারপর আবার ঘরে ঢুকে দেখল, কোথাও যদি ভুলক্রমে এক টুকরো থেকে যায়—না নেই। নিশ্চিন্তে সে সেই গন্ধমাদনটি মাথায় নিয়ে চলে গেল। মানসদা উঠে গিয়ে লোকটার নির্গমন দেখলেন। এবং বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। এঘরে অতীশ আছে যেন তাঁর আর মনেই নেই। সে এবার ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। দেয়ালে হিজিবিজি লেখা। কাঠ

কয়লা পেনসিল, ইটের টুকরো যখন যা হাতের কাছে পাওয়া গেছে তাই দিয়ে লেখাগুলোর কাজ সারা হয়েছে। আর বিচিত্র সব জীব-জন্তুর মুখ। এসব যেন পৃথিবীর নয় অন্য কোন সৌরলোকের। প্রতিটি জীবজন্তুর নিচে কিছু লেখা। উঠে না গেলে পড়া যাবে না। কিন্তু উঠতে সংকোচ হচ্ছে। অথবা বড় সংক্রামক ব্যাধির মতো সেই যে ভয় গ্রাস করেছে তাকে তা থেকে, সে কিছুতেই অব্যাহতি পাচ্ছে না। সে কারণে সে বসেই থাকল। জীব-জন্তুগুলো কাছে গিয়ে দেখতে পেল না। কিছুটা হাঁসজারু হাতিমি বকচ্ছপের মত এরা দেয়ালে উঁকি দিয়ে আছে। ছবিগুলো দেখে শিল্পীর নিখুঁত হাতের প্রশংসা করতেই হয়। চারপাশের দেয়ালে এমন সব হিজিবিজি অজস্র লেখা আর জীবজন্তুরা একত্রে কতদিন থেকে যেন বাস করে আসছে।

তখনও মানসদা দাঁড়িয়ে আছেন রেলিং ভর করে। অতীশ দেখল, বিছানার চাদর বালিশের ওয়াড় পাট ভাঙা। এই মাত্র বদলে দিয়ে গেছে কেউ। সেন্টার টেবিলে ফুলদানি, ওতে রজনীগন্ধার গুচ্ছও রাখা হয়েছে। তাজা শিশির বিন্দুর মতো ফোঁটা ফোঁটা জল লেগে আছে গায়ে। সে হাত দিয়ে দেখল, হাতে জল লাগছে। এত তাজা আর নিটোল ফুলের পাপড়ি—আর দেয়ালে অস্বাভাবিক সব কথাবার্তা। অদৃশ্য গোপন ইচ্ছার এক প্রিয়তম খেলা। গানের কলি থেকে তার মনে এমনই কিছু প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু মানসদা রেলিঙে এখনও অনড়। কি দেখছেন! সে তখন দূর থেকেই দেখতে পেল, সেই বড় মাঠটায় অগ্নিশিখা। তারপর দাউদাউ করে কিছু জ্বলে গেল। মানসদা আগুনে জ্বলতে দেখলেন— তাঁর স্বর্বস্ব কেউ যেন জ্বালিয়ে দিচ্ছে। তিনি ঘরে ফিরে বললেন, ঈশ্বরের বাগানে রোজ এমন কত ঘটনা ঘটছে, কে আমরা তার খবর রাখি।

অতীশ দেখল মানুষটির চোখ এখন ভারি বিষণ্ণ। তার সঙ্গে আর একটি কথা বলছে না। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছেন। যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। কারণ মানুষটার শরীর কেঁপে কেঁপে যাচ্ছিল। খোলস বদলাবার সময় সরীসৃপদের যাতনার মত এক অতীব যাতনা সারা শরীরে তার কষ্টের সূচ ফোটাচ্ছে কেউ।

অতীশ এতে ভারী বিড়ম্বনা ভাবল। কিছুই জানতে পারছে না। কাউকে কোন প্রশ্নও করতে পারছে না। নতুন মুখ সব। এসে বুঝেছে—এখানে অদৃশ্য কিছু চক্রান্ত সব সময়েই চলছে। দৈবের মতো হঠাৎ তা কারো মাথার ওপর নেমে আসে। যখন টের পাওয়া যায় তখন আর করার কিছু থাকে না।

সে অগত্যা বলল, উঠছি মানসদা।

মানসদা কেমন সংবিৎ ফিরে আসার মতো বললেন, তোমার খাওয়া হয়ে গেছে।

—না।

—আমরা একসঙ্গে খাব। অনেক খাবার। অনেক। তুমি সঙ্গে থাকলে আমি খাওয়ায় স্বস্তি পাব।

আর তখনই অতীশ প্রশ্ন করল, আমি কেন খুন হয়ে যাব? খুন হয়ে গেলে কে একসঙ্গে বসে খেতে পারে বলুন?

—নবীন যুবক,—বলতে বলতে তিনি উঠে বসলেন। তোমার চোখ এত গভীর কেন। তুমি কি সুদূরের কিছু দেখতে পাও?

সে বলল, আমার কথার জবাব দিন।

—নবীন যুবক অনেক দিন হয়ে গেল, মাঠঘাট পার হয়ে কোথাও যাবে বলে রওনা হয়েছিলে। শেষে এক রাজার বাড়িতে হাজির। রাজা তোমাকে নিয়ে এসেছেন তাঁর ভাঙা প্রাসাদের ফাঁক-ফোকর বন্ধ করার জন্য। কোন গর্তে তুমি হাত দেবে কে জানে। কোথায় কালসাপ ফণা তুলে আছে বাইরে থেকে কি করে বুঝবে। মাথায় হাত পড়লে তোমায় তারা ছেড়ে দেবে ভাবছ?

অতীশ প্রতিটি কথা স্পষ্ট শুনতে পেল। সে বলল, একজন খাঁটি মানুষ কিন্তু আমাকে বলেছেন, স্ট্রাগল ইজ দ্য প্লেজার।

—পারলে কোথায়। তালে পালালে কেন? ছেড়েছুড়ে দিলে কেন?

অতীশ দেখল তখন দুজন বয় বাবুর্চি। একজন খানসামা লাইন বন্দী হয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে। হাতে তাদের নানা রকমের কারুকাজ করা প্লেট। প্লেটে রকমারী সুস্বাদু খাবার। সেণ্টার টেবিল সরিয়ে বড় ভাঁজ করা টেবিল পেতে দেওয়া হয়েছে। সাদা চাদর বিশাল। মাঝে একটা প্রজাপতি উড়ছে। দূরে একটা টিকটিকির ছবি। লেজ নাড়ছে টিকটিকিটা। প্রজাপতিটা জানেও না পেছনে একটা রাক্ষস। লোভে লালসায় লেজ নাড়ছে। যে কোন মুহূর্তে তাকে গিলে ফেলতে পারে।

॥ তিন ॥

রাজবাড়িতে কে জাগে। ছেদিলাল জাগে। সবার আগে ছেদিলাল সদর দিয়ে ঢোকে। আর বলে, কোন জাগে? ছেদিলাল জাগে। তার সঙ্গে বিবি থাকে। লেড়কি থাকে। আর সে মরদ ছেদিলাল। কখনও কখনও সে বলে, হামি জমিদার ছেদিলাল আছে। হামি রাজবাড়ির নোকর আছে। বাবু দেখলেই সে সেলাম করে। সকাল সকাল, তখন আসমানটা আনধার থাকে, সে ঢুকে যায়। রাজবাড়ির কাজ বলে কথা। সে না গেলে রাজার ঘুম ভাঙবে না। প্রথমেই অন্দরে ঢুকে গলা হাঁকড়াবে। কাজ না হলে, হাঁকবে, ছেদিলাল হাজির। অন্দর মহলের দরজা খুলে গেলেই ঝটাপট জল মারা, ঝাঁট দেওয়া। সে থাকে রাজার মহলায়, বিবি যায় রাণীমার মহলায়। অন্দরের কাজ সারতে সারতে বেলা বাড়ে। সূর্য উঠে আসে। ছেদিলালের এটা এক নম্বর কাজ। তার পল্টন এক নম্বর কাজ সেরেই জড় হয় বড় একটা পাতাবাহার গাছের নীচে। বালতি ঝাঁটা রেখে গোল হয়ে বসে বাসি রুটি শুকনো, জল দিয়ে গুড় দিয়ে খায়। গোঁফে গুড় লেগে থাকে। কাঁচা-পাকা গোঁফে গুড় লেগে যায় বলে মাঝে মাঝে খুবই ক্ষেপে যায়। তখন ছেদিলালকে কেউ কিছু বলে না। মর্জি হলে দু নম্বর কাজে হাত দেবে, নয় গাছের নিচে শুয়ে ঘুম যাবে। বিবি বেটি বসে থাকে না, তারা কাজ করে চলে। প্রাইভেট অফিসারের বাড়ি,—নম্বরবাবু বেণীবাবু রজনীবাবু, সব বাবুরা থাকে ওদিকে—সেটা দু নম্বর কাজের পালা।

সব শেষে বাবুর্চিপাড়া, সেটা সে বিকেলের দিকে করে। দুপুরের দিকে মেসবাড়ির নালা-নর্দমা সব সাফ করে। সূর্য না উঠতে ছেদিলালের কাজ আরম্ভ হয়, সূর্য হেলে গেলে সে পল্টন নিয়ে চলে যায় খালাসিবাগানের বস্তিতে। রাজাদের দেওয়া জায়গা, বিনা পয়সায় থাকতে পায়। বড় রাজার আমল থেকেই তার এই সব সুবিধাটুকু। সে এ-জন্য বাবুর্চিপাড়ার লোকদের একদম গ্রাহ্য করে না। মর ব্যাটারা নালা-নর্দমায় পচে। শালে শুয়ারকে বাচ্চে। কোনদিন সে যায়, কোনদিন যায় না।

কিছু বললে বলবে, শালা হামি রাজার জমাদার আছে। খুশি মাফিক কাজ-কাম হবে।

সুরেন বাজার যেতে দেখল, ছেদি খুব মনোযোগ দিয়ে রুটি খাচ্ছে। পাশে তার ডবকা লেড়কি পাছা ভারি করে বসে আছে। রুপোর বিছে কোমরে।

বৌটা ঠ্যাং ছড়িয়ে হাঁটুর ওপর কলাইর থালা নিয়ে বসে। যাকে যা লাগছে দিচ্ছে। পাশে বড় মগে চা। সুরেন বেশ নাগাল পেয়ে গেছে মত বলল, তুই কি আমাদের বেটা মারবি! গন্ধে টেকা যাচ্ছে না।

ছেদি গ্রাহ্য করছে না। সে গোঁফে গুড় লেগে না যায়, এ-সব কারণে তার তখন অমনোযোগী হওয়া একেবারে বারণ।

সুরেন বুঝতে পারল, ছেদিলাল নেশাখোর, মাতাল। ওকে বলে লাভ নেই। সে তার বিবিকে বলল, এই কুমরি, একবার দেখে আয় কি হয়ে আছে!

কুমরি বোঝে এই বাড়ির সবাই রাজা-মহারাজা। কাউকে চটাতে নেই। ওরা দিনে কাজ করে। দুপুর হলে সে চলে যায়—রাতে কর্পোরেশনের কাজ আছে। দু-চারটা এমনিও আছে ঠিকা কাজ। এটাই তাদের আসল কাজ। এখান থেকে তাড়ালে তাদের কোন মোকাম থাকবে না। সে বলল, সুরেনবাবু। আজ যাবে।

সুরেন যেতে যেতে দেখল, মেসবাড়ির সামনের জানলায় কেউ উঁকি দিয়ে আছে। পাশে রাজার নতুন বাড়ি। বড় বড় জানলা—গাড়িবারান্দা। নতুন বাড়িতে রাজার মামাত ভাই কাবুলবাবু থাকে। জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁত মাজে সকাল পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত। এই দু ঘণ্টা একটা লোকের দাঁত মাজতে যায়। সে জানে কাবুলবাবু, দাঁত মাজতে মাজতে মেসবাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। ডান দিকের কোয়ার্টারে থাকে রাধিকাবাবু। তিনটে ঘর দখল করে আছে। বড় ছেলেকে বিয়ে দিয়ে এনে আরও একটা বাড়তি ঘর রাজার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছে। সেই ঘরটায় বৌ হাসিরাণী থাকে। কাবুলবাবুর নজর পড়েছে বৌটার ওপর। সে দেখেছে, মাঝে মাঝেই দু চোখে মিলন হয়। এরা রাজার খোদ লোক—এই নিয়ে কোন কথা চলে না। ফলে গোপন আছে সব। সে যেতে যেতে হাই তুলল। তুড়ি দিল দু আঙুলে। ফটাফট শব্দ কে করে! বেটা সুরেনের কাজ। কাবুলবাবু বলল, সুরেন তোমার আঙুলে এত জোর আসে কি করে!

সুরেন বুঝতে পারল কাজটা সে ভাল করে নি। সে গড় হল। তারপর কাঁচুমাচু মুখে বলল, বড্ড হাই উঠছে।

—রাতে ঘুম হয় না?

সুরেন কি বলবে ভেবে পেল না। রাতে ঘুম না হলে দিনে পড়ে পড়ে ঘুমাবে। নির্ঘাত কাজে ফাঁকি। এই করে সব রসাতলে গেল। ঘুম হয়েছে বললেও

ল্যাটা আছে। খুব কামাচ্ছে। শালা ফিকিরবাজ। এদিক-ওদিক পয়সা হচ্ছে। রাজার খাচ্ছে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে। আঙুলে জোর কেন? বাড়তি প্রোটিন। ওটা আসে কি করে! কে দেয়। এই লোকটার সঙ্গে বাড়ির আসল মনিবের লাইন। পুট করে লাগলেই হল। সুরেনটা তুড়ি মারতে শিখেছে। ভাল কথা নয়। গ্যারেজের ইনচার্জ এই বাবু। সব গাড়ির জিম্মাদার। কেউ কেউ গাড়িবাবু ডাকে। গাড়ি মেরামতের কাজ জানে বাবু। গাড়ি চালাতে জানে। ড্রাইভারদের ছুটি-ছাটায় সে বৌরাণীর গাড়ি চালায়। কুমারবাহাদুরের গাড়ি চালায়। কান ভাঙাতে কতক্ষণ। সে বলল, ঘুমের দোষ কি বাবু! মশা! মশা হয়েছে।

মশার প্রসঙ্গ ওঠায় ছেদিলালের প্রসঙ্গ এসে গেল। এত ফিনাইল যায় কোথায় প্রশ্ন করল কাবুলবাবু?

—সেই ত কথা। কে দেখে! যার যা খুশি চালিয়ে যাচ্ছে। মেরে দিচ্ছে সব। ছেদিলালের বিরুদ্ধে সুরেনের রাগটা এতক্ষণে ঝালা মেরে উঠল।—এই দেখুন না, দু দিন হল আমাদের লাইন মাড়াচ্ছেই না। বললে হম্বিতম্বি করে।

কাবুলবাবু জানলা থেকে সরে গেল। এই হা-ভাতে লোকটার সঙ্গে কথা বলার জন্য বয়ে গেছে! সুরেনকে দেখেই জানলার সুন্দর ডাগর চোখ দুটো টুপ করে ডুব মেরেছে। রাতে কুম্ভটা করে কি! বৌটার বড়ই বালিকা বয়স। কুম্ভটা শালা কুম্ভকর্ণ। এখনও ঘোমাচ্ছে। বৌটা পালিয়ে বসার ঘরে চলে এসেছে। এখান থেকে নতুন বাড়ির জানলা স্পষ্ট। এখান থেকে সে রাজার বাড়ি দেখতে পায়। রাজার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক একজন মানুষ তাকে জানলায় দেখতে ভালবাসে। কাবুলবাবু এটা টের পেয়ে গেছে।

সুরেন দেখল এখন দুটো জানলাই শুনসান। সে হাঁটতে থাকল। বড় মেয়েটা চার-পাঁচদিন হল এখানে আবার চলে এসেছে। ফের ঠেঙিয়েছে। পিঠে দাগ, হাতে পায়ে দাগ। আর যাবে না বলেছে। রাতেই বায়না করছিল, চিংড়ি মাছ দিয়ে কচুর শাক খাবে। এখন বাজারে সে চল্লিশ পয়সার চিংড়ির খদ্দের। গায়ে রাজবাড়ির ছাপ মারা কোট।

বাজারটা রাজার। কোটটা দেখলে গণ্যিমান্যি করে। বাজারে যাবার আগে কোটটা আগে চাই। আর চাই পান-সুপারি, খয়ের। গলায় রক্ত কফ ওঠে। পান খায় সুরেন। রক্ত কফ কেউ টের পায় না। চবর চরবকরে খায় আর পিক ফেলে। গায়ে তাত থাকে। গায়ে তাত হলে সে বেশ মজা পায়।

কেমন নেশা নেশা লাগে। নেশাখোরের মত চোখ লাল থাকে। খকর খকর কাশে। শরীরটা নাচে, টাল খায়—এই করে চালিয়ে দিচ্ছে। শালা দুনিয়ার কেউ টেরও পাচ্ছে না তার একটা বড় ব্যারাম আছে। সুপারিনটেণ্ডেন্ট মাঝে মাঝে জ্বালায়।—আরে ডাক্তার দেখা। খুক খুক কাশি মানুষের ভাল নয়।

ডাক্তার দেখাই, আর তোমরা রক্ষা পেয়ে যাও। সেটি হচ্ছে না।

মেসবাড়ি পার হলেই দোতলা বাড়ির নিচে চার-চারটা ঘর। প্রথম ঘরটায় থাকে, কলকাতা অফিসের অ্যাকাউন্টাণ্টবাবু। একটা ঘর। আর বারান্দা। বারান্দায় মুলি বাঁশ দিয়ে ঘেরা। তক্তপোশ আছে একটা। ভোরে বাবুর মেয়েটা এখানে গরমে চিত হয়ে পড়ে থাকে। খুব ভোরে সে একবার যেতে গিয়ে ভারি সরমে পড়ে গিয়েছিল। শাড়ি উঠে আছে। সে দেখি দেখি করে সবটা দেখেও ফেলেছিল। সবাই ঘুমে কাতর। এত বড় মেয়েকে কেন যে বারান্দায় শুতে দেওয়া। শহরে থাকলে মানুষের আক্কেল থাকে না। পরের ঘরটায় আছেন কেষ্টবাবু। অফিসের কালেকটরবাবু। ভাড়া আদায়, রাজার মামলা-মোকদ্দমার সাক্ষী ঠিক করা, আদালতে হাজিরা দেওয়া এ-সব কাজে মানুষটার দু পয়সা উপরি। তাই সকালে কেমন মৌজ করে হারমনিয়াম নিয়ে বসে গেছে। গলা সাধছে। গলা সাধা শেষ হলেই—গান ধরবে—আয়লো অলি কুসুম কলি। কলি পর্যন্ত আসতে সাতটা বাজবে। তারপর চুলে কলপ, গোঁফে কলপ, মসৃণ মুখ গাল নিয়ে আদ্দির পাঞ্জাবি, আর ধুতি পরে অফিসে হাজিরা। তারপর সারা দিন কোথায় যে থাকে। রাজার টাকা বারো ভূতে লুটে খাচ্ছে খাক—তার সে-জন্যে হিংসে নেই। তাই বলে বেকার ছেলেটা ঘরে বসে তার দাড়ি গোঁফ উপড়াবে! কেউ দেখার লোক নেই! রাজার বাড়িতে সবাই গোঁফ রাখে—কুমারবাহাদুরের গোঁফ আগে বড়ই সরু ছিল, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মোটা হয়ে উঠেছে। রাজা খুশি হবেন ভেবে সব ব্যাটা গোঁফ রাখে। কিন্তু ঈশ্বর তার সে উপায়টুকুও রাখে নি। সে তার ব্যাটার ভয়ে গোঁফও রাখতে সাহস পাচ্ছে না। কাজের উন্নতি, চার কুড়ি দশ টাকায় সেই যে থেমে আছে তার থেকে আর তার মুক্তি মেলে নি।

জানলা থেকে কেষ্টবাবু সুরেনকে দেখতে পেল। গুটি-সুটি যাচ্ছে। এত সকালে যাচ্ছে যখন, খবরটা দিয়ে যেতে পারবে। সে গলা বাড়িয়ে বলল, সুরেন নাকি রে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—মুক্তাকে বলে যাস, আজ ওর ওখানে খাব না।

মুক্তাকে সুরেন চেনে। বাজার যেতেই সুনীল ডাক্তারের ডিসপেন্সারি—তার লাগোয়া গলিতে মুক্তা থাকে। বিধবা মানুষ। সংসারে একা। আগে বাড়ি বাড়ি কাজ করত। এখন নিজেই হোটেল খুলেছে টাকা জমিয়ে, কেষ্টবাবু মেসের সঙ্গে ঝগড়া করে মুক্তার কাছে চলে গেছে। দুপুরে রাতে মুক্তার কাছে মিল নেয়। যেদিন খাবে না, সকালে বলে দিতে হয়। মেসে এই নিয়ে একদিন তুলকালাম। কেষ্টবাবু দেশ থেকে এসে দেখল, বিল পড়ে আছে। মেসে না খেলেও বিল দিতে হয়। দু দিন খায় নি, বিল ঠিক এক মাসের। কেষ্টবাবু এই নিয়ে দরবার করেছিল। কিন্তু মেসের ম্যানেজার বলেছে, ওভাবে হয় না মশাই—কড়াক্রান্তির হিসাব রাখার সময় কার আছে! সাত দিন দশ দিন না থাকলে এক কথা। সেই থেকে কেষ্টবাবু খাওয়ার পাট মেসবাড়ির চুকিয়ে মুক্তার কাছে চলে গেছে। মানুষটা আবার যৎকিঞ্চিৎ মেয়েছেলের দোষ আছে। সম্বল এই গান। এবং কেউ কেউ গান শিখতে আসে। মেয়েদের ছেলেদের নিয়ে মাঝে মাঝে বেশ জলসা বসায়—ছলচাতুরি জানে লোকটা। আসলে লোকটা ফুর্তিফার্তা করার কৌশল জানে। লোকটাকে দেখলেই সুরেনের মনে হয় খেপলা জাল নিয়ে পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে কেষ্ট চক্কবর্তি। পরনে গামছা। কুঞ্চিত লোমশ শরীর। মুখে মাছ ধরার ছলাকলা। লোকটাকে সে একদম সহ্য করতে পারে না। ধম্ম বলে মানুষের আর কিছু নেই! সোমত্ত মেয়ে আছে তিন-তিনটা। বৌ-এর দাঁত পড়ে গেছে। এই শহর থেকেই কেষ্টবাবু বৌ-এর জন্য দাঁত বাঁধিয়ে নিয়ে গেছে। ছেলেরা ছোট। স্কুল-কলেজে পড়ে। তোর এ-সব আর শোভা পায় কেষ্ট।

এইভাবে সকাল থেকেই সুরেনের মানুষের ওপর রাগ বাড়ে। বেলা যত বাড়ে রাগটা বাড়ে, যত পড়ে আসে রাগটা কমে আসে। বিকেলে আনাজের বাজারটা সস্তা। কচুর শাক কচুর লতা থেকে থানকুনি পাতা সবই তখন তার জন্য বাজারে অপেক্ষা করে থাকে। মাথা গরম রাখলে দরদাম-করা যায় না। তা ছাড়া মাথা গরম রাখলে সংসারে কি-ই বা হয়। যত মাথা ঠাণ্ডা তত মানুষের উপকার। আসলে তার এটাই নেই। সে যখন-তখন যা না তাই বলে বসে। এই যেমন সে এখন কেষ্ট চক্কবর্তিকে গাল দিতে দিতে যাচ্ছে। বোঝ বেটা আমি কত সোজা সাপটা লোক। রাজাগজা নয়। তুই ত কেষ্ট চক্কত্তি।

তখনই আবার জানলায় হাঁক—ওরে সুরেন, যাচ্ছিস যখন, পান আনবি।

স্থরেন অনেকটা দূরে চলে গেছিল, প্রায় সদর দেউড়িতে। সেখান থেকেই কেষ্ট চক্কত্তির গলা পেয়ে সে ছুটে আসতে লাগল—আজ্ঞে যাই বাবু। তারপর মনে মনে বলল, ও-বাবু ভেব না, তোমার হাঁক পেয়ে ছুটছি। স্থরেন তেমন লোকই নয়। তার ইজ্জত আছে। যাচ্ছি গরজে। পান না থাকলে পানটা স্থপুরিটা তোমার কাছে হাত পাতলে পাই। তখন তোমাকে বড়ই গুণী মানুষ ভাবি হে। কেষ্ট চক্কবত্তির গলা! ফান্দে পড়িয়া বগায় কান্দে, গাও ত এমন একখানা গান—বলি গানই বটে। গুণীজনকে ধন্যি ধন্যি করতে হয়। স্থরেন জানলায় এসে দাঁড়ালে কেষ্টবাবু দশটা পয়সা দিয়ে বলল, একটা গোটা স্থপুরি আনবি। তারপর ফিসফিস গলায় বলল, নতুন বাবুকে দেখেছিস!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কেমন, কোথায় উঠেছে?

—আপনাদের ওপরে।

—রাত হয়ে গেল। দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। আজ সবার আগে যাব। কোন ঘরে আছে।

সে বলল, ওপারেই আছে।

—ফুলি বলল, সাধু-সন্তের মত মুখ নাকি!

—তা ভাল মানুষই মনে হল। বড় বড় চোখ। লম্বা গৌরবর্ণ। দশাসই মানুষ।

—পাগলাবাবুর মত।

—তাই বলতে পারেন।

—পাগল না হয়ে যায়! এ-বাড়িতে সাধুসজ্জন এলে ত শুনেছি পাগল হয়ে যায়।

কেষ্ট চক্কত্তির এই এক কু-কথা। মগজের মধ্যে যত কু-ভাবনা। ঠাকুরের নাম নে। গলা সাধছিলি সাধ। কে পাগল হবে দুনিয়ায় তার তুই কি জানিস! সে বলল, একটা গোটা স্থপারী?

—ঐ একটাই। কোর্ট থেকে ফিরে আসার সময় আনব। ভাল ভাল গোটা গোটা। বড়বাজারে রাখুর দোকানে ভাল স্থপারী রাখে। কাটলে সাদা। খেতে মিষ্টি মিষ্টি। কস একদম নেই। গলা সাধা শেষ। স্টোভে চা করবেন বোধ হয়। গলাটা কাঠ কাঠ ঠেকলে স্থরেন বলল, বাবু চা রানাবেন বুঝি।

কেষ্টবাবু বুঝতে পেরেই বলল, না। চা না। কাপটাপগুলি ধুয়ে রাখছি। চিনি নেই। আনতে হবে।

—দিন না এনে দিচ্ছি।

—না এখন থাক। তুই যা।

বাবু মিছে কথা বল না। ভগবান রাগ করবে। তোমার দিলু পরিষ্কার বাবু। তুমি ছয় নয় করতে পার। তুমি সুধাসাগর। তোমার এ-সকালে মিছে কথা বললে মুখ খসে পড়বে। সুরেন অগত্যা হাঁটা দিল। সকালবেলায় কোত্থেকে যে শয়ে শয়ে কাক এ-বাড়িটাতে উড়ে আসে! আসলে বুঝি পচা গন্ধ পায়। পচা গন্ধ মানুষের না টাকার। কাল থেকে দুর্গন্ধে ঘরে টেকা যাচ্ছে না। প্রথমে ভেবেছিল, কোন খুপড়িতে ইঁদুর মরে পচে আছে কিন্তু কোন ঘরেই কিছু পাওয়া যায়নি। এই গন্ধের মধ্যেই রাতে পুঁই চচ্চড়ি আর শুকনো রুটি খেয়েছে। নালা-নর্দমা সাফ হয় না, তা এমন ত কতই হয় না, আজ কেন, ছেদিলাল কবে রোজ নালা-নর্দমা সাফ করে। কিন্তু গন্ধটা এখনও নাকে লেগে আছে কেন? আঁস্তাকুড় থেকে গন্ধটা উঠছে। ছাই তরকারির খোসা, মাছের আঁশ, পচা মাছের ধোওয়া জলের একটা ভোটকা গন্ধ থাকে—ডাঁই হয়ে আছে। —দুদিন না নিলেই ডাঁই হয়ে যায়—তার ভেতরে মরা কুকুর বেড়াল কেউ সেঁধিয়ে রাখেনি ত। যদি ছেদিলালের সঙ্গে সকাল বেলায় ভাল করে কথা কয়ে হাতে-পায়ে ধরে, তারপরই বামুনের আভিজাত্য সুরেনের মাথায় চাগিয়ে উঠল। তাঁরা হল গে নবীনগড়ের গাঙ্গুলী বংশ। সে ছোট কাজ করে বলে বাপ-ঠাকুর্দার ইজ্জত নিতে পারে না!

কাকগুলি মাথার ওপর উড়ছে। বাবুপাড়ার দরজা জানলা খুলছে। বাবুদের একটা ছোট ছেলে ওর সামনেই নর্দমায় পেচ্ছাপ করতে থাকল। সুরেন বলল, নুনুবাবু, চিনুদিদি ভাল আছে।

নুনু পেচ্ছাপ করতে-করতেই মুখ তুলে তাকাল। সুরেন দাদা তাকে কিছু বলছে। সে বলল, দিদি সকালে উঠে বসেছে।

তারপরই সুরেন জিভে কামড় দিয়ে ফেলল। কেউ তো জানে না নধরবাবুর মেয়ের অসুখ। শুয়ে থাকে। ঘর থেকে বের হয় না। বড়ই গোপন—এই বাড়িটাতে গুষ্টির শেষ নেই। যত যাও—ঘর-বাড়ি। কে কোথায় কিভাবে পড়ে আছে পড়ে থাকে কারও জানার কথা নয়।

বাবুদের হেঁশেলের খবর না জানাই ভাল—কারণ সে বোঝে, দফাদারের

আবার গোরু। তার চেয়ে এখন জোরে হাঁটা ভাল। এ সময়টা রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া থাকে না। সে সোজা ট্রাম লাইনের ওপর দিয়ে হাঁটতে পারবে। সকালে ট্রামের পাতে কেমন ঠাণ্ডা ভাব। খালি পায়ে সে তখন বড়ই সুড়সুড়ি বোধ করে। এই সুড়সুড়িটা তার আর কোথাও লাগে না। স্ত্রী সহবাসেও না। সুতরাং সে খুবই পা চালিয়ে হাঁটবে ভাবল। কিন্তু কিন্তু—কৈ জানালায় কৈ!

ওপরের জানলা থেকে তখনই কে ডাকল, সুরেনদা বাজারে যাচ্ছ। সঙ্গে সঙ্গে সুরেনের মুখে হাসি খেলে গেল। ঐ ত দাঁড়িয়ে। সে ভাবল চোখে কম দেখছে না ত! —কে মতি বোন বলছ! তা যাচ্ছি।

—সুখী নাকি চলে এসেছে।

—কি করবে বোন। স্বামীটা বড় জ্বালায়। খেতে দেয় না। পেটের ছাঁচ পাল্টাবে কি করে কও। মেয়ে হয়, চার-চারটা মেয়ে তাই বলে লাথি ঝাঁটা। এরাই ত সংসারে লক্ষ্মী।

—মেয়েগুলো সঙ্গে এয়েছে।

—তা আনবে কেন? ছাঁচে ঢালবে তুমি, খাওয়াব আমি। বলে দিয়েছি, আসবি ত একা আসবি। আমার ছাঁচ আমি ফেলতে পারি না। কি ঠিক না!

কথাগুলো জোরে জোরে বলছিল সুরেনদা। সকালবেলায় কত সহজে খারাপ কথা বলতে পারে। মতির কান গরম হয়ে গেছিল। কিন্তু মার ঐ স্বভাব—তক্কে তক্কে থাকা—সুরেনটা দেখিস বাজারে যায় কিনা। যে রাজবাড়ির ছাপ দেখিয়ে ভাল জিনিস কিনতে পারে। দু' পয়সা সস্তাও হয়। কিছু মারার স্বভাব আছে। তা মেরেও বেশ তাজা সবজি-টবজি চিনে আনতে পারে। মতি বাইরে বের না হলে কেবল খায় আর ঘুমায়। ছোট ছুটো স্কুলে-কলেজে পড়ে। মতিরই সব চালাতে হয়। কাল বের হয় নি বলে, সে ঘুম থেকে সকাল সকাল উঠেছিল। শরীরটা ভাল ছিল না। শরীর ভাল না থাকলে তিন দিন বেহুঁশ হয়ে ঘরেই পড়ে থাকে। এই তিন দিন তার সকালে ওঠার অভ্যাস। আজও ওঠে, তার মনে হয়েছিল, মাথাটা ঝিমঝিম করছে। সে একটা চেয়ার নিয়ে জানলায় বসেছিল—মা এসে বলে গেছে, দেখিস ত সুরেনটা বাজারে যায় কিনা।

তখন সুরেন ভাবল, সিকিটা হয়ে যাবে। সে খুবই দ্রুত পায়ে হেঁটে এল, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে থাকল। নিচে এখানে প্রায় বারো ঘর এক উঠোনের মত। পাখির খাঁচার মত পুরানো স্যাঁতস্যাঁতে বাড়ির সব দরজা। রং ওঠা।

মরচে পড়া জানলার সিক। নিচে একদম আলো বাতাস নেই। দোতলায় উঠলে, আলো বাতাস আসে। পারতপক্ষে সে এই বারোয়ারি বাড়িটাতে ঢোকে না। কে না থাকে। ট্রামের কণ্ডাকটার থেকে, বড়বাজারের দালাল। মতি বোনেদের সে অন্য সময় হলে হাফ-গেরস্থ ভাবত। কিন্তু এখন মনে হল, মতিবোন দেখতে কি সুন্দর। চুল লম্বা। লম্বা থুতনি, চোখের নিচে কাজল লেপ্টে থাকে। ছোট একটা তিল আছে ঠোঁটের নিচে। ডুরে শাড়ি পরলে লক্ষ্মীমতী লাগে।

মতি দরজায় দাঁড়িয়েই ছিল। একটা সাদা থানের ব্যাগ, তিন টাকা হাতে। এই তিন টাকায় বাজার। মাছ, আনাজপাতি, শাক, একটা ডিম। ডিমটা মতির জন্য আসে। শরীরে বড় ধকল তার। ডিম না খেলে জোর পাবে কি করে! শরীরের লাবণ্য থাকবে কি করে! একা ডিম খাওয়া কোন দোষের না। সুরেন বাজারে যাওয়ার সময়, এখানটায় এলেই খুব আস্তে হাঁটে। যেন জানলা থেকে কেউ তাকে দেখতে পায়। সিকিটা আধুলিটা থাকে বলে ইজ্জতের মাথা খেয়ে নিজে বলবে না, দিন বাজারে যখন যাচ্ছি, আপনাদেরটাও দিন। তালেই ধরে ফেলবে। ভারি গরজ। কেন গরজ, কিসের গরজ মানুষ টের পায় সব।

মতি বলল, আজ ডিম এনো না। খাব না। পেটটা গণ্ডগোল করছে।

—তোমাকে বোন বলেছি, খাও দাও। সব করে শরীর ঠিক রাখ। তবে বেশি খেলে পেট ঠিক থাকে না।

মতি বলল, কৈ খাই। বাড়িতেই ত পড়ে থাকি।

সুরেন বুঝতে পারল, সক্কালবেলায় তার সত্যি কথা বলা উচিত হয় নি। পাবলিক নিয়ে কারবার—তার ওপর মেয়েমানুষ, রাজার বাড়িতে ভাড়া থাকে··· সব দিক বিবেচনা করে চলতে হয়। সে আহাম্মকের মতো সত্যি কথা বলে ফ্যাসাদে পড়ে গেছিল আর কি। সে বলল, আমি জানি না তুমি কোথায় যাও! দশজন কু-কথা বললেই আমি শুনব! এ-বাড়িতে তোমার মতো কটা সতী লক্ষ্মী মেয়ে আছে!

মতি বলল, ও কথা থাক সুরেনদা।

—না আমি বলবই। ভয় পাই ভাবছ! বাড়িতে থাকি, আমরা বুঝি কিছু টের পাই না।

সুরেনের নিজেরও এক গণ্ডা মেয়ে আছে। কেবল বড়টার বিয়ে হয়েছে। বাকি তিনটে দেখতে মন্দ না। সে জন্য নিজের ছাঁচ নিয়ে বড়াই আছে। তবে

বড়ই কাকলাশ। গায়ে মাংস লাগলেই অন্য রকম। কাকলাশ বলে মানুষের নজর কাড়ে না। সুরেন নাকে তেল দিয়ে ঘুমাতে পারে। সে যার তার নামে আকথা কু-কথা বলে ফেলতেও পারে। মেয়েরা বড় হচ্ছে তার সে নিয়ে ভয় নেই।

তারপর সুরেন হাঁটে। বেলা হয়ে গেল আজ। ট্রাম বাস বেশ চলছে। রোদ উঠে গেছে। আসলে সে আজ ঘুম থেকেই দেরি করে উঠেছে। যখন সে ছেদিলালের সঙ্গে কথা বলছিল, তখনই বোঝা উচিত ছিল, বেলা হয়ে গেছে। মেঘলা আকাশ, কখনও রোদ। আষাঢ় মাস হলে কি হয়, শরতের মত আকাশ যাচ্ছে। সে ঘুম থেকে উঠে মেঘলা আকাশ দেখে টেরই পায় নি, বেলা হয়েছে। সে ত সকাল সকাল ওঠে। তবে রাতে খুব কাশছিল। দুপুর রাতেও। শেষ রাতের দিকে তার ঘুমটা এসেছিল। আগ রাতেও সে ঘুমাতে পারে। কিন্তু কুম্ভবাবু ডেকে নিয়ে গেছিল। তাকে বলেছিল, সুরেনদা, বাতাসী কাল থেকে তোমার বৌমার সঙ্গে থাকবে।

—আপনি কোথায় থাকবেন।

—আমার অফিস আছে না। বাবার অফিস, ভাইরা কলেজে যায়, আড্ডা মারে, বাড়ি থাকে না। তোমাদের বৌমা বড়ই ভয় পায়। জামাইবাবু ছিল, সেও বাবার ওপর রাগ করে চলে গেল। রাতে বাতাসী ঘরে চলে যাবে।

—বৌদি বুঝি বলেছে!

—বৌদি না বললে বুঝব কি করে।

ল্যাটা। ধর্মের বৌ নিয়েও শান্তি নেই। কাগে বগে ঠোকরায়। তা বাবু সোমত্ত বয়সে এটা সবারই থাকে। কম বেশি থাকে। তখন ভরা যৌবন উথাল-পাথাল করে—টাল সামলাতে পারে না বাবু—এধার-ওধার নজর যায়। কিন্তু সে ত সুরেন। হাবা-গোবা না। লেখাপড়া জানে। ক্লাস এইট অব্দি বিদ্যা তার। অত সহজে কাবু হবে কেন। সে বলেছিল, ওর মাকে বলে দেখি। আপনার বৌদির তো শরীরটা ভাল না জানেন। বাতাসী এটা-ওটা এগিয়ে দেয়। রুটিটা করে দেয়। জলটা এনে দেয়। বাটনাটা বেটে দেয়। ঘরটা মুছে দেয়।

—টেবি কি করে?

সুরেন বুঝল আতান্তরে পড়েছে।

—টেবি বড় সোহাগী বাবু। মাকে ছেড়ে থাকতে পারে না।

কিন্তু ছোটটা নিতান্তই ছোট। ইচ্ছে হলে ইজের পরে ইচ্ছে হলে পরে না।

পরে না বললেই হয়। পরতে চাইলেই দেবে কোত্থেকে। সুরেন অকপটে বলল মনারে দিলে চলে না কুম্ভদা। কন্যে আমার চতুর হয়েছে।

কুম্ভ বুঝল শালা ত্যাঁদড়। কিন্তু সে খুব সরল মানুষের মতো বলেছিল মনা তো ভাল করে কথা বলতেই পারে না।

—তালে বলেন কথা বলার লোক চান। বৌদির একা খুব কষ্ট। আপনি চলে গেলে বৌদিরে টেবি নিয়ে যাবে এসে।

কুম্ভ বুঝতে পারছিল, পয়সা চায়। এখন আর কিছুই পয়সা ছাড়া হবার উপায় নেই। না হলে কেমন হাবাগোবার মত বলে দিল সুরেনদা, নিয়ে যাবে। ইজ্জত বোঝে। জানে, ইজ্জতের ব্যাপার। বৌকে পাঠালে বাপ ঘর থেকে বের করে দেবে। তাছাড়া সেও এই বাড়িতে সম্প্রতি রাজার নজর কেড়ে নিতে পেরেছে। তারই প্ররোচনা, প্ররোচনা কথাটাই কুম্ভ ভেবেছিল—রাজা খুঁজে পেতে ঠিক তার মনমত হাবা-গোবা লোক ধরে এনেছে। সেই রাজাকে বলেছিল কুমার বাহাদুর ওটা আপনার গোল্ড মাইন। চুরি করে ফাঁক করে দিচ্ছে। সেই থেকে রাজার নজর তার ওপর। পাঁচ-সাত বার কারখানায় রাজা ঘুরেও এসেছেন। তারপরই বুড়ো ম্যানেজারকে ছাড়পত্র দিয়ে বলেছেন এখন তুই ত্থাখ। লোকের খোঁজে আছি। রাজার সেই মনের মতো লোকটা কাল হাজির। সে যায় নি। বাপকে পাঠিয়েছে। এখানে বাপকে দিয়েই খেতে বলেছে। প্রথম থকেই কব্জা করা—নালে লাগানি-ভাঙানি আগে থেকেই হতে থাকলে হুঁশিয়ার হয়ে যাবে।

কুম্ভ সুরেনের দিকে তাকিয়েছিল। কথা বলছিল না।

—তালে কুম্ভদা ঐ কথা থাকল। সুরেন হাঁটা দিচ্ছিল।

—আরে না না। শোন সুরেনদা। তুমি বাতাসীকে সকালেই পাঠিয়ে দিও। মাসে ও কিছু হাত খরচ পাবে। কাল থেকে শিট মেটালের নতুন ম্যানেজার এখানে খাবে। একা তোমার বৌদি পেরে উঠবে না।

সুরেন সহসা হাতে আকাশ পাবার মতো বলেছিল, তালে নবর চাকরি হবে বাবু। এতদিন ত বলেছেন, ম্যানেজার বদমাইস আছে। আপনার লোক হলেই নিতে চায় না। এবারে নতুন ম্যানেজারকে বলে কয়ে নবটার হিল্লে করেন। পায়ে পড়ছি কুম্ভদা। শরীর আর টানছে না। বাতাসী সকালেই চলে যাবে।

কুম্ভ বুঝেছিল ছকের ঘুঁটি তার দিকে। সে হাই তুলতে তুলতে বলেছিল, হয়ে যাবে। সে বলেছিল মনে মনে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি যখন আছি, তখন তোমার চিন্তা নেই সুরেনদা। এমন একটা কথা পেয়েই সুরেন নানা সুখের কথা

বলছিল! ভাবতে ভাবতে নিজেই একটা রাজার বাড়ি বানিয়ে ফেলছিল। আজ রাতে সে-জন্য ঘুম আসে নি। তাড়াতাড়ি, বড়ই তাড়াতাড়ি করা দরকার। আটটা বাজার আগে রাজার অফিসে হাজিরা। সে পা চালিয়ে বাজার থেকে প্রায় দৌড়ে ছুটি আসতে থাকল। বিকেলে নিশ্চিন্তে লম্বা টানা একটা ঘুম। নতুন ম্যানেজার—নবর চাকরি—ঘুম। আর বিকেলেই ছেদিলাল স্বরেনদের বস্তির নালা নর্দমা সাফ করতে গিয়ে গোলমাল বাধিয়ে বসল। ঘুম দিল চটকে।—ই কিয়া বাবু! এ-কিয়া চীজ। মানুষ ভি নেহি কুত্তাভি নেহি। দেখিয়ে। বলে সে আঁস্তাকুড় থেকে কি একটা মরা ছোট কুকুর বেড়ালের বাচ্চা টেনে বের করল। ফুলে ফেঁপে ঢাক। সে দোলাচ্ছে। লোকজন ছুটে আসছে। রাজবাড়ির লোকজন যে যেখানে ছিল ছুটে আসছে। একটা মানুষের লাশ। মানুষটা জন্মাবার আগেই কারা হত্যা করে এই আবর্জনার মধ্যে পুঁতে রেখে গেছে। তার খুপড়ির সামনে এই হত্যাকাণ্ড। ক্রোধে স্বরেনের মাথা গরম হয়ে গেল। সে থুক্ থুক্ করে কাশছে। নিজেকে যাজিয়েছে, এবার সবাইকে যজাবে। কেউ শালা রক্ষা পাবে না। দুটো খুপড়ি পার হলে আর একটা খুপড়ি। সেখানে বৌ মেয়েরা থাকে। নব থাকে। সে-সেখানে দূর থেকে আনাজপাতি ছুঁড়ে দেয়। ভেতরে যায় না। সংসারে শুধু এই খুপড়িটার জন্য তার এখনও কিছুটা মায়া আছে।

লাশটা দেখছিল আর থুথু ফেলছিল স্বরেন। সবার গায়ে থুথু ছিটাচ্ছিল অলক্ষ্যে। চোখ দুটো দুর্বাসার মতো জ্বলছে।

॥ চার ॥

রাতে চন্দ্রনাথ ভাল ঘুমাতে পারে নি। এমনিতেই সকালে ওঠার অভ্যাস ঘুম না হলে আরও সকালে উঠে বসে থাকেন। অন্ধকার থাকে উঠোনে। গাছ-পালাগুলো নিঝুম। উত্তরের আকাশে বারান্দা থেকে বড় নক্ষত্রটা দেখতে পান। আজ দেখলেন বড় নক্ষত্রটা দেখা যাচ্ছে না। বর্ষাকাল, আকাশ মেঘলা থাকে। কিন্তু দুদিন ধরে আকাশ শরতের আকাশের মতো। নক্ষত্রটা দেখা যাবার কথা! কোথায় গেল। লিচু গাছটার নিচে এসে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। না, দেখা যাচ্ছে। ফের এসে বসলেন বারান্দায়। শান বাঁধানো মেঝে মাটির দেয়াল। ওপরে টিনের শেড। এটাই বড় ঘর। এই ঘরে তিনি একটা তক্তপোশে আলাদা

শোন। পাশের বড় তক্তপোশটায় ধনবৌ তার দুই নাতিনাতিন আর মেজ বৌমা শুয়েছে। অতীশ চলে যাওয়ায় উত্তরের ঘরটা ছোট দুই ছেলে দখল করে নিয়েছে।

নক্ষত্রটা দেখার পর তার কেন জানি মনে হল, না কিছু হারিয়ে যায় নি। অথচ সারাটা রাতই তিনি আধো ঘুম আধো জাগরণে দেখেছেন তাঁর কিছু হারিয়ে গেছে। তিনি দুবার বালিশের তলা, তোষকের নিচে হাত বাড়িয়েও দেখেছেন। তাঁর বাকস প্যাঁটরা বলে কিছু নেই। অতীশ যা টাকা দেয়, সব একটা পুঁটুলিতে রাখেন। দরকার মতো টাকা পয়সা বের করে দেন। কড়াক্রান্তির হিসেব তিনি কখনও রাখেন না। জীবনটাই আন্দাজের ওপর চলে যাচ্ছে! অত হিসেবে কি দরকার। মোটামুটি একটা হিসাব রাখেন। দু-চার টাকার এদিক-ওদিক হলে তিনি কখনই ধরতে পারেন না। পুঁটুলিটাতে রুদ্রাক্ষের মালা আছে। গোটা দশেক তাঁর জীবনের মূল্যবান বই। বইগুলোও ঠিক আছে। পদ্মপুরাণ, পুরোহিত-দর্পণ, কাশীরামের রামায়ণ, একটি এ-বছরের পঞ্জিকা, দ্রব্যগুণ সম্পর্কিত বই···না সবই ঠিক আছে। কেউ কিছু সরায়নি। তবু রাতে আধো ঘুম আধো জাগরণে কেন যে মনে হচ্ছিল কেউ তাঁর কিছু সরিয়ে নিয়েছে। তিনি কিছু হারিয়েছেন।

ধনবৌর পাতলা ঘুম। লম্ফ জ্বালতে দেখে বলেছিল, কি করছ?

চন্দ্রনাথ গম্ভীর গলায় বলেছিলেন, টাকা গুনছি। যেন এমন সময় কারো জেগে থাকা ঠিক না। কথা বলে নিবিষ্টতা ভঙ্গ করা ঠিক না। তোমাকে কে আবার জাগতে বলেছে! খবরদারি করতে বলেছে। ঘুমাচ্ছ ঘুমাও।

ধনবৌ পাশ ফিরে শুতে গিয়ে বুঝেছিল ছোট নাতি প্যান্ট কাঁথা সব ভিজিয়েছে। তাড়াতাড়ি উঠে ডাকল, ও বৌমা, ওঠো। কাঁথা পাল্টে দাও। সব ভিজিয়েছে।

মেজ বৌমা উঠেও দেখেছিল, মশারির নিচে চন্দ্রনাথ বসে আছেন। সামনে সেই নতুন লাল-পেড়ে কাপড়ের পুঁটুলিটা। কি আঁতিপাতি করে খুঁজছেন।

—এত রাতে বাবা কি করছেন। বৌমা এমন প্রশ্ন করেছিল।

—এই খুঁজছি।

—কি খুঁজছেন?

—সেটা বলতে পারলে তো হতই। মনে করতে পারছি না। তোমরা কিছু আমার ধরেছিলে!

—না বাবা। পাশ থেকে আর একটা ছোট্ট কাঁথা বের করে ধনবৌর হাতে দেবার সময় মেজবৌমা বলেছিল, এই নিন মা। এত পেচ্ছাপ করে!

—ছেলেমানুষ করবে না। শরীর না হলে হাল্কা হবে কি করে।, বড় হবে কি করে। তোমরাই বা বুঝবে কি করে সন্তান মানুষ করতে কি কষ্ট!

মেজবৌমা তারপর শুয়ে পড়েছিল। অতীশ চলে যাওয়ায় উত্তরের ঘরটা বৌমা ছেড়ে দিল। ভয় পায় একা থাকতে। মেয়েটা বাড়ি নেই। বড় শ্যালক গোপাল এসে নিয়ে গেছে।

চন্দ্রনাথের হুম করে বড় শ্যালকের ওপর কেমন রাগ চড়ে গেছিল। নবাবী এখনও ঠিক আছে। স্বভাব চরিত্র ভাল ছিল না। বৌটিকে মারে! চরিত্রে কিছু দোষ ছিল এক সময়। গুণের মধ্যে এই নিঃসন্তান মানুষটি অলকাকে মেয়ের চেয়ে বেশি ভালবাসে। সময়ে অসময়ে অলকাকে কিছুদিন কাছে নিয়ে রাখে।

ধনবৌ কাঁথা পেতেও বোধহয় বসে বসে মজা দেখছিল। না হলে এক সময় শুনতে পাবেন কেন, বয়স যত বাড়ছে, তত ভীমরতি ধরছে।

—হ্যাঁ বলেছে!

—তা না হলে মানুষ কি হারায় নিজে জানে না।

—জানলে ত হয়েই যেত!

হঠাৎ ধনবৌ কেমন ক্ষেপে গেল। —আলো নিভিয়ে শোবে কিনা বল! তোমার কি। সময় নেই অসময় নেই পড়ে পড়ে ঘুমালেই হল। নিশ্চিন্ত জীবন। এখানে এসে আর কুটোগাছটি নাড়লে না।

চন্দ্রনাথ এসব কথায় ধনবৌকে ভীষণ ভয় পায়। এদেশে আসার পর সত্যি তিনি আর কাজ নেননি। আর যে লোকটা এদেশে প্রায় যৌবন শেষে প্রৌঢ় বয়সে এল, তাঁকে কাজ দেবেই বা কে! কাজ যে একেবারে জুটছিল না তা বললে মিথ্যা হবে—কিন্তু কোথায় যেন চন্দ্রনাথের একটা বড় অহঙ্কার ছিল। এখন আর তেমন জমিদার কোথায়, জমিদারী কোথায়। দোকানে বসে বসে খাতা লিখবেন—চন্দ্রনাথ এটা ভাবতেও পারতেন না। এরই মধ্যে সুখে দুঃখে ঘর-বাড়ি বানিয়েছেন, পৈতৃক পেশা যজমানিটা ছাড়েননি। কলোনির প্রায় সব ঘরেই পূজা পার্বণে তাঁর ডাক আসে। এখনও এটাই সম্বল। মেজছেলে অতীশ এখানে এসে চাকরি নেবার পর সংসার সচ্ছল। দিন তাঁর ভালই যাচ্ছিল। কিন্তু গোল বাধাল—কি যেন তাঁর হারিয়েছে। এইসব সাত পাঁচ ভেবে তিনি আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন। ধনবৌর মাথা গরম হলে, হয়ত আর ঘুমাবেই না। বকর বকর শুরু করে দেবে। সারা জীবন হাড়মাস জ্বলে খাঁ খাঁ হয়েছে—কত এমন অভিযোগ উঠবে। এসব ভয়েই তিনি হারিকেনটা নিভিয়ে শুয়ে

পড়েছিলেন। কিন্তু তারপরও ঘুম এল না। মানুষের কিছু হারিয়ে গেলে ঘুমায় কি করে!

রাত থাকতেই পা টিপে টিপে নেমে গেছিলেন তক্তপোশ থেকে। তামাকের একটা পিপাসা আছে। খুব সন্তর্পণে যেন কেউ টের না পায় দরজা খুলে বারান্দায় মাদুর পেতে বসেছিলেন। একপাশে শুকনো সব গাছগাছড়া টোকা মুছিতে রাখা। সেগুলো তাঁর কাছে গুপ্ত সম্বলের মতো। তার মধ্যে দেশলাই গোঁজা থাকে। সেটা খুঁজে বের করার সময়ই মনে হয়েছিল, নক্ষত্রটা আকাশে নেই। কোথাও নেমে গেছে। লিচু গাছটার নিচে এসে নক্ষত্রটা খুঁজে বের করতেই সাহস ফিরে পেলেন। নিশ্চিতে তামাক খেলেন। তারপরই মনে করতে পারলেন অতীশের কোষ্ঠীটা তিনি দেখছেন না। বইপত্রের মধ্যে সবার কর-কোষ্ঠী তিনি ভারি গোপনে রেখেছেন। সেটা তার হারিয়েছে। তার কাছে এখন সেটা খুবই প্রয়োজনীয় বস্তু।

নির্মলা সকালে উঠে ঘর থেকে বের হতেই দেখল, বাবা চোখ বুজে বারান্দায় বসে আছেন। ঠিক যেন এক নির্বিকল্প পুরুষ। অচৈতন্য প্রায়। আগে এমন রূপ দেখা না দেখলে নির্মলা এ-সময় খুবই ভয় পেত। বাবার মধ্যে কি যেন অতিপ্রাকৃত কিছু খেলা করে বেড়ায়। তিনি সংসারে থেকেও যেন নেই। কোথায় এক অদৃশ্য অভিকর্ষ আছে যা তাঁকে টানে। তখন তিনি এমন কথাবার্তা বলেন যা সংসারী মানুষের পক্ষে সম্ভব না। এজন্য নির্মলা এই মানুষটির সেবা-যত্নের কোন ত্রুটি রাখে না।

সে ভাবল ডাকে, আপনি কি বসে বসে ঘোমাচ্ছেন। কিন্তু নির্মলা জানে, এ-সময় তাঁকে ডাকলে তিনি ভারি বিরক্ত বোধ করেন। নির্মলার মুখে সামান্য হাসি খেলে গেল। আসলে মেজ ছেলে কলকাতায় চলে যাওয়ায় নিজেকে তিনি তার চেয়ে বেশি বিপন্ন বোধ করছেন। বার বার বলেছেন, তুমি এদিকে কোথাও দেখ। অত দূরে যেয়ে কাজ নেই। মানুষ দূরে গেলে পর হয়ে যায়।

অতীশ বাবার কথায় হেসে ফেলেছিল।

—হাসবে না।

—আপনি তো আগে এমন ছিলেন না বাবা। কত সহজে সব কিছু অগ্রাহ্য করতে পারতেন।

—বৃক্ষের মত মানুষ। যত বড় হয়, বয়স বাড়ে তত ঝড় ঝাপ্টা বেশি

লাগে। তাছাড়া কলকাতা জায়গাটা ভাল না। ওখানে গেলে মানুষ মানুষ থাকে না। তুমি ইতিহাস পড়ে দেখ। তাই লেখা আছে।

অতীশ বাবার সেকেলে মনোভাব একদম পছন্দ করে না। বাবার ঐ ভয়। অতীশ বলেছিল, সব বড় বড় মানুষেরা কিন্তু সেখানেই শেষ পর্যন্ত গেছেন। বিদ্যাসাগর মশাই বাবার আদর্শ পুরুষ। সে বলেছিল, আপনি জানেন না, তিনি কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগর মশাই হয়েছিলেন। বীরসিংহ গাঁয়ে থাকলে বিদ্যাসাগর হতেন না।

বাবা কেন জানি আর কিছু বলেন নি। শুধু বলেছিলেন, তোমরা বড় হয়েছ, যা ভাল মনে কর, করবে। তবে বয়স বাড়লে মানুষের ভয় বাড়ে।

নির্মলা তখন অতীশকে সমর্থন করে বলেছিল, বাবা, আপনি কলকাতার অত দোষ দেবেন না। নিজে ঠিক থাকলে কার কি করার আছে।

বাবা এই কথায়, তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছিলেন। বুঝেছিলেন নির্মলা কলকাতার মেয়ে বলেই অভিযোগ হজম করতে রাজি না। পায়ের ওপর দু হাত ছড়িয়ে নিজের সারা শরীর দেখতে দেখতে বলেছিলেন, বড়ই প্রলোভন। কলকাতায় গেলেই লোভে পড়ে যায় মানুষ।

অতীশ বলেছিল, মানুষ বেঁচে থাকতে চাইবে না? মানুষ বড় হতে চাইবে না?

—মানুষের বড় হওয়া আর ধান্দাবাজ হওয়া এক কথা না অতীশ।

—সেটা সব জায়গাতেই আছে। দুষ্টু লোকেরা, ধান্দাবাজ লোকেরা ছত্রাকের মতো গজায়।

তারপর আর বাবা কোন কথা বলতে সাহস পান নি। এখন টের পাচ্ছে নির্মলা, অতীশ বাড়ি না থাকায় সামান্য বিভ্রমে পড়ে গেছেন তিনি। আজীবন শহরে থেকে মানুষ বলে, প্রথম প্রথম এখানকার সব কিছুই বড় নির্জন এবং চুপচাপ মনে হত নির্মলার। কোথাও যেন জীবন সে-ভাবে জাঁকিয়ে বসে নেই। ব্যস্ততা নেই, অনিশ্চয়তা নেই—কেমন প্রাণহীন এক জগৎ। প্রথম প্রথম সে খুবই হাঁফিয়ে উঠত। মাইল তিনেক দূরে শহর, বড় মাঠ পার হয়ে গেলে পাকা রাস্তা। মাঝে মাঝে বাস ট্রাকের শব্দ কানে আসত শুধু। দূর দিয়ে গরুর গাড়ি যায়। একটা কোঁ কোঁ আওয়াজ। বাগদি মেয়েরা মাছ ধরে ফিরে আসে। গায়ে গামছা। হাল গরু ধানের ক্ষেত, হাঁসের ডাক প্রথম প্রথম কেমন বিশ্রী লাগত। বাবা হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে ক্ষেতের মধ্যে চবর চবর

করে হাঁটছেন। তার শ্বশুর এই মানুষটা, জমিতে মুনিষদের সঙ্গে কেমন লেপ্টে থাকতেন—নির্মলার ভাল লাগত না। সকাল হলে গরু বের করা গরু মাঠে দিয়ে আসা, দুধ দোওয়ানো, গোয়াল ঘর পরিষ্কার করা—এসবে ভারি দুর্গন্ধ—মাঝে মাঝে ওক পেত তার। বৃষ্টির সময় উঠোনে পা দেওয়া যেত না, সারাটা উঠোন কাদায় থিকথিক করছে। নালা ডোবায় জল, ঘাস জঙ্গল, আর সাপের উপদ্রব। সব সময় নির্মলা বড় ভয়ে ভয়ে থাকত। শুধু একজন তার নিজের। তার সর্বস্ব। তাকে পাবে বলে সব স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে সে এ-জীবনে এসে ঢুকেছিল। চার বছর বাদে সেই মানুষ তাকে এখানে ফেলে কলকাতায় প্রবাসী হবে বলে চলে গেল।

নির্মলা কল পাড়ে গিয়ে মুখ ধুল। কাপড় ছাড়ল। সকালে বাবা তাকে একটা গুরুদায়িত্ব এখানে আসার পরই দিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বৌমা তুমি গৃহলক্ষ্মী। ঠাকুর তোমার হাতের ফুল বেলপাতা পেলে খুশী হবেন। তুমি রোজ পূজার ফুল দূর্বা তুলবে। বাসি কাপড় ছেড়ে নিও। এখন নির্মলার সেই গুরুদায়িত্ব পালনের সময়। ঠাকুর ঘরের শেকল খুলে ঠাকুর প্রণাম সারল। ভেতর থেকে সাজি বের করে নিল নির্মলা। সব কাজই খুব আস্তে করছে। কারণ বাবার যা নমুনা তাতে মনে হচ্ছে তিনি অনেক ওপরে উঠে সন্তানকে লক্ষ্য রাখার জন্য চোখ বুজে আছেন। এই অবস্থায় খুটখাট শব্দে যদি তাঁর অভিকর্ষ নষ্ট হয় তবে তিনি ব্যাজার মুখে বললেন, দিলে ত সব মাটি করে। আমি অতীশের চারপাশটা দেখব বলে বসেছিলাম—কোথায় গিয়ে উঠল—আর তোমরা খটাখট করে দিলে সব মাটি করে।

প্রথম প্রথম নির্মলার বাবার এমন সব আচরণে হাসি পেত। সে দেখত, প্রতিবেশীরা বাবার কাছে এসে পায়ের নিচে বসে আছে। বলছে, কর্তা দেখেন ত সানু ভাল আছে কিনা। মাসের ওপর হল কোন চিঠি নেই!

বাবা বলতেন, এখন হবে না।

—কখন আসব কর্তা।

—কাল ঠাকুর ঘরে যখন বসব তখন আসিস।

পরদিন এলে বাবা বলতেন, বুঝতে পারলাম না কিছু। দেখি রাতে।

সকালের দিকে এলে বলা, ভালই আছে। চিন্তা করিস না। চিঠি আসবে। কাজে-কম্মে আটকে গেছে।

নির্মলার প্রথম প্রথম বাবার এমন আচরণ ভালও লাগত না। মনে হত

বাবা মানুষকে ঠকাচ্ছে। একদিন রাতে সে অতীশকে অভিযোগও করেছিল, এটা কি! বাবার কি দরকার লোককে মিথ্যে স্তোকবাক্য দেওয়া। বাবাকে ত এ-জন্য মিছে কথা বলতে হয়। তিনি কি ঠিক জানেন, কে কি করছে!

অতীশ কি লিখছিল, সব শুনতে পায়নি, বলেছিল, কে মিছে কথা বলছে!

—বাবা।

—বাবা মিছে কথা বলছে! কেমন অবাক চোখে তাকিয়ে নির্মলাকে দেখছিল। অতীশের এই চোখকে নির্মলার বড় ভয়। যেন গভীর থেকে এক আত্মজিজ্ঞাসার মতো প্রশ্ন, তুমি কে? তুমি আমার কে!

—তাই তো। আমতা আমতা করে নির্মলা পালাত চাইলে, অতীশ খুব ধীরে ধীরে বলল, বাবার মিছে কথা বলার কারণ?

—লোককে দূরের খবর দেয়। বাবা কি সেখানে গেছে?

অতীশ কেমন সামান্য আশ্বস্ত ভঙ্গীতে বলল, তবে বিষয় এই। বাবা লোককে দূরের খবর দেয় কেন। আমারও সেই প্রশ্ন, বাবা দূরের খবর দেয় কেন? তারপরই অনেক দূরের কিছু যেন অতীশও দেখতে পায়। সে বলেছিল মানুষের মধ্যে কি থাকে, কি থাকতে পারে তুমি জান না। তাছাড়া বাবা আমার সরল মানুষ, ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি বাবা নিজে ঠকেছেন, কাউকে ঠকায় নি। এই যে বাড়ি ঘর এখানে বানিয়েছে বাবা, কত সাপ ছিল, বাবা একটাও সাপের গায়ে আমাদের হাত দিতে দেন নি। প্রকৃতির জীব, তোমরা বেঁচে বর্তে থাকবে, তারা থাকবে না। বাবা এমন বলতেন। বাবার সঙ্গে যেখানে যখন যজমান বাড়ি গেছি দেখেছি বাবা সবার মঙ্গল কামনা করছেন। বলছেন, দাস মশাই আপনার সোনার সংসার লক্ষ্মী ঘরে বাঁধা। বাবা নিজের জন্য তার ঈশ্বরের কাছ থেকে বোধহয় কিছুই চেয়ে নেননি!

নির্মলার তখন ভারি অস্বস্তি। অতীশ কথাগুলি তার দিকে তাকিয়ে বলছিল না। বাইরে জানালার দিকে অতীশের মুখ। সে দূরের কোথাও কিছু দেখতে দেখতে যেন বলে যাচ্ছে। সুদূরে সে একবার হারিয়ে গিয়েছিল—এখানে আসার আগেই লোক মুখে সে-সব খবর নির্মলা জানে—দ্বীপ-টিপ সমুদ্র এবং পৃথিবীর এক কোমল অন্ধকার থেকে মানুষের প্রত্যাগমন ঘটলে এমনই বুঝি হয়। নির্মলা বলেছিল, তারাপিসি পাড়ায় বলে বেড়াচ্ছে সব মিছে কথা। কর্তা কিছুই দেখতে পান না। আন্দাজে বলেন। বাবার কথা নাকি ঠিক হয় নি।

তারাপিসি প্রতিবেশী। এখানকার চারপাশে যারা আছে সবাই দেশের

লোক। বাবা বাড়ি করার পরই দেশের মানুষজনকে খবর পৌঁছে দিয়েছিল, নিজের মঙ্গল চাও তো চলে এস। এখানে একটা বড় বনভূমিতে নতুন আবাস গড়ি হচ্ছে। সময় থাকতে বাড়ি-ঘর বানিয়ে নাও। পরে আর আসতে পারবে না পারবে না ঠিক কি। সেই থেকে দেশের মানুষজন চলে আসতে লাগল। বাড়ি ঘর বানাতে থাকল। আসলে বাবার বাড়ি-ঘর হয়ে যাওয়ার পর মনে হয়েছিল বুঝি সবই আছে, গাছপালা মাঠ সবই আছে, কেবল সেই কাছের মানুষেরা নেই।

অতীশ নির্মলার দুঃখটা টের পেয়ে বলেছিল, বাবা কেন যে বলতে যায়! এবং পরদিন সকালেই সে বাবাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, আপনি আর এ-সবের মধ্যে থাকবেন না। কার কে কোথায় আছে, কেমন আছে আপনার কি দরকার বলার। সংসারের কি লাভ এতে।

অতীশকে বিষয়ী হতে দেখে বাবা বলেছিলেন, রক্তে তোমার দোষ ঘটেছে। জীবনে লাভালাভই বড় করে দেখছ। মানুষের শুভাশুভ দেখছ না। তুমি তো বিষয়ী মানুষ নও।

অতীশ বাবার কথার জবাবে কিছু বলতে পারে নি। বোধহয় ভেবেছিল, এই রকমেরই মানুষ তার বাবা। নির্মলার ওপরও বিরক্ত হয়েছিল। তার কথাতেই সে বাবার ব্যক্তিগত ভাল লাগা মন্দ লাগার বিষয়ে নাক গলাতে গিয়েছিল। বাবা কি টের পেয়ে তখনই বললেন, তারা বলেছে। ও তো বলবেই। বললাম, আমাকে সময় দে, বসতে দে, ভাবতে দে, মনোযোগী হতে দে, না তা চলবে না। এক্ষুনি বলে দিতে হবে। রাতে ঘুম আসবে না। রাতে না ঘুমালে শরীর নষ্ট। আয়ু নষ্ট। এ-সব তোমরা বুঝবে না। বেঁচে থাকার জন্য জীবনে প্রশান্তি দরকার। তারার খুব কষ্ট হবে ভেবে বলতে গেলাম। মিলল না। মিলতে নাই পারে। তখন যে আমার শরীরে কোন দোষ ঘটেনি, তাই বা কে বলবে। দোষে পড়লে হয় না।'

এই দোষ শব্দটি বাবা খুব বলেন। অর্থাৎ অপবিত্র ছিলেন। তারাপিসি বয়স আন্দাজে যৌবন ধরে রেখেছেন। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স—বাবা কি সেই যৌবনবতী মহিলাকে দেখে লুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। নতুবা দোষ ঘটে থাকতে পারে বলেছিলেন কেন। নির্মলা ফুলের সাজিতে একটা একটা করে শ্বেত জবা, রাঙা জবা বেলফুল রাখছে আর এমন সব ভাবছে। মানুষের শরীর ত। দোষ ঘটতেই পারে। বাবার পক্ষেই সম্ভব অকপটে সব স্বীকার করা।

আর এভাবেই নির্মলা বুঝতে পারছিল, এই বাড়িটার ওপর গাছপালার ওপর এবং বাবার ওপর তার টান বেড়ে যাচ্ছে। আগের মতো আর খারাপ লাগে না। ক্রমে নির্মলা এই সংসারে পবিত্রতা টের পেয়ে শহরের আকর্ষণ ভুলে যেতে বসেছিল। আর তখনই তার মানুষটার যে কি জেদ অথবা সে অভিমান বলতে পারে, মানুষের নীচতায় সে বড় কষ্ট পায়, সে সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে গেল।

কাল রাতে নির্মলারও ভাল ঘুম হয়নি। এমনিতেই তার মানুষটার শরীরের প্রতি আকর্ষণ কম। সে দেখেছে, এগিয়ে না দিলে মানুষটা কিছু খায় না। কিংবা বলা যেতে পারে কোন দূরবর্তী নক্ষত্রের প্রভাব আছে তার ওপর। বাবাও বলেন এই নক্ষত্রের প্রভাবেই অতীশ এক জায়গায় সুস্থির হয়ে বসতে পারছে না। সময় লাগছে।

নির্মলা বাসন্তী রঙের শাড়ি পরেছে। নির্মলা লম্বা উঁচু। ছিমছাম সুন্দর চেহারা। তীক্ষ্ণ নাক চোখ। চোখের ধার প্রবল। এই ফুলের বাগানে সে ঘুরে বেড়ালে টের পায় আশ্চর্য এক সুঘ্রাণ উঠছে। নীল আকাশ। ঘাস ভিজা ভিজা। ঘাসে বর্ষার কীট পতঙ্গ উড়ে বেড়াচ্ছে। ফুল গাছগুলোর ডালপালা হাওয়ায় সামান্য দুলছিল। মা উঠে পড়েছেন। রান্নাঘর থেকে বাসন-কোসন বের করার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সাবিত্রী এসে যাতে বসে না থাকে সে জন্য সব কাজ এগিয়ে রাখছেন।

বাবা বারান্দা থেকেই তখন ডাকলেন, আরে ওঠ তোরা। বেলা হয় না। তোদের ঘুম ভাঙে না কেন। একবার উঠে দেখ। কি দেখবে যেন নির্মলা বোঝে। দিন বয়ে যায়। কাজ কাম ফেলে রাখিস না। সকাল সকাল সব ঘরে তুলে নে। আসলে যেন সেই মোজেসের মত সে বাবার দৈববাণী শুনতে পায়। অতীশ কেন যে বাবার সবটাই এক আত্মসুখ ভেবে থাকে। বাবা এ-সব ভাবতে ভালবাসে—ঈশ্বরের সঙ্গে তার খুব নিকট সম্পর্ক। খেতে বসলে, বাবা বলবেন, ঠাকুর খাও। কোনদিন রান্নাবান্না পছন্দ মতো না হলে বলবেন, ঠাকুর আজ খেয়ে সুখ পেল না।

ফলে নির্মলার কাছে বাড়িটা কোন আশ্রম-টাশ্রমের মতো মনে হয়। দু' দিনের জন্য এই আশ্রমে সবাই এসে হাজির হয়েছে। গাড়ি এলে সবাই সব ফেলে আবার উঠে পড়বে। রাস্তা গেছে বাড়ির পাশ দিয়ে। ইঁট সুরকির রাস্তা। ধারে ধারে বাবার হাতের গাছ। আম জাম নারকেল লিচু। বার-

চোদ্দ বছরে গাছগুলো আকাশের নিচে ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে। পূবমুখী ঠাকুর ঘর। পশ্চিমমুখী বড় ঘর। পাশাপাশি দুটো উত্তর দক্ষিণমুখী ঘর। বাড়ি-ঘর ছেড়ে বাবা কোথাও আজকাল দু'-একদিনের বেশি থাকতে পারেন না। সব তিনি খেটে-খুটে করছেন। বড় ছেলে তার বৌ নিয়ে বিদেশে থাকে। কালেভদ্রে আসে। কেমন আলগা সম্পর্ক সবার সঙ্গে। মাঝে মাঝে অতীশকে বলেন, ওকে একটা চিঠি দিস। আমি ভাল আছি লিখবি। টাকা পয়সার কথা কিন্তু কিছু লিখবি না। সুবিধা অসুবিধায় বাবাকে বড় ছেলে টাকা দেয় না বলে অভিমান আছে একটা। —বড়ই স্বার্থপর। সংসারে লেপ্টে থাকার দামটা বুঝল না। তখনই কেন জানি এই মানুষকেই মনে হয় বড় বিষয়ী। বাবাকে বিষয়ী ভাবলে, নির্মলা অস্বস্তি বোধ করে। সে দেখল তখন সাজিতে নানা বর্ণের ফুল। বেলফুল শ্বেত জবা, রাঙা জবা, অপরাজিতা, ঝুমকো লতা, স্থলপদ্ম। সাজিটা বেশ বড়। পূজায় বসে বাবার ফুল কম পড়লে রাগ করেন।

নির্মলা এখন আঁতিপাতি করে খুঁজছে আর কি ফুল আছে। দেখলে মনে হবে সক্কালবেলায় এক যুবতী গাছগুলোর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। একবার এ-গাছের নিচে আবার ও-গাছের নিচে বসে উঁকি দিয়ে যখন বুঝল, বাগানে আর একটি ফুলও নেই তখন নিশ্চিন্তি। বাবা বাগানে এসে ফুল আছে দেখতে পেলে রাগ করেন। বিকলেই ফুটল ফুলটা যেন অভিশাপ দিতে পারে। ফুলের অভিশাপ বলতে। তখন তিনি বিড়বিড় করে খড়ম পায়ে বকবেন আর হাঁটবেন।—তোমরা বৌমা গাছে ফুল ফুটে থাকে দেখতে পাও না। বলত, আমি না দেখলে অনর্থক সকালে ঝরে থাকত গাছের নিচে। কারো সেবায় লাগত না।

বাবা তখনও ডাকছেন, ওরে ওঠ। উঠে ঠাকুর প্রণাম কর। প্রহ্লাদ আর কত ঘুমাবি। একবার শুক্রাচার্যের কাছে যেতে হবে। তারপর কি ভেবে আবার জোরে জোরে ডাকছেন, অ-বৌমা, বৌমা, আসল কথাটাই বলা হয়নি। তুমি শিগগির এসো।

নির্মলা কাছে এলে বলেন, অতীশের কোষ্ঠীটা পাচ্ছি না। তুমি কোথাও রেখেছ।

—আমার কাছেই ত রাখলেন। বললেন, বৌমা নিজের জিনিস বুঝে নাও।

—ঠাকুর একেবারে ভুলে গেছে। তারপরই প্রফুল্ল হাসি। যেন মসকরা করছেন নিজের সঙ্গে। তালে ভুল হচ্ছে। তোমার তো সন্তান-সন্ততির বিষয়ে এত ভুল হয় না। শেষে বললেন, ওটা দেবে। সুবল আচার্যকে ডেকে আনতে হবে। শুক্রাচার্য কি বলে দেখি!

প্রহ্লাদ কর্তার হাঁক পেয়েই উঠে পড়ল। তারপর হাসু ভানুকে ডাকল। এই যে কর্তাসকল ওঠেন! ঘণ্টা বাজছে।

প্রহ্লাদ দরজা খুলে বের হয়ে এল। হাসু শুয়ে শুয়েই চিৎকার করছে, বৌদি বৌদি, ভানু আমাকে লাথি মারছে। দেখ এসে।

এই ছোট দুই দেওর ভারি দুষ্টু। বাবার বেশি বয়সের জাতক। এ-দেশের মাটিতে এ-দুটির জন্ম। অতীশের সঙ্গে বয়সের তফাত অনেক। যেন এরা বাবার পুত্র সন্তান না, অতীশের। এদের জন্য তার বড়ই দুর্ভাবনা। পড়াশোনা দেখার ভার তার ওপর। বাবা পড়ল কি পড়ল না—একেবারে দেখেন না। মানুষ নিজের চেষ্টাতেই সব করে—তার ইচ্ছাতেই সব হয়—এমন বিশ্বাসের মানুষের ওপর সব ছেড়ে দেওয়া যায় না বলেই অতীশ যাবার আগে এই দুই ছেলের ভার নির্মলার ওপর দিয়ে গেছে।

নির্মলা ধমক লাগাল, দুটোকেই কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখব। তাড়াতাড়ি উঠে মুখ ধুয়ে নাও। পড়তে বস। টাস্কগুলো কর। সব দেখব।

প্রহ্লাদ তখন বের হয়ে মাটি ছুঁয়ে প্রণাম করল। তারপর ঠাকুরঘরের দাওয়ায় মাথা ঠেকাল। চিমটি কেটে একটু মাটি তুলে জিভে ছোঁয়াল। দিনের কাজ এই করে আরম্ভ। গরুর ঘর থেকে ধলি কালিকে বের করতে হবে। দোয়াতে হবে। দুধের বালতিটা কলপাড়ে যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গেল। জমিতে কাদা করা আছে। কাল বিকেলে কিছু সাঁওতাল মেয়ে ঠিক করে এসেছে। সাতটা না বাজতেই চলে আসবে। এরই মধ্যে একবার যেতে হবে আচার্যের কাছে। তাঁকে ডেকে নিয়ে আসতে হবে। কাল থেকেই কর্তা কেমন উসখুস করছেন। আজ সকালে বুঝতে পারল তিনি অতীশ দাদাকে পাঠিয়ে ভাল নেই। আচার্য না আসা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছেন না। এবং তখনই মনে হল কর্তা সবার বেলায় এত জানে নিজের বেলায় কিছু জানে না কেন! অবশ্য এত সাহস নেই তার। ধার্মিক মানুষ জানে এই লোকটাকে তল্লাটের মানুষেরা ভক্তি শ্রদ্ধা করে। সেও করে। কোন গুপ্ত কলকাঠি আছে ঠাকুরের কাছে। সেটা নিজের বেলায় অকাজের বান্দা।

তখন ফুল দূর্বা ঠাকুরঘরে রেখে এল নির্মলা। তারপর ট্রাঙ্ক খুলে কুষ্ঠিটা বের করল। লম্বা। কারুকাজ করা ফিতে লাগানো একটা সরু কাঠের দণ্ড দিয়ে লাটাইর মতো প্যাঁচানো। সবটা খুললে প্রথমেই চোখে পড়ে কল্যাণ শ্রীমান অতীশ দীপঙ্কর দেবশর্মণ ভৌমিকস্ত জন্ম পঞ্জিকা—রোহিণী নক্ষত্র, বৃষ রাশি,

নরগণ। তারপরই বোধহয় নিচের লেখাটুকুতে আছে গ্রহ নক্ষত্রের ভজনা—ওঁ আদিত্যাদি গ্রহাসর্বেন নক্ষত্রানি চরাশয় দীর্ঘসায়ু প্রকুবর্বন্ত যস্তের জন্মপত্রিকাং ব্রহ্মাদি দেবতা সর্বে গোষ্যাদি মাতৃকাস্তথা স্থর্যাদয়ো গ্রহাসর্বে রক্ষন্তু বালকং। হে আদিত্যাদি গ্রহ সব বালককে সব বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করুন। নির্মলারও সঙ্গে সঙ্গে এমন বলতে ইচ্ছে হল। বালক কথাটা ভাবতেই কেমন রোমকূপে নির্মলার বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। অতীশের বালক বয়সের কোন ফটো নেই। এই বাড়িটা তার মানুষজন, শতাব্দী পিছিয়ে এই গ্রহে এখনও বসবাস করে যাচ্ছে। ভাবতে গিয়ে কেমন আচ্ছন্ন বোধ করল নির্মলা। বাবার ডাকে সংবিৎ ফিরে পেল। বাবা জিজ্ঞেস করছেন বারান্দা থেকে, পেলে।

—পেয়েছি।

—আমাকে দাও। কাজ আছে।

মানুষটার সব কর্মফল এই কোষ্ঠীর মধ্যে আছে। মানুষটার ভূত ভবিষ্যৎ সব। কোষ্ঠীটা হাতে নিয়ে সে আজ কেন জানি ভারি রোমাঞ্চ বোধ করল। মানুষটা দু'দিন হল তার সঙ্গে নেই। নেই বলেই বুঝি এত আগ্রহ। তার এখন কেন জানি কোষ্ঠীটা হাত-ছাড়া করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। নির্মলা কোষ্ঠীটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। সবল আচার্য এল যখন তখন দশটা বাজে।

কলকাতায় তখন অতীশ কুম্ভর সঙ্গে প্রিন্টিং সেকসান থেকে বের হয়ে আসছে। রঙ বার্নিশের গন্ধ। গন্ধটা সে কবে থেকেই পেয়ে আসছে। সেই সুদূরেও সে যখন ছিল. এমনি রঙ বার্নিশের গন্ধ, মবিলের গন্ধ, গ্যাসের গন্ধ। জাহাজে ওঠার সময়ও প্রথম সে এমন একটা বিশ্রী গন্ধ পেয়েছিল। তার পাশে সুপারভাইজার হরিহরবাবু প্রিন্টিং ইনচার্জ মণিলাল। কুম্ভ সব বোঝাচ্ছিল। টিনপ্লেট কোথায় সাইজ করা হয় তারপর কিভাবে ব্লক হয় এবং শেষে সেই ব্লক লিথোতে তুলে টিন ছাপা থেকে ফ্যাব্রিকেশন সব।

তিনটে বড় বড় টিনের সেডের মধ্যে কারখানা। প্রিন্টিং সেকসানের দুটো অংশ। বড় অংশটায় গ্যাস চেম্বার, প্রিন্টিং প্রেস। বার্নিশ করার জন্য ছোট্ট ঘেরা জায়গা। তার পাশে আর্টিস্টদের ঘর। ডিজাইন থেকে ব্লক সব এ-ঘরে। তারই পাশে কাঠের পার্টিশান—সেখানে ম্যানেজারের ঘর। নিচের দিকে লাগোয়া অফিস, আলমারি ফাইল-পত্র সব। সেডের পাশে বড় অশ্বত্থ গাছ—গাছটায় একটা লাল রঙের ঘুড়ি আটকে আছে।

এক নম্বর টিনের শেড থেকে নেমে রাস্তা পার হতে হয়, রাস্তা পার হলে দু নম্বর টিনের শেড। অতীশ রাস্তায় নামতেই দেখল, একজন কুষ্ঠ রুগী খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছে। কুম্ভ বলল, আমাদের পুরোনো মিস্ত্রি শিবলাল। পাশেই থাকে। গেটে দারোয়ান, উঠে দাঁড়িয়েছে। বস্তি এলাকার মধ্যে এই তিনটে শেড বলে, কলহ বচসা কানে আসছে।

শিবলাল, দূর থেকেই গড় হল।

অতীশ বলল, আরে করছেন কি!

কুম্ভ আগে, হরিহর পেছনে, মাঝখানে অতীশ। কারখানায় কেউ উঁকিঝুঁকি মারছে না। লম্বা প্ল্যাটফরমের মতো টিনের চালা বেশ দূরে চলে গেছে। বাইরে সে দেখল, একটা চওড়া বেল্টিং ঘুরছে। শেডের মধ্যে ঢুকতেই বাইরের সব কোলাহল মেশিনের শব্দে ডুবে গেল।

কুম্ভ বলল, এগুলো কামড়ি মেশিন। পাশে কাইচি। কাইচিতে দুটো লোক ভীষণ নিবিষ্ট হয়ে কাজ করছে। সেখান থেকে টিন ঢুকিয়ে নিয়ে কেউ আসছে কামড়ি মেশিনে। ঝপাঝপ মেশিন থেকে সাইজকরা টিনের পাত পডছে। প্রতিটি কর্মী ভীষণ হাত চালিয়ে কাজ করছে।

কুম্ভ বলল, নজর দিলে এটাও দেখবেন একদিন মেটাল বকস হবে। লাভের গুড় সব আগের ম্যানেজারের পেটে। এখন কে খায় দেখুন।

অতীশ হাঁটতে থাকল। কুম্ভবাবু সারাক্ষণ বকবক করছে। লম্বা চওড়া বাত বলছে। চারপাশে অজস্র বেল্টিং ঘুরছে। পর পর কটা পাঞ্চিং মেশিন, লেদ মেশিন। লেদম্যান ফুল স্পিডে লোহার মোটা রডে চিজেল সেট করে বসে আছে। কটর কটর করে লোহা কাটার শব্দ কানে আসছিল। পরিশ্রমী এই মানুষগুলো খুবই বিপাকে পড়ে যেন কাজ করে যাচ্ছে। পর পর সে এ-ঘরে পঁচিশ ত্রিশজন কর্মী দেখল, সবাই রুগ্ন, চোখ কোটরাগত। একটা লোক ডিবের বিট কাটছিল উবু হয়ে, আর তার দিকে কেমন জলন্ত চোখে তাকাচ্ছে। দেখলেই ভয় করে। পাতলা ঢ্যাঙা পাতলুনের মতো চেহারা, গোঁফ ততোধিক লম্বা। কুম্ভ নাম বলে যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে অতীশের মনে হল, আবার সেই লজঝড়ে জাহাজ। হাত দিলেই সব খসে পড়বে। এই লজঝড়ে জাহাজটাকে মেটাল বকস বানাতে হবে। কিন্তু যা সব চেহারা মেশিনপত্র তার আগেই যদি সমুদ্রে ডুবে যায়! লজঝড়ে জাহাজের ক্যাপ্টেন সালি হিগিন্স সে এখন নিজে। নিয়তি মানুষকে শেষ পর্যন্ত

কোথায় নিয়ে আসে। সে যতই লজঝড়ে জীবন থেকে পালাতে চায়, তাকে কে বা কারা বলিদানের জন্য যেন সেখানেই টেনে নিয়ে যায়। আর্চির প্রেতাত্মা সঙ্গে থাকে। গন্ধে অতীশ টের পায় সে এসে গেছে। তখনই কুম্ভ বলল, এর নাম মনোরঞ্জন। আমাদের বিটম্যান। ইউনিয়নের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি।

অতীশ জাহাজে ইউনিয়ন দেখেনি। সে বলল, ইউনিয়ন!

—এখানে সি পি এম-এর ইউনিয়ন।

সেই ইউনিয়নের লোকটা তখন বিট থামিয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করল। অতীশও হাত তুলে নমস্কার করল। কিছু যেন বলতে চাইল লোকটা—অতীশ শুনতে চাইল না। প্রেতাত্মার গন্ধ তার নাকে এসে লাগছে। সে সোজা অফিসে এসে বসল, এ একদিনে বোঝা যাবে না। তবে গন্ধে বুঝতে পারল, আর্চি আশেপাশেই আছে। তাকে ধাওয়া করছে। কারো না কারো ওপর ভর করে তাকে জ্বালায়। এখানেও সে তাকে ছেড়ে দেবে না। অতীশ কিছু কিছু কাজ বুঝে নিতে গিয়ে বুঝল, এ-বিষয়ে তার কোন অভিজ্ঞতা নেই—কানেও ঢুকছে না। এতে আর্চির অনেক সুবিধে। সে বলল, কুম্ভবাবু, একদিনে সব ঢুকবে না। চলুন বরং বস্তিটা একবার ঘুরে দেখে আসি। আসলে সে আর্চির অশুভ প্রভাব থেকে মুক্তি পাবার জন্যই যেন বাইরে বের হয়ে এল। এবং নিশ্বাস নিতে গিয়ে বুঝল, সেই গন্ধটা আরও ভারি, আরও ভুরভুর করছে। এখানে সে ভাল করে নিশ্বাস নিতে পর্যন্ত পারছে না। আর্চি আগের মতো আবার তার পিছু নিয়েছে। কিন্তু সেটা কেন সে এখনও বুঝতে পারছে না। সেটা কে? তার চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হল।

॥ পাঁচ ॥

ফেরার পথে অতীশ বলল, ভাল ধূপকাঠি দরকার। ধূপকাঠি কিনব কুম্ভবাবু।

কারখানা থেকে গাড়ি বের হতেই অতীশ কথাটা বলল। দু-পাশের বস্তি তখনও শেষ হয়নি। কালীমাতা হোমিওপ্যাথ ডিসপেনসারির সামনে গাড়ি। রাস্তার কলে বালতির লাইন। পাশে বড় বড় ঝাঁকা। বেতের মোড়া লম্বা। ছোলা শসা পেঁয়াজ গুঁড়ো লঙ্কায় সাজানো। রাস্তা জুড়ে বসে গেছে হকাররা। ওদের এখন বের হবার সময়। গাড়ি দেখে ওরা তাড়াতাড়ি ঝাঁকাগুলি সরিয়ে

নিচ্ছে। অতীশ দেখল, দাওয়ায় বসে এক বুড়ি নাতিনের উকুন বাছছে। বস্তির উলঙ্গ শিশুরা কোথা থেকে একটা আখ চুরি করে এনেছে—তাই নিয়ে হুটোপাটি। বেওয়ারিশ কুকুর এবং আবর্জনায় ভর্তি চারপাশ। থিকথিক করছে নোংরা জল। তার মধ্যে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। ছাগল গরু ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাড়ি চালাবার সময় খুব সতর্ক থাকা দরকার। কুম্ভকে এরা চেনে। কেউ কেউ সেলামও ঠুকে গেল।

কুম্ভ বলল, ভাল ধূপকাঠি আমারও দরকার। ড্রাইভারকে বলল, একটু ঘুরে যাবি।

দোকান থেকে ধূপকাঠি কেনার সময় কুম্ভ বলল, আপনার পছন্দ হচ্ছে না।

—ভাল গন্ধ হবে ত!

—খুব সুন্দর গন্ধ। নিয়ে দেখুন না।

—চড়া গন্ধ দরকার।

—আমার কিন্তু চড়া গন্ধ অতীশবাবু একদম পছন্দ না।

অতীশ বলতে পারত, আমারও না। কিন্তু এ মুহূর্তে কড়া গন্ধ চাই। এই এক ল্যাটা জীবনে। সে এক ধূপকাঠি কিনতে কিনতেই ফেরার হয়ে যাবে এমন ভাবল। সে প্রায় হামলে তুলে নিল ডজনখানেক ধূপবাতি।

কুম্ভ অতীশবাবুর কাণ্ড দেখে হাঁ হয়ে গেল। —এত ধূপকাঠি দিয়ে কি হবে?

অতীশ কিছু বলল না। দাম মিটিয়ে বলল, চলুন।

কুম্ভ ভাবল বেশ লোক বটে। এসেই ধূপকাঠি কিনতে শুরু করেছে। সে তবু বলল, দেশে পাঠাবেন বুঝি।

অতীশ বলল, না।

—ধূপকাঠি বেশি দিন থাকলে নষ্ট হয়ে যায়।

অতীশ বলল, জানি।

কুম্ভ কেন জানি আর কিছু বলতে সাহস পেল না; পাঁচ সাত ঘণ্টা একসঙ্গে কাটিয়ে মনে হয়েছে মানুষটা কথা বলতে বলতে খুব অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কাজ বুঝে নেবার সময় না হলে কেউ বলতে পারে না চলুন বস্তিটা ঘুরে দেখি। মানুষটা লেখালিখি করে; বস্তি দেখার তাই আগ্রহ। কিন্তু বস্তির কিছুটা ভিতরে গিয়েই বলল, থাক চলুন। পরে দেখা যাবে। এই বস্তির মধ্যে মাত্র একটা ন্যাড়া বেল-গাছ এবং অশ্বত্থ গাছ দাঁড়িয়ে। আর কিছু নেই। ইলেকট্রিকের তার এদিক-ওদিক ঝুলে আছে। সব খুপরিগুলি আলকাতারায় অথবা পিচের টিনে মোড়া।

ছোট ছোট দরজা। মানুষগুলি আরও ছোট, কাকলাশ। দেখে দেখে কুম্ভর অভ্যাস হয়ে গেছে। একটা লোক গামছা পরে শেডের নিচে বসে আছে। চা বানায় লোকটা। গালে বড় জড়ুল। চুল সাদা। লোকটা দাওয়ায় ঘুমায়। লোকটার নাম হরকু সিং। নাম শুনেই অতীশবাবু কেমন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছিল।

কুম্ভ বলেছিল, আপনি আলাপ করতে পারেন। যদি বলেন অফিসে ডাকিয়ে আনব। বস্তির কেচ্ছা কাহিনী জানে।

অতীশ বলেছিল, কেচ্ছা কাহিনী লেখার বিষয় হতে পারে না কুম্ভবাবু।

কুম্ভর তাই ধারণা। সে হিন্দি সিনেমাখোর। বৌ হাসিরাণী প্রায় পারলে এবেলা ওবেলা দেখতে চায়। কোন রববার ফাঁক গেলে কুম্ভ জানে বিছানায় বউ ঘেঁষতে দেবে না। ভয়ে সে আগেই সেজন্য টিকিট কেটে রাখে, এবং একটা সপ্তাহ বৌকে তবে বিছানায় উল্টে-পাল্টে নিরাপদে বেশ জুতসই দেখা যায়। হাসিরাণীর রং গৌরবর্ণ। মসৃণ ত্বকে কি সুষমা! রক্তে বিজবিজ করে থোকা থোকা পোকা। ভেতরে কামড়ায়। হিন্দী সিনেমা না দেখলে পোকারা ভেতরে কামড়াতে উদ্গ্রীব হয় না। কেমন নিরাসক্ত, ঠেলে ফেলে দেয় বুকের ওপর থেকে। কুম্ভ নিচে গিয়ে শুয়ে থাকে।

গাড়িটা যাচ্ছে। ট্রাম লাইনে দুটো ট্রাক দাঁড়িয়ে। সিনেমা ভাঙছে। হাউসের গায়ে সাই জোয়ান এক মদ্দ এবং পাশে লম্বা ঠ্যাংখালি করে যুবতী দাঁড়িয়ে। বড়ই কামের উদ্রেক করে। রাস্তায় ভিড়। মানুষজন বাসের জন্য মোড়ে মোড়ে জমা হয়ে আছে। কাদার মতোই থিকথিক করছে মানুষেরা।

অতীশ এইসব দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক থাকতে চাইছে। কারণ গন্ধটা নাক থেকে যাচ্ছে না। সে ধূপকাঠির প্যাকেটগুলি নাকের ডগায় প্রায় এনে উবু হয়ে বসল। কতক্ষণে গাড়িটা রাজবাড়িতে ঢুকবে। ঢুকলেই স্নান, এবং ঘরে ধূপ-বাতি জ্বেলে দেবে। গন্ধটা তবে নাকে ঝুলে থাকবে না। আর্চির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে।

গাড়িটা ওদের রাজবাড়ির সামনে নামিয়ে দিল। বাকি পথটুকু হেঁটে যেতে হবে। প্রথম দিন বলে একটা গাড়ি পাওয়া গেছে। পরে অতীশকে ট্রামে বাসেই যেতে হবে। তার ট্রামে-বাসে ওঠার অভ্যাস একেবারে নেই। রাস্তা-ঘাটও ভাল চেনে না। সে নামার সময় বলল, কুম্ভবাবু আমাকে যাবার সময় ডেকে নেবেন।

কিন্তু রাজবাড়ি ঢোকার মুখেই দেখল ভেতরে যতদূর দেখা যায়—খালি।

একটা লোক নেই। হঠ যা হঠ যা করে চিৎকার করছে একটা লোক। টিকিধারি গায়ে লম্বা পিরান পরনে পাঞ্জাবি। সে লোকটাকে আগে দেখেনি। দু পাশ থেকে লোকজন সরে যাচ্ছে। যদি কেউ সামনে পড়েও যায়, নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এবং হাত করজোড় করা।

সদরের সিপাই হাঁকল, খবরদার রাজার গাড়ি আতা হ্যায়।

অতীশ দেখল, সাদা রঙের একটা ক্যাডিলাক। ভেতরে রাজেনদা। পাশে মেমসাহেবের মতো ববকাটা চুলের এক যুবতী। চোখে নীল চশমা। ভারি সুন্দর দেখতে এক রহস্যময়ী নারী। চোখ উদাস মনে হল। একবার যেন অতীশকে চোখ তুলে দেখেছেও। অতীশেরও চোখে চোখ পড়ে গেছে। তারপরই সে কেমন বিমূঢ়। যুবতীকে কোথায় যেন দেখেছে, কতকালের যেন চেনা। কে এই যুবতী এমন মনে হল তার! চেনা। কিন্তু সে তো দীর্ঘদিন বিশেষ করে নিরুদ্দিষ্ট জীবন থেকে ফিরে আসার পর গাঁয়ে ছিল। মাঝে এক বছর একটা কো-এডুকেশন ট্রেনিং কলেজে বি টি পড়েছে। হোস্টেল জীবনের সে কিছু মেয়ের মুখ মনে করার চেষ্টা করল। সবিতা, আরতী, চন্দ্রা, জ্যোৎস্না, পূরবী এক এক করে তার সব সহপাঠিনীদের মুখ মনে করার চেষ্টা করল। না ওদের কেউ এমন দেখতে ছিল না। ওরা কেউ এত সুন্দর, এত লম্বা, এত মহিমময়ী ছিল না। শরীরে নীল রক্ত না থাকলে এমন নমনীয়তা চোখে মুখে কখনও আসে না।

সদরে সেও এক পাশে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। রাজবাড়ির এই নিয়ম। রাজা বের হলে দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকা। হাত করজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকা। সে যত বড় অফিসার হোক রেহাই নেই। অতীশ নতুন। জানে না সব কিছু। সে হাতে ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কুম্ভবাবু বলল, এটা কি করলেন!

কি হল! তখনই বুঝল, তারও উচিত ছিল কুম্ভবাবুর মতো হাত তুলে কপালে ঠোকা। তারপর বলল, আমি ত জানি না। তারপরই ভেতরে কেমন এক দৈত্য মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ক্রীতদাসের ভূমিকা পালন করতে হবে ভেবেই মাথার ঘিলুতে জ্বর চলে আসে। সে ভেতরে ভেতরে কেমন ক্ষেপে যায়। শক্ত এবং অমার্জিত গলায় বলল, এটাই এ-বাড়ির নিয়ম বুঝি?

কুম্ভ বলল, আজ্ঞে তাই। তবে সব ঠিক হয়ে যাবে। থাকতে থাকতে অভ্যাস হয়ে যাবে। আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। এখন আর লাগে না। নতুন নতুন লাগবে। ভাববেন না। চামড়া ভারি হয়ে যাবে।

অতীশ মনে মনে কেন জানি ভয়ংকর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। সে জানেও না তার

নাকে আর গন্ধটা নেই। কখন গন্ধটা উবে গেছে। প্রেতাত্মার ভয় থেকেও এই অবমাননার ভয় তীব্র তীক্ষ্ণ। সে আসলে বিভ্রমের মধ্যে পড়ে গেছে। যে গেল সে কে? তার গাড়ি গেলেই করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা—ভাবা যায় না। বরং বিদ্রোহ করবে। রিভলিউশন। এ-বাড়িতে এটা রেভলিউশনেরই শামিল। গতকাল সে রাজার সঙ্গে জুতো পরে দেখা করেছে। বাড়িতে এই নিয়ে তোলপাড় গেছে। মানসদাও খবরটা পেয়ে গেছিলেন। একবার সকালে এসে বলে গেলেন, ওহে নীবন যুবক, তোমার ত ভারি আস্পর্ধা হে। রাজার ঘরে জুতো পরে ঢোক। বেয়াদপ।

নবীন যুবক হাঁ করে তাকিয়েছিল।

মানসদা বলেছিলেন, বুটের তলায় যতক্ষণ থাকবে মনে রাখবে ভাল আছ। চুরি কর চামারি কর খুন কর সব মাফ। বের হতে চেয়েছ কি মরেছ।

অতীশ কি বলতে গেলে এক ধমক দিয়েছিল মানসদা।—দেখ নবীন যুবক আমি তোমার আগে পৃথিবীতে এসেছি। অনেক দেখা। তুমি মনে করছ দেশ-বিদেশ করেছ বলে সব বোঝ সব জান। মোসায়েবি বলে একটা কথা আছে অভিধানে। সেটা একবার খুলে পড়ে দেখ। উপকারে লাগবে। তুমি কতটা কাজের তার চেয়ে বেশি দরকার কত বড় তুমি মোসায়েব। ইংরেজ আমল থেকে দেশে সেই এক ট্রাডিশন চলছে। ফক্কা ছক্কা বাইরে চলে, রাজার বাড়িতে চলে না। বলে তিনি তার মুঠো আল্গা করে দেখালেন, কিছু নেই। তবু কত জোর এই মুঠিতে। চেপে ধর, মনে হবে, বিশ্বসংসার তোমার তালুতে, আল্গা করে দাও, মনে হবে সাঁতার কাটছ।

সে ভাঙা শ্যাওলাধরা দোতলা বাড়িটার সামনে এসে সকালের কথাগুলি মনে করতে পারল। সৎ মানুষ চাই। সৎ জীবনের আশায় সে এখানে এসেছে। প্রথম সে নির্ভয় পেয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে সব ফাঁকা। সে বলল, আচ্ছা কুম্ভবাবু রাজেনদার পাশে ভদ্রমহিলা কে? প্রায় বিদেশিনীরা মত দেখতে।

—ওরে বাপ, আপনার সঙ্গে কথা বললেও দেখছি কেলেঙ্কারি হবে। বলতে হবে কে? তারপর খুব গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, বৌরাণী। সব কব্জা করে ফেলেছে। কুক্ষিগত করেছে সব। এ-সব কথা আবার দু-কান করবেন না যেন। কুম্ভ পরে বলতে যাচ্ছিল, কাছা-আলগা লোক মশাই আপনি। ধরে ফেলেছি। তারপরই সতর্ক করে দিয়ে বলল, দু-কান করবেন না। করলে সোজা মশাই অস্বীকার করব। বাবা বলেছেন, আত্মরক্ষার জন্য সব করা চলে। বাবার

কথা খুব মানি। দেখছি এতে আমার উপকারই হয়েছে। অনেক বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পেয়ে গেছি।

কুম্ভ চলে যাচ্ছিল, অতীশ ফের ডেকে কি যেন ভাবল বলবে। কিন্তু ভুলে গেছে কি বলবে।

কুম্ভ বলল, কিছু বলবেন ?

—আচ্ছা বৌরাণীর দেশ কোথায় ছিল জানেন।

—আপনার দেখছি ভারি ব্যামো আছে। ও দিয়ে কি হবে! আমাদের সাহস আছে জানার!

—বাঙালী মেয়েরা তো দেখতে এমন হয় না।

—কে বলেছে বাঙালী। তবে শুনেছি বাপ বাঙালী জমিদার ছিল। বাকিটা ঠিক জানি না। জানলেও বলব না। আপনি আমার ওপরওয়ালা, যদি জোর করে জানতে চান বলতে পারি। ধরা পড়লে বলব, চাকরি রক্ষার্থে বলেছি। তালেই দোষ খণ্ডন।

—না, জানতে চাই না। আর শুনুন, আমি কিন্তু রাতে মেসে খাব। আমার জন্য আর বাড়িতে ঝামেলা বাড়াবেন না।

কুম্ভ খুব মোলায়েম গলায় বলল, আপনাকে দাদার মতো দেখি বলেই এত জোর গলায় কথা বলি। বাবা বলেছেন, মানুষটা ভাল। সেই থেকে ভাল মানুষ আছেন। তবে কি জানেন, এ-বাড়িতে ভাল মানুষকেই আমাদের ভয়। আপনাকে কোন কথা বলতে ভয় করে।

অতীশ উঠে সিঁড়িতে যেতে যেতে বলল, আরে না, যত ভাল মানুষ আমাকে আপনারা ভাবছেন, আসলে আমি তত ভাল নই। শেষে নিজের কাছেই জবাবদিহি করার মতো বলল, ছোটবাবু কি ঠিক না! তুমি আড়ালে চলে যাচ্ছ কেন। সামনে এস। আমি ঠিক বলিনি!

অতীশ দেখতে পেল তার পাশে পাশে ছোটবাবু লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। ছোটবাবু একটা ক্রস কাঁধে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে টুইন ডেকে উঠছে। পেছনে পেছনে বনি উঠে আসছে। পাশে সেই বুড়ো মানুষ—হাত তুলে দিগন্ত প্রসারিত সমুদ্র দেখিয়ে বলছেন, ইউ উইল কেরি দিস ক্রস।

অতীশ ছোটবাবুকে প্রশ্ন করল, সেটা মানুষের কতদিন।

ছোটবাবু সমুদ্রে উড়ে উড়ে বলে যাচ্ছে যেন, আজীবন অতীশ। আজীবন এই ক্রস বহন করে যেতে হয়।

অতীশ সাহস পেয়ে গেল। এই করে সে তার সাহস ফিরিয়ে আনে। সে তখন আবার স্বাভাবিক, সাধারণ মানুষ। কেউ একজন পাশের ঘর থেকে বলল, ফিরলেন!

—এই ফিরলাম।

—তাস খেলবেন। পার্টনার পাচ্ছি না।

অতীশ হেসে বলল, খেলব। তবে শিখিয়ে নিতে হবে।

—ধুস। আপনি মশাই তবে কি!

অতীশ বুঝতে পারল, তার সমবয়সী এই যুবকটি আজ অফিস কামাই করেছে। সে যখন বের হয়, তখন সিঁড়িতে দেখেছে শ্যামলা রঙের একটা মেয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এই যুবকের ঘরে ঢুকে গেল। কলেজে পড়ে-টড়ে বোধ হয়। হাতে বই খাতা। মেয়েটি এখন না থাকায় নিঃসঙ্গ বোধ করছে। তাকে তাস খেলতে বলছে। তাস খেলা জানে না বলে, বিস্ময়কর মানুষ ভেবেছে। সে যুবকের নাম জানে না। আলাপ করে নাম জেনে নেবার মানসিকতাও তার গড়ে ওঠেনি। ফলে সে দেখেছে, মানুষের সঙ্গে কিছুতেই তার দূরত্ব ঘুচতে চায় না। সে যেখানেই গেছে নিঃসঙ্গ এবং একা হয়ে পড়েছে। এবারে সে ভাবল, এগুলো ভাল লক্ষণ না। এই জীবনও তার কাছে সেই অনিশ্চিত জীবনের মতো। এখানেও সে চায় কোন মৈত্রদা তার পাশে থাকুক। সারেঙ সাব থাকুন। মাথার ওপর কেউ না কেউ বিশাল বৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে থাকুক জীবনভর। দু-দিনের মধ্যে একমাত্র মানসদাই যেন কিছুটা বৃক্ষের মতো। কিন্তু গতকাল সে যা দেখেছে তারপর এই মানুষের ওপর কতটা নির্ভর করতে পারবে!

অতীশ গলা বাড়িয়ে বলল, আপনার নামটা জানা গেল না।

—জয়ন্ত চক্রবর্তী। জয়ন্ত বলে ডাকবেন। এখানে সবাই চক্রবর্তী বলে। এটা আমার ভাল লাগে না।

—রাজার অফিসেই আছেন।

—ওরে বাপ, মরে গেলেও না। আমার বাবা করতেন। আমরা কেউ করি না। বাবা আমার রাজার ভয়েই অকালে মরে গেলেন। আসলে এদের মুশকিল কি জানেন, এরা ভাবে তাদের ছেড়ে গেলে অন্য কোথাও কেউ কাজ করতে পারবে না। বাপের মতো বেটারাও ভিক্ষা চাইতে আসবে।

অতসব কথা অতীশ শুনতে চায়নি। শুধু সামান্য কাছে আসার জন্য দুটো একটা কথা বলা। ছেলেটি খুব খোলামেলা কথা বলছে। আরও বলত, কিন্তু

হাত মুখ ধুয়ে এখন কিছু খাওয়া দরকার। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মেস বাড়িতে নটায় খাবার দেবে। এর আগে সামান্য কিছু খেয়ে না নিলে খিদেয় কষ্ট পাবে ভাবল। গাড়ি বারান্দায় আলো জলে উঠেছে। রাজপ্রাসাদে আলো, নতুন বাড়ির একটা দিকে আলো জলছে। অন্য দিকটা অন্ধকার। নিচে সব অফিস ফেরত মানুষ যে যার ঘরে ঢুকে যাচ্ছে।

অতীশ বাথরুমে স্নান করে নিল। ঘরে এসে তোয়ালে মেলে দেবার সময় দেখল, জয়ন্ত বারান্দায় রেলিঙে ভর করে কি দেখছে। নাকে রুমাল চাপা এবং সেও একটা পচা গন্ধ পেল। নিচ থেকে খুপরি ঘরগুলোয় বাচ্চাদের সোরগোল আসছে। সে বলল, জয়ন্তবাবু কিসের গন্ধ পাচ্ছি।

—আরে বাইরে এসে দেখুন। মানুষের লাশ। কে গায়েব করে রেখেছিল।

এমন নিরাসক্ত গলায় জয়ন্ত কথাটা বলল, যেন এটা কোন ঘটনাই নয়। সে দৌড়ে বাইরে বের হয়ে গেল। দেখল তিন চাকার আবর্জনা টানার টিনের একটা গাড়িতে এ-বাড়ির জমাদার বস্তা ঢেকে কি নিয়ে যাচ্ছে। পেছনে এক দঙ্গল লোক।

অতীশ মানুষগুলোর কৌতূহল দেখে বুঝল, জয়ন্ত ঠাট্টা করছে। এতটুকু গাড়িতে মানুষের লাশ যায় কি করে। কুকুর বেড়াল মরেছে। সে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে ঘরে ফিরে এল।

জয়ন্ত ওখান থেকেই বলল, বিশ্বাস হচ্ছে না! এ-বাড়িতে আপনি আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভ্রূণ হত্যা হয়েছে। লক্ষণ ভাল না।

অতীশ বলল, তার মানে!

জয়ন্ত বলল, ভালবাসার দান এখন আঁস্তাকুড়ে। পচে ঢোল।

অতীশ কেমন বিমর্ষ হয়ে গেল। এই ঘটনার সঙ্গে তার আসার একটা সম্পর্ক খুঁজছে জয়ন্ত। সে বলল, হত্যাকারী ধরা পড়েছে!

—না।

—প্রাইভেট অফিসে এই নিয়ে ঝামেলা গেল। আমারও ডাক পড়েছিল।

—কেন?

—যদি জানি। যদি কোন ক্লু দিতে পারি। আসলে এটা তো আর রাজার বাড়ি নেই। চারপাশটা দেখুন বস্তির মতো। ঐ ঘেরাটা দিয়ে রাজা সতীত্ব বাঁচাচ্ছে। কতদিন চলে দেখা যাক।

এখন বাড়িতে যত যুবতী মেয়ে আছে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করালেই সব ধরা

যায়। ওতে কারো গরজ নেই। তখনই কুন্তবাবু নিচে ছুটে আসছে। হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়িতে উঠছে।

—দাদা শুনেছেন কাণ্ড।

—এই ত নিয়ে গেল।

—বলেন, এ-বাড়িতে কারো থাকতে ইচ্ছে করে। বাড়িটাকে রেণ্ডিপাড়া করে ছাড়লি।

অতীশ বলল, এতে উত্তেজিত হবার কি আছে!

—নেই বলছেন। তা হলে নেই। সে উঠে পড়ল। তারপর কেমন উত্তেজিত গলায় বলল, কোথায় ও-সব পয়দা হয় জানা আছে। হাত দিতে পারছি না। যখন দেব না, রাজার বাড়ি উল্টে যাবে।

অতীশের কানে লাগছিল কথাগুলো। বলল, কুন্তবাবু বসুন। চা আনান কাউকে বলে। কিছু খাবার। অতীশ টাকা বের করে দিল।

কুন্তবাবু বেশ প্রফুল্ল হয়ে গেল। এ-বাড়ির সবার ওপর খবরদারি করার একটা হক আছে তার। সে রেলিং-এ ঝুঁকে ডাকল, দেখত, অফিসে কে আছে নকুল। কালীদা পঞ্চানন যেই থাকুক পাঠিয়ে দিবি। নতুন ম্যানেজারবাবুর চা মিষ্টি আনতে হবে।

চা মিষ্টি খাবার পর কুন্তবাবু বলল, যাই দাদা, কাল মোহনবাগান ওয়াড়ি খেলা আছে। যাবেন নাকি! টিকিটের জন্য ভাববেন না। কাবুলবাবুকে ধরলেই হবে। রাজার মেম্বারশিপের কার্ড আছে। কাবুলবাবুর আছে। ওকে ধরলে দুটোই পাওয়া যাবে।

অতীশ দেখল, এই মানুষ কিছুক্ষণ আগে ভেবেছিল, সমাজ সংসার রসাতলে গেল, এই মানুষ সিঙাড়া মিষ্টি খেয়ে কাল খেলা দেখবে ভেবে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। এই মানুষ তার অফিসে তার পরেই জায়গা দখল করে আছে। বছর চারেক হল কাজ করছে। কাজ বোঝে ভাল। আসলে অফিসে সে ওপরওয়ালা না এই কুন্তবাবু পরে বোধ হয় টের পাওয়া যাবে। অতীশ এ-মুহূর্তে এই নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করা পছন্দ করছে না। এখন তার মনের মধ্যে সেই রহস্যময়ী নারী—কোথায় কখন, কবে—কত দূরে কোন অতীতে, তবু এত পরিচিত, যেন কতকাল সে শৈশবে এই মুখটা মনে মনে লালন করেছিল—অথচ মনে করতে পারছে না।

তখনই কুন্তবাবু বলল, আপনি খাবেন না শুনে বাবা খুব কষ্ট পেয়েছেন। মেসের খাওয়া আপনার সহ্য হবে!

—সে হয়ে যাবে।

—শুনছি ত আপনার কোয়ার্টার ঠিক হচ্ছে।

—আমার কোয়ার্টার!

—আরে দাদা আপনি খুব গুড বুকে আছেন। চালিয়ে যান। কোথায় যে আপনি স্থতো টেনে রেখেছেন কে জানে। আমি একটা আলাদা কোয়ার্টার চাইলুম, কিছুতেই রাজাকে রাজি করানো গেল না। পাশের একটা বাড়তি ঘর দিয়ে দায় চুকিয়ে দিল।

অতীশ কিছুই শুনছে না। সে কি ভেবে কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন থাকার পর বলল, আমি তো কোয়ার্টারের কথা বলিনি কুম্ভবাবু। কারটা আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছেন দেখুন!

কুম্ভবাবু বেঁটে গোলগাল চেহারার মানুষ। মাথায় ঘন চুল, রং ফর্সা। পাতলুন পরনে। জরির কাজ করা পাঞ্জাবি গায়ে। বাপের মতো সৌখিন। কেবল কানে এখনও আতর মাখানো তুলো গোঁজা নেই। বয়স বাড়লে হবে। অফিস থেকে ফিরে স্নান-টান সেরে এসেছে। গলায় ঘাড়ে পাউডার। বেশ স্থগন্ধ ছড়াচ্ছিল। সে এখন ঘরটা দেখছে। দোতলায় এটা এখন রাজার গেস্ট-হাউস। বাইরের কেউ এলে থাকে। কুম্ভ এ-ঘরটায় অনেকদিন আসেনি। অতীশ আসায় এ-ঘরটায় আবার আসার স্থযোগ পেয়েছে। সে পায়ের উপর পা রেখে বলল, এ শর্মা দাদা না জেনে কিছু বলে না।

এ-বাড়ির ওপর অতীশের কৃতজ্ঞতায় মনটা কেমন ভরে গেল। নির্মলা এলে সে এত ভয় পাবে না। নির্মলাও এখন তার কাছে বড় বৃক্ষের মতো। মিন্টু টুটুল সে। আসার সময় মিন্টু টুটুল ঘুমিয়েছিল। ফুটফুটে দুটো শিশু জানেই না তাদের বাবা একা পড়ে গিয়ে কত অসহায় বোধ করছে। ভয় পাচ্ছে। এবং যা হয়ে থাকে, তাকে পেলেই সেই প্রেতাত্মা গন্ধ ছড়ায়। অফিসে আজ প্রথম গন্ধটা পেয়েছিল। এবং যা করে থাকে, সে এক বাকস ধূপকাঠি কিনে এনেছে। পরে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে রাখলে অতীশ দেখেছে গন্ধটা কেমন ক্রমে মরে আসে! সে নিজেই এভাবে আত্মরক্ষার উপায় বের করে নিয়েছে। প্রথম প্রথম সহসা কখনও এভাবে ঘরে ধূপকাঠি রাশি রাশি জ্বালিয়ে দিলে নির্মলা বিস্মিত হয়ে বলত, করছ কি। একটা-দুটো জ্বালাও। এত গুচ্ছ গুচ্ছ জ্বালাচ্ছ কেন। লোকে তো পাগল বলবে।

অতীশ নির্মলার কথায় তখন ক্ষেপে যেত। গন্ধটা ছড়ালেই তার মাথা

কেমন ঠিক থাকে না। চোখ লাল হয়ে যায়। কথা কম বলে। চুপচাপ বসে থাকে। কেউ কিছু বললেই, চিৎকার করে ওঠে। নির্মলা বুঝতে পারে না কেন এমন হয়, মাঝে মাঝে বিভ্রমে পড়ে গিয়ে কেঁদে ফেলে। আর তখনই অতীশের কি হয়ে যায়। সে নির্মলার প্রতি অহেতুক নিষ্ঠুর আচরণ করছে ভাবে। বলে তুমি ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন। মাঝে মাঝে আমার এটা হয়। কিসের গন্ধ পাই। খেতে পারি না। ধূপকাঠি জ্বেলে দিলে স্বস্তি পাই।

ধূপকাঠি জ্বেলে দিলেই সে আবার ভাল হয়ে যায়। মনের সব ধন্দ ঘুচে যায়। নাক টেনেও তখন আর কোন গন্ধ পায় না। আজ অফিসে গন্ধটা পাবার পরই সে খুব বিচলিত বোধ করছিল। ফেরার পথে এক ডজন ধূপকাঠি কিনেছে। গাড়িতে প্রেতাত্মার গন্ধটা ভুরভুর করছিল। চোখ লাল হয়ে উঠছিল। পারলে গাড়িতেই যেন সে ধূপকাঠি জ্বালাত। কিন্তু এতে কুম্ভবাবু মাথায় গোলমাল আছে ভাবতে পারেন। সেজন্য ধূপকাঠি নাকের কাছে নিয়ে বসে ছিল। আর কখন গন্ধটা নিজ থেকেই উবে গেল। এমন ত হয় না। কখন হল এটা। রাজার দেউড়িতে আসতেই সেই রহস্যময়ী নারী—সে কে? সে এখন রাজার ঘরনী—আগে কি ছিল, কোথায় ছিল—তখনই গন্ধটা বুঝি ভয়ে ফুস করে উড়ে গেছে।

কুম্ভবাবু বলল, কি ভাবছেন। গল্পের প্লট।

—না, না।

—বৌদিকে ফেলে এসে মন খারাপ।

অতীশ হাসল। বলল, তা বলতে পারেন। রমণীরা ভারি তুকতাক জানে, কোথাকার কে, অথচ দেখুন কেমন মৌরসী পাট্টা গেড়ে বসে গেল। তাকে ফেলে এক-পা নড়া যায় না। কোথাও গেলেই মন কেমন করে।

—ভাববেন না। কোয়ার্টার পেয়ে যাচ্ছেন। শুনছি তো অন্দরের পাশেই আপনার কোয়ার্টার দেওয়া হবে।

অতীশের বুকটা ছাঁত করে উঠল। ওদিকটা ত খুবই রেসট্রিকটেড জোন। নির্দিষ্ট কিছু আমলা যেতে পারে। বয়বাবুর্চিরা যেতে পারে। জমাদার পুরনো পাইক বরকন্দাজ যেতে পারে—যারা গতকাল তার সঙ্গে দেখা করে গেছে তারাই রাজবাড়ির সব হালচাল বলে গেছে। ভুলেও ওদিকটা মাড়াবেন না। কৈফিয়ত তলব হবে। খাস খানসামার খুব লাগানো ভাঙানোর স্বভাব।

এ-বাড়ির কিছু কিছু গোপন খবর খুব সহজেই চাউর হয়ে যায়। কিছু কিছু

গোপন খবর দু-একজনের কানে আসে আর অতি গোপন খবর কেউ জানতে পারে না। কুমার বাহাদুর বৌরাণী আর নির্দিষ্ট আমলা শুধু জানে। কুম্ভ কিছু কিছু গোপন খবর পায়। রাধিকাবাবু পুত্রদের কন্যাদের এই গোপন উৎসের মুখ খুলে দিয়ে প্রমাণ করেন, রাজার তিনি কত বিশ্বস্ত লোক। কুম্ভ বড় হয়ে এটা টের পেয়েছে। কুমার বাহাদুর বলেছেন, অতীশকে ভাল দেখে একটা কোয়ার্টার দিন। ওর যাতে কোন অসুবিধা না হয় দেখুন।

বিকেলে ফিরেই কুম্ভ সব শুনেছে। শুনেই সে ক্ষেপে গিয়েছিল। আসতে না আসতেই কোয়ার্টার। আমরা ভেসে এসেছি। তবে তার বাবা রাধিকাবাবু সে ভাবতে গর্ব বোধ করে। সে বলল, বাবাই কুমার বাহাদুরের কাছে কথাটা তুললেন। অতীশের খুব অসুবিধা হচ্ছে। একা থাকে কোথায়, খায় কি, কে দেখে? মেসে খেলে অজীর্ণ রোগে ভুগে মারা পড়বে ছেলেটা।

অতীশ শুনে যাচ্ছিল।

কুম্ভ বলল, বাবা আপনার খুব সুখ্যাতি করেছেন কুমার বাহাদুরের কাছে।

অতীশ বলল, আগেকার দিনের মানুষদেরই এই স্বভাব। খুঁটিয়ে দেখে না। ভাল লাগলেই ভাল বলে ফেলে। আমার বাবাকেও দেখেছি এরকমের।

কুম্ভ বলল, বাবাই কুমারবাহাদুরকে কোয়ার্টারের কথা বললেন। কিন্তু এরা একদম পিচাশ জানেন। থাকলেও দেবে না। কুমারবাহাদুর বলল, কোয়ার্টার কোথায়। ফাঁকা তো একটাও নেই। কিন্তু বাবার সঙ্গে পারবে কেন? বললেন, সোজাসুজি বললেন দেখুন কুমারবাহাদুর কাজ ভাল চাইলে তাকে সুযোগ-সুবিধা দিতেই হবে। সারাদিন কাজের পর যদি নিজের পরিজন নিয়ে একটু থাকার জায়গা না পায় তো মন দিয়ে কাজ করবে কেন!

অতীশ এবার প্রশ্ন না করে পারল না, রাজেনদা কি বললেন?

—এরা কিছু বলতে চায় দাদা? এদের মুখ থেকে কথা খসিয়ে নিতে হয়। বাবা ঠিক খসিয়ে নিয়েছেন। নিধিবাবুর কোয়ার্টার ফাঁকা।

—নিধিবাবুটা কে?

—নিউবেঙ্গল টাইপ ফাউণ্ড্রির ম্যানেজার। রিটায়ার করেছেন মাস দুই হল। কুমার বাহাদুরের বাবার আমলের লোক। ইদানীং চোখে দেখতে পান না। আশির কাছাকাছি বয়েস। রাজার খুব বন্ধুলোক ছিলেন।

কুম্ভকে এখন অন্যরকম লাগছে। এরা তার ভাল চায়।

কুম্ভের বাবার প্রতি অতীশের মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। আসলে বাবার

সঙ্গে আলাপ ছিল বলেই হয়ত তাকে খুব স্নেহ করছেন। সে রাতে খাবে না বলায়ও কষ্ট পেয়েছেন। আগেকার আমলের মানুষ বলেই এটা হয়। আজকাল মানুষের মধ্যে এসব গুণ একেবারেই নেই। অতীশের বলার ইচ্ছা হল, আপনার বাবার এ ঋণ শোধ করতে পারব না। কি বলে এখন সে যে কৃতজ্ঞতা জানাবে তার বাবাকে! কিন্তু তার আছে আশ্চর্য এক স্বভাব, সে কিছুতেই খুব বিগলিত হয়ে যেতে পারে না। কখনই সে সব ভেতরের কথা প্রকাশ করতে পারে না। সংকোচে পড়ে যায়। সে তখন আবার চুপচাপ বসে থাকে।

কুম্ভ বলল, কোয়ার্টার পেলে খাওয়াবেন। কত বড় খবর। রাজার খুব নিজের লোক না হলে এখানে কোয়ার্টার মেলে না। আপনি আসতে না আসতেই তার নিজের লোক হয়ে গেলেন। ঈর্ষা হয়।

তারপর কুম্ভ উঠে যাবার সময় বলল, কি খেলা দেখছেন ত!

অতীশ হেসে বলল, কাল থাক। আর একদিন যাওয়া যাবে।

কুম্ভ উঠে যাবার সময় ভাবল, বড়ই নীরস লোক। খেলাতে পর্যন্ত উৎসাহ নেই। কি ভাবে লোকটা সব সময়! এত আচ্ছন্ন থাকে কেন! কিছু একটা রহস্য আছে। জাহাজে কাজ করত। স্বভাব-চরিত্র ভাল থাকার কথা না। মেয়েমানুষ ঘাঁটা-ঘাঁটি করতে গিয়ে বড় রকমের অসুখ বাধিয়েছে। ফুটে বের হলে টের পাওয়া যাবে। এবং সে বের হবার মুখে যাতে ক্ষত ফুটে বের হয় সেই প্রার্থনাই করল ভগবানের কাছে। তার কথা ছিল, শিট অ্যাণ্ড মেটাল প্রিন্টিং পাবলিক লিমিটেডের ম্যানেজার হবার। কিন্তু এত করেও রাজার বিশ্বাস অর্জন করতে পারল না। মনে মনে ভারি আফসোস। কোথা থেকে উটকো লোক রাজা যে ধরে আনল।

সিঁড়ি ভাঙতে গিয়ে কুম্ভর মাথা গরম হয়ে গেল। যত নামছে, তত গরম হচ্ছে মাথা—সে শেষ পর্যন্ত হেরে গেল। কি না করেছে সে, আগের ম্যানেজারের বাড়ির ছবি তুলে এনে দেখিয়েছে, দেখুন টাকা আপনার কোথায় যায়! কাস্টমারদের ধরে নিয়ে গিয়ে বলেছে, কি পারশেন্টেজে কাজ হয় দেখুন। যতটা ঘটেছিল তার চেয়ে বেশি বানিয়ে বানিয়ে সে প্রথম তার বাবা ওরফে রাধিকাবাবুর মারফত রাজার কান ভারি করেছে। বলেছে, এটা আপনার গোল্ড মাইন। নজর দিন। আপনার পূর্বপুরুষের স্বার্থ রক্ষা করুন। চার বছরে অক্লান্ত খেটে সে কোম্পানীর খুঁটিনাটি বিষয় রপ্ত করেছে। প্রিন্টিং থেকে ফেব্রিকেশনে, কোথাও এতটুকু খুঁত থাকলে ধরতে পারে, শোধরাতে পারে। একাউন্টস তার নখদর্পণে। সেলট্যাকস,

ইনকামট্যাকস সে নিজে করতে পারে। ক্যাশ, লেজার, ব্যালেন্সশীট তার কাছে এখন জলের মত। এক আশাতেই সে এতদূর দৌড়ে গেছে। এখন কি না এই হারামজাদা ঘুঘু লোকটা তার বাড়াভাতে ছাই দিয়েছে। গত রাতে পৃথিবীতে সেও আর এক মানুষ যে বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছে। এসে গেছে শুনেই তার হৃৎপিণ্ডে কে যেন আগুন নিক্ষেপ করেছিল। সে স্থির থাকতে পারে নি। ছটফট করেছে সারারাত। সকালের দিকে ঘুম চোখে লেগে এসেছিল। ঘুম ভাঙলে দেখেছিল, হাসিরাণী ঘরে নেই। কাবুলকে দেখার জন্য ঠিক জানালায় পালিয়ে গেছে। তালে বল বাবু আমি তোমাকে ক্ষমা করব কেন। তুমি যত ভাল-মানুষই হও, আমি তোমাকে নরকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করব। আমি তো মানুষ।

॥ ছয় ॥

স্বরেন জানালায় উঁকি দিয়ে অবাক হয়ে গেছে। আটটা বেজে গেছে কখন এখনও ঘুমাচ্ছে। সাদা চাদরে ঢাকা শরীর। চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন তিনি। ফুল স্পিডে পাখা চলছে। সাদা সাদা ছাই উড়ছে ঘর ভর্তি। রোদ এসে পড়েছে জানালায়। জানালার একটা পাট সামান্য খোলা, সে উঁকি দেবার সময় পাটটা ঠেলে দিল। দরজা বন্ধ দেখে প্রথমে অবাক হয়ে গেছিল—তিনি কি ভেতরে নেই! দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখে ভেবেছিল, ভেতরেই আছেন। এত বেলায় দরজা বন্ধ করে কি করছেন। কিন্তু তার শিরে শমন। অন্দরে ডাক পড়েছে। সে বৌরাণীর মেজাজ জানে। এক্ষুণি ডেকে নিয়ে না গেলে, তার বিরুদ্ধে কৈফিয়ত তলব হবে। দরজা বন্ধ যখন জানালায় উঁকি দেওয়া যাক—কিন্তু যদি মানুষটার জপ-তপের অভ্যাস থাকে—তা ভঙ্গ হলে ক্ষেপে যেতে পারেন। তবু খুব সাহস করে জানালায় উঁকি দিতেই অবাক। আবছা মত একটা ছায়ামূর্তি বিছানায় পড়ে আছে। জানালা ঠেলে দিতেই স্পষ্ট দেখল, তিনি চিত হয়ে শুয়ে আছেন। চাদরে গলা পর্যন্ত ঢাকা। হাওয়ায় চুল ঝড়ের মতো উথাল-পাতাল হচ্ছে। তিনি ঘুমাচ্ছেন। তারপরই কেমন শঙ্কায় বুক কেঁপে গেল। এভাবে মানুষ ঘুমায় না। মরেটরে যায়নি তো। আজকাল আকছার এই শহরে কত রকমের অপ-মৃত্যু ঘটছে। কাল বিকেলে একটা লাশ পাওয়া গেছে, আবার কি আজ সকালে আর একটা লাশ বের করা হবে। প্রায় তার পা ঠকঠক করে কাঁপছিল। তখনই

সে চিৎকার করে উঠল : অ নতুনবাবু, নতুনবাবু অন্দরে আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছে।

অতীশ অনেক দূর থেকে যেন শুনতে পাচ্ছে তখনও, ও ছোটবাবু ছোটবাবু আর কতদূর! আমরা আর ডাঙ্গা পাব না? দু'দিন হয়ে গেল!

দরজায় খুটখুট শব্দ, তারপর সজোরে কেউ দরজায় ধাক্কা মারতেই সে ধড়মড় করে উঠে বসল। দেখল, জানালায় সুরেন। আরও কেউ কেউ বারান্দায় দাঁড়িয়ে। সে উঠে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল। মানসদা, সেই ছেলেটা, আরও দু-একজন। মানসদা চটেই গেলেন, তুমি কি মানুষ না! এত বেলায় লোকে ঘুমোয়! তোমার চোখ-মুখ ভাল না বাপু। তোমাকে বিশ্বাস নেই।

অতীশ খুব লজ্জায় পড়ে গেছে। এত বেলা হয়েছে সে টের পায়নি। সারারাত সে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না। সে সারারাত হিজিবিজি সব স্বপ্ন দেখেছে। স্বপ্ন দেখলে তার ভাল ঘুম হয় না। সকালে কেমন অবসাদ লাগে। সে একবার সকালে জেগেছিল, তারপর অবসাদ বোধ করতেই আর একটু গড়াগড়ি দিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এত বেলা হয়ে গেছে সে ঘুণাক্ষরে টের পায়নি।

সে দরজা খুলতেই সুরেন ওকে সেলাম দিল। এ-বাড়িতে এ-সব রেওয়াজ এখনও চালু আছে। সে তো খুব বড় কাজ করে না এদের। মাঝারি সাইজের কর্তা-ব্যক্তি। তার আর কুমার বাহাদুরের মাঝখানে একজন বুড়ো মতো অফিসার আছেন। কলকারখানার সাধারণ সমস্যা সংক্রান্ত কথাবার্তা সব তারই সঙ্গে সারতে হবে বলে কুম্ভবাবু জানিয়েছে। এখন সুরেনের কথাবার্তা শুনে সে একটু চমকে গেল। তার অন্দরে ডাক পড়েছে। কে ডাকছে কেন ডাকছে এত সব প্রশ্ন করার ক্ষমতা তাঁর নেই। বোধ হয় সুরেনেরও বলার কথা নয়। সে তাড়াতাড়ি কি করবে ভেবে উঠতে পারছে না। বিছানার চাদর ঠিকঠাক করতে গিয়ে দেখল মানসদা তার দিকে সংশয়ের চোখে তাকিয়ে আছেন। সে বলল, কি হল মানসদা।

—তোমার সাহস দেখছি। তুমি যেন গ্রাহ্যই করছ না।

—হাতমুখ না ধুয়ে যাই কি করে!

—তাড়াতাড়ি কর। এই সুরেন বেটা দালাল, বলগে যা, যাচ্ছে। এক্ষুণি ঘুম থেকে উঠল।

অতীশ মুখে পেস্ট নিয়ে বলল, আমাকে ডাকছে কেন সুরেন?

—বাবু আমরা নফর মানুষ। অত জানলে এখানে আমাদের রাখবে কেন বলুন।

মানসদা জয়ন্ত বিছানায় বসে পড়েছে ততক্ষণে। জয়ন্ত ঘরটা দেখছে। অজস্র পোড়া ধূপকাঠি ছড়ানো ছিটানো। ঘরটা নোংরা হয়ে আছে। ঘুমের ঘোরে সে নিজের ঘরেও সুগন্ধ আতরের মতো কিছুর গন্ধ পেয়েছে। একবার সে বিছানা ছেড়ে উঠবে ভেবেছিল—গন্ধটা কোত্থেকে আসছে। এবাড়িতে এখানে সেখানে দুর্গন্ধ উঠছে কবে থেকে, সুগন্ধ থাকার ত কথা নয়। এখন বুঝতে পারছে এটা অতীশবাবুরই কাণ্ড। শোবার সময় গুচ্ছ গুচ্ছ ধূপকাঠি শিয়রে জ্বালিয়ে রাখে। সে মানসদার দিকে তাকিয়ে বলল, প্রায় আপনার জুড়িদার।

মানসদা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হলেন। তাঁর ঘরে মাঝে মাঝে তালা মেরে যায় কেউ। সে এত ভাল থাকার চেষ্টা করে, কারো কোন অপকার করে না, কেবল মাঝে মাঝে তার কি হয়—সে চিৎকার করতে থাকে—ও কি গন্ধ! পচা টাকার গন্ধ! ঘরে ঘরে সে তখন ছুটে বেড়ায়।

—তোমরা পচা টাকার গন্ধ পাচ্ছ না। অহ কি গন্ধ! টেকা যাচ্ছে না। কোত্থেকে আসছে গন্ধটা। পুলিশে খবর দাও। সব অসুখে পড়ে যাবে। মহামারী শুরু হয়ে যাবে।

অতীশ বাথরুমে বলে জয়ন্তর কথা শুনতে পায়নি। সে এসে দেখল, তখনও সুরেন দাঁড়িয়ে আছে। অতীশ মুখ মুছে বলল, তুমি যাও। আমি যাচ্ছি।

—চিনবেন না বাবু।

আসলে সুরেন সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছে। সে ভাবল, এমন কি করেছে, যার জন্য তার অন্দরে ডাক পড়েছে। এটা খুবই অস্বাভাবিক ঠেকছে। এরা বনেদী জমিদার বংশ। এখনও যা আছে যেমন ধরা যাক কলকাতার ওপর ত্রিশ-বত্রিশ বিঘে নিয়ে এই বাড়ি, কাঠাপিছু দাম কুড়ি হাজার টাকা করে হলে, কি দাম হয় এবং কলকাতায় এমন আছে অনেক অট্টালিকা, দেশে বিশাল দেবোত্তর সম্পত্তি এবং শহরের কিছু এলাকা এখনও ইজারা দেওয়া আছে। সবই উড়ো খবরের মতো তার কানে এসে ঢুকেছে। বাইরে থেকে এদের বৈভব এখন ঠিক বোঝা যায় না। ভিতরে ঢুকলে বোঝা যায়, বৈভবের অন্ত নেই। অন্দরের নিয়মকানুন লঙ্ঘন করা যায় না। পর্দা ঢাকা গাড়ির চল সেদিনও ছিল নাকি। এ-বাড়ির রাজকন্যাদের মুখ বৌরাণীদের মুখ কেউ দেখেছে কখনও এককালে বিশ্বস্ত আমলারাও বলতে পারত না। এখন অবশ্য এতটা বোধহয় বেড়াজাল নেই। অতীশ জামা প্যাণ্ট পরতে পরতে বলল, মানসদা কেন যে ডাকছে, বুঝছি না।

মানসদা পরেছেন পাজামা পাঞ্জাবি। তার চা এসেছে। তিনি বললেন, চাটা দু'ভাগ করে দাও। অতীশ একটু চা পেয়ে খুব বিগলিত হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি চা খেতে খেতে বলল, মানসদা বসুন, আমি ঘুরে আসছি। সে এটাচি খুলে একটা পাট ভাঙা রুমাল পকেটে গুঁজে নিল। তখন মানসদা বলল, ঘাবড়ে যাচ্ছ খুব দেখছি। মাথার চুলটা আঁচড়ে নাও। এত স্বাভাবিক এবং ভাল মানুষ মানসদা, তার ঘরে তালা ঝোলে কেন! মানসদার চোখ নীলচে রঙের। উজ্জ্বল। এতটুকু অস্বাভাবিকতা নেই চোখে মুখে। এ-মুহূর্তে মানসদাকে তার পৃথিবীর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ মনে হচ্ছে। এই মানুষটি সম্পর্কে কুম্ভও কোন খবর দেয়নি। কুম্ভ রাজবাড়ির এত খবর রাখে, অথচ এই মানুষটি সম্পর্কে গতকাল প্রায় নীরব ছিল। সে বের হবার মুখে মানসদা বলল, আমি ঘরে তালা দিয়ে দিচ্ছি। এসে চাবিটা নিয়ে নিও।

অতীশ সিঁড়িতে নামতে নামতেই হাত তুলে দিল। সিঁড়ির মুখে ছোট্ট লন। কাঁটা তারের বেড়া। মাঝে ছোট্ট গেট। ওপরে মাধবী লতার ঝাড়। এখানটায় সে লম্বা বলে মাথা নুইয়ে ঢুকল। লন পার হয়ে লম্বা বারান্দার ওপর বড় বড় সেকালের পেল্লাই দরজা। বার্মা টিকের। যে কোন দরজা দিয়ে সামনের মারবেল মেঝে দেখা যায়। সুরেন একটা দরজায় দাঁড়িয়ে গেল। অতীশকে বলল, আজ্ঞে এখানে বসুন। শম্ভু এসে আপনাকে নিয়ে যাবে।

সেই বড় বসার ঘরটা। মাঝখানে কার্পেট পাতা। সোফা নেই। কোণায় কোণায় বসার জন্য আলাদা ডিভান। এই ঘরটা এত বড় যে ও-পাশে একটা লোক বসে ন্যাতা মারছে প্রথম সে টেরই পায় নি। দু'দিন ধরে যতবার সে এই প্রাসাদে ঢুকেছে, লোকটাকে দেখেছে, জল আর ঝাড়ন নিয়ে ঘরদোর সাফ করে যাচ্ছে। এ-প্রাসাদে লোকটা বুঝি সারাদিন এই একটা কাজই করে। হাবাগোবা মুখ। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনে ছেড়া খাঁকি হাফপ্যান্ট শতচ্ছিন্ন গেঞ্জি গায়ে। অতীশ ঘরে কেমন একটা বিদেশী আতরের গন্ধ পাচ্ছে। সকালেই বোধহয় এই প্রাসাদের নিয়ম সারা ঘরে দামী আতর স্প্রে করে দেওয়া। বাইরে থেকে গন্ধটা পাওয়া যায় না। যত ভিতরে ঢোকা যায় গন্ধটা তত প্রবল হয়।

ঘড়িতে দেখল, সাড়ে আটটা বেজে গেছে। ঘরের দেয়ালে টেবিলে, সব রকমারি ঘড়ি, কোনটা সাড়ে আটটা বাজায় বেহালার ছড় টেনে দিল, কোনটার শব্দ কাচের বলের মতো গড়িয়ে গেল—কোনটা এক জলতরঙ্গ আওয়াজ তুলে নিথর হয়ে গেল। বিচিত্র এক শব্দ ধ্বনির মধ্যে দেখল রাধিকাবাবু হন্তদন্ত হয়ে

যাচ্ছেন। নধরবাবু এবং অফিসের সেই বুড়ো বড় কর্তা, গায়ে পুরো ছাই রঙের স্যুট, চোখে ভারি চশমা, পেছনে কেউ আসছে একটা ফাইলের পাহাড় নিয়ে। অতীশকে অসময়ে এখানে বসে থাকতে দেখে রাধিকাবাবু কিঞ্চিৎ সংশয়ে পড়ে গেল। বলল, তুমি এখানে ভাই! কুমার বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করবে?

অতীশ উঠে দাঁড়াল। বলল, না।

অতীশের কথা শোনার সময় নেই রাধিকাবাবুর। তিনি চলে যাচ্ছেন। বোকার মতো অতীশ কিছুটা তার সঙ্গে হেঁটে গেল। আবার যদি কিছু প্রশ্নটশ্ন করে সেই আশায়—কিন্তু রাধিকাবাবু সোজা বিলিয়ার্ড টেবিলের ধার ঘেঁষে দ্রুত হেঁটে চলে গেল। এবং সে দেখল অফিসার, কেরানী, পিয়নের একটা পল্টন লাইনবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে যাবে বলে, তারা দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরের দরজা বন্ধ। ভেতর থেকে নির্দেশ না এলে কেউ ঢুকতে পারছে না। অতীশ এটা দেখার পরই ভাবল, সে ঠিক জায়গায় বসে নেই। শঙ্খ এসে যদি দেখতে পায় সে নেই, তবে খবর দেবে, কোথায়, কেউ নেই ত! তবে একটা কেলেঙ্কারী হবে। সে জন্য সে আবার সুরেন তাকে যেখানে বসতে বলে গেছে, সেখানে অসহায় যুবকের মতো বসে পড়ল। পাশে কুম্ভবাবু থাকলেও যেন এ-মুহূর্তে সাহস পাওয়া যেত।

সেই লোকটার কিন্তু কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে জল ঝাড়ন নিয়ে বিশাল কক্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ন্যাতা মেরেই চলেছে। এ-ঘরটা হয়ে গেলে পাশের ঘরে। ওটা হলে তার পাশের ঘরে। সকাল থেকে সে এই কাজটা কত মনোযোগ দিয়ে করে যাচ্ছে। তখনই সাদা ধবধবে উর্দি পরা একজন হাফ যুবক তাকে সেলাম দিল। —আসুন সাব। বলে সে তাকে বিশাল কক্ষের একটার পর একটা পার করে নিয়ে যেতে থাকল। এবং শেষে দেখল, সব রেশমী সুতোয় কারুকাজ করা সাদা চাদরে ঢাকা এক আশ্চর্য বিলাস কক্ষ। মেহগনি কাঠের দেয়াল। এয়ার কণ্ডিশানড ঘর। দু' পাশের দরজা ভারি কাঁচের। সিল্কের দামী পর্দা ঝুলছে; কারুকাজ করা কাঁচের জানালায় দুটো পাখি বসে। দেয়ালে রাজপুরুষদের সব আবক্ষ মূর্তি। মাথায় পাগড়ি, এবং দামী বৈদূর্যমণি পাথর-টাথরের মালা গলায়। দেয়ালে ছ'-সাতজন রাজপুরুষ কোমরে তরবারি, নাগরাই জুতো পায়ে। বংশ পরম্পরায় এক একজন এসে এই দেয়ালে দাঁড়িয়ে গেছেন। রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ওরফে রাজেনদার ছবিটা সে আবিষ্কার করল, উত্তরের দেয়ালে। পরিচিত মানুষটাকে এই পোশাকে দেখে

সে কেন জানি ফিক করে হেসে ফেলল। তারপরই মনে হল, ঘরে কেউ নেই ত! কোন গুপ্ত পথে তাকে কেউ দেখছে না ত! সে খুব সতর্ক হয়ে গেল। শঙ্খ ওকে বসতে বলে গেছে। কেন বসতে বলে গেছে, কে আসবে এ ঘরে সে কিছুই বুঝতে পারছে না। আশেপাশে কোন কাকপক্ষী আছে বলে টের পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু সেই দামী আতরের গন্ধটা এখানেও ভুরভুর করছে। গতকাল সে বৌরাণীকে এক পলক দেখেছিল—বড় চেনা, বড় অন্তর্গত সেই ছবি—কিন্তু সারারাত ধূপকাঠি পুড়িয়েও সে কে আবিষ্কার করতে পারে নি।

মনে পড়ছে, একবার এমনি দৈবদুর্বিপাকের মতো স্যালি হিগিনসের কেবিনে তার ডাক পড়েছিল। সে সেখানে এমনি এক সংশয় নিয়ে গেছিল। বুক কাঁপছিল। এখানেও তাই। কোন অবিশ্বাস্য ঘটনা জীবনে ঘটে গেলে তার এই রকমের হয়। মুখে ভীতু বালকের ছাপ ফুটে ওঠে। সোফাগুলোর কাভার সব দামি ভেলভেট কাপড়ের। কার্পেটে বাঘ সিংহের লাল নীল মুখ আঁকা। মাথা সমান উঁচু আয়না। কাচের বড় জারে শ্বেতপাথরের দুটো নগ্ন নারী মূর্তি। পরস্পর জড়িয়ে আছে। এমন একটা কক্ষে তার সঙ্গে এখন কে দেখা করতে আসছে!

তখনই মনে হল খুব মৃদু পায়ের শব্দ। কেউ আসছে। তার উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এমন এক বনেদি পরিবারে সে এই ঘরে এসে বসতে পেরেছে—তার সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য সে ঠিক বুঝতে পারছে না। পায়ের শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছে। খুব নরম চটি পরে কেউ আসছে। তারপরই সে দেখতে পেল, প্রায় জাদুমন্ত্রে বিপরীত দিকের দরজার পর্দা সরে যাচ্ছে। এবং প্রায় আবির্ভাবের মতো এক যুবতী নারী তার সামনে হাজির। লাল পেড়ে সাদা সিল্ক, হাতে ঢাকাই শাঁখা, কপালে বড় সিঁদুরের টিপ এবং চোখে অনেক দূর অতীতের স্মৃতি। তার দিকে অপলক তাকিয়ে বলছে, তুই কি রে, তুই চিঠির জবাবটাও দিলি না। এমন অমানুষ তুই!

অতীশ হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। এবং ক্রমে কেমন জলের অতলে ডুবে যাচ্ছিল। কি বলবে, কিভাবে অভিবাদন করবে এবং সহজ স্বাভাবিক হতে গেলে তার এখন কি করণীয় কিছুই বুঝতে পারছে না। সে নির্বাক হয়ে গেছে। মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে—চিঠি, কিসের চিঠি। রমণী তার কবে দেখা এক যুবতী যেন। সে কিছুতেই কাল রাতে মনে করতে পারে নি। সে এটা শেষ পর্যন্ত কোথায় এসে গেল!

—কি রে তুই আমার কথার জবাব দিচ্ছিস না কেন? এতটুকু দেখছি স্বভাব পাল্টায় নি তোর। সেই আগের মতো দশটা কথা না বললে কথার উত্তর দিস না।

এবার আর না পেরে অতীশ বলল, কিছুই বুঝতে পারছি না বৌরাণী! আমার কিছু মনে পড়ছে না।

—তুই আসলে নিজেকে ছাড়া আর কিছু চিনলি না। খুব স্বার্থপর তুই। না হলে ভুলে যায় কেউ!

আর তখনই অতীশের মাথার মধ্যে ড্যাং ড্যাং করে পূজার বাজনা বাজতে থাকল। ঢাক বাজছে, কাঁসি বাজছে ট্যাং ট্যাং। সবুজ ঘাস খাচ্ছে একটা মোষ। মোষটাকে কারা বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে পূজামণ্ডপে। নতুন গামছা কোমরে পেঁচিয়ে ছোটাছুটি করছে কারা। ধূপ দীপ জ্বলছে। মোষ বলির রক্ত নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে কারা। কে ছুটে এসে ওর কপালে, সেই রক্তের ফোঁটা দিয়ে গেল। সে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। সেই মুখ, সেই মুখ সেই সেই—সে কেমন মুহ্যমানের মতো বলল, তুমি কমল!

—কমল কি রে? কমল পিসি বল।

অতীশ মাথা নিচু করে বলল, আমি জানতাম না, তুমি এ-বাড়ির বৌরাণী কমল!

—কে জানত! আমি জানতাম। কত নতুন ম্যানেজার আসে। আমি জানতাম তুই সেই মুখচোরা জেদি ছেলেটা! কাল এক পলক দেখেই অবাক—আরে এ যে সেই! সব ঠিক আছে। সব। কেবল লম্বায় তালগাছ হয়ে গেছিস।

তারপর অতীশ কোন রকমে একবার চোখ তুলে বলল, কাল আমারও মনে হচ্ছিল বড় চেনা তুমি। কবে কোথায় যেন দেখেছি? তারপর, তারপর সেই ভাঙা শ্যাওলা ধরা পরিত্যক্ত জমিদার বাড়ির কক্ষের কথা ভাবতেই ওর কান গরম হয়ে গেল। এই হাত দে। দে না। কেউ দেখবে না। ফ্রক পরা এক বালিকা, চুল সোনালী, চোখ নীল এক বালিকা তাকে জাপ্টে ধরেছিল। সে এখন নারী। তার শরীর শিউরে উঠল। সে তার সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে যেন সামনে বসে আছে।

কমল সোফায় শরীর এতটুকু এলিয়ে দেয় নি। সোজা হয়ে বসে আছে। হাত দুটো হাঁটুর ওপর রাখা। আঙুলে বিশাল হীরের আংটি জ্বলজ্বল করছে। মাথায় সামান্য ঘোমটা, পায়ের পাতা শাড়িতে ঢাকা। অতীশের কেন জানি

ইচ্ছা হল কমল তার পা সামান্য বের করে রাখুক। সেই সুন্দর দেবী প্রতিমার মতো পা দুটো তার এখন দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

তারপরই কমল কেমন আবেগে বলল, তুই এতদিন কোথায় ছিলি!

অতীশ কত কথা বলতে পারে। কিন্তু সে এ-বাড়িতে নতুন। তার পক্ষে সব জানা সম্ভব না। কমল গোপনে ডেকে এনেছে কিনা কে জানে! এতে তো বিপদ বাড়ে। কিংবা কমলের মাথায় কোন গণ্ডগোল ঘটে যায় নি তো! একজন সদ্য আসা যুবককে, এই অন্দরে নিয়ে আসা নিয়ে হৈচৈ হতে পারে। পারিবারিক মান-সম্মানের প্রশ্ন আছে। সে বলল, কমল তুমি ডেকেছ কেন?

—তোকে একটু দেখব বলে।

অতীশ এর কি জবাব দেবে। সে বলল, অমলা কোথায় আছে?

বৌরাণীর মুখে কূট হাসি খেলে গেল। বলল, সে আছে। দিদি তোকে নিয়ে যেতে বলেছে।

—ও জানল কি করে?

—কালই ফোন করলাম। বললাম, একটা আশ্চর্য খবর দিচ্ছি দিদি। খুব অবাক হয়ে যাবি।

তার ইচ্ছা হল জানতে অমলার বর কি করে। তারপর মনে হল, অমলা না কমলা—কে তাকে জাপ্টে ধরেছিল। আসলে সেই শৈশব মানুষকে চিরদিন তাড়না করে বেড়ায়। অতীশের কেন জানি আজ অমলাকেও দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। যা ফেলে এসেছিল, এই দেখার মধ্যে তা যেন সে নতুন করে ফিরে পাবে। সেই সুবিশাল জমিদার গৃহে সে তখন কুণ্ঠিত বালক। তার কাছে জগৎটা ছিল রূপকথার দেশের মতো। অমল কমল ছিল তার জীবনে প্রথম দেখা রূপকথার রাজকন্যা। তাদের একজনকে এখানে সে দেখবে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। সে ভাবল, এই নতুন জীবনে এটা ভাল হল কি মন্দ হল জানে না। ওদের দু'জনকে দূরাগত কোন ছবির মধ্যে সে পেতে চেয়েছে এতদিন। এত সামনা-সামনি একজনকে পেয়ে সে কেমন ঘাবড়ে গেছে।

কমল ওর দিকে তাকিয়ে আছে। বলছে, হাবার মত কি দেখছিস?

অতীশ বলল, না কিছু না।

—আমার দিকে তাকা।

অতীশ তাকাতে পারল না।

—তাকা বলছি।

অতীশ বলল, আমি বুঝতে পারছি না। তোমার কি ইচ্ছে! আমাকে বিভ্রমের মধ্যে ফেলে দিও না।

—তুই অনেক দিন জাহাজে ছিলি না রে?

—ছিলাম।

—অনেক দিন নিরুদ্দেশ হয়ে ছিলি?

—ছিলাম।

—তোকে দেখলেই মনে হয় যে নাবিক হারায়েছে দিশা। তোর যেন কি হারিয়ে গেছে না রে?

অতীশ খুব বিষণ্ন বোধ করল।

অতীশের এই মুখ দেখলে ভারি কষ্টের মধ্যে পড়ে যেতে হয়। কমল সহসা উঠে কাছে এল অতীশের। শরীরে সামান্য ঠেলা দিয়ে বলল, ভয় পাচ্ছিস!

—না।

—মুখ এত কাতর কেন?

অতীশ বলল, কমল মেজবাবুর খবর কি! সে কথা ঘোরাতে চাইল।

—বাবা গত হয়েছেন অতীশ। কথাটা বলতে গিয়ে ভেতরে কেমন কমলের কান্নার উদ্বেগ হল। সে উঠে গেল জানালায়—কি দেখল, তারপর ফিরে এসে পায়ের ওপর পা তুলে বসল। একটা মাছি ভনভন করে উড়ছিল। কমল বেল টিপল। সেই উর্দি পরা হাফ যুবক হাজির। ওর দিকে তাকিয়ে বলল, এটা কি!

শঙ্খ মাছিটাকে ঘর থেকে তাড়াবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। পর্দা তুলে দিল। দরজা খুলে দিল, তারপর মাছিটাকে তাড়িয়ে নিজেও অদৃশ্য হয়ে গেল।

অতীশ বলল, কত তাড়াবে। ঐ দেখ পাশে আর একটা।

কমল খুব কাতর চোখে তাকাল। যেন এখুনি ওটা এসে ওকে কামড়াবে। হুল ফোটাবে। এবং সে মরে যাবে। অতীশ উঠে গিয়ে হাওয়ার মধ্যেই খপ করে মাছিটাকে ধরে ফেলল।

কমল বলল, ছি ছি তোর ঘেন্না-পিত্তি নেই। তুই একেবারে গেছিস। বলে কমল নিজে উঠে গেল। একটা ট্রে নিয়ে এল। একটা দামী শ্যামপোর শিশি। ট্রেটা কাছে নিয়ে বলল, হাত ধো। অতীশ হাত পাতলে জল দিল, সে হাত ধুলে কাঁধ থেকে তোয়ালে নিয়ে বলল, হাত মুছে ফেল। এবং হাত মোছা হলেই দেখল, ট্রে হাতে আর কেউ আসছে। শরবতি লেবুর রস, কিছু আঙুর, দুটো

হাফ-বয়েল ডিম, স্যাণ্ড-উইচ চার পিস। কমল নিজেই সাদা চাদরের উপর সাজিয়ে রাখল। খা।

সে কিছুই না করতে পারছে না। সে যতবার কমলকে চোখ তুলে দেখেছে, সেই মুখ, ফ্রক গায়ে বব কাটা চুলের মুখ। বিশাল বারান্দায় অথবা ছাদে দৌড়াচ্ছে। চঞ্চল বালিকার সেই মুখ ছাড়া কমলের মুখে আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না অথবা নদীর পাড়ে জুড়িগাড়িতে বসে আছে কমল। অনেক দূরের কোন বালিয়াড়িতে সে দাঁড়িয়ে। তাকে হাত তুলে ডাকছে। অথবা সেই হাতী—গলায় ঘণ্টা বাজছে, যেন দূর অতীত থেকে সে ধ্বনি কানে আসছে। অতীশ চামচে দুটো আঙুর মুখে তুলে বলল, আমরা সব হারিয়েছি কমল। বড় হতে হতে আমরা কত কিছু হারাই।

কমল ওর খাওয়া দেখছিল—সতর্ক নজর রাখছে—এ-ঘরে দু' দুটো মাছি কি করে ঢুকল! আরও যে নেই কে জানে। কখন খাবারটার ওপর উড়ে এসে বসবে কে জানে! সে চারপাশে খুব সতর্ক নজর রাখছিল। আর চুরি করে অতীশের মুখ দেখছিল।

—রোজই আমি কেন জানি আশা করতাম, তুই আমাকে চিঠি লিখবি। এখন দেখছি নিজেই হাজির। আমার ঈশ্বর তোকে এখানে নিয়ে এসেছেন। আমি প্রার্থনায় বিশ্বাস করি অতীশ।

অতীশ বলতে পারত, দেশ ভাগের পর আমরা এক মহাপ্লাবনে ভেসে যাচ্ছিলাম। সেখানে দু' পারের সব কিছু অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। কোথায় কার ঘরবাড়ি কিছুই চোখে পড়ছিল না। কে কিভাবে বেঁচে আছে জানার কোন উপায় ছিল না। এখন প্লাবনের জল নেমে এসেছে। দু-পাড়ে বাড়ি-ঘর মাঠ, গাছপালা, পাখি সব এখন দৃশ্যমান। কিন্তু মানুষের যা হয়, জীবন বয়ে যেতে যেতে সে অন্য এক প্লাবনে ভেসে যায়। সে কোথাও স্থির থাকতে পারে না কমল। আমিও এক জায়গায় স্থির বসে নেই। কত রকমের জটিলতা আমাকে গ্রাস করছে তুমি জান না। কাল সারারাত ঘুমাতে পারি নি ভাল করে। এখানে আসার পর কেন জানি না আর্চির প্রেতাত্মার আবার গন্ধ পাচ্ছি। গন্ধটা পেলেই বুঝি আমার খুব সতর্ক থাকা দরকার। কোন দিক থেকে কি বিপদ আসবে বুঝতে পারছি না।

কমল সহসা বলল, তোর বৌ দেখতে কেমন হয়েছে রে?

—খুব সুন্দর। খুব ভাল মেয়ে।

—ভূঁইয়া দাদু কোথায় আছেন?

অতীশ বুঝতে পারল কমল তার সোনা জ্যাঠামশাইর খবরাখবর নিতে চায়। সে বলল, বড়দার কাছে আছেন।

—তোর সেই পাগল জ্যাঠামশাই ?

—তিনি কোথায় চলে গেছেন ?

—কোথায় গেলেন। কোন খবর পাস নি ?

—না। বাবা জ্যাঠামশাই ঘর-বাড়ি বিক্রি করে চলে এলেন এখানে। আমরা সবাই। তার পরের ঘটনার কথা ভেবে হাসি পেল অতীশের। সে তখন জানতও না, হিন্দুস্থান বললে মানুষের কোন ঠিকানা বোঝায় না। কত সরল বিশ্বাসে সে একটা গাছে লিখে এসেছিল, জ্যাঠামশাই আমরা হিন্দুস্থানে চলিয়া গিয়াছি। অতীশের কথা বলতে গিয়ে কেন জানি চোখে জল এসে গেল। অতীশ চোখ আড়াল করার জন্য মুখ ঘুরিয়ে বলল, উঠি কমল।

—দাঁড়া। আর একটু বোস। বলে কমল উঠে এল তার কাছে। তারপর কেমন ঝুঁকে পড়ল মাথার ওপর। নাক টানল, তারপর কেমন হতাশ গলায় বলল, হ্যাঁ রে তোর গায়ে যে চন্দনের গন্ধ লেগে থাকত, সেটা টের পাচ্ছি না কেন রে।

অতীশ বলল, আমার গায়ে কবে চন্দনের গন্ধ ছিল কমল।

—ছিল। তুই জানতিস না। ছাদে আমি প্রথম গন্ধটা পাই।

—এখন নেই ?

—না।

—বোধহয় তাও হারিয়েছি।

—এই তুই দাঁড়া তো!

অতীশ দাঁড়াল। কমলও পাশে এসে দাঁড়াল। আশ্চর্য সুঘ্রাণ কমলের শরীরে। প্রায় গা ঘেঁষে। সেই বালিকা বয়সের মতো মাথায় হাত তুলে দেখল, অতীশ তার চেয়ে কতটা লম্বা! অনেকটা। হাত নামিয়ে বলল, তুই আমার চেয়ে তখন খাটো ছিলি না রে ?

অতীশ বলল, মনে নেই।

—আমার সব মনে আছে! সব।

সব বলতে কমল কি বোঝাতে চায়। কমলের কি সংশয় জন্মেছে, প্রাচীন শ্যাওলা ধরা ঘরটার স্মৃতি সে ভুলে গেছে! সে ইচ্ছে করেই বলল, তোমার মুখ বাদে আমার কিছু মনে নেই কমল।

—চিঠিটার কথা ?

—তাও ভুলে গেছি।

—এত ভুলে গেলে কোম্পানি চালাবি কি করে ? কমল কেমন একটু রূঢ় হয়ে উঠল।

—কুম্ভবাবু আছে। সুনৎবাবু আছেন।

—তোর নিজের কিছু থাকবে না! না থাকলে ওরা পেয়ে বসবে না!

অতীশ কোন জবাব দিল না।

কমলের ঋজু তীক্ষ্ণ নাক মুখ। স্বর্ণ চাঁপার মতো রঙ। আর বড় বড় চোখ। পরনে লাল পেড়ে সিল্ক—যেন আগুন হয়ে জ্বলছে তার পাশে। অন্ধকারে মোমের আলোর মতো জ্বলছে। তার ভয় হচ্ছিল। কেউ এ-ঘরে আসতে পারে, রাজেনদা আসতে পারে। এত কাছাকাছি যে সে ঘেমে উঠছিল। কমল তখনই বলল, অতীশ তুই নষ্ট হয়ে গেছিস। তুই আর ভাল নেই। চন্দনের গন্ধ চলে গেলে কেউ আর ভাল থাকে না।

সে বলতে পারত, জীবনে এক পরিমণ্ডল থেকে অন্য এক পরিমণ্ডলে চলে আসছি কমল। বয়স বাড়ছে, আর পরিমণ্ডল পরিবর্তিত হচ্ছে কমল। এখন আর ইচ্ছে করলেই দুম করে কাজ ছেড়ে দিতে পারব না। সেদিনও যা পেরেছি, আজ আর তাও পারব না। আগে আমার একটা ছোট জাহাজ ছিল। জাহাজটার যাত্রী মা বাবা ভাই বোন। এখন জাহাজে যাত্রী বেড়েছে। নির্মলা, মিণ্টু টুটুল নতুন যাত্রী। এই জাহাজটাকে চালিয়ে ঘাটে পৌঁছে দিতে হবে। আগে জাহাজের ক্রু ছিলাম। এখন নিজেই কাপ্তান। খুশি মত যেখানে সেখানে তাকে ছেড়ে দিতে পারি না। যাত্রা অনিশ্চিত। তবু ঘাটে পৌঁছাব বলেই এই বড় শহরে চলে এসেছি। তুমি আমাকে যতই নষ্ট চরিত্রের বল, আমি আর কিছুতেই ঘাবড়াব না। তারপরই মনে হল সে কি সব হিজিবিজি ভাবছে। কমল কখন চলে গেছে এই বিলাস কক্ষ থেকে সে টেরও পায় নি। সামনে সেই উর্দি পরা হাফ-যুবক—সে বলছে, আজ্ঞে আইয়ে সাব। সে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

খাবার টেবিলে কুমারবাহাদুর ঠাট্টা করে বৌরাণীকে বললেন, ছাগের পোলা কিডা কয়।

বৌরাণীও ঠাট্টা করে বলল, কিছু কয় না। তারপর চামচে করে সামান্য গ্রীন পিজ মুখে দেবার সময় খুব গম্ভীর হয়ে গেল বলতে বলতে, ওকে না আনলেই

ভাল করতে। ওর বাপকে চিনি, ওর জ্যাঠামশাইকে চিনি। সেকেলে মানুষ। ভাল মানুষ। অতীশও তাই। ওর বড় জ্যাঠামশাই পাগল হয়ে গেছিলেন। অতীশের আর কি সম্ভ্রান্ত চেহারা, ওর পাগল জ্যাঠামশাইকে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না মানুষ দেখতে কত সুপুরুষ হয়। ভূঁইয়া দাদুকে আমাদের বাড়ির সবাই সমীহ করত। বাবা স্টীমার ঘাট থেকে নেমে প্রথম সে মানুষটার পায়ে মাথা ঠুকতেন। নিয়ম ছিল, আমাদেরও গড় হওয়া। তাঁর ভাইপোকে এনে কতটা ভাল করলে মন্দ করলে বুঝতে পারছি না।

৭

সকাল থেকেই সুরেনের মেজাজ বিগড়ে গেছে। সকালেই সে মেজ মেয়েটাকে সেই খারাপ লোকটার ঘরে যেতে দিল। লোকটা লম্বা ঢ্যাঙা। চুপচাপ জানালায় বসে থাকে। বিড়ি খায়। রেলে কাজ করে। মেসবাড়ির একটা আলগা ঘরে থাকে। জানালার একটা পাট বন্ধ থাকলে ভেতরে লোকটা কি করছে বোঝা যায় না। বাতাসী চা পাঁউরুটি এনে দেয় রাস্তা থেকে। কখনও বাতাসা মুড়ি। বিড়ি পান যখন যা দরকার বাতাসীকে দিয়ে আনায়। সঙ্গে দশ-পাঁচটা পয়সা বেশি দেয়। একবার আলতার শিশি পাউডার কিনে দিয়েছিল। তা ছাড়া দরকারে-অদরকারে সুরেনকে পাঁচ-সাত টাকা ধার দেয়। ধার দিলে আবার ভুলেও যায়। কিন্তু এবারে কিছুতেই ভুলছে না। সকালবেলাতেই ডেকে বলল, অ সুরেন টাকা কটা দেবে নাকি?

কদিন বাতাসীকে যেতে দেওয়া হয় নি। কুম্ভবাবুর বাসায় সকালেই চলে যায়। বাসি রুটি দুখানা খেতে দেয় কুম্ভদার বৌ। দুপুরে ডাল-ভাতও দেয়। রাতে কুম্ভবাবু ফিরে না এলে ছুটি হয় না বাতাসীর। কুম্ভবাবুকে খুশি রাখার জন্য সে বাতাসীকে ছেড়ে দিয়েছে। বাতাসী কোন দিক সামলাবে। টাকাটা চাইতেই সে বাতাসীকে বলল, যা হামুবাবুর ঘরে যা। ঝাট-ফাট দিয়ে আয়। খুব চটে গেছে। তারপরই মনে হয়েছিল মেয়েটা যেন খুব খুশি বাপের কথা শুনে। বলল, যাচ্ছি! এবং চুলে কাঁকুই দিয়ে বেশ সেজে-গুজে যেতেই মেজাজটা বিগড়ে গেল। তোর বাপের বয়সী মানুষ তার কাছে এত সাজ-গোজের কি থাকে! কিন্তু টাকাটা বড়ই দায় তার। গেলে যদি টাকাটার কথা হামুবাবু ভুলে যায়। তারপরই মনের মধ্যে কূট কামড়। মেয়েটা তার ভাল করে বড়ই হয় নি—অথচ খুব

পেকে গেছে। মাঝে মাঝে এমনভাবে পুরুষমানুষ দেখলে ফিক্‌ফিক্ করে হাসে যে তার বুকে হিম ধরে যায়। তখন কাশিটা বাড়ে। বাতাসীর ঘর ঝাঁট দিতে অত সময় লাগার কথা না। কি করে! মনের মধ্যে তার প্রবৃত্তি ছোট হয়ে যায়। টুক টুক করে জানালায় হেঁটে এসে বলে, অ হামুবাবু, বাতাসীর হল!

হামুবাবু জানালার ফাঁক দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলে, সুরেন নাকি!

হামুবাবু নিচের দিকে হাত টেনে কি সামলায়। ঘরে বাতাসী আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না। হামুবাবু শুয়ে আছে। হামুবাবু পোশাক-আসাকে বড়ই ঢিলেঢালা। যতক্ষণ ঘরে থাকবে শুধু একটা আণ্ডারওয়েয়ার পরনে। মাকুন্দ মানুষ, গায়ে একটা লোম নেই, চুল ছোট্ট করে কাটা—মাথা নাকি এতে হাল্কা থাকে। একটা জানালা একটা দরজা। মেসবাড়ির ভেতরে না ঢুকলে দরজাটা দেখা যায় না। বাতাসী কি করছে! সুরেন বলল, বাতাসী, হয়েছে তোর!

বাতাসী ভেতর থেকেই বলল, এই হল যাই! হামুকাকার কাপ-ডিশ ধুয়ে যাচ্ছি।

—সকাল সকাল চলে যাস মা। কুন্তবাবু বের হয়ে যাবে।

বাতাসী ফ্রক গায়ে দেয়। ফ্রক গায়ে দিলে বড়সড় লাগে না। আর যে বয়সে যতটা শরীরে বড় হওয়া দরকার ছিল, যেন তা বাতাসীর ঠিকঠাক বড় হয় নি। অকালে সব অপুষ্টির জন্য। কিন্তু মানুষের সব জায়গায় অপুষ্টি বুঝি এক রকম থাকে না। সুরেন ভাবল এটা-ওটা বলে দাঁড়িয়ে থাকা যাক—তাহলে এই যে গায়ে-ফায়ে হাত দেওয়া সেটা হামুবাবু পারবে না। তবে সে আর কতক্ষণ—আর একটু বাদেই অফিস, তখন ছানাপোনাগুলি বেড়াল ছানার মত ম্যাও ম্যাও করে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। কিছু গন্ধটন্দ পেলেই দাঁড়িয়ে যায়। তবে ঐ একটা সুবিধে। বয়স বাড়লে তার মেয়েরা আদর পায়। সুধীর বেলাতেও দেখেছে। শরীরে মাংস লাগতেই রাধিকাবাবু বললেন, বিয়ে দিয়ে দে। ভাল ছেলে। জমি-জমা আছে। ইষ্টিশনে ভাজাভুজির দোকান আছে। থাকবে ভাল, খাবে ভাল। প্রায় বলতে গেলে ওরা তুলে নিয়েই গিয়েছিল। বাতাসীও আজকাল আদর পেতে শুরু করেছে।

সুরেন বলল, সিগারেট আছে নাকি হামুবাবু?

আমি ত আজকাল গাঁজা খাচ্ছি সুরেন।

সুরেন কেমন ভীত গলায় বলল, অত কড়া সহ্য হবে না। গাঁজা খায় লোকটা সে শুনেছে। ইদানীং অফিসেও যায় না? এই ঘরটায় বসে বসে কেবল আইনের

বই পড়ে। হামুবাবুর ধারণা, তার বিরুদ্ধে সবাই ষড়যন্ত্র করছে। 'সেই ষড়যন্ত্র আটকাবার জন্য সে এখন আইনের বই ঘাঁটাঘাঁটি করছে। মাঝে দেখেছে কপালে লম্বা সিঁদুরের ফোঁটা টেনে কোথায় একবার নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। ফিরে এসে বলল, তীর্থে গেছিলাম। বাতাসীকে দিয়ে কাশী বিশ্বনাথের প্রসাদও পাঠিয়েছিল।

সুরেনের কাছে হামুবাবুর সবটাই ভাল, ঐ হাত-কাত দেয় এমন একটা ধান্দা দেখা দিতেই মনটা বিগড়ে গেছে। আগে সে এটা বুঝতে পারত না। তার মেয়েদের আদর করে ডাকত ঘরে, বাতাসী টেবি সবাইকে। লজেন্স দিত খেতে। চা বানিয়ে নিজে খেত, মেয়ে তিনটেকে দিত। মুড়ি বাদাম ভাজা মেখে ভাগ ভাগ করে দিত। তিনটে মেয়েই হামুবাবুর ন্যাওটা। রথের মেলায় গেলে দশটা করে পয়সা। এত কে করে! কিন্তু বাতাসী না গেলে রাগ করে। পয়সা ফেরত চায়। এটা সুরেনের মনে ধন্দ ঢুকিয়ে দিয়েছে। কূট কামড়। সে ডাকল, হল বাতাসী।

—তুমি যাও না সুরেন! হলেই চলে যাবে।

—বাবু আমরা হলেম গে কপাল পোড়া মানুষ। তা ঘরে আপনার থাকলে হাতের কাজ এগিয়ে দিলে কার কি আসে-যায়। কিন্তু কুন্তবাবু অফিসে যাবে ত।

—তা বাতাসী কেন?

—উ কুন্তবাবু আর ভরসা পায় না।

হামুবাবু সব জানে। নতুন বাড়ির ওদিকে জানালাটা খুলে গেলেই সব বোঝে। সে বলল, পাহারা দিয়ে কিছু হয় না সুরেন। এ হল গে ঘুসঘুসে আগুন। কেবল পোড়ে। আর পোড়ে।

—ভাল আছেন বাবু বিয়ে-থা করলেন না। মুক্ত। কি খাব, কি খাওয়াব ভাবতে হয় না। ওরে বাতাসী হল?

হামুবাবু বিরক্ত হয়ে উঠে বসল। পা দুটো কাঠি কাঠি—রগফগ সব ভেসে উঠেছে। রুগ্ন শরীর। মাংস না থাকলেও ছিবড়েটা আছে শরীরে। চোখ লাল করে বসে থাকে। গাঁজা খেলে চোখ সাদা থাকবে কি করে। তুরীয় ভাব সব সময়। কাজ-ফাজ করে যা পায়, তাও নেশা-ভাঙে ওড়ায়। খায়-দায় কম। মেসে দুবেলা খায় ঐ নামে। আর কেবল মানুষের বসে বসে আদ্যশ্রাদ্ধ করে। কোথায় মিছিল হচ্ছে, কোথায় প্লাবন হচ্ছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাগজে দেখে। এতে তার খুব আনন্দ। কাগজটা মেলাই আছে। অপঘাত মৃত্যু, বালিকা হরণ,

বাসের চাকায় চেপ্টে গেছে, বৌ পলাতক, এ-সব খবর পড়ে লোকটা মজা পায়।

সুরেন ভাবল, আজ কি মজার খবর আছে জেনে নেয়। এতে তারও মজা আছে। এই একটা জায়গায় হামুবাবুর সঙ্গে তার খুব মিল। সে বলল, কাগজে আর কি খবর হামুবাবু।

—খবর তো অনেক। তোমার রাজার মাথা ঠিক আছে ত!

সুরেন বুঝতে পারল না, এ-কথা কেন সে বলল,—রাজার কি অভাব আছে হামুবাবু, মাথা ঠিক থাকবে না।

—তুমি একখানা মানুষ বটে সুরেন। কাকের মত স্বভাব।

এই সকালে কাকের সঙ্গে তুলনা করায় সে খুব আহত হল। কাক হল নিম্নস্তরের প্রাণী। সে হল নবীনগরের গাঙ্গুলীবংশের মানুষ। দেশ ভাগ হয়ে গিয়ে এত ফের। তাই এই লোকটা তাকে যৎপরোনাস্তি কটূক্তি করছে। সে মুখ ব্যাজার করে বলল, কাক কেন বাবু কোকিলের কথা বলুন।

—কোকিল কি আন্ধা আছে। তুমি একটা আন্ধার মত কথা বলছ। যেন কিছু জান না। খবর পাও নি!

সুরেন খুব মহামুশকিলে পড়ে গেছে।—কি খবর। এ-বাড়িতে ত সকাল হলেই খবর লেগে থাকে। এই সেদিন, বৌরাণী নতুন ম্যানেজারকে অন্দরে ডেকে পাঠিয়েছিল বলে একটা খবর হয়ে গেল। ঘরে ঘরে এক কথা। এ-বাড়ির সব ভাঙছে। কেবল ভাঙচুর হচ্ছে। এটাতেও সে মজা পায়।

তখনই হামুবাবু বলল, তোমার রাজার ফুটানি এবারে যাবে। বুঝেছ। বস্তি সব সরকার নিয়ে নেবে বলেছে। বিল আসছে।

সে বলল, তাই হয় যেন বাবু। সব যাক। ফিসফিস করে বলল, আমাদের রতনবাবু, চিনেন না, রাধিকাবাবুর শ্যালক। নলগায়ের এজেন্ট ছিল, রাজা ওটাকে তাড়িয়েছে। লাখ টাকা নাকি মেরে দিয়ে সরে পড়েছে।

—রাজা কেস করছে না কেন।

—কেস! কি যে বলেন! রন্ধ্রে রন্ধ্রে পোকা। কোথাকার জল কোথায় গড়াবে—রাজা মামলা একেবারে পছন্দ করে না। কত খাবি, নে লাখ টাকা নিয়ে সুখে থাক।

—তাড়িয়ে দিল কেন! ওতো জেনে-শুনেই চোর পোষে। দু-পয়সা তোমার রাজারও হয়, তারও হয়। সাদা টাকা আর কে চায় এখন।

সুরেন বলল, তালে সিগারেট না থাকলে একটা বিড়ি দেন; ও বাতাসী তোর হল ? আমার হয়েছে জ্বালা। বাবু আপনাকে কত বললাম, নবরে একটা কিছু করে দিন, মাথা ঠিক রাখতে পারছে না। কাল সারারাত ফেরেনি। কি দুর্ভাবনা কন। সকালে হাজির। বললাম, কোথায় গেছিলি। তোর জননী সারারাত না ঘুমিয়ে থেকেছে।

—কোথায় গেছিল!

—রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাড়ি গুনছিল নাকি!

—কে দিল এ-কাজ।

—নিজেই ঠিক করে নিয়েছে। পয়সা হাতে না থাকলে কি করবে! বলল, কাজটা খুবই ভাল। এতে কারো চোখ টাটায় না।

হামুবাবু বুঝতে পারল, বেকার থাকলে মাথায় গণ্ডগোল দেখা দিতেই পারে।

—তুমি বললে না, গাড়ি গুণে কি হবে?

—আমার কথা শোনে!

—গাড়ি যখন গুনছে তখন ধূপকাঠি বিক্রি করছে না কেন?

—সেটা বুঝিয়ে বলুন না আপনারা! তারপরই মনে হল, গাড়ির সঙ্গে ধূপ-কাঠির সম্পর্ক কি থাকতে পারে? সে বলল, এ-কথা কেন বাবু?

—আজকাল দেখতে পাচ্ছ না, কত ধূপকাঠি জ্বলছে। সবাই ঘরে এখন ধূপ-কাঠি পোড়ায়। তোমাদের নতুন ম্যানেজারের নাকি গোছা গোছা ধূপকাঠি লাগে। ভাল খদ্দের। তারে পাকড়াও না।

—তারে ত কুম্ভবাবুরে ধরে সিট মেটালে ঢোকানো যায় কিনা দেখছি। কুম্ভবাবু নাকি হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছে মানুষটাকে। কাজ একদম বোঝে না। কুম্ভবাবু পাশে না থাকলে চোখে আন্ধার দেখে।

—নবরে পাঠিয়ে দাও না নতুন ম্যানেজারের কাছে। কুম্ভ তোমাকে ঘোরাবে।

—পাঠাব কি বাবু পেনসিল নিয়ে বসে এখন অঙ্ক করছে।

—আবার পরীক্ষা দিচ্ছে নাকি!

—পরীক্ষা না বাবু। সকালে এসেই স্নানটান সেরে মাদুর বিছিয়ে বসে পড়েছে। কেবল গুণ অঙ্ক!

—এত গুণ দিয়ে কি হবে?

—কি নাকি হিসাব করে দেখছে। দেশের অপচয় কতটা দেখছে। এই অপচয় বন্ধ করলে, কতজন বেকার কাজ পেতে পারে তার একটা সরল অঙ্ক মাথায় এসে গেছে তার। কিছুতেই মাদুর থেকে ওঠানো গেল না।

—নবর মাথা পরিষ্কার ছিল। তুমি পড়ালে না সুরেন! আমার ঘরে এসে কাগজ পড়ে যায়। কত রকমের প্রশ্ন করে। আমি ঠিক উত্তর দিতে পারি না। হামুবাবুর মধ্যে এখন একটা ভালমানুষ দেখা দেওয়ায় খুব গম্ভীর গলায় কথা বলছে।

—খুব মনে রাখতে পারে। কিছু বললেই সাল তারিখ উল্লেখ করে বলবে, সব বেটা ফেরেববাজ। ঘুষখোর। ধান্দাবাজ। সেতো কাউকে মানে না বাবু! ঈশ্বর পর্যন্ত তার কাছে একটা হারামী। বলেন, এ ছেলের কি গতি হবে।

হামুবাবু এবার কি ভেবে বলল, এই বাতাসী যা। আজ আর আসতে হবে না। কাল সকালে কুম্ভবাবুর বাড়ি যাবার আগে একবার আসিস। আর সঙ্গে সঙ্গে বাতাসী বের হয়ে গেল। সুরেনের ইজ্জতে বড় লাগল। বাপের কথায় গ্রাহ্য নেই। বাপ নয়, কাকা নয়, মামাও নয় লোকটা, তার কথা কেবল শোনে। সুরেনের আবার কাশি উঠল। কফ উঠল। সে জানালার পাশেই কফটা ফেলে রাখল। কফের পোকা দেয়াল বেয়ে উঠুক। জখম করুক লোকটাকে। এ-মুহূর্তে সেও নেশাখোরের মত বলল, মানুষ জাতটাই হারামী। জাতটার সর্ব অঙ্গে ঘা হোক পোকা-হোক। বসে বসে দেখি। এবং এইসব বলতে বলতে সুরেনের মাথা গরম হয়ে গেল। সব তার হাতের নাগালের বাইরে। বড় ছেলে তাও বকে যাচ্ছে। সর্ব কনিষ্ঠটিও তার পুত্র সন্তান। হামাগুড়ি দেয়। উঠে দাঁড়ায়। হাতে তালি বাজায়। পা পা করে হাঁটে। সামনে এক মানুষ সমান গর্ত। সারা বাড়ির মলমূত্র সেখান দিয়ে বয়ে যায়। ধর্মপত্নীকে বার বার সাবধান করে দিয়েছে, ডুববে। সব ডুববে। ধর্মপত্নীর এক কথা, কপালে থাকলে হবে। বিধাতার ওপর বড়ই বিশ্বাস! পাঁচ পাঁচটা নর্দমা পার হয়ে গেল, এই একটার বেলায় তেনার যত আদিখ্যেতা। কেউ তাকে মর্যাদা দেয় না। বাতাসী না, টেবি না, সুখী না। বড়টা তো এখন অঙ্ক নিয়ে বসেছে। কোথা থেকে বগল দাবা করে এনেছে কাটা কাগজ। তাতে একটা রোঁয়া ওঠা পেন্সিল দিয়ে লম্বা অঙ্ক করছে। কার মাথা ঠিক থাকে। এখন গিয়ে মনে হল লাথি কষায়, হারামজাদা ইতর, কাজের কাজ না করে অঙ্ক করা। অঙ্ক করবে বাবুরা। তেনাদের হিসাব রাখতে হয়। তোর আছেটা কি হিসাব রাখবি। নর্দামা পার হয়েই হাঁক পাড়ল, বাবা নব, অঙ্ক তোমার হল?

—না বাবা। এই আর একটু তবেই হিসাব মিলে যাবে।

—বাবা নব, তুমি আর অঙ্ক কর না। হামুবাবু বলল, ধূপকাঠি বিক্রি করতে। পুঁজি কম লাগে। নতুন ম্যানেজার বড় খদ্দের। সময় থাকতে পাকড়ে ফেল।

নবর বড় বড় চুলে কপাল ঢাকা। সে নুয়ে অঙ্ক করছে। শিরদাঁড়াটা দাঁড়াশ সাপের মত মোটা হয়ে নেমে গেছে কোমরে। তার দু-পাশে পাঁজরা, অঙ্কের হিসাব মেলে না। যতবার গুনেছে এক দিকে পাচটা অপর দিকে এগারটা। ডাক্তারবাবু তার পাঁজরার হিসাব দিয়েছিল, বাইশটা। তার নিচে দুটো হলদে থলে পাঁঠার ফুসফুসের মত সেখানে নাকি বিজবিজে পোকা বাসা বানিয়েছে। সে ভাল হয়ে যাওয়া মানেই সেখানে বড় রকমের একটা হত্যাযজ্ঞ।

সে অবার বলল, বাবা নব, তোমার অঙ্কের বিষয়টা জানতে পারি? হামবাবু বললেন, বিষয়টা জেনে নাও।

—হামুবাবুকে বলবে, ওকে ধরে আমি ঠ্যাঙাবো, অঙ্ক করছি, এখন ডিস্টার্ব করবে না।

—তুমি বারান্দা থেকে নেমে অঙ্কটা কস। আমার স্নানের সময় হয়েছে। দুটো মুখে দেব বাবা।

নব খুব দার্শনিকের মত উবু হয়েই বলল, খাওয়াটা বড় কথা নয়। খেলে পেট ভরে এটুকু হলেই তোমার বাসনা উবে যায়। কিন্তু তারপরেও থাকে। তার খবর রাখ না!

—অত খবরে কাজ নেই বাবা নব। আমি অবগাহনে যাচ্ছি। তুমি নতুন ম্যানেজারকে গিয়ে বলে এস, এবার থেকে যত ধূপকাঠি লাগবে আমি দেব। পয়লা এই দিয়ে শুরু করে দাও। আলামোহন জীবন এ-ভাবেই শুরু করেছিল জান?

নব জানে, এগুলো সবই বাবার ধর্ম কথা। সেই কবে থেকে নজির টেনে আসছে। বাপের বিদ্যে ক্লাস এইট পর্যন্ত। ঐ বিদ্যায় যা খবর সংগ্রহ করেছিল সেটাই এখন জীবনে মূলধন হয়ে আছে। এই নিয়ে একশ আটাশবার বাবা আলামোহন দাসের নজির টানলেন। সে অঙ্কটা করছে বলে মাথা গরম করতে পারছে না। তা না হলে কুরুক্ষেত্র বেধে যেত। এটাও এ-বাড়ির সকাল বিকেলের ধর্মযুদ্ধ! সে তাই মাথা ঠাণ্ডা রেখে বলল, অঙ্কের হিসেবটা শোন তাহলেই মাথায় খাওয়া উঠে যাবে। ভি আই পিতে চব্বিশ ঘণ্টায় গাড়ির সংখ্যা তোমার সতের হাজার চারশ আটাশ। এই সংখ্যাকে তুমি গুন দাও

তিনশ পয়ষট্টি দিয়ে। তোমার মনে আছে ত এই কটা দিনে পৃথিবীতে বছর হয়। তারপর গুণ কর গড়ে চার লিটার তেল। তারপর গুণ কর।

—কি দিয়ে গুণ করব বাবা ?

—দাম। তেলের দাম। কত টাকা হয় জান। তোমার মাথায় আসবে না। বাবুদের বাবুগিরিতে একটা পঞ্চাশ হাজার একর জমির চাষ বছরে ভি আই পিতে উবে যায়। এই দেশে কত এমন ভি আই পি আছে। কত পঞ্চাশ হাজার একর চাষ হতে পারে কত পঞ্চাশ লক্ষ বেকার চাকরি পেতে পারে ভেবে দেখ।

স্বরেন ভাবল ছাওয়ালের মাথাটি গেছে। রেগে গেলে মাতৃভাষা তার লজ্জে আসে। সে বলল, বাইর হ শুয়ার। বাইরাইয়া যা। সে কি খুঁজতে থাকল। বোধ হয় লাঠিটাটি সে আত্মরক্ষার্থে লাঠি টেনে বের করতে গেল।

বাপের এই রাগকে নব গ্রাহ্য করে না। লাঠি টেনে এনে মাথায় তুলতেই খপ করে ধরে ফেলল। পাশের খুপরি থেকে কখন বের হয়ে আসছে ছুতোর হরিচরণ, তার বৌ, ছোট মেয়েটা তার পাশ থেকে ছুটে এসেছে রাজমিস্ত্রি অধীর। বিপত্নীক বলে একা। সঙ্গে পুটি ডবকা ছুড়িটা। নবর সঙ্গে মাঝে মাঝে ঠাট্টা-তামাশা করে। কোলাহল শুনে বাবুচিপাড়ার লোকজনও ছুটে এল। এরা সব একই লাইনবন্দী লোক। দুঃখ-কষ্টে একই গোত্রের মানুষ। স্বরেনের আজ আবার কি নিয়ে মাথা গরম হয়েছে। ওরা এসে দেখল নব বাপের লাঠি কেড়ে নিয়ে তার ওপর বসে আছে। আর মুখের ওপর আঠা দিয়ে জোড়া একটা লম্বা তালিকা। সে সেটা খুব নিবিষ্ট মনে দেখছে। মুখ নিশ্চিন্তে আড়াল করে হিসাবটা ফের মিলিয়ে দেখছে।

সবাইকে লক্ষ্য করে স্বরেন বলল, বলেন, কার মাথা ঠিক থাকে। তুই আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তুই আমার শ্রাদ্ধের অধিকারী আর তুই তোর পিতৃদেবকে কলা দেখাস। দিনরাত টোটো করে ঘুরে বেড়াস।

রাজমিস্ত্রি অধীর বলল, দিনকাল খুবই খারাপ। আমাদের সময় যা হক করে কেটে গেল। বড় খারাপ দিন আসছে। লোক সব না খেয়ে মরে যাবে। কলিতে মানুষের হেনস্তা কত। আগে থেকে হিসেব করে না চললে তারপর ভডনং। রাস্তায় ঐ পাগলটার মতো হাঁকতে হবে—কি যেন হাঁকে, ও হরিচরণ, কি যেন সাধুবাক্য কয়।

—ও মনে থাকে না। কাল দেখি পাগলার মাথায় একটা কাগের পালক বাঁধা খাক রাস্তায় উর্ধ্বনেত্রে দাঁড়িয়ে আছে।

তখনই কেমন হুঁশ ফিরে এল সুরেনের। তার জ্যেষ্ঠপুত্র পাগল হয়ে যাচ্ছে না ত। পাগলের উপদ্রব খুবই বেড়েছে। দোতলা বাড়িটায় থাকে পাগলাবাবু নতুন ম্যানেজরের মাথায়ও কি নাকি আছে। সারা রাত ধরে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে নাকি বসে ছিল। আর পাগলাবাবুর ত কথাই নেই। নতুন বাবু আসার পরই কেমন বিবেচক মানুষ হয়ে গেল। বিকেলে এখন মাঠে বেড়াবার অনুমতি পর্যন্ত পেয়ে গেছে। সে বলল, বাবা নব মাথা ঠাণ্ডা কর। মাথার মধ্যে গোঁজা দিস না। ওতে বিপত্তি বাড়ে। তোর চাকরির ভাবনা কি। কুম্ভবাবু বলেছে সিট মেটালে তোর একটা কিছু হয়ে যাবে বাবা। ছেলের মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য সাহস দিল। যেন সবই ঠিক হয়ে গেছে।

হরিচরণ বলল, তুমি যাও সুরেনদা। এখানে থাকলে তোমারও মাথা খারাপ হয়ে যাবে। অগত্যা সুরেন অবগাহন করবে বলে বের হয়ে গেল। সামনেই দুটো বড় বড় পুকুর। এ-ছাড়া আছে অন্দরের পুকুর। অন্দরের পুকুরের চারপাশে উঁচু দেয়াল। তার ওপর কাঁটাতারের বেড়া। ও-পাশে মাঠ। মাঠের পর গোয়ালবাড়ি—তারপর জেলখানার মতো উঁচু পাঁচিল। অন্দরে নতুন বৌরাণী সকালে সাঁতার কাটেন। গায়ে-পায়ে প্রায় নাকি উলঙ্গই থাকেন তখন। একমাত্র খাস বেয়ারা শঙ্খ থাকতে পারে কাছে। তার হাতে তোয়ালে, গন্ধ সাবান এবং কতরকমের সুগন্ধী তেল। কুমার বাহাদুর বেতের চেয়ারে পাশের লনে বসে থাকেন। নভেল পড়েন। চুরুট খান। বৌরাণী এসেই একটা নিজস্ব ফুলের বাগান করেছেন। সেখানে দুজনে জ্যোৎস্না রাতে ঘুরে বেড়ান। কত সব পাথরের মূর্তি সেখানে। স্নানে গেলেই মনে হয় পাঁচিল বেয়ে একবার ঐ ভিতরটা দেখে। কি ফুল, কি গাছ, কি দেবদেবীর মূর্তি আছে ওখানে দেখার একটা ঘুসঘুসে ইচ্ছা পুকুরের পাড়ে এলেই সুরেনকে কেন জানি পেয়ে বসে। সে এই খোলা পুকুরে সাঁতার কাটছে, তাকে দেখার কেউ নেই। সেও একসময় মেঘনা নদী পার হয়ে যেত। সেও একবার আসমানদি চরে সাঁতার দিয়ে রুপোর মেডেল পেয়েছিল। ধর্মপত্নী তার সাক্ষী। আর তখনই টেবি সুখী আরও কেউ কেউ ছুটে আসছে। হাউহাউ করে চিৎকার করছে। আর্ত চিৎকার—বাবা তাড়াতাড়ি উঠে এস। দাদা কি করছে! কেমন করছে! সবাই জোরজার করে ধরে রেখেছে। বাবা! বাবা!

মাথার সব উবে গেল সুরেনের। সে এসে দেখল নবর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে সবাই। হরিচরণ হাত-পা বাঁধছে। সে বলল, কী হল নব বাবা? তোমরা ওকে ছেড়ে দাও। আমি দেখছি।

আরও সব লোকজন ছুটে এসেছে। প্রায় রাজবাড়ি ভেঙে। নব মাথা ঠুকছিল দেয়ালে। আমাদের ইজ্জত সব কেড়ে নিচ্ছে কেন। কেন, কেন? কপাল থেকে রক্ত পড়ছে। তারপরই সে কেমন হাত ছুড়ে বলল, খুন হবে, খুন। একটা খুন হবে। বলতে বলতে সে ছুটে রাজবাড়ির দেউড়ি পার হয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

অতীশ চেঁচামেচি শুনে বারান্দায় বের হয়ে এল। দেখল কিছু লোক দেউড়ির দিকে ছুটে যাচ্ছে। সে দেখল কুম্ভবাবুর ভাইরা, দাম্বুবাবু তার ছেলেমেয়ে, ওদিক থেকে আসছে। সে বলল, কি হয়েছে নিমু।

—সুরেনের ছেলেটা বোধ হয় আত্মহত্যা করতে গেল।

—কোথায় গেল?

—রাস্তায়। গাড়ির তলায় চাপা পড়ে মরবে বলছে।

—কি হয়েছিল?

—চাকরি পাচ্ছে না। কাল নাকি সারা দিন ভি আই পিতে দাঁড়িয়ে গাড়ি গুণেছে।

এইসব অশুভ খবর অতীশকে খুবই বিড়ম্বনায় ফেলে দেয়। সে বুঝতে পারে না, সুরেন এতদিন এই বাড়িতে কালাতিপাত করেও কেন ছেলের একটা কাজ সংগ্রহ করতে পারে না। সে দেখল তখন সুরেনও ফিরে আসছে। অতীশ ওপর থেকেই বলল, পেলে?

—না। সুরেন মাথা নীচু করে চলে যাচ্ছিল। মানুষের সন্তান কত প্রিয়—এই মানুষটারও তাই। চোখ মুখ শুকনো, বিপর্যস্ত এক মানুষ সুরেন। সে যদি এখন ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় তবু যেন তার সাতখুন মাপ। সে বলল, তুমি একবার দেখা কর সুরেন।

সে বলল, এখন ত হবে না বাবু। অফিসের টাইম হয়ে গেছে। পরে যাব।

আসলে মানুষ সেই কবে থেকে ক্রীতদাস পালন করে আসছে। তার থেকে মানুষ এখনও মুক্তি পায়নি। সুরেন এখন ক্রীতদাসের ভূমিকা পালন করছে। তার নিজের মরার সময়টুকু নেই। ঠিকমতো হাজিরা না দিলে—কোনদিন একটা নোটিশ ধরিয়ে দেবে। তার লায়েক ছেলেটা কোথায় কি করছে এই মুহূর্তে তা নিয়ে ভাববারও সময় নেই। সবারই সন্তান-সন্ততি থাকে। তার নিজেরও আছে। সে কেমন নির্মম হয়ে গেল। সে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে থাকল। তারপর সুরেনকে ডেকে বলল, কোন দিকে গেছে বলতে পার?

সুরেন হতাশ গলায় বলল, মনু খানসামা লেন দিয়ে কোথায় চলে গেল।

অতীশের এই এক বিড়ম্বনা—কোথায় গেল বাপের কোন তাড়া নেই। সে কুম্ভবাবুর বাড়ির পাশে আসতেই দেখল, একটা জটলা। অতীশকে দেখে কেউ কেউ চুপ করে গেল। কুম্ভবাবু দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে। অতীশকে দেখেই বলল, আসুন দাদা, ঘরে আসুন।

—সুরেনের ছেলেটা নাকি চলে গেছে?

—আবার আসবে।

—বাসটাসের তলায় পড়ে নাকি মরবে বলছে।

—কতবার মরে এরা। সে-নিয়ে আপনার মাথা খারাপ করে কি হবে দাদা। আমরা কি করতে পারি। সরকারই কিছু করছে না। রাজাকে বললেও বলবে, দেয়ার ইজ গভমেন্ট, গো টু হিম। আমরা তো শোষণ করছি, আমাদের কাছে আর আসা কেন।

অতীশ এ-মুহূর্তে এই ছেলেটার জন্য আর কার কাছে যাবে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

সকালে উঠেই অতীশের কিছু লেখালিখি থাকে। লেখা নিয়ে নিবিষ্ট থাকতে হয়। আজ সকালে উঠে একটা লাইন লেখা হয়নি। বাড়ির জন্য মনটা কেমন উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। নির্মলা লিখেছে, টুটুলের জ্বর। বাবা নেই বলে মিণ্টুর মন খারাপ। সে স্ত্রী পুত্র ছেড়ে কোথাও এতদিন একা থাকেনি। সকালেই সে একবার তার কোয়ার্টার দেখতে গিয়েছিল। বড় বড় তিনখানা ঘর। সামনে লম্বা বারান্দা। রান্নাঘর বাথরুম। অন্দরের লাগোয়া ঘর। দরজায় দাঁড়ালে অন্দরের গাড়িবারান্দা দেখা যায়। সামনে সব বড় বড় পাতাবাহারের গাছ।

সবই ভাল—তবে খুব পুরানো বাড়ি বলে ঘরের পলেস্তারা সব খসে পড়েছে। এখন মেরামত হচ্ছে সব। মেঝের জায়গায় জায়গায় তাপ্পিমারা। উঁচু শিলিং। আগেকার আমলের ঘরবাড়ি যেমন হয়ে থাকে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব দরজা। মেরামত শেষ হলে হোয়াইট ওয়াস। তারপরই সে নির্মলাকে নিয়ে আসতে পারবে। শনিবারে ভেবেছিল বাড়ি চলে যাবে—কয়েকদিনেই সে এখানে কেমন হাঁপিয়ে উঠেছে। কেমন একটা বন্দী জীবন—সব সময় নিরাপত্তা বোধের অভাব। বিশেষ করে তার অফিসে বসলে সে এটা বেশি টের পায়। লুজিং কনসার্ন। প্রিন্টিং সেকেলে, গ্লেজ ঠিক আসে না। লিথো প্রিন্টিং এখন অচল। এই অচল কারখানার সে ম্যানেজার। কর্মীদের মাইনে দেখে সে খুবই অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল।

সবচেয়ে বেশি বেতন পায় প্রিন্টিংম্যান মণিলাল সেটা দু'শ টাকাও নয়। হেল-পারদের মাইনে সাতাশ টাকা। সাতাশ টাকায় কি হয়! সে একজন কর্মীকে ডেকে বলেছিল, তোর কে আছে? সে বলেছিল, কেউ নেই। সাতাশ টাকায় স্যার, কেউ থাকলে চলে না! ফুটপাথে থাকি। চা-পাঁউরুটি খাই। তারপর ও যা বলেছে তাতে সে আরও হতবাক হয়ে গেছিল। মাইনে পাবার দিনে শুধু ভাত খায়। মাইনে হলে সে কলের জলে ভাল করে স্নান করে নেয়। ঐ একটা দিনই তার প্রকৃতপক্ষে স্নান আহার। এ-সব শুনে সে আর বেশি কথা বলতে সাহস পায়নি। দেখলেই ভয় ধরে যায়। যে কোন মুহূর্তে এরা ওর শরীরে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিত পারে। তার এখন মনে হচ্ছে, সুরেনকে দেখা করতে বলে খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ করেনি। সে সুরেনের ছেলেকে একটা হেলপারের কাজ অবশ্য দিতে পারে। এতে সে তার নিজের বিরুদ্ধে আরও একজন শত্রু তৈরি করবে। তবু মনের মধ্যে কি থেকে যায় সুরেনের জন্য তার কষ্টবোধ বাড়ে।

অফিসে যাবার সময় এ-নিয়ে একবার কুমার বাহাদুরের সঙ্গে কথা বলল। যে কোন কারণেই হোক কুমার বাহাদুর অতীশকে অন্য গোত্রের মানুষ ভেবে থাকে। তিনি বললেন, ব্যালেন্সসীট দেখেছ?

অতীশ বলল, দেখেছি।

—এরপর লোক নেওয়া ঠিক হবে কিনা ভেবে দেখ।

অতীশ কেমন শিশুসুলভ হাসিতে বলল, একজন নিলে আপনার আর কত ক্ষতি হবে দাদা।

কুমার বাহাদুর জানেন, অতীশই এমনভাবে কথা বলতে পারে। তিনি বললেন, তোমার কারখানা, যা ভাল বোঝ করবে।

অতীশ বাইরে এসে দেখল, সুরেন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। সে তাকে বলল, কাল তোমার ছেলেকে পাঠিয়ে দিও। কিছু একটা হয়ে যাবে। কুম্ভবাবু পাশের চেয়ারে বসেছিল। সে কথাটা শুনে চোখ কেমন ছোট করে ফেলল। অতীশের মাথা হেঁট করে কুমার বাহাদুরের ঘরে সে অবশ্য যেতে পারে না। তার সম্বল তার বাপ রাধিকাবাবু। কাবুল আর প্রাইভেট অফিসের স্যার—সনৎবাবু। সনৎবাবুকে সে গিয়ে চুপিচুপি বলল, স্যার অতীশবাবু সুরেনের ছেলেকে কারখানায় কাজ দেবে বলেছে। আপনি জানলেন না, আপনাকে না জানিয়ে এটা হচ্ছে। আমি নিজেই এতে অপমান বোধ করছি।

সনৎবাবু দলিলের কপি মেলাচ্ছিলেন বসে বসে। পাশে একজন সেরাস্তাদার। এই কপি নিয়ে আজই উকিলের কাছে ছুটতে হবে। সব বস্তি অঞ্চলটাকে একটা পাবলিক লিমিটেডে কেস দেওয়া হচ্ছে। বছরকার রেভিনিউ স্ট্যাম্প জুডিসিয়েল স্ট্যাম্প সব জমা থাকে। সবই বেক ডেটে করা হচ্ছে। রেজিস্টারকে বড় রকমের ঘুষ দিলেই বাকি কাজটা হয়ে যাবে। এ-সব খুবই নটঘটে কাজ। দলিল দস্তাবেজ ঘাঁটতে ঘাঁটতে মাথা খারাপ ঠিক এই সময়ে এমন খবরে তিনি খুবই চটে গেলেন। বললেন, অতীশকে ডাক।

কুম্ভবাবুর বাপ রাধিকাবাবু পাশের টেবিল থেকে উঠে এসে বলল, স্যার এখন না। আগে কুমারবাহাদুরের সঙ্গে কথা বলুন। মনে হয় অতীশ কুমারবাহাদুরের সঙ্গে কথা বলেই করেছে। ওখানে ঠিক না করে, অতীশকে বললে ভুল করবেন।

পরদিন সকালে অতীশকে এসে সুরেনই ডেকে নিয়ে গেল। রাস্তায় অতীশ বলল, ছেলেকে পাঠিয়ে দিও কিন্তু। কাল শুনলাম রাতে ফিরে এসেছে।

—যাবে বাবু। আপনি মা বাবা। একটু দেখবেন। আমার বড় আদরের ছেলে নব। জ্যাষ্ঠ সন্তান কার না আদরের হয় বলেন।

অতীশ কুমারবাহাদুরের ঘরে ঢুকেই দেখল তিনি একগাদা চিঠিপত্র নিয়ে ব্যস্ত। চিঠিগুলো তার খাস বেয়ারা সুরজিত কাঁচি দিয়ে মুখ কেটে রেখেছে। তিনি একটা করে চিঠি বের করছেন, আর লাল পেনসিলে টিক মেরে যাচ্ছেন। কোথাও সামান্য নোট করছেন কিছু। সে যে দাঁড়িয়ে আছে তিনি যেন খেয়ালই করছেন না। চিঠি দেখতে দেখতেই সহসা বললেন, সুরেনের ছেলেকে কাজ দেওয়া ঠিক হবে না। অতীশ কিছু বলতে যাচ্ছিল, তিনি ফের বললেন, কারো কারো ইচ্ছে নয় তার এখানে কাজ হোক। মাথা গরম ছোকরা, তুমি বিপদে পড়বে।

—কিন্তু কথা দিয়েছি।

—কথার দাম আমরা এখন ক'জন রাখতে পারি। সরকারই রাখতে পারছে না।

—এটা মানসম্মানের প্রশ্ন।

—সেটা আমাদের বাপ-জ্যাঠাদের আমলে ছিল।

অতীশ বলল, কতটা আর ও ক্ষতি করতে পারে?

—অনেক। আর তুমি এতটুকুতেই বিচলিত হলে চলবে কি করে? চার পাশে চোখ মেলে দেখ। রাস্তায় পাঁচিলের পাশে কত আঁস্তাকুড়। তুমি ভাঙতে

পারবে। বলেই তিনি বেল টিপলেন। দরজার পাশে অন্য কোন আমলা অপেক্ষা করছে। তাকে তিনি ডেকে পাঠালেন। অতীশ বুঝতে পারল, কুমারবাহাদুর এ-নিয়ে তার সঙ্গে আর কোন কথা বলতে চান না। তার চোখ মুখ কেমন লাল হয়ে যাচ্ছে। গায়ের রক্তে কোথায় যেন অসম্মানের কাঁটা বিজবিজ করছে। মগজের ঘিলুতে কেউ সূচ ফোটাচ্ছে। সুরেনকে কি বলবে! তার কেন জানি মনে হচ্ছে এটা আর্চির কাজ। আর্চির সেই প্রেতাত্মার প্রভাব। তার মাথার মধ্যে তক্ষুণি ঘণ্টাধ্বনি শুরু হল। সেই কবে থেকে সেটা হয়ে আসছে। সে ঘেমে যাচ্ছিল। কুমার বাহাদুর তার দিকে একবার চোখ তুলেও তাকায়নি। ভারি ঠাণ্ডা ব্যবহার। কেন এমন হয়! সেতো কারো প্রতি বিরূপ নয়, শত্রুতা করেনি। তবে কেন তাকে এভাবে বিড়ম্বনার মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারপরই শুনতে পেল সুদূর থেকে কারা যেন কিছু বলে যাচ্ছে—পৃথিবীতে সর্বত্রই আর্চিরা রয়েছে অতীশ ঘাবড়ে যেও না। দূরাতীত কোন গ্রহের মধ্যে জীবনের দেখা সেই তিন মহাপুরুষ যেন হাত তুলে দিয়েছেন—দেখল সেখানে ঈশ্বর, সারেঙসাব আর স্যালি হিগিনস—তাঁদের হাত সে দেখতে পেল অনেক উর্ধ্বে উঠে গেছে। মাথা নিচু করে সে ধীরে ধীরে অগত্যা বের হয়ে এল। তার এখন সত্যি আর কিছু যেন করণীয় নেই

॥ আট ॥

অতীশ অফিসে আজ ভাল করে কাজে মনোযোগ দিতে পারল না। ভারি অসম্মান এবং অপমানে সে কেমন প্রায় চুপচাপই ছিল। বিল ভাউচার এলে সই করে দিয়েছিল। পার্টির কাছে তাগাদার একটা লিস্ট পড়ে আছে। সে আজ টাকার জন্য কাউকে তাগাদা দেবার পর্যন্ত উৎসাহ পেল না। কুম্ভবাবু বাইরের ঘরে বসে সেল ট্যাকসের রিটার্ন করছে। সুপারভাইজার বলে গেছে বার্নিশ ভাল দেয়নি। পাঞ্চিং-এ রং চটে যাচ্ছে। ডাইস খারাপ হতে পারে—এসব কথাবার্তা কিছু এবং জানালা দিয়ে তাকালেই চোখে পড়ে সেই শিউলালের ঘর। সে কলপাড়ে বসে গা ঘষছে। পাশ থেকে জল নিচ্ছে লাইনবন্দী লোকেরা। সে সুরেনকে কিছু বলেও আসেনি। নব হয়ত আসবে। নব আসবে এই ভয়ে সে খুবই বিমর্ষ বোধ করছিল। আসলে সে সুরেনের মনে একটা প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছিল—সেই প্রত্যাশা সে পূরণ করতে এই মুহূর্তে অক্ষম। কেন যে বলতে

গেল নবকে পাঠিয়ে দিও। অথচ এই নিয়ে কুম্ভবাবুর সঙ্গে আলাপ করলে মনটা হাল্কা হতে পারে। দুবার কুম্ভবাবু তার ঘরে এসে একটু বসার তাল খুঁজছিল। কিন্তু চুপচাপ থাকায় বিল ভাউচার সই করিয়ে নিয়ে চলে গেছে।

আর সব কিছুতেই কেমন এক অস্বাভাবিক কিছু মনে হচ্ছে তার। শহরের মানুষ সে নয় বলেই হয়ত তার এসব খুব অস্বাভাবিক ঠেকছে। কমলের সঙ্গে কথাবার্তা তার কিছুটা ভূতুড়ে ব্যাপার মনে হচ্ছে। আসলে কি তার ভেতর বৌরাণীকে দেখার পরই কমল অবচেতন মনে এসে আশ্রয় করেছে। সে রাতে কি কমলকে নিয়ে কোন স্বপ্ন দেখেছিল। কমলের ব্যবহারও ভারি বিস্ময়ের মনে হয়েছে তার কাছে। এসব বনেদি বংশে ভাঙচুর হচ্ছে ঠিক, তাই বলে অন্দরে ডেকে নিয়ে যাওয়া! তার এখনও অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে ঘটনাটা। মানসদা না স্থরেন এবং ভ্রূণ হত্যা সবই কেমন রহস্যজনক। নব নাকি সারাদিন সারারাত ভি আই পিতে গাড়ি গোনে। মানুষের এমন নিষ্ঠুর পরিণতি শহরে না এলে যেন সে বুঝতে পারত না। সেই পাখিটা তাকে হণ্ট করছে। পাগলটা আজও দেখেছে একটা পালক বেঁধে লাঠিতে রাজাবাজারের দিকে বীর দর্পে হেঁটে যাচ্ছে। সে এই নগর জীবনের একজন মস্ত ব্যস্ত মানুষ যেন। সব কিছু আগ্রাহ্য করে কেবল হাঁকছে, দু ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর। কখনও বলছে, দম মাধা দম, পাগলা মাধা দম। তার কত কাজ। এক মুহূর্ত তার বসে থাকার সময় নেই। যেন সে চুপচাপ থাকলে, বসে থাকলে পৃথিবীটা রসাতলে যাবে।

আর এ সময়ই বাড়ির জন্য মনটা কেমন হাহাকার করে উঠল। নির্মলা থাকলে আজ তাকে সব খুলে বলতে পারত। সব অপমান তা হলে সেই পাগলের মতো সেও অগ্রাহ্য করতে পারত। প্রায় মাস হতে চলল—কাজটাজ কিছুটা বুঝে নিয়েছে। পার্টিরা আসছে। এবং সে এ কদিনেই টের পেয়েছে, এই পার্টিদের সঙ্গে কুম্ভবাবুর একটা গোপন লেনদেন আছে। কুম্ভবাবু সহজেই দশ-বিশ টাকা ট্যাকসি খরচা করতে পারে। বৌকে নিয়ে ট্যাকসি ছাড়া ঘোরে না। নামী রেস্তোরায় বৌকে নিয়ে প্রায়ই রাতের খাওয়া-দাওয়া সারে। বৌকে প্রায়ই নতুন নতুন শাড়ি গয়না কিনে দেয়। এমন অভিযোগ তার কানে এসেছে। লোকটাকে চোখে চোখে রাখতে বলেছে কেউ। কুম্ভবাবু নিজেও ভারি ফিটফাট থাকে। সামান্য মাইনেতে এটা কি করে সম্ভব সে বুঝে উঠতে পারে না। কস্টিং দেখা দরকার। সবটা বুঝে না নিতে পারলে সে আপাতত কাজটা করতে পারছে না। তার জন্য প্রাণপণে সে কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে চাইছে।

হলে কি হবে—সেই এক পাগল বার বার হাঁকছে—এবং এই হাঁক থেকেই সে বুঝতে পারে, লোকটা তার কোন গল্পের নায়ক হতে চলেছে। এ বাড়িতে ঢোকার দিন, যেন তাকে দেখেই পাগলটা হেঁকে উঠেছিল—অথচ তার মনে হয়েছিল অদৃশ্য কোন এক জগৎ থেকে সে হাঁকছে। এখন মনে হচ্ছে তার ভেতরে সব অপমানের জ্বালা এই পাগলটাই পারে নিঃশেষ করে দিতে। কারণ সে যখন লেখাতে দেখতে পায়, সেই মানুষ অবিকল উঠে এসেছে, তখন কেমন বিজয়ীর মতো তার উল্লাস—অহংকার অতীব এক তখন তাকে গ্রাস করে।

সে ক্যাশবুকের পাতা উল্টে যাচ্ছিল। কিছু ভাউচার এখনও ক্যাশবুকে রয়ে গেছে। ক্যাশবুকের সঙ্গে মিলিয়ে টিকমার্ক দিয়ে দিচ্ছে। ক্যাশ এখন থেকে তার কাছে আছে। কোম্পানির দায়িত্ব নেবার দ্বিতীয় দিনেই নির্দেশ এসেছে, ক্যাশ আগলানোর দায় তার। কারণ টিফিন এবং ট্র্যাভলিং-এ দেখা যাচ্ছে প্রতিদিন একটা বিরাট খরচের বহর। পার্টিদের ঘরে যাওয়া আসা কাজটা, টাকা আদায়ের কাজটা কুম্ভবাবু টিফিনের পরে করে থাকে। ট্রামের মানথলি কাটা আছে। টিফিনের পর তাকে আর পাওয়া যায় না। সে তখন প্রায় মুক্ত। ট্র্যাভলিং অ্যালাউন্স বাবদ সে রোজই পাঁচ-সাত টাকা এখান থেকে নেয়। সনৎবাবু বলেছেন, এ দিকটা দেখতে। পার্টিদের নাম চাইবে। মাঝে মাঝে ফোনে যোগাযোগ করবে। অর্থাৎ আকারে ইঙ্গিতে বিষয়টা যাচাই করে নিতে তাকে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু মুশকিল অতীশের মনে হয় এটা মানসিক নীচতার লক্ষণ। সে আজ পর্যন্ত কোন কাস্টমারকেই ফোন করে বলতে পারেনি, কুম্ভ যথার্থই পার্টির ঘরে গিয়েছিল কিনা।

এতে মনে হয় সে নিজেই পার্টির কাছে ছোট হয়ে যাবে।

এবং এই এক মাসে সে বুঝতে পারছে, কাজটার পক্ষে সে খুবই অনুপযুক্ত। কাজটার সঙ্গে তার মনের কোন মিল নেই। সাধারণ সব কাজই মানুষের একদিন একঘেয়ে ঠেকে—কিন্তু এখানে এসে মনে হয়েছে—সে জীবনে আর একটা বড় ভুল করেছে। তার তখনই কেন জানি ইচ্ছা হয় যদি কোথাও আবার শিক্ষকতার কাজ পায় চলে যাবে। কোন দূর গাঁয়ে। সেখানে থাকবে আদিগন্ত মাঠ, নদী ফুল পাহাড় উপত্যকা, এমন একটা জায়গায় তার চলে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সে জানে, আপাতত যা মাইনে পাচ্ছে, শিক্ষকতা করে সেটা সে উপার্জন করতে পারবে না। তাছাড়া নিরাপত্তাবোধের অভাবেও সে বিশেষ উদ্বিগ্ন। একটা লজঝড়ে কোম্পানির প্রায় সব দায়িত্বভার তার ওপর। টাকা আদায় কাঁচামাল

সংগ্রহ, পার্টির পেমেন্ট, সেল টেক্স, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড কন্ট্রিবিউশন সব জমা যথা-সময়ে দেওয়ার দায়িত্ব তার। সে বুঝতে পারে এটা এখন তার জীবনের বড় ফ্রন্ট। আর একটা ফ্রন্ট সেই প্রেতাত্মা। স্যালি হিগিনস যার সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, তৃতীয় ফ্রন্ট তার স্ত্রী-পুত্র এবং বাবা-মা। আর চতুর্থ ফ্রন্ট। সে নিজেই গলায় ফাঁসের মতো আটকে নিয়েছে—সেটা তার লেখা। সে বুঝতে পারে এখানে আজীবন তাকে চারটা ফ্রন্টে লড়তে হবে। আর তখনই আর একটা মুখ সুদূর থেকে ভেসে আসছে—সে আর কেউ নয়, বনি। সে একটা বোট দেখতে পায়। সেও এক গভীর গোপন ফ্রন্ট। বনি চঞ্চল বালিকার মতো পাটাতনে ছুটে বেড়াচ্ছে। কখনও হালে বসছে। কখন চাপাটি তৈরি করছে। ছোটবাবুকে খেতে দিচ্ছে। আর চারপাশে খুঁজছে যদি কোথাও এতটুকু ডাঙা চোখে পড়ে। শুধু হাহাকার সমুদ্র বাদে বনি কিছু আবিষ্কার করতে না পারলে বলছে, ছোটবাবু আমাদের কী হবে?

ছোটবাবুর তখন আশ্বাস, এই দেখ চার্ট। তিনি সব বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমরা এর বরাবর গেলে, ঠিক সান্তাক্রুজ দ্বীপ পেয়ে যাব। কোরাল সীতে সবচেয়ে কাছের দ্বীপ ওটাই। কম্পাসের কাঁটার দিকে লক্ষ্য রাখবে, যেন সউথ-ইস্ট ইস্টে বোটের মুখ ঘুরে না যায়।

তালে কি হবে?

আমরা তবে অজানা এক সমুদ্রে গিয়ে পড়ব।

তালে আমরা মরে যাব ছোটবাবু?

সেই মুখ কি করুণ আর অপার্থিব। বালিকার চোখ সজল হয়ে ওঠে। কতদিন থেকে তারা সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে। সেই কবে থেকে যেন। কোন দূর অতীতে মনে হয় বনি ডাঙার মানুষ ছিল। সেও। এখন সমুদ্রের সব রকমের হাহাকার দেখে বনি অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন শুধু ছোটবাবুর জন্য তার বেশি চিন্তা। ছোটবাবু এতটুকু মুখ ভার করে থাকলে, কাছে ছুটে এসে হাঁটু গেড়ে বসে।—এই ছোটবাবু বলে ছোটবাবুর থুতনি তুলে ধরে। বলে, বাবা সত্যি কি বলেছে বল! বাবা আমাদের সমুদ্রে ভাসিয়ে দিল কেন? সঙ্গে ক্রসটা দিয়েছে কেন? বাইবেল দিয়েছে কেন। আমরা কি কোন পাপ কাজ করেছি?

তিনি তো বনি আমাদের নামিয়ে দেবার আগে বললেন—সমুদ্রের অশুভ প্রভাবে পড়ে যেতে পারি সেজন্য ক্রসটা বোটে তুলে দিলেন, বাইবেল দিলেন। আসলে ছোটবাবু বলতে পারল না, আমরা আর ডাঙা পাব না। এই বোটেই

আমরা মরে পড়ে থাকব। মাথার কাছে বাইবেল থাকবে। ক্রসটা থাকবে। আমরা মরে গিয়ে আবার ভূত হয়ে না যাই—সেজন্য তিনি তাঁর ধর্মীয় কাজটুকু আগে থেকেই সেরে রেখেছেন। তারপরই ছোটবাবু দেখল সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সমুদ্র শান্ত। পারপয়েজ মাছের ঝাঁক ভেসে উঠবে। অতলে নীল গভীর জল। যতদূর চোখ যায় শুধু অসীম জলরাশি। ছোটবাবুর মনে হয়, এখুনি সেখানে কোন অতিকায় প্রাণী ভেসে আসবে। পাইলট মাছ দেখলেই বুঝতে হবে কোন নীল হাঙর সমুদ্রের অতলে ঘাপটি মেরে আছে।

বনি হাঁটু গেড়ে বসে আছে পাটাতনে। মাথার ওপরে বিশাল আকাশ। কোথাও এতটুকু মেঘ নেই। নক্ষত্রর সব ফুটে উঠছে একে একে। দূর থেকে ডানার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। লেডি অ্যালবাট্রস উড়ে গেছিল সকালে, সন্ধ্যায় ফিরে আসছে। ফিরে এসেই চুপচাপ হালটার মাথায় ঘাড় গুঁজে বসে থাকবে। আর অজস্র প্রশ্ন তখন বনির, এই এলবা ডাঙার খোঁজ পেলে। কতদূর গেছিলে? আমরা ঠিক যাচ্ছি তো। কোথাও জাহাজ জেলে নৌকা কিছু দেখলে?

ছোটবাবু পালের দড়িদড়া খুলে ফেলছিল। বনির চিৎকার তখন পরিত্যক্ত জাহাজটা সম্পর্কে, তখন একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছে। ওরা কোথায়? কত দূরে? বাবা কেমন আছেন?

ছোটবাবু পালের দড়িদড়া এক জায়গায় জড় করে রাখছে। সে পাটাতন খুলে দেখল অয়েল ব্যাগটা ঠিক আছে কিনা। সমুদ্র এমন শান্ত থাকলে ভয়ের কথা। সে যেন বাতাসের গন্ধে ঝড়ের অভাস পাচ্ছিল।

সে বলল, বনি জল, খাবার এখনও আমাদের মাসের মত মজুত আছে। দুই বুড়ো মনে হয় শেষদিকে নিজেরা কিছু খায় নি। অথবা বুড়োরা টের পেয়েছিল, জাহাজের পরিণতি এই হবে।

বনি বলল, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না। তুমি এখনও আমাকে সত্যি কথা বলছ না!

ছোটবাবুর ভারি অসহায় মুখ। তাঁর নির্দেশ আছে, বনি যেন জানতে পারে এক অজানা সমুদ্রে ছোটবাবুর সঙ্গে বনিকে ভাসিয়ে দেওয়া হল। এখন একমাত্র যেন দৈবই তাদের রক্ষা করতে পারে।

ছোটবাবুর এই অসহায় মুখ দেখলেই আর্চির সেই দৌরাত্ম্যের কথা মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে বনি কেমন হয়ে যায়। গায়ে নীলাভ ফ্রক, মাথায় নীলাভ চুল, সামনেই ডাঙা পাবে বলে সে বোটে উঠে এসেছিল। সে তার দামী দামী

পোশাক, পারফিউম সঙ্গে এনেছে। সন্ধ্যা নামার আগে সে একজন নারীর মতো সাজতে বসে গেল। ছোটবাবুকে কষ্ট দিলে সে নিজেই বড় বেশি ভেঙে পড়ে। তারপর প্লেটে খাবার, সামান্য জল। খাবার বলতে দুখানা চপাটি, দুটো সারডিন মাছ, এক গ্লাস জল, দুটো আলু সেদ্ধ। নিজের জন্য বলতে গেলে বনি কিছুই রাখেনি।

ছোটবাবু পালটা ভাঁজ করে সব গিয়ারের সঙ্গে ফেলে রাখল। কম্পাসের কাঁটা দেখে সে বুঝেছিল উল্টো হাওয়া বইছে। কেমন এলোমেলো হাওয়া। যদি পাল তুলে রাখে যতটা তারা এগিয়েছে, ঠিক ততটা তারা পিছিয়ে যাবে। এই ভেবে পাল খুলে দড়িদড়া নিচে রেখে সমুদ্র থেকে জল তুলে হাতমুখ ধুয়ে নিল। লোনা জলে শরীর মুখ করকর করে। সেটা শুকিয়ে গেলে একরকমের প্রসন্নতা বোধ করে ছোটবাবু। দুপুরে ওরা দুজনেই দড়িদড়া ধরে সমুদ্রে ডুব দিয়ে উঠে এসেছিল। বেশি ঘাম হলে তেষ্টা পায়। ডুব দিয়ে বুঝেছিল, ঘাম হচ্ছে না, তেষ্টাও কম পাচ্ছে। গত রাত্রে মনে হয়েছিল অতিকায় কিছু মাছেরা পাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু শেষ রাতে অন্ধকার ছিল বলে কিছুই টের পায়নি। আজ রাতে কি হবে কে জানে। একটা লম্ফ জ্বালা থাকে মাস্তুলে। কোন দূরবর্তী ওটাই জাহাজের এখন সংকেত। আর অজস্র প্রশ্ন তখন বনি এই যদি দূর থেকে কোন জাহাজ অথবা জেলে নৌকা তাদের দেখতে পায়! সে বলল, আগে লম্ফটা জ্বালিয়ে দাও। এত তাড়াতাড়ি খেতে দেবার কি হল! কত কাজ বাকি।

বনির চোখ ভারি বিহ্বল। ছোটবাবু বনির এই চোখ দেখলে আবিষ্ট হয়ে যায়। হাঁটু গেড়ে পাশে বসে দুহাতে জড়িয়ে ধরে চুলে মুখ ঘষতে থাকে। বনি ছোটবাবুর বুকে টুপ ওরে মুখ লুকিয়ে ফেলে। অতিকায় পাখিটা তখন হাওয়ায় পাখা ঝাপটায়।

কুম্ভ এসময় টেবিলে ঝুঁকে একবার উঁকি দিয়ে দেখল, মানুষটা ক্যাশবুকে ঝুঁকে আছে। সামনে ক্যাশবুক খোলা। বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল, চার-পাঁচটা চেয়ার সামনে। তার ভেতর দিয়ে মানুষটার মাথা মুখ হিজিবিজি মাকড়সার জালের মতো অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মাথা নিচু করে বসে আছে। কপালে অবিন্যস্ত চুল পাখার হাওয়ায় উড়ছে। বড়ই আবিষ্ট। বোধহয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে সব। কিন্তু পরে মনে হল, না, কিছুই দেখছে না মানুষটা। নেশায় বুঁদ হয়ে মানুষ বসে থাকলে যেমনটা হয় অনেকটা সেরকমের। খুব

কাহিল হয়ে গেছে। আজ যা বড় একখানা ল্যাং খেয়েছে তাতেই এই। সকাল থেকেই দেখছে খুব গম্ভীর। মুখে আশ্চর্য প্রসন্নতা থাকে সকাল থেকে, তা আর নেই। এই প্রসন্নতা সে সহ্য করতে পারে না। মুখে এমন একটা ধার্মিকভাব থাকে যে সাধুসন্ত ভাবতেও কষ্ট হয় না। এই ক্যামেফ্লেজটা লোকটার না ভাঙতে পারলে তার শান্তি নেই। সে পুলকিত বোধ করল। সে ভাবল উঠে একবার যায় কাছে। একটু দরদ দিয়ে কথা বলে। এই ভেবে সে উঠে এল। তারপর চেয়ারে বসে বলল, কাবুল আসবে যাবেন নাকি?

অতীশ কেমন ধড়মড় করে উঠে বসার মতো মুখ তুলে তাকাল।—অঃ আপনি!

—তবে কি ভেবেছিলেন!

—না, ভাবলাম···আসলে সে ভেবেছিল, নব বুঝি এসে গেছে।

—ঠিক প্লট ভাবছেন!

অতীশ বলল, ঐ আর কি!

—কাবুল আসবে। চাঙ্গোয়ায় যাব। যাবেন নাকি। কাবুল খাওয়াবে বলছে।

কাবুলবাবু কুম্ভর ছেলেবেলার বন্ধু। একসঙ্গে রাজপ্রাসাদে বড় হয়েছে। কুম্ভের বাড়িতে কাবুলবাবুর যেতে কোন নোটিশ লাগে না। এই মানুষটা যখন তখন চলে আসে এবং কুম্ভকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় যায়। সে কোন প্রশ্ন করতে পারে না। কারণ কুম্ভবাবুই বলেছে, কাবুল থেকে সাবধান থাকবেন। ও রাজবাড়ির এজেন্ট। ওর কাছে কোন বেফাঁস কথা বলবেন না।

অতীশ বলল, বিকেলে কাজ আছে। একটু কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় যাব ভাবছি।

—আপনার ঐ এক দোষ দাদা। জীবনটাকে বড় সিরিয়াসলি নিয়েছেন! সব ব্যাপারে অত সিরিয়াস হওয়া ভাল না। সকাল থেকেই দেখছি মুখ গোমড়া করে বসে আছেন।

—কখন মুখ গোমড়া করলাম।

—মুখ গোমড়া না করেন, মনটা প্রসন্ন নয় এটা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে।

অতীশ ক্যাশবুকটা বন্ধ করে সরিয়ে রাখল। বেল টিপে সুধীরকে ডাকল। সুধীর এলে বলল, চা কর। সে কেমন জড়তা কাটিয়ে ওঠার জন্য ফ্যানটা পুরো পাঁচে দিয়ে এসে আবার নিজের জায়গায় বসল।

দুটো ঘর থেকেই মেশিনের শব্দ কানে আসছে। তিন নম্বর শেডটা দূরে বলে তার মেশিনপত্রের আওয়াজ এখান থেকে পাওয়া যায় না। অতীশ শব্দ শুনেই টের পায় কোন মেশিনটা চলছে, কোনটা বন্ধ আছে। জাহাজের এঞ্জিনরুমে কাজ করে তার ভেতরে এই ইনস্টিংট গড়ে উঠেছে। আর তার জানালা থেকে রাস্তার ও-পাশের শেডের সবটাই প্রায় দেখা যায়। এই একমাসেই বুঝেছে, কর্মীরা সারাদিনে যা কাজ করে, ওভারটাইমে তার ডবল কাজ দেয়। কিছুতেই সে বুঝিয়ে-সুজিয়ে কারখানার উৎপাদন বাড়াতে পারেনি। যেখানে আট দশ হাজার কনটেনার তৈরি হয় আট ঘণ্টায়, কাজের লোকগুলি সামান্যতম আন্তরিক হলে একই সময়ে দ্বিগুণ কাজ দিতে পারে। আসলে ঘুণ ধরেছে—এই কারখানার দেয়ালে, দরজায়, যন্ত্রপাতিতে সর্বত্র ঘুণ। কাজের লোকগুলির শরীরেও ঘুণ ধরেছে। এভাবে চালালে, দু-চার বছরে কারখানা লাটে উঠবে। এই থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে তাকে কিছু একটা করতেই হবে। এবং যেটা এখন তার মাথায় বেশি কাজ করছে, সেটা হচ্ছে এদের বেতন বৃদ্ধি দরকার। এই বেতনে কোন মানুষের পক্ষে দুবেলা পেট ভরে খেয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব না।

কুম্ভ বলল, সকালে কুমারবাহাদুর কি বলল ?

অতীশ অকপটেই বলল, রাজি হলেন না।

—রাজি হলেন না মানে ?

—নবর কাজের জন্য বলেছিলাম। কাল বললেন, নাও। যদি দরকার মনে কর নাও। আজ সকালে ডেকে একেবারে উল্টো কথা বললেন।

কুম্ভ মনে মনে বেশ মজা পাচ্ছে। বলল, উল্টো কথা বলাই এদের স্বভাব। এরা বড় লোক দাদা। এরা টাকা ছাড়া কিছু বোঝে না।

সুধীর এসে বলল, চা নেই স্যার।

কুম্ভ ধমক লাগাল।—চা নেই তো আগে বলতে পার না কেন! দেখ্ সুধীর তোকে বার বার বলছি, কাজ ঠিক মতো করবি। তুই আছিস কি জন্যে! এখন চা এনে তারপর জল গরম করবি!

অতীশ ড্রয়ার খুলে টিফিন একাউন্টে দুটো টাকা বের করে দিল।—চা রাস্তা থেকে নিয়ে এস। এবার থেকে যেন ভুল না হয়।

সুপারভাইজার এসে দরজায় মুখ বাড়াল। দেখল কুম্ভবাবু ম্যানেজারের সঙ্গে গল্প করছেন। সে একজন কর্মীর অভিযোগ নিয়ে এসেছে। কর্মীটি হেল্পার,

বিটের কাজ জানে, এখন জরুরী দরকার পড়ায় তাকে বিটে বসতে হবে। কিন্তু সে রাজি না। তাকে বিটম্যান না করলে সে কাজে বসবে না বলছে।

অতীশ অভিযোগটি মন দিয়ে শুনল। তারপর বলল, আজকের মতো চালিয়ে দিতে বলুন। কাল এ-নিয়ে কথা বলব।

—কথা অনেকদিন ধরেই হচ্ছে। কোন ফয়সালা হচ্ছে না।

অতীশ বলল, আমি তো আজই শুনলাম। একটা দিন ত দেবেন।

কুম্ভ তখন বেশ জাঁকিয়ে বসে গেল। বলল, দাদা আসকারা দেবেন না। কারখানা জায়গাটাই খারাপ। আপনি যেই একজনকে লিফট দেবেন, অমনি দেখবেন পাতাল থেকে দশটা মুখ বার হয়ে আসছে। আপনাকে খাব খাব করছে।

অতীশ আগে এই সব সমস্যায় একটুকুতেই নিজেকে বিপর্যস্ত বোধ করত। এখন কিছুটা সয়ে গেছে। সে কুম্ভকে বলল, আপনি একবার ভেতরে যান। দেখুন বুঝিয়ে কিছু করতে পারেন কিনা। সঙ্গে সঙ্গে কুম্ভ উঠে চলে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সব ঠিকঠাক করে চলে এল। অতীশ ভাবল কুম্ভবাবুর ক্ষমতা আছে। সে দেখেছে কিছু কিছু শ্রমিক ওর খুব বাধ্যের। চার-পাঁচ বছর কুম্ভবাবু আছে। মাঝখানে ম্যানেজার ছিল না কুম্ভবাবুই চালিয়েছে সব। এতেই প্রভাব প্রতিপত্তি তার বেড়েছে। সে বলল, দেখুন তো কি ঝামেলা। এখন নব আসলে কি বলি!

—কি বলবেন আবার। সোজাসুজি না করে দেবেন।

—কিন্তু ওর বাবাকে আমি কথা দিয়েছি। আর এটা তো আমার খুশি মতো করিনি। কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েই করেছি। এখন আমার সম্মানটা থাকে কোথায়।

কুম্ভ ভীষণ রেগে গেছে মতো বলল, এতে শুধু আপনার সম্মান, কোম্পানির সম্মান যায় না! কর্তৃপক্ষের সম্মান থাকে। কান টানলে মাথা আসে না।

অতীশ বলল, কারা নাকি আপত্তি জানিয়েছে?

—কার দায় পড়েছে দাদা। একটা বেকার ছেলের কাজ হবে, তাতে কেউ বাধা দিতে পারে। ধর্মের ভয় নেই! আসলে কি জানেন দাদা, এরা সব পছন্দ অপছন্দ অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে খালাস। নিজেরা ধোওয়া তুলসীপাতা সেজে বসে থাকে। এদের আপনি একদম বিশ্বাস করবেন না। দেখছেন ত কাবুলটা এলে সব নিয়ে কথা হয়। বলতে কি খিস্তিখাস্তাও হয়। কিন্তু কারখানা নিয়ে একেবারে স্পিকটি নট।

কুম্ভর প্রতি অতীশের কেন জানি কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে গেল। যদিও মাঝে

মাঝে আশ্চর্য এক নিশুতি গন্ধ পায়, কুম্ভবাবুর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে সেই নিশি পাওয়া ভূতের গন্ধটা কেন জানি লেগে থাকে। আর্চির সেই হাঁ করা মুখ—মুখের ওপর ছোটবাবু ওপোর হয়ে পড়ে দেখেছিল লোকটাকে সে যথার্থই খুন করতে পেরেছে কিনা, আর তখনই ভক করে গন্ধটা এসে লেগেছিল নাকে। হাঁ করা মুখ থেকে একটা পচা গন্ধ বের হচ্ছে। ওর মাথাফাতা গুলিয়ে উঠতেই সিঁড়ি ধরে নেমে আসছিল। আর চারপাশে তখন কি গভীর অন্ধকার। চারপাশে জাহাজীদের হল্লা চিৎকার। এলিওয়ে ধরে কারা বোট ডেকে ছুটে যাচ্ছে। এনজিন রুমে বিস্ফোরণ! বয়লার-ফয়লার সব ছত্রাকার। সারা জাহাজে এক অতিকায় দুর্যোগ—ছোটবাবু দুর্যোগে পড়ে গন্ধটার কথা ভুলে গেছিল। পরে কিছুদিন সে সুস্থ স্বাভাবিক। কিন্তু সমুদ্রে ভাসমান বোটে বনির লুকনো মুখের দিকে তাকাতেই সে শিউরে উঠল। একটা ভুরভুর পচা গন্ধ আসছে কোথেকে! সে বনিকে শুকে দেখল—না সেখান থেকে উঠছে না। অতিকায় একটা সুরমাই মাছ তুলে রেখেছিল, ওর ভেতর থেকে লালা চুষে খাবে বলে—সেটা পচে যেতে পারে, সে তাড়াতাড়ি মাছটার কাছে চলে গেল—না আঁষটে গন্ধ, পচা গন্ধটা নেই। লেডি আলবাট্রসও বোটে নেই—তবে গন্ধটা আসছে কোথেকে। যেন চেনা চেনা গন্ধ। একবার এই গন্ধে তার মাথাফাতা গুলিয়ে উঠেছিল—সেটা কবে কখন, ঠিক সেই গন্ধ, ঠিক তক্ষুনি মাথায় ঘণ্টা ধ্বনি, যেন সেই অ্যাবট অফ অ্যাবট ব্রথক—নিরন্তর ঝড়ের রাতে ঘণ্টা ধ্বনি করে চলেছে, ছোটবাবু তুমি আর্চিকে খুন করেছ। সে তোমাকে ক্ষমা করবে না। তাহলে কি সেই প্রেতাত্মার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গন্ধ। সে কাছেই রয়েছে। সে তার প্রতিশোধ নেবে বলে এই বিশাল দিগন্ত প্রসারিত জলরাশির ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। ছোটবাবু চিৎকার করে উঠেছিল, গড সেভ আজ। সেভ আজ ফ্রম অল ট্রাবলস। বনি টের পেয়ে বলেছিল, ছোটবাবু ক্রসটা আমার মাথার কাছে এনে দাও। ওটা ছুঁয়ে বসে থাক। কোন অশুভ প্রভাবে আমরা তবে পড়ে যাব না। কুম্ভবাবু কাছে এলে মাঝে মাঝে সেই গন্ধটা কেন জানি নাকে এসে লাগে।

কুম্ভবাবু বলল, চলুন ঘুরে আসি। মনটা ভাল হবে। কাবুল আমাদের খাওয়াবে বলছে। ও গাড়ি নিয়ে আসবে।

অতীশ কোন জবাব দিল না।

তারপর ভারি বিশ্বস্ত মানুষের মতো বলল, জাহাজে ত শুনেছি সবাই সব খায়। গরু বাছুর মেয়েছেলে মদ। আপনি খাননি।

অতীশ চেয়ারে মাথা এলিয়ে দিল। তারপর হাতটা মাথার ওপর ছড়িয়ে বলল, জাহাজে সবই চলে।

—তবে আপনি যেতে চাইছেন না কেন। আপনার তো প্রেজুডিস থাকা ঠিক না।

—তা অবশ্য নেই। তবে এখন ভুলে গেছি সব।

তখনই ফোনটা বেজে উঠল, হ্যালো হ্যালো। হ্যাঁ মিঃ ভৌমিক বলুন। কি খবর! মাল কাল যাবে না। তারপর অতীশ ক্যালেণ্ডারের পাতা দেখে বলল, বুধবার পাবেন।

—বহুৎ ঝামেলা হো জায়গা বাবুজী। থোড়া জলদি করিয়ে।

—জলদিই করছি।

—বাবুজী সিজন টাইম আছে। থোড়া মেহেরবানী করিয়ে।

—আরে এতে মেহেরবানী করার কি আছে।

তখনই কুম্ভ বলল, রামলাল?

অতীশ ঘাড় কাৎ করল।

—হাজার তিনেক টাকা আরও অ্যাডভান্স চান।

অতীশ কোন অ্যাডভান্সের কথা বলল না। সে ফোন ছেড়ে দিল। কুম্ভের ভেতরে তখন একটা জেদী চিতাবাঘ ওৎ পেতে থাকে। অতীশ আসার পর সব সময় থাবা উচিয়ে বসে থাকে। যেন অতীশ খুবই একটা ভুল করে ফেলেছে! তার কথার কোন গুরুত্ব দেওয়া হল না। সে কি নিজের জন্য এটা করছে! ফোন নামাবার সঙ্গে সঙ্গে বলল, অ্যাডভান্সের কথা কিছু বললেন না।

—ওর তো অনেক টাকা অ্যাডভান্স পড়ে আছে। শোধ দেবো কি করে।

—আপনি কি মনে করেন, লোকটা এমনিতে লোটা কম্বল নিয়ে কলকাতায় এসেছে। ধান্দা নেই। এমনিতেই দশ-বার হাজার টাকা ফেলে রেখেছে। কোন ধান্দা নেই। মেহেরবানী করেন বলে, অথচ কোন ধান্দা নেই।

—আপনিই যে বলেছেন, লোকটা দুঃসময়ে কোম্পানিকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

—বাঁচিয়ে রেখেছে কেন? আখের না থাকলে সে বাঁচাতে আসবে কেন। আর কারখানা নেই, আর মাল সাপ্লাই করার লোক নেই।

অতীশ এসব কথার জবাবে কি বলবে! এই মানুষটাই রামলালকে একদিন সঙ্গে নিয়ে এসে বলেছিল, রামলাল ছিল বলে আপনি কোম্পানির ম্যানেজার হয়ে আসতে পেরেছেন। না হলে কবে লাটে উঠে যেত। বিপদে-আপদে শেঠজী

আমাদের রক্ষা করে আসছে। সেই শেঠজীকেই কুম্ভবাবু এখন ধান্দাবাজ বলছে। লোকটার মতি-গতি অদ্ভুত রকমের। সে কুম্ভবাবুর হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য বলল, পরে এক সময় বললেই হবে।

—দাদা, ঐতো মুশকিল। তপ্ত কড়াইয়ে তেল ঢালবেন না, ত কী হবে! ওর চাপ আছে আপনিও চাপান দেবেন। দেখবেন সুড়সুড় করে টাকা নিয়ে হাজির।

কিন্তু তার মাথায় এখন আর কুম্ভবাবুর কথা ঢুকছে না। সে সেই কুষ্ঠ রুগীর ঘরটার দিকে তাকিয়ে আছে। জানালা দিয়ে দেখা যায় শিবলাল রকে বসে পায়ে ন্যাকড়া জড়াচ্ছে। তারপরই একটা মেয়েছেলে এসে তাকে খাবার দিয়ে যায়। শিবলাল ঘরের মধ্যে আসন পেতে খাবে। ঘরটায় সে একবার উঁকি দিয়ে দেখেছিল। দেয়ালে রাজ্যের ক্যালেণ্ডার। সবই রাম সীতার ছবি। এবং একপাশে আরও একটা ছবি—বৈজয়ন্তীমালা। প্রায় উলঙ্গ হয়ে আছে মতো। জলে নেমে সাঁতার কাটছে। ঘরের মধ্যে আসবাব বলতে কাঠের একটা বাক্স, কাঠের পাটাতনে বিছানা পাতা এবং ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত কিছু কাঁথা বালিশ। সম্বল বলতে তিনটি রিকশা তার ভাড়া খাটে। বাইরে বিকেলে বসে থাকে। সামনে থাকে জলচৌকি সেখানে ভাড়ার পয়সা কড়া ক্রান্তি গুনে নেয়। সন্ধ্যা হলে, সে রাস্তার আলোতে তুলসীদাসী রামায়ণ সুর ধরে পাঠ করে। সকালের দিকে দেখেছে, সে প্রত্যেক ভিখারীকে দুটো করে পয়সা দেয়। কাউকে ফেরায় না। যে মেয়েটি রেঁধেবেড়ে খাওয়ায় কুম্ভবাবু বলেছে যুবতীকে সে রক্ষিতা রেখেছে। এসব ভাবতে গিয়ে অতীশের মনে হল, মানুষের বেঁচে থাকার মতো বড় কিছু নেই। তার এত ভালমানুষ না হলেও পৃথিবীর কোন ক্ষতি নেই। আসলে সে ভালমানুষ, না কাপুরুষ। সব তাতেই ভয়। কি যেন তার হারিয়ে যাবে বলে ভয়। সেই ভয় থেকেই যত গন্ধ নাকে এসে লাগে। নিজেকে অতীশ শক্ত করতে চাইল। বলল, কখন যাবেন?

কুম্ভ বলল, কোথায়?

—এই যে হোটেল যাবেন বলছেন।

—আপনি যাবেন ত। গেলে কাবুল খুব খুশী হবে। ওর বৌদির আপনি খুব পিয়ারের লোক। এখন আপনাকে তেল দেবার জন্য রাজবাড়ির সব চোর ছ্যাচোড়েরা উঠে পড়ে লাগবে।

অতীশ এমন কথায় কিঞ্চিৎ বিরক্ত হল। এর ভিতর কমলকে টেনে আনা

কেন তা ছাড়া কমল সম্পর্কে তার শৈশব থেকেই একটা দুর্বলতা আছে। কমলকে নিয়ে কেউ কিছু বললে সে অপমানিত বোধ করে। কুম্ভবাবু আরও দু একবার জানার চেষ্টা করেছে, কি কথা হল বৌরাণীর সঙ্গে। কিছু বলল ?

অতীশ বলেছিল, কিছু বলেনি। এমনি কথাবার্তা হয়েছে। কেমন লাগছে এই শহর। কোন অসুবিধা হচ্ছে না ত। এই সব আর কি।

—আর কিছু না।

—না।

—তা কটা কথা বলতে এত সময় লাগে!

—আর কি কথা হতে পারে বলে আপনার ধারণা।

—কত কথা হতে পারে। আমরা বাইরের লোক কি করে জানব। তবে দাদা সাবধান থাকবেন। লক্ষণ ভাল বুঝছি না। যারাই রাজার পেয়ারের লোক হতে গেছে তারাই মরেছে।

অতীশ বুঝতে পারছে না এরা সবাই রাজবাড়িতে জন্মেছে বড় হয়েছে, এদের কারো কারো তিন পুরুষ চার পুরুষ এই বাড়ির খেয়েছে, পরেছে, কেউ কেউ চুরি চামারি করে নিজেরাও ছোটখাট রাজা বনে গেছে—এবং এই যে কুম্ভবাবু এদের রক্তে এবাড়ির নিমকের গন্ধ শুঁকলেই পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রথম থেকেই কুম্ভ কেমন বেপরোয়া। যেন সে পারলে গোটা রাজবাড়িটাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আসলে তার আসার জন্য এটা হয়েছে কিনা কে জানে। সে এজন্য কেন জানি এখন থেকেই কুম্ভবাবুকে সামান্য তোয়াজ করতে শুরু করেছে। তা না হলে কমলের সঙ্গে দেখা হবার পর তাকে সাহস পায় কি করে প্রশ্ন করার। সেই বা এ নিয়ে কথা বলে কেন! তার তো বলা উচিত ছিল বৌরাণীর সঙ্গে কি কথা হল, আপনার জানার কি দরকার। অথবা সে এড়িয়ে গেলেই পারত। তারপরই মনে হল, অফিসের কাজে কর্মে সে এই লোকটার ওপর নির্ভরশীল। এই মৌকায় লোকটা তাকে পেয়ে বসেছে। কাবুলবাবু এলে সে সোজাসুজি বলল, আপনারা যান। আমার সময় হবে না।

কুম্ভ বলল, এই দাদা সাহস। আপনার বৌমা বলল, দাদাকে কিন্তু সঙ্গে নেবে।

অতীশ আঁতকে উঠল। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ কুম্ভবাবু। অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে তার বৌ। বছরখানেক হল বিয়ে হয়েছে। গর্ভবতী। মাস তিন-চার বাদে কুম্ভবাবুর স্ত্রী জননী হবে। সেই জননীও যাচ্ছে সঙ্গে। তার মুখ থেকে রা সরছিল না।

কাবুল বলল, রোজ তো হয় না। দাদা বৌদি রোটারি ক্লাবে গেছে। ওদের পার্টি আছে গ্র্যাণ্ডে। আমরাও তিনজনে মিলে ছোটখাট একটা পার্টির আয়োজন করছি। আপনি আমাদের গেস্ট।

অতীশ অগত্যা আর যেন কিছু বলতে পারছে না। সে ওদের পিছু পিছু উঠে গেল। কুম্ভবাবু সুপারভাইজারকে ডেকে বলল, কেউ যদি ফোন করে বলবেন কাজে বের হয়েছি। আমরা আর ফিরব না। ট্রাম রাস্তায় গাড়ি রেখে এসেছে। কাবুলবাবু। গাড়ির পাশ থেকেই হাসিরাণী দরজা খুলে দিল। দারুণ সেজেছে। ঠোঁটে প্রচণ্ড লাল লিপস্টিক নখে রুপোলি নেল পালিশ, দামী শিফনের শাড়ি হাতে মীনা করা বালা। বগল খালি করে হাত তুলে বলছে, আপনি এখানটায় বসুন দাদা।

অতীশের কেন জানি মনে হল হাসিরাণীকে আজ হোক কাল হোক একটা লক্ষ্মীর পট তার কিনে দেওয়া দরকার। শরীরে বড়ই কামুক গন্ধ।

॥ নয় ॥

চার্চের ঠিক সামনে সেই পাগল। গায়ে কিম্ভূতকিমাকার পোশাক। ছেঁড়া তালিমারা উচ্ছিষ্ট জামা পাতলুনে ঢাকা শরীর। নোংরা। গালে দাড়ি। চোখ কোটরাগত। বগলে বোঁচকা। হাতে দমমাধা দমের লাঠি। ন্যাকড়া জড়ানো পালক বাঁধা। একটা লম্বা দাঁত ঠোঁটের ফাঁকে বের হয়ে ঝুলছে। সে বিকেল থেকেই উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। আর কেবল হাঁকছে দম মাধা দম পাগলা মাধা দম।

এখন চার্চের সামনে দাঁড়িয়ে সে মাথায় রুমাল বাঁধছে। মাথার ওপরে কাক উড়তে দেখে ভয় পেয়ে গেছে। কারণ এরা বড়ই তাকে ঠোকরায়। তার এখন শত্রুপক্ষ বলতে শহরে এরাই। আর সব মেরে এনেছে। কুকুর বেড়াল সে ঠেঙিয়ে সব তাড়িয়েছে। হাতের লাঠিটা জাদুমন্ত্রের মতো। সে ডাস্টবিনের পাশে ঘোরাফেরা করলে ভয়ে আর কেউ ত্রিসীমানা মাড়ায় না। কিন্তু কাকেদের বেলায় তার জারিজুরি খাটে না। এরা কোত্থেকে এসে সব ছোঁ মেরে তুলে নেয়। এসব কারণে তার মাথা গরম। সে গাছে উঠে কাকের বাসা দেখলেই ভেঙে ফেলে। কদিন ধরে সে এই কাজটা খুব মনোযোগ সহকারে করে যাচ্ছে। আজ সকালে দুটো অশ্বত্থ গাছ এবং দেবদারু গাছ খুঁজে সাতটা কাকের বাসা ভেঙেছে। আর সেই থেকেই কাকের তাড়া থেকে বাঁচবার জন্য। চার্চের কার্নিশের মধ্যে

কিছুক্ষণ লুকিয়েছিল। সে কফিনটায় শুয়ে থেকে দেখেছে মরে গেলে সে কতটা লম্বা জায়গা নেবে। খুব বেশি না। মরে গেলে তার এ জায়গাটুকুর অভাব হবে না বুঝেই বের হয়ে এসেছিল। মনে ভারি অশান্তি। তখনই দেখল একটা কাক আবার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। মাথা ফাতা ঠুকরে না দেয়, ঠুকরে ঘিলু তুলে না খায়, খেলেই মাথাটা ফাঁকা হয়ে যাবে। বড় ভয় তার ফাঁকা মাথা নিয়ে আর যাই করা যাক এমন চোর-জোচ্চোরের শহরে ঘোরাফেরা করা যায় না। কখন তবে কে তার সর্বনাশ করে বসবে। তার একটু সতর্ক থাকা দরকার। এবং এখন একমাত্র কাজ দামী মস্তিষ্ককে রক্ষা করা। এর মধ্যেই ঘিলু পোরা আছে। কাকেরা মস্তিষ্কের ঘিলু খেতে খুব ভালবাসে। প্রথমে রুমাল, পরে গামছা তারপর বোঁচকা বুঁচকির যত সংগ্রহ করা ন্যাকড়া সব মাথায় পেঁচিয়ে ওটাকে ঢাউস কুমড়ো পটাস বানিয়ে ফেলল।—খা শালারা, কত খাবি খা। কত ঠোকরাবি ঠোকরা। ও বাপ এই ব্রহ্মতালু ভেদ করা আর তোগো কম্ম নয় বাপ। মাথাটা ভারি নিরাপদ ভেবে সঙ্গে সঙ্গে ছুটো ডিগবাজি।

একটা ডিগবাজি খেতেই স্বাদ পেয়ে গেল। চোখ ঘুরে যায় উল্টে যায়, মাথা ঘুরে যায়, বড়ই নেশার মতো লাগে। সে পর পর ডিগবাজি খায়। কাঠের দেয়াল পার হয়ে ডিগবাজি খায়, ট্রাম লাইন ফাঁকা পেয়ে সে সম্রাট সিজার হয়ে যায়। সবই তার দখলে। সে সেখানেও ডিগবাজি খায়। তারপরই অগুনতি বাসের ভিড় জটলা। কারা তেড়ে আসে সে দৌড়ে যায়। যেন বলে, আমার কোন ভোগ দখলের স্পৃহা নেই বাপু, সব তোদের দান করে দিলাম। যা এবার লুটে পুটে খা।

তারপর সে আর যানবাহনের জন্য মানুষের জন্য প্রতীক্ষা করছিল না। এখন এক পাগলিনীর জন্য তার প্রতীক্ষা। তার আসার কথা। সে তার জুড়িদার এই শহরে। সকাল থেকেই দেখছে না। সে কাছে থাকলে সাহস পায়। তার মনোযোগ বাড়ে। আকর্ষণ বাড়ে। মারামারি করতে পারে। মনুষ্যকুলে এই একজনই তার বলতে গেলে সম্বল—যার সঙ্গে মিনি মাগনায় শুতে পায়। কখনও খেতে পায়।

বর্ষাকাল, অথচ কদিন বৃষ্টি নেই। খাঁ খাঁ শুকনো আকাশ। প্রখর উত্তাপ। প্রখর উত্তাপে তার সঙ্গিনী গায়ে জামা কাপড় রাখতে পারে না। নগ্ন থাকে।

কতবার সে কোমরে গামছা বেঁধে দিয়ে বলেছে—ঢেকে ঢুকে রাখ, কাকের উপদ্রব বেড়েছে। ওটা ঠুকরে তুলে খেলে মজা বুঝবি।

ঠিক তখনই চার্চের সামনে এক শববাহী শকট। কাচের ভেতরে কালো বোরখা পরা বিবির মতো কফিনটা লম্বা। সোনার ঝালরে ঢাকা। কত তাজা ফুল সুগন্ধ আতর! সে জোরে জোরে নাক টেনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল। ধূপকাঠি পুড়ছে। শোকের পোশাকে কিছু যুবক যুবতী। কালো পোশাক পরা সাদা চুলের সেই লোকটা সিঁড়ি ধরে উঠে যাচ্ছে। হাতে একটা বই। তারই মতো জোব্বা গায়ে দেওয়া। মরা মানুষ এলেই সে দেখেছে এই লোকটা আসে। খুব মান্যিগণ্যি পুরুষ। মরামানুষের কফিনটাকে তুলে নিয়ে যায় কারা। সে তখন গম্ভীর গলায় হেঁকে উঠে বলে—কে আসবি আয়, সংক্রান্তির মাদল বাজছে আয়। তারপরই অশ্লীল গালাগাল—লে বাবা তোর সুখ পুটলিতে লিয়ে এলি না বাপ। যাবি যখন সব লিয়ে যাবি না। শেষে কি বিড়বিড় করে বলতে থাকে—লে বাবা, শালার কিছুই সঙ্গে গেল নাকো। একেবারে ফক্কা। তারপরই ভেউভেউ করে কান্না ওখানটায় গিয়ে তোরে কে দেখবে গ। তোর সঙ্গে কেউ গেল না, কি হবে গো!

যাতায়াতের পক্ষে বড়ই বিঘ্ন এই পাগল। ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা পর্যন্ত দায়। কে একজন হেঁকে উঠল, এই উজবুক, ওঠ রাস্তা থেকে। গাড়ি চাপা পড়বি তো। রাজার বাড়ি থেকে গাড়ি বের হচ্ছে। কোটিপতি মানুষের বৌ যাচ্ছে গাড়িতে সেই গাড়িটা পর্যন্ত ছোঁয়াচে পড়ে যাবে ভেবে পাগলকে মাঝ রাস্তায় বাঁচিয়ে চলে যায়। তখন দিগ্বিজয়ী বীরের মতো হাসে—হা হা হা। জয় জয় হে। জয় দাও প্রভু, কৃপানাথের। জয় রাজা হরিশ্চন্দ্রের। সে কোঁচড় থেকে এক এক করে বাতাসে উড়িয়ে দেয় পাখির পালক। এক মরা কাকের ছানাও সে উড়িয়ে দেয় হাওয়ায়। ওটার গন্ধেই কাকগুলি তার পিছু তাড়া করছিল। সে এতক্ষণে এটা টের পেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাথায় জড়ানো বোঁচকাবুঁচকি খুলে দেখতে থাকল পাগলিনী একটা ভাঙা ঠেলাগাড়ির নিচে শুয়ে সব দেখছে আর মুচকি হাসছে। তারপর কি ভেবে উঠে এক দৌড়। পাগলিনী সেই ছানাটা হাতে দুলিয়ে যেন বাজার করে ফিরছে মতো ঠেলাগাড়ির নিচের আস্তানায় গিয়ে ঢুকে পড়ল।

কবে কোন এক বুড়ো নির্জীব ঠেলাওলা ওটা রাস্তার ধারে ফেলে চলে গেছিল। ছেঁড়া ত্রিপল ফেলে চলে গেছিল। পাগলিনী ভারি মজা ভেবে ঠেলাগাড়ির ওপরে দৌড়াদৌড়ি করেছে কতদিন। তারপর ওটা আরও ওপরে তুলে নিয়ে রাজবাড়ির পাঁচিলের পাশে উঁচু মতো জায়গা দেখে ফেলে রাখল। বড়ই পরিত্যক্ত ভূমি।

সব আবর্জনার আঁস্তাকুড় জায়গাটা। এখন সেটা আশ্রয় তার। সে রোদ বৃষ্টিতে তার নিচে শুয়ে থাকে। ঘুমিয়ে থাকে। ত্রিপলটা দিয়ে ঢাকা বলে কেউ দেখতে পায় না গাড়ির নিচে বসে সে কি করছে। কি খাচ্ছে।

কাকগুলি এখন আর সেই পাগলের মাথায় নেই। পাগল হরিণ নিশ্চিন্তে হেঁটে গিয়ে সেই দেবদারু গাছটার নিচে বসল। পোড়া বিড়ি বের করল ঝোলাঝুলি থেকে। কাকের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে তার রাজ্য জয়ে বের হবার ইচ্ছা। বের হবার আগে দম নিচ্ছে বসে বসে।

তখনই বাস ট্রামের লোকজন দেখতে পেল কাকেরা যুদ্ধ বাধিয়েছে। ঝাঁকে ঝাঁকে কাক উড়ে এসে সেই ত্রিপলে ঢাকা পরিত্যক্ত ঠেলাগাড়িটায় ঝাপটা মারছে। ঠোকরাচ্ছে। নিশ্চিন্তে কেউ নিচে বসে কাকের ছানার পালক ছাড়াচ্ছে লোকজনরা কেউ আর টের পাচ্ছে না। এমন একটা কাকেদের যুদ্ধ—প্রায় যেন পঙ্গপাল নেমে আসছে, আকাশ কালো হয়ে গেছে, দুনিয়ার সব কাক মানুষের ইতরামিতে অতিষ্ঠ হয়ে যেন শহর আক্রমণ করতে আসছে। আশেপাশের বাসিন্দারা তো ভয়ই পেয়ে গেল। মন্ত্রিসভায় তখন বৈঠক চলছিল, পুলিশ তখন খবর দিল, স্যার কাকেরা শহর আক্রমণ করছে। এই খবরে দমকলবাহিনীকে ছুটে যেতে বলা হল। খবরের কাগজ থেকে সাংবাদিক ছুটল। সঙ্গে ফটোগ্রাফার। বড় বড় হরফে ছাপার জন্য বার্তা সম্পাদক কি হেড-লাইন করা যায় ভাবতে ভাবতে পায়চারি শুরু করে দিল। জনগণ খবরটা খাবে। কিছুদিন থেকে খবরের বড় আকাল চলছে। এখন পাল্লা দিয়ে মজাদার হেড-লাইন না করতে পারলে কাগজ কাল সকালে মার খেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন সালে এই কাকের আক্রমণ ঘটেছিল, কাকের সংখ্যা কত, কত বিচিত্র রকমের স্বভাবের কাক আছে, এদের চরিত্র মনুষ্য চরিত্রের সঙ্গে কোথায় মিল এই নিয়ে একটা চতুর্থ পাতায় ফিচার লেখার জন্যও নানারকমের কাক চরিত্রসহ—এনসাইক্লোপিডিয়া সংগ্রহে মেতে গেল খবরের কাগজের সাঁতারুরা।

ততক্ষণে পাগলিনী সতীবিবির পালক ছাড়ানো শেষ। আগুন জ্বলল নিচে। খড়কুটোতে বাচ্চাটাকে পুড়িয়ে নিল। তারপর গোগ্রাসে গিলে ফেলল কাকের রোস্ট। বড়ই সুস্বাদু খাবার। জনগণেরা তখন ভারি ভিড় করেছে। ট্রাম বাস জ্যামে পড়ে গেছে। দোকানদার, দালাল, ফেরিয়ালা, নাট্যকার, কবি সাংবাদিক অঞ্চলের যে যেখানে ছিল ছুটে এসে দেখল, কাকেরা চলে যাচ্ছে। ধোঁয়া মাংস-পোড়া গন্ধ কমে আসতেই কাকেরা সব চলে যেতে থাকল। সামান্য ধোঁয়া

উঠেছিল ত্রিপলের ফাঁক ফোঁকারে। হোসপাইপে জল মারতেই এক মূর্তিমান কলকাতা কল্লোলিনী। সবাইকে দাঁড়িয়ে দাঁত ভ্যাংচাচ্ছে। আসলে এটা কাকতালীয় ব্যাপার ভাবল শহরের লোকেরা। কেউ কেউ বলল, কাকেরা যুদ্ধ করলে দেশে প্লাবন দেখা দেয়। জ্যোতিষিরা বললেন, শনি ও রাহু সিংহে রয়েছে। আগামী দশই জুলাইর মধ্যে একের পর এক গ্রহ গিয়ে সিংহে সন্নিবিষ্ট হচ্ছে। রবি ৪ জুলাই শুক্র ৭ জুলাই, বৃহস্পতি ৯ জুলাই এবং বুধ দশই জুলাই সিংহে মিলিত হচ্ছে শনি ও রাহুর সঙ্গে। এতগুলি গ্রহ সন্নিবেশের ক্রিয়া প্রতি-ক্রিয়া সম্পর্কে বিবাদ বিসম্বাদ স্বাভাবিক। এই বিবাদ বিসম্বাদের ফলে আর কিছু না হোক কাকেদের আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। এর ফলে বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিতে পারে। মধ্য এশিয়ায় ও আফ্রিকায় রক্তপাত ঘটতে পারে। রাজনৈতিক উত্থান পতনেরও সম্ভাবনা আছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াসহ ভারতের কোন কোন অংশে ভূমিকম্প, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মহাপ্লাবনের আশঙ্কা আছে।

পাগলের এতসব জানার কথা নয়। তার কাজ শুধু সঞ্চয় করে যাওয়া। সে রাস্তায় কিছুই ফেলার জিনিস ভাবে না। যা পায় সঙ্গে নিয়ে নেয়। ভাঙা খুরি হাঁড়ি পাতিল দেশলাইর বাক্স প্লাস্টিকের ছেঁড়া ব্যাগ সবই তার বড় দরকারী। সে তার সঞ্চয় কোথাও ফেলে যায় না। দিনকে দিন সঞ্চয় বাড়তে বাড়তে ওটা ভারি একটা বস্তা হয়ে গেছে। মাথায় তুলতে কষ্ট হয়। সেজন্য সে মাথা থেকে নামাতে ভয় পায়। মাথায়ই থাকে। এবং ঘাড় শক্ত হয়ে যায়। শিরাগুলি শক্ত হয়ে যায়। তবু সে মাথা থেকে নামাতে সাহস পায় না। কে আবার তুলে দিতে এসে ছিনতাই করে নেবে তার চেয়ে এই ভাল বাবা মাথার জিনিস মাথায় থাক। কিছুই ফেলা যায় না। সেজন্য সে নারকেলের মালা এবং সিগারেটের বাকস দিয়ে মালা গেঁথে গলায় পরেছিল। পিঠে পুরাতন জামার নিচে পচা ঘামের গন্ধ। সে রাস্তায় জ্যাম দেখে, ভিড় দেখে মানুষের পাগলামি দেখে হাসছিল। পাগল হেসে হেসে সবাইকে বলছিল, দু-ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর। সে অন্য কোন সংলাপ খুঁজে পাচ্ছিল না। সে এই একটা কথাই এখন পর্যন্ত মনে রাখতে পেরেছে।

কিন্তু তার বোঁচকার কথা মনে পড়ে গেল। দম মাধা দমের লাঠিটার কথা মনে পড়ে গেল। মানুষের ভিড় দেখে মনে হয়েছিল এরা তার এতদিনের সঞ্চিত সব তৈজসপত্র ছিনতাই করে নেবে। সে বোঁচকা এবং দমমাধাদমের লাঠি ফেলে দেবদারু গাছটার নিচে ছুটে এসেছিল। তার বস্তাটা মাথায় নিয়ে দাঁড়াতেই

মনে পড়ল, ওগুলো সে কোথায় যেন রেখে এল। এত সম্পত্তি ফেলে রাখা ঠিক না। এতে বিপত্তি বাড়ে। কোনটা ফেলে সে কোনটা রক্ষা করবে বুঝতে পারছে না। বস্তাটা মাথা থেকে নামালেই এটা তার সম্পত্তি থাকবে না এমন মনে হয়। মনে হয় সর্বসাধারণের সম্পত্তি হয়ে যাবে। এত কষ্ট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কি দরকার ছিল তবে সম্পত্তি বাড়াবার। একটু উদার হওয়া যায় না। এই দিয়ে থুয়ে সে হাল্কা হতে পারে। ভাবতেই ধপাস করে ফেলে দিল মাথা থেকে বস্তাটা। সে লাঠিটা খুঁজতে ছুটে গেল। ওটাতে সে কাকের পালক বেঁধে রেখেছে। বড়ই মূল্যবান বস্তু। হারালে সে বংশে নির্বংশ হবে।

মানুষের বংশে নির্বংশ হওয়া ভাল কথা না। লাঠিটা না থাকলে সে নির্বংশ হতে পারে ভেবে খুবই বিচলিত বোধ করল। যেন বড়ই আতান্তরে পড়ে গেছে। তখন বাস যায় ট্রাম যায়, মানুষের মিছিল যায়। আর দেখে আঁস্তাকুড়টা ক্রমেই বড় হয়ে যাচ্ছে। যেন জাদুমন্ত্র বলে আঁস্তাকুড়টা এই শহরের যা এখনও সুখী পায়রা সম্বল আছে সব পুড়িয়ে খাবে। সে সেটা কিছুতেই হতে দেবে না। লাঠিটা বগলে থাকলে কাকের পালক বাঁধা থাকলে কোন দুষ্ট প্রভাব কাছে ঘেঁষতে পারবে না। সেটা কাঁধে নিয়ে বেড়ালে মানুষের মঙ্গল হবে। এই মানুষের মঙ্গল হবে ভেবেই সে লাঠিটার খোঁজ করছে এত করে। দেখলে মনে হবে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে সারাটা রাস্তা। বুড়োটা চুরি করে নেয়নি তো, আবার। লোকটাকে সে কিছুদিন থেকেই খুব সন্দেহ করছে। কোথেকে এসে তার জায়গাটা দখল করে বসে গেল। সঙ্গে পুরুষ্ট মাইয়া আছে একখান। নাম কয় চারু।

তখন সূর্যের প্রখর উত্তাপ কমে আসছে এবং ছায়াবিহীন এই পথ। ফুটপাথে অথবা গাড়িবারান্দায় যারা রাত যাপন করছে যারা ঠিকানাবিহীন, যাদের তৈজস-পত্র ছেঁড়া নোংরা এবং পাগল হরিশের মতো প্রাচীনকাল থেকে সব সংরক্ষণ করছে তারা এখনও অন্নের জন্য ফেরেববাজের মতো ঘোরাফেরা করছে। ছেঁড়া সব তৈজসপত্রের ভিতর শুধু এক অতিকায় বৃদ্ধ মুখে দাড়ি শণপাটের মতো এবং সাদা মিহি চুল আর অবয়বে রবিঠাকুরের মতো যে কপালে হাত রেখে শেষ সূর্যরশ্মি আকাশে দেখার চেষ্টা করছিল। কিছুদিন থেকে হরিশ এই লোকটাকে সন্দ করছে। সঙ্গের ডবকা ছুঁড়িটা উদোম গায়ে পড়ে থাকে। গা আল্গা করে রাখে। এরাই দমমাধাদমের লাঠিটা গায়েব করতে পারে। লাঠিটার জাদুটোনা টের পেয়ে গেছে বুড়োটা! তন্ন তন্ন করে খুঁজেও যখন পেল না তখনই বুড়োটার সামনে

এসে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে গেল। এটা তার একটা প্রশ্নের তরীকা। ঊর্ধ্ববাহু হলেই বুঝতে হবে সে কিছু ফেরত চায়।

বুড়োটা বলল, আমার কাছে কিছু নেই।

হরিশ কোমর দোলাল। অর্থাৎ আছে।

বুড়োটা বলল, নেই, কিছু নেই।

হরিশ আরো জোরে ডাইনে বাঁয়ে কোমর দোলাল। অর্থাৎ আছে, আছে। দাও। না দিলে অমঙ্গল হবে। মনুষ্য জাতি বিলোপ পাবে। ওটা বড়ই প্রয়োজনীয় দ্রব্যবস্তু।

তখন বুড়োটা বিরক্তিতে অতিকায় বৃদ্ধ হয়ে যেতে থাকল। গায়ে কি পচা দুর্গন্ধ।—সরে দাঁড়া সরে দাঁড়া। বলে একটা ঠ্যাঙা নিয়ে তেড়ে গেল।

হরিশ ঊর্ধ্ববাহু হয়েই দাঁড়িয়ে থাকল। নড়ল না।

ফুলি বলল, কি সুন্দর দিন। আমার এই ঘাসে এখন ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। ফুলি রাজবাড়ি থেকে বের হয়ে এখানে একটু প্রেম করতে চলে এসেছে।

সত্যি সুন্দর দিন। বর্ষাকাল, অথচ কি নির্মল আকাশ। ঠিক শরতের আকাশের মতো। ফুলি মাঠের ঘাস মাড়িয়ে যাচ্ছিল। পাশে তার সুন্দর যুবক সুনন্দ। সে তার হাত ধরে হাঁটছে। এ-সময়ে পৃথিবীটা মানুষের কাছে কত পবিত্র হয়ে যায়। ওদের হাঁটা চলা কাথাবার্তা থেকেই বরা যাচ্ছিল, এরা এখন পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। ওরা ঘাসের ওপর বসে পড়ল। তারপর দু'জন দুজনের মুখ দেখল।

ফুলি সারাটা বিকেল শুধু আজ আয়নায় মুখ দেখেছে। বাথরুমে সুগন্ধ সাবানে চান করেছে। মা বলেছে, অত সময় ধরে চান করছিস কেন ফুলি। ফুলি মুখে জল নিয়ে ফুৎ করে উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, ঠাণ্ডা জলে চানে কি আরাম। আহা সেই মানুষ আজ আবার তার জন্য কোন গাছের নিচে অপেক্ষা করবে বলেছে। কতদিন থেকে সে এমন আশা করতে করতে বড় হচ্ছিল। তার থাকবে একজন সুন্দর প্রেমিক। যে সহজেই বলবে ফুলি তুমি কি সুন্দর। চল না কোন জ্যোৎস্না রাতে আমরা কোন গভীর অরণ্যে চলে যাই।

ফুলি তারপর কার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল, সেই লতাপাতা আঁকা সিল্কের শাড়িটা। তার এক মাথা চুল। চুলে শ্যাম্পু দিয়েছে। ওর ফাঁপা চুল ঘন নীল

রঙের হয়ে যায় তখন। প্রতিটি লোমকূপ থেকে চুলের গভীর সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। সে এটা টের পেলেই লা লা করে গান গায়। তার অহংকার বলতে এই ঘন নীল রঙের চুল। ছেড়ে দিলে একেবারে হাঁটু অব্দি নেমে যায়। সুনন্দ ফুলির সারা মাথা ভরা এক প্রকাণ্ড সবুজ বাবুইর বাসাটার দিকে হাত দিতে গিয়ে কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল।

ফুলি বলল, এই কি হচ্ছে।

—একটু দেখি না।

—না এখন না।

সুনন্দ বলল, একদিন দেখ ঠিক আমি মরে যাব। আমি তোমার কিছুই পাব না।

সুনন্দর এই বোকা বোকা কথা ফুলির বুকে কেমন আগুন ধরিয়ে দেয়। সে বলে, দাদা তোমাকে আমাদের বাসায় আসতে বারণ করেছে?

—কৈ না তো!

—তবে তুমি যে সেদিন এলে না?

—সেদিন মানে?

—সব ভুলে যাও কেন। তুমি বললে না, রোববার বিকেলে যাব।

—ও সেই কথা। —যাব ভাবলাম, কিন্তু পরে মনে হলে গিয়ে কি হবে। সবাই বাড়ি থাকলে গিয়ে কি লাভ।

—ঐ একটাই বোঝ। আর কিছু বোঝ না। আর আসছি না দেখ।

সুনন্দ পায়ের শাড়ি সামান্য তুলে দেখল ফুলির। কি সাদা আর মাখনের মতো নরম উরু।

ফুলি শাড়িটা নামিয়ে দিল জোর করে। —তুমি কি! মানুষ জন আছে না।

—অতদূর থেকে কেউ বুঝতে পারবে না।

—ঐ দেখ, একটা ঘোড়সওয়ার পুলিস।

সুনন্দ দেখল, দূরেই ঘোড়সওয়ার পুলিস। ঘোড়ার মুখটা তাদের দিকে। কদম দিচ্ছে। সে একটু সরে বসে বলল, কি বলে বাড়ি থেকে বের হলে?

—যা বলে বের হই।

—কিন্তু যদি ধরা পড়।

—কি হবে তবে? বলব, সুনন্দদার কাছে গেছিলাম। তারপরই বলল,

রাজবাড়িতে জানো একটা মানুষের অ্যামব্রায়ো পাওয়া গেছে। আঁস্তাকুড়ে পড়েছিল।

ফুলির উচ্চ মাধ্যমিকে বায়োলজি আছে সেই সুবাদে ভ্রূণ-টুণ না বলে এমব্রায়ো বলল। যেন ফুলি কত অভিজ্ঞ—এবং সে বলল, জানো আমার আর পড়াশোনা করতে ভাল লাগে না। তোমাদের বাড়ি থেকে কিছু অমত হবে?

সুনন্দ বলল, এখনও আমার দুই দিদির বিয়ে বাকি—তুমি তো সব জান।

—তা হলে আমরা কতদিন এ-ভাবে থাকব।

—দিদিদের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত।

—কবে ওরা করবে।

—করবে মনে হয়। কারণ ওরাও তো তোমার মতো অধীর।

এ-সব কথা হামেশাই এ-শহরের উঠতি যুবকদের যুবতীদের এবং এরা নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের যারা তাদের এই পার্ক, সিনেমা, থিয়েটার এবং বড় মাঠটা সম্বল। দূরে দূরে যতদূর চোখ যায়, কোথাও তরুণ যুবকেরা খেলা করছে—কোথাও ঘোড়া দৌড়ে যাচ্ছে কোথাও জোড়ায় জোড়ায় ঘুরছে। মহারাণীর স্মৃতিসৌধটির পাশে এমন সব যুবক যুবতী গাছের নিচে বসে উত্তেজনায় অধীর হচ্ছে। চোখ মুখ জ্বলছে। এই বয়সে তাদের আর কি করণীয়। কিন্তু তারা জানে তাদের অনেকেরই এক স্বপ্ন-সমুদ্রে শুধু ভেসে বেড়াতে হয়। ইচ্ছেমত তারা গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। তাদের জন্য সব সুন্দরী যুবতীরা বড় হয় ঘুরে বেড়ায়, তারা শুধু দেখে যায়। সুনন্দ দেখল নদীর পাড়ে সূর্যাস্ত হচ্ছে। অসংখ্য পাখি উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে। চারপাশে নগরীর কোলাহল, বাস ট্রাম এবং স্কাইস্ক্র্যাপার। সে রেড রোডের গোলমোহর গাছগুলি পার হয়ে আরও গভীর মাঠের মধ্যে ফুলিকে নিয়ে ঢুকে যেতে থাকল। ফুলির শরীরে আশ্চর্য লাবণ্য। ওর জঙ্ঘায় না জানি কোন মহাসমুদ্র খেলা করে বেড়াচ্ছে। সে এখনও সেখানটায় হাত দিতে পারেনি। এই একটা ভীষণ ইচ্ছেয় ফুলির কাছে এলেই তার শরীরে কেমন জ্বর এসে যায়। ইচ্ছে হয় কত কথা বলবে, কিন্তু কেমন মূক বধিরের মতো সে শুধু তাকিয়ে থাকে। শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করে তাকে ফিরে যেতে হয়—কারণ মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর মধ্যে মা বাবা, ভাই বোন সব মিলে এক প্রাচীর তৈরি হয়ে আছে। সেই প্রাচীর ভাঙার জন্য একটু এগোলেই সংসারে কোথায় কিছু হারিয়ে যায়।

ফুলি বলল, এই, আমি ফিরব। সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

—আর একটু চল না হাঁটি।

ফুলির মধ্যেও মানুষের সঙ্গ পেলে যা হয়—এক জলোচ্ছ্বাস ঘটছে। সে সেটা টের পাচ্ছিল। সে হাঁটতে পারছিল না। কেমন শরীরে আশ্চর্য জড়তা নেমে আসছিল এবং সে নিজেকে নিজেই ভয় পাচ্ছিল। শেষ তো সেই এমব্রায়ো। ওটার জন্য সে জানে খুব ভাববার নেই। কিন্তু অস্পষ্ট অন্ধকারেও সে বুঝল কোথাও এই শহরে একটু নিরিবিলি জায়গা নেই—যেখানে সে এবং সুনন্দ মুহূর্তের জন্য এক হয়ে যেতে পারে। ফুলি অন্যমনস্ক হবার জন্য বলল, এই প্রিয় শহরে আমরা একদিন বুড়ো হয়ে যাব। ভাবতেও কেমন ভয় লাগে।

সুনন্দ বলল, বুড়ো হতে দিচ্ছি না।

—তুমি না দেবার কে! জান আমার মা এখন কেমন হয়ে গেছে। কি সুন্দর না ছিল দেখতে! আমার বয়সে ঘরে একটা ফটোতে মাকে মধুবালার মতো সুন্দর লাগছিল। সেই মা কেমন হয়ে গেছে দেখতে। জান আমার কেবল ভয় করে—আমিও একদিন ঠিক মার মতো হয়ে যাব।

সুনন্দ দেখল এখন ওরা অনেকটা মাঠের গভীরে ঢুকে গেছে। বলল, এস আমরা পাশাপাশি এখানে শুয়ে থাকি।

—পুলিস ধরুক আর কি।

সুনন্দ বলল, বড়ই সুসময় চলে যাচ্ছে। এই সুসময় আমরা শুধু পালিয়ে ভালবাসছি। জানো রাতে তোমার কথা ভাবতে ভাবতে কেমন অস্থির হয়ে যাই, মা বাবা দিদি সব কেমন দূরের মনে হয়। যেন এতদিন যে বড় হওয়া সে শুধু তোমার জন্য।

ভালবাসার কথা সাধারণত এই রকমেরই হয়ে থাকে। কাজেই নতুনত্ব কিছু নেই। সুনন্দদের সময়ে এই কথা, তার আগেও এই কথা, তার আগেও এই কথা। আগামী জন্ম-জন্মান্তরে এই কথা। এইভাবেই মানুষ বালক থেকে যুবক হয়, যুবক থেকে প্রবীণ, তারপর বুড়ো। তখন ঈশ্বর দরকার হয়। মানুষের কোথাও না কোথাও একটা আশ্রয় বড়ই দরকার। এখন সুনন্দর আশ্রয় এই ফুলি।

সুনন্দ পাশে বসে দাঁতে ঘাস কাটতে কাটতে এ-সব ভাবছিল। ফুলির দাদা ওর সঙ্গে পড়ত সুরেন্দ্রনাথে। ওর দাদা ভাল কবিতা আবৃত্তি করতে পারত। নাটক করতে পারত ভাল। একবার একটা কবিতাও লিখেছিল কলেজ ম্যাগাজিনে। সে-কবিতাটা পড়ে ফুলির দাদার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। আলাপ,

ভাব, তারপর বন্ধুত্ব। ওর দাদা যা কিছু লিখত প্রথমেই তাকে সেগুলো দেখাত। সুনন্দর মনে হত, ফুলির দাদা রবিঠাকুর না হয়ে যায় না। অশেষ গুণ আছে তার। কিন্তু এখন সে সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে একটা অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করছে। আর সুনন্দ এই নিয়ে আঠারবার ইণ্টারভিউ এবং প্রথম প্রেম। ফুলির সঙ্গে তার প্রেম চলছে। সে ভেবেছে মরে যাবে ফুলির জন্য। একটা কিছু করে ফেলবেই। প্রেম নিয়ে সে ছেলেখেলা করতে ভরসা পাচ্ছে না।

—এই শোন। ফুলি সুনন্দর হাত ধরে বলল।

—কী?

—বাবা সেদিন তোমার কথা দাদাকে বলছিল। সুনন্দর খবর কিরে! দু-তিন হপ্তা হল আসছে না।

—সুধীন কি বলল।

—বোধ হয় কাজে আটকে পড়েছে।

—একবার খোঁজ নিলে হয় না। ওরা তো বেলঘরিয়ায় থাকে। রিফুজী কলোনিতে ওর বাবা বাড়ি করেছে।

ফুলিদের পরিবারে রিফুজি জল চল নয়। প্রথম প্রথম সুনন্দকে বাঙাল বলে বাড়ির সবাই ঠাট্টা তামাশাও করেছে। এবং জল চল নেই বলেই ফুলির বাবা প্রথম দিকে সুনন্দর আসা খুব পছন্দ করত না। কিন্তু বছরখানেক ধরে অন্যরকম। অফিসে তার বস বাঙাল। সিট মেটালে নতুন ম্যানেজার এসেছে সেও বাঙাল। প্রাইভেট অফিসের স্যার বাঙাল। একেবারে দেশটা ক্রমেই বাঙালে বাঙালে ছয়লাপ হয়ে যাচ্ছে। যেখানে যাও, অফিসে ব্যাঙ্কে, ট্রামে বাসে শুধু বাঙাল ছাড়া মুখ দেখা যায় না। আত্মীয়-স্বজনদের মেয়েরাও এখন বাঙাল বিয়ে করতে ব্যস্ত। তার দিদির দুই মেয়েই ভালবাসাবাসি করে অফিসের দুই বাঙালকে বাড়ি তুলে এনেছে। তার বোনের নন্দাই মেয়ের বিয়েই দিয়েছে বাঙাল দেখে। বাঙালরা নাকি খুব করিতকর্মা হয়। মেয়েদের বিয়ে দাও তো বাঙাল খোঁজ। ছেলেদের বিয়ে দাও তো স্বজাতি দেখে দাও।

এইসব কারণে সুনন্দর ওপর ফুলির বাবার বেশ স্নেহ ভালবাসা জন্মাচ্ছিল। এ-জন্য অভাবের সংসারে দুবার নিমন্ত্রণ করেও খাইয়েছে। সুনন্দ একটা চাকরিও করছে প্রাইভেট ফার্মে। তবে সে ব্যাঙ্কে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ওর আশা ব্যাঙ্কে সে একটা কাজ পেয়ে যাবে। ফুলির বাবা আজকাল ঠনঠনে দিয়ে আসার সময় শরীর ভাল থাকা নিয়ে যখন মা ঠাকুরুণকে মাথা ঠোকে তখন সঙ্গে

সুনন্দর ব্যাঙ্কের চাকরিটার কথা মাকে মনে করিয়ে দেয়। —তোমার তো মা সবাই সন্তান। সন্তানের শখ-আহ্লাদ তুমি না মেটালে কে মেটাবে। মা মাগো তোরই ইচ্ছা সব। তারপরেই মনে হয়, মুখটা খালি, দোক্তাপান খাওয়ার ভারি বদভ্যাস। পাশের পানের দোকান থেকে একটা পান হাতে কিছু জর্দা নিয়ে হাঁটা দেয়। এ-সব অবশ্য ফুলিই বলেছে সুনন্দকে। —মনে হয় বাবা তোমাকে এখন পছন্দ করছে। সেই সুবাদে সব ঝেঁটিয়ে সেদিন ফুলির বাবা পরিবারবর্গ নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে চলে গেল। ফুলি বাড়ি পড়ে থাকল একা। সুনন্দর সেদিন আসার কথা। ফুলির মনে হয়েছিল, বাবা ভুলে গেছেন। মাও। দাদারা তো রাত দশটার আগে বাড়ি ঢোকে না। কেবল সুনন্দ ওকে জড়িয়ে আদর করার সময় বলেছে, তুমি একা। ওফ্ কি যে ভাল লাগছে না।

সেই থেকেই ফুলির কাছ থেকে সুনন্দ এটাওটা চেয়ে নেয়। সব চাইলেই অবশ্য পাওয়া যায় না। কুমারী মেয়ের নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটতে পারে। নিরাপত্তার বিঘ্ন না ঘটিয়ে যতটা দেওয়া যায়, ফুলি সুনন্দ কিছু চাইলে সেইটুকু দেয়। তার বেশি না। সেজন্য সুনন্দ যে ছবি উঠে যাচ্ছে তার শেষ শো দেখে। হল ফাঁকা। অনেক কিছু এখন চাওয়া যায়। সেজন্য সুনন্দ কখনও অপরিচিত রেস্তোরাঁতে ফুলিকে নিয়ে বসে। পর্দা টেনে দেয়। তারপর জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। ফুলি তখন শরীরের সঙ্গে একেবারে মিশে থাকতে ভালবাসে। এইভাবে মাস ছয়েক ধরে খেলা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন ব্যাঙ্কে শুধু একটা চাকরি। ওটা হয়ে গেলেই সে নদীর পাড় ধরে আর হেঁটে যাবে না। নদীটা সোজাসুজি অতিক্রম করবে। এবং সেখানেই সে প্রথম এক গভীর অরণ্য দেখতে পাবে। ফুল ফল লতাপাতা, ঝড় বিদ্যুৎপ্রবাহ, শ্বাপদসংকুল এক অরণ্য। নিয়তি মানুষকে শেষ পর্যন্ত সেখানেই টেনে নিয়ে যায়। সুনন্দ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, তুমি মা হয়ে যাবে, আমি বাবা হয়ে যাব। দাঁত নড়বড়ে হবে—তবু ফুলি আমরা যুবকেরা যুবতীরা কি এক তাড়নায় সেখানেই শেষ পর্যন্ত গিয়ে হাজির হই। এইটুকু বলে সুনন্দ ঘাসের উপর সত্যি শুয়ে পড়ল। সে যেন বলতে চাইল এইভাবে নিয়তি আমাদের কবরের দিকে নিয়ে যায়।

ফুলি মাথার কাছে বসে বলল, এই শুলে কেন?

সুনন্দ বলল, কত নক্ষত্র না আকাশে?

ফুলি বলল, লক্ষ্মীটি ওঠো।

সুনন্দ বলল, তুমি যাও।

ফুলি তখনই বলল, ছাখ কারা আসছে। দু-তিনটা ষণ্ডামার্কা ছেলে।

সনন্দ দেখল ছেলেগুলি তাদের ঘিরে ফেলেছে। একজন বলল, দাদা কি করছিলেন বেশ মজা, না বেশ টিপে টুপে দেখা হচ্ছে। তারপরই ধাই করে মুখে ঘুষি।

সুনন্দ বলল, আমাকে মারছেন কেন ?

—প্রেম। শালা প্রেম চুটিয়ে দিচ্ছি। এই ক্যাবা দুটোকেই ন্যাংটো করে ছেড়ে দে ত।

—দেখুন আমরা বেড়াতে এসেছি।

—আর জায়গা পাও নি চাঁদু। কি আছে দেখি।

—কিচ্ছু নেই।

একজন বলল, মার না আর একটা টুসকি। বাছাধন হড়হড় করে সব বের করে দেবে।

ফুলি ভয়ে কাঁপছিল। গলা শুকিয়ে আসছে। চিৎকার করতে গিয়েও পারল না। পুলিশ পুলিশ! কিন্তু কোথাও কেউ নেই। গাছের ও-পাশ দিয়ে মানুষজন হেঁটে যাচ্ছে। ফুলি দৌড়ে খবর দেবে ভাবল। আর তখনই তিন নম্বর ষণ্ডামার্কা ছেলেটা ওর হাত ধরে ফেলেছে। দেখি রানী। কাছে এস। কি আছে ? কিছু নেই। আহারে! বলে কানের দুল খসিয়ে নিল। সুনন্দ ঘড়ি খুলে দিচ্ছে। ফুলির হাতে আর আছে কাঁচের চুড়ি।

—পকেটে ছাখ ক্যাপ।

পকেট হাতড়ে দেখা হল।

তখন সেই দস্যু সর্দারটি বলল, তোরা একে একে চুমু খা।

আর তখনই সুনন্দর কি হয়ে যায়। সে ক্ষেপে গিয়ে এলোপাথাড়ি লাথি ছুঁড়তে থাকে। এবং প্রায় পাগলের মতো সে লাফিয়ে পড়ল একটার ঘাড়ে তারপর জোর হিন্দি সিনেমার মতো রদ্দা চালাল। ওর মাথার মধ্যে কেউ কিছু চালিয়েছে। সে রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছিল। ফুলি চিৎকার করছে, মেরে ফেলল, মেরে ফেলল। সেই আর্ত চিৎকারে মানুষজন ছুটে আসছে। তারপরই দেখল সব ফাঁকা। ফুলি অপরিচিত মানুষজনের মধ্যে বোবা হয়ে গেছে। একটা কথা বলতে পারছে না। সুনন্দ পায়ের কাছে পড়ে আছে। মানুষজন দেখে ওঠার চেষ্টা করছে।

তখন জনতা ওদের ওপরই ক্ষেপে গেল। কেন আসেন—ঠিক হয়েছে

বেশ হয়েছে। সুনন্দ তখন হাত ধরে টানল ফুলির, এই এস। মানুষজন তামাশা দেখার জন্য ভিড় করতেই ফুলি বলল—তোমার রক্ত পড়ছে।

—ঠিক হয়ে যাবে। এস।

—স্বকর্মের ফল। জনতা থেকে কেউ একজন বলল। যেন এরা জীবনে মেয়েমানুষ ছুঁয়েও দেখে নি।

—বাড়ির লোকও বলি, এমন একটা ধিঙ্গি মেয়েকে ছেড়ে দেয়। তারপর ওরা মানুষের মূল্যবোধ নিয়ে কথা বলতে বলতে চলে গেল। সব ভেঙে পড়ছে! জীবনে সততা নেই। কি হল দেশটা!

সুনন্দ রুমাল দিয়ে ক্ষত স্থানটা চাপা দিয়ে হাঁটতে থাকল।

ফুলি বলল, আমরা এখন কোথায় যাব সুনন্দ? আর্ত অসহায় মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে সুনন্দ কেমন বিভ্রমে পড়ে গেল।

তখন বিশাল কাচের দরজা ঠেলে মতি ভিতরে ঢুকছে। সুবিশাল করিডোরের পাশে কাচের কাউন্টার। পাঁচ সাতটা ফোন নিয়ে ঘোষবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। একটা তুলছেন, একটা নামাচ্ছেন। মসৃণ গোলগাল মুখ। মাছির মতো দু'টুকরো গোঁফ নাকের নিচে। গলায় বো টাই। চেক কাটা টেরিকটনের স্যুট পরে ফোনের রিসিভারে ঝুঁকে আছেন। কাউন্টারের ভেতরে মিস কাপুর গোলাপী রঙের ভেলভেটের শাড়িতে আগুন হয়ে বসে আছে। এখনও বোধহয় ঘোষবাবু ক্লায়েন্ট ধরতে পারে নি। মতিকে দেখে মিস কাপুর সামান্য মাথা নত করল। হাসল সামান্য। দেরিতে আসায়, তার পরে সে ক্লায়েন্ট পাবে। তার নিজেরও আজ দেরি হয়েছে। ঘোষ মতিকে দেখেই, ইশারায় কাউন্টারের ভেতর চলে আসতে বলল।

এখানে এলেই মতি যেন অন্য এক জগতে চলে আসে। কত সুন্দর পৃথিবী মানুষ নিজের জন্য তৈরি করে নিতে পারে এখানে না এলে বিশ্বাস করা যায় না। লাল কার্পেট পাতা করিডোরে। সব অদৃশ্য লাল নীল আলো দেয়াল থেকে যেন চুইয়ে পড়ছে। সব ছিমছাম নারী পুরুষ হল্লা করতে করতে ডান দিকের সিঁড়ি ধরে উঠে যাচ্ছে। বয় বেয়ারারা সাদা উর্দি পরে ভারি ব্যস্ত। কাঁচের দরজার ও-পাশে ইকবাল অনবরত সেলাম ঠুকে যাচ্ছে। তাকে দেখেও সেলাম ঠুকতে যাচ্ছিল—যেই দেখল মতি বোন, আর অমনি হেসে বলল, ক'দিন এদিকে আর মাড়ান নি বুঝি।

কথাটার মধ্যে কেমন একটা নম্রতা টের পেয়ে মতি প্রথম ভ্রূ কুঁচকে ছিল।

তারপর বুঝল, ইকবাল সে ধরনের মানুষই নয়। সে ইতর কথাবার্তা প্রায় জানেই না। মিস কাপুরের পাশে দাঁড়িয়ে রিসেপসনিস্টদের মতো হাবভাব করতে থাকল। এটা এগিয়ে দিচ্ছে। সিগারেটের কেস থেকে একটা সিগারেট তুলে নিল। কোন পুরুষ একা উঠে গেলেই মিষ্টি করে হাসতে হচ্ছে। কাউন্টারে দাঁড়ালেই এটা করতে হয়। কোথায় কোনটা কাজে লেগে যাবে—এই হাসির মধ্যে শরীরের এক বিশেষ ইচ্ছের প্রকাশ ফুটে উঠলে হয়ত এখানেই বুক করে ফেলতে পারে।

মতি আজ হাল্কা লিপস্টিক ঠোঁটে দিয়ে এসেছিল। ইদানীং সে বুঝেছে, খাপ খোলা পুরুষেরা খুব উগ্র সাজ পছন্দ করে না। সে জন্য সে তার স্বভাবে চরিত্রে নারী মহিমময়ী এমন একটা ভাব ফুটিয়ে রাখে। লাজুক, চোখ নামিয়ে নেওয়া, আস্তে কথা বলা, কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে যাওয়া, একটু উদাস হয়ে যাওয়া এ-সব অভিনয় রপ্ত করতে না পারলে বৈলাইনের পুরুষেরা আরাম পায় না। প্রথম দিকে তার স্বভাবেই ছিল এগুলো। পরে লাইনের মেয়ে হয়ে যাওয়ার পর, তার সে-সব হারিয়ে গিয়েছিল। ঘোষবাবু একদিন বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কি কর! ফিরতি বার আর তোমার নাম করে না। আসলে মতি বুঝেছিল, সে পাকা বেশ্যা হতে গিয়েই ভুল করেছে। পাকা বেশ্যাদের বাবুরা ঠিক চিনে ফেলে। সেই থেকে সে এখন যেটা তার স্বভাবের ছিল, সেটা অভিনয়ে এনে দাঁড় করিয়েছে।

ঘোষবাবু ফোন রেখে একটা চিরকুট এগিয়ে দিলেন। চলে যাও।

মিস কাপুর ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। পরে এসে আগে। আসলে বাঙালী বলেই এই স্বজাতি প্রীতি। কিন্তু লোকটা জানে না, এর আসল মালিক একজন পাঞ্জাবী। যদি এই প্রাদেশিকতার কথা কানে তুলতে পারে তবে নাকানি-চোবানি খেতে হবে খুব। তবু মিস কাপুর এই ঘোষবাবুকে সমীহ করে। কারণ তিনি ইচ্ছে করলে বলতে পারেন, আপনার চাহিদা কমে গেছে। বাজারে আর চলছে না। সেটা কত বড় অপমানের বিষয়। সে-জন্য সে খুব করুণ গলায় বলল, বাবুজী ইট ওয়াজ মাই টার্ন।

ঘোষবাবু স্মিত হাসলেন। মাথার ওপরে কাঁচের বোর্ডে নীল অক্ষরে লেখা ওয়েল-কাম। তার নিচে ঘোষবাবুর মাছির মতো গোঁফের ফাঁকে স্মিত হাসি বড়ই কুটগন্ধ ছড়াচ্ছিল। বললেন, ক্লায়েন্ট প্রেফারস মতি। হোয়াট কেন আই ডু।

এর পর মিস কাপুর অগত্যা চাবির রিং ঘোরাতে থাকল। মতি সিঁড়ি

ঘরে উঠে যাচ্ছে। প্রায় যেন একটা স্বর্গরাজ্য পার হয়ে আর একটা স্বর্গ রাজ্যে সে চলে যাচ্ছে। নীল রঙের কার্পেট পাতা সিঁড়িতে। পা ডুবে যাচ্ছিল। ৩০৮ নম্বর ঘর। তার এখন, কোন দিকে কোন ঘরের সিরিয়েল আরম্ভ সব মুখস্থ। একতলা, দোতলা, তিন-চার-পাঁচ তলা। দোতলায় সব লাউঞ্জ, ব্যাংকোয়েট হল পাঁচটা। সে এখন গ্রীন ভেলির পাশ দিয়ে যাচ্ছে। কাঁচের ঘরে ভেলভেটের তাকে নানান রকম ইংরাজী হিন্দি বই। দু'জন যুবক, একজন যুবতীকে নিয়ে বইগুলি দেখছে। পাশে একটা রকমারী শাড়ির শো-রুম। তারপরই ম্যাডভিলা—সেখানে মিউজিক বাজছে। কাঠের সুইংডোর ঠেললেই সব নানা রকমের আবছা আলো আঁধারে শোনা যাবে মিউজিক বাজছে। আর দূরে অদূরে সব হিজিবিজি মানুষের মুখ—কেমন ভূতুড়ে ছায়া ছায়া—অবিকল এক নকল নরকের ভয়ের মতো জায়গাটা। নারী পুরুষ লাল নীল গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে—আর কি গোপন ব্যথায় মুসড়ে যাচ্ছে—অথবা সুরা যা মানুষকে অতীব এক সরলতা এনে দেয় একটা লোককে সে উঠে যেতে যেতে দেখল, দাঁড়িয়ে হাঁকছে এনি মোর ফ্লাওয়ার? মতি পাশের বিরাট কাচের ফুলদানি থেকে যেতে যেতে দুটো ফুল তুলে নিয়ে লোকটার হাতে দিতেই কেমন চকমক করে তাকাচ্ছে। নেশায় লোকটা বড়ই টলছিল। ফুল পেয়েই মুখে পুরে দিল এবং চিবুতে থাকল।

॥ দশ ॥

প্রথমেই মনে হল একটা চৌকো মতো মুখ তার চোখের সামনে ঘুরে গেল। তারপর বাঘের মতো একটা ডোরা কাটা মুখ। অতীশ চোখ রগড়াল। জিভ ভারি হয়ে আসছে। মাথা বেশ ঝিমঝিম করছে। হাসিরাণীর ভ্রূ প্লাক করা। নাকে ফলস নথ। কাবুলবাবু লেমন জিন নিয়েছে। চুকচুক করে খাচ্ছে। কুম্ভবাবুর হুইস্কি ছাড়া পছন্দ না। ওকেও পীড়াপীড়ি করেছিল। কিন্তু সে বলেছে অনেক দিন অভ্যাস নেই। আপনাদের অনারে সামান্য বিয়ার খাব। হাসিরাণীর গ্লাসে খুবই সামান্য লেমন জিন। সে বেশি খায় না। কখনও খায় না কেবল দাদার অনারে সে যেন নিয়ম রক্ষা করছে। সব কিছুই এভাবে অনারে হচ্ছিল, যখন প্লেট ভর্তি চিলি চিকেন, যখন অতীশ একবার ইতিমধ্যেই বাথরুম থেকে ঘুরে এসেছে তখনই চোখে একটা ডোরাকাটা বাঘ উঁকি দিয়ে গেল। সে বুঝতে পারল না এত নেশা লাগছে কেন। জিভ এত ভারি ঠেকছে কেন। এক

বোতল বিয়ারে এমন ত হবার কথা না। সে গ্লাসটা তুলে চোখের সামনে নিয়ে এল—না কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তারপর মনে হল দীর্ঘদিন অনভ্যাসের ফল—অথবা কলকাতায় আসলে বিয়ারের বদলে হুইস্কিই দেওয়া হয়। সে অনেক খবর রাখে, কিন্তু এই শহরের কোন খবরই রাখে না। এক মাসেই বুঝেছে তার শেকড়-বাকড় আলগা হয়ে যাচ্ছে ফের।

কাবুলবাবু বলল, আর একটা নি।

অতীশ মাংস চিবুচ্ছিল। কেমন গা বমি বমি ভাব। এটাও তার কখনও হয়নি। সে বলল, না আর পারব না।

কুম্ভ হোহো করে হেসে উঠল। বলল, দাদা এই আপনার দৌড়! হাসি তো আপনার চেয়ে বেশি খেতে পারে?

—তা পারে। আমি পারি না।

—বাবা বাড়ি আছেন বলে না হলে দেখতেন।

হাসিরাণী বলল, না দাদা আমি খাই না। ও মিছে কথা বলছে।

কুম্ভ বলল, খেলে দোষের কি! বৌরাণীও তো খায়। তার জন্য বৌরাণীকে চরিত্রহীন বলতে হবে। খারাপ মেয়ে-মানুষ বলতে হবে। কি কাবুল বলিস নি! কাবুল চুপ করে থাকল। অতীশের কোথায় যেন চড়াৎ করে লাগল। কমলকে নিয়ে কথা বলছে কুম্ভবাবু। কুম্ভর কথাবার্তা কাবুল ঠিক রেলিশ করছে না। বাড়ির আদর্শ বলতে কুমার বাহাদুর এবং বৌরাণী। এরা যখন খায় তখন এটা একটা আধুনিকতার লক্ষণ। এদের কথাবার্তায় বুঝেছে কুম্ভবাবু বাহাদুর আদমি, দামী দামী ইংরেজী রেকর্ডে গান শোনে—কুম্ভবাবুর বাড়িতেও সেই গানের রেকর্ড। কুমার বাহাদুর নীল রঙের টাই পরতে ভালবাসেন, কুম্ভবাবুও মাঝে মাঝে নীল রঙের টাই পরে। কুমার বাহাদুর পাইপ টানে, অফিসে মাঝে কুম্ভকে পাইপ টানতেও দেখেছে। মাঝে মাঝে কুম্ভ রজনী-গন্ধার ঝাড় কিনে নিয়ে যায়। ঘরটায় তাকে একদিন নিয়ে গেছিল—বসতে দিয়েছিল, দেয়ালে তার ও রাজা বাহাদুরদের ফটো, নিজের ফটো। সমুদ্র তীরের ফটো—শেষ পর্যন্ত সেখানে পৌঁছাতে চায়। কাবুল সে আর হাসিরাণী হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সংসারে সে হাসিরাণীর স্বপ্নের মধ্যে সাঁতার কাটে। তারপরই চিন্তার সূত্র এলোমেলো। কেমন ঝিমঝিম মাথা। গা ভারি ভারি। দাঁড়াতে গিয়ে বুঝল বেশ টলছে—মানুষজন অস্পষ্ট এবং দু'জন হয়ে যাচ্ছে। আসলে কি এরা বিয়ারে কিছু মিশিয়েছে এই যেমন হুইস্কি—এতে তার এলার্জি আছে। সে কখনও খায় না।

অতীশ বলল, আপনারা খান। আমি আর খাচ্ছি না।

হাসিরাণী বোধহয় মানুষটার জন্য ভেতরে কোন্ অনুরাগ বোধ করে থাকবে, সে বলল, তোমরা দাদাকে আর দেবে না, দিলে খুব খারাপ হবে।

হাসিরাণীর কথায় কুম্ভ এবং কাবুল দুজনই কেমন সচকিত হয়ে গেল। বলে না দেয়। বলে দিলে মন্দ হবে। এই সন্দেহটা হলে তাকে নিয়ে ওরা যতদূর যেতে চায়, আর যেতে পারবে না।

কুম্ভ বেয়ারাকে ডেকে বিল মিটিয়ে দিল। অতীশকে বলল, ধরব ?

—না ধরতে হবে না। চলুন।

সবার পেছনে হাসিরাণী। এই মানুষটার পেছনে ওরা এত লেগেছে কেন ? বৌরাণীর খুব পছন্দ বলে, কুমার বাহাদুরের খুব বিশ্বাসী বলে। হাসিরাণীর কেন জানি মনে হল, একদিন গিয়ে সে দাদাকে সতর্ক করে দেবে গোপনে। দাদা এদের সঙ্গে যাবেন না। এরা আপনাকে বিপদে ফেলতে চায়। এবং তখনই কেন জানি ইচ্ছে হয়, এই মানুষটার সঙ্গে হেঁটে গেলে সে আরাম বোধ করবে। কাবুল দরজা খুলে ধরলে হাসরাণী বলল, আসুন ভিতরে।

—কুম্ভবাবু কোথায়।

—পান কিনছে।

হাসিরাণী হাসল। বলল, বাড়িতে গন্ধ পাবে না।

—কি হয় গন্ধ পেলে ?

—কি ভাববে সবাই। দাদা মদ খায়। কি ভাবে বলুন।

—মদ খাওয়াটা খারাপ হবে কেন। এতে কাজের ক্ষমতা বাড়ে। অতীশ কথাগুলি জড়িয়ে জড়িয়ে বলছে। কথা জড়ালেই খারাপ। তখন শো। তখন অনিয়মে পড়ে যাওয়া। সে দেখল আরও চার-পাঁচজন বের হয়ে আসছে। একটা লোক বেহালা বাজিয়ে পয়সা চাইছে। গরীব ভিখারীর হাত লম্বা হয়ে আসছে। সে পকেট থেকে তুলে রেজকিগুলো দিয়ে দিল। হাসিরাণী গাড়ির ভেতরে ঢুকে তাড়াতাড়ি অতীশকে যেন ভিতরে ঢুকিয়ে নিল। বলল, চুপ করে বসুন। মাথাটা এলিয়ে দিন, আরাম পাবেন।

অতীশ বলল, হাসি একটা কথা বললে রাগ করবে না বল।

—রাগ করব কেন ?

—বাড়িতে তোমার লক্ষ্মীর পট নেই। আমার খুব ইচ্ছে একটা পট কিনে দেব। লক্ষ্মীর পট। পাঁচালি। কিনে দিলে নেবে ত ?

—ওর এসব পছন্দ না।

—কুম্ভবাবু তো কালীভক্ত।

—তাই ও চায় না।

—তালে দেব না। স্বামীর অবাধ্য হতে আমি তোমাকে বলব না। স্বামীর অবাধ্য হওয়া ভাল না।

তখন কুম্ভ এসে দেখল হাসিরাণীর পাশে অতীশ গা লেপ্টে বসে আছে। কুম্ভর ভেতরটা গরগর করে উঠল। কিন্তু কিছু না বলে একটা পান এগিয়ে দিল অতীশের দিকে। বলল, খান। গন্ধটা মরবে। অতীশের মনে হল সেই ডোরাকাটা বাঘটা চোখের সামনে লাফিয়ে পড়ছে।

হাসিরাণী বলল, আমারটা কৈ?

—তোমার মুখে গন্ধ কোথায়, তুমি যে খাবে।

অতীশ বলল, আচ্ছা কুম্ভবাবু আপনি কি আর জন্মে বাঘ ছিলেন? না, আই মিন বাঘের বাচ্চা।

কাবুল চোখ টিপল। কুম্ভ ওর বিয়ারের সঙ্গে তিন তিনবার হুইস্কি মিশিয়েছে। আর একটু হলেই কাবু করে আনতে পারত। কিন্তু হাসিরাণীর বাধা ছিল। বলল, আপনি কি টের পান, মানুষ কোন জন্মে কি থাকে?

—কি যেন হয় মাথার মধ্যে। এই দেখুন না কখন থেকে একটা জন্তুর মুখ আমাকে কেবল তাড়া করছে। কখনও বাঘের মনে হয়, কখনও শেয়ালের, কখনও মানুষের মুখ—হিজিবিজি দাগ কাটা, টলতে টলতে আসছে। আমাকে ধরতে আসছে।

অতীশের পাশে কুম্ভ বসে পড়ল। গাড়ি চালাচ্ছে কাবুল। কাবুলের কাছে অতীশবাবুর মুখোশ যত খুলে ধরা যায়। কারণ সেই একমাত্র তার এখন নিজের লোক—যে তার হয়ে রাজাকে বলবে। সবই সে করছে হাসিরাণীর জন্য, তুমি যে কেমন মেয়েছেলে বাব্বা বুঝি না। নিজের ভালটাও বোঝ না। তুমি জান না এই লোকটা আমার তোমার সব সুখ কেড়ে নিতে এসেছে।

কুম্ভ মনে করছিল মদ খাওয়ার ঘোরে অতীশবাবু রাজার দুমুখো স্বভাব নিয়ে কিছু বলবে—এই ভুলচুক কথাবার্তা, সঙ্গে বেফাঁস দুটো-একটা বের হয়ে গেলেই কাজ দেবে। নবর চাকরির প্রসঙ্গও তুলেছিল। কিন্তু অতীশবাবু ভারি সেয়ানা, শুধু ঘাড় নেড়ে গেছে। নিজের কথা বলে নি। বৌরাণী তাকে ডেকে কি বলেছে, তাও সে বিন্দুমাত্র ওগলায় নি। মদ খেলে তো মানুষ সোজা সরল হয়ে

যায়-অথচ এত খাওয়ার পরও রাজার সম্পর্কে একটা বেফাঁস কথা বলে নি। এ-ছাড়া কুম্ভ বোঝে তার মাথায় নানা রকম ফন্দি খেলা করে বেড়ায়। কোথা দিয়ে কোন রন্ধ্রপথে ঢোকা যাবে, কাকে কি-ভাবে জড়িয়ে দেওয়া যায়—এটাই তার মাথায় থাকে। সে ইচ্ছে করেই খাবার টেবিলে বৌরাণীর কথা টেনে এনেছিল। অন্দর মহলের গোপন খবর কাবুল রাখে। আসলে সে অতীশবাবুর কাছে কাবুলকেও জড়িয়ে রাখল। যেভাবে রাজবাড়ির প্রভাব প্রতিপত্তি কমছে-বাড়ছে তাতে করে কাবুলের ফ্রন্ট দুর্বল করে রাখা দরকার। যখনই কাবুল তেরিয়া হয়ে উঠবে তখনই হাতের অস্ত্র, বৌরাণী মদ খায়। কাবুলবাবু খবরের উৎস। কুম্ভ চায় এক সঙ্গে দুটো ফ্রন্টকেই ঘায়েল করতে। হাসির বুদ্ধি কম। সে বুঝছেই না, এতগুলি টাকা গচ্চা এমনি সে দেয় নি। কাবুলের নামে পার্টি দিয়ে সে দু ফ্রন্টে লড়াই জমিয়ে তুলতে চায়। কিন্তু এত করেও অতীশবাবুর মুখ থেকে রাজবাড়ির কোন নিন্দা প্রশংসাই বের করতে পারল না। ভেতরে ভেতরে সে টাকার জ্বালায় জ্বলছিল। তবে এখন এটাই সুখ, কাবুলই অন্দর মহলের গোপন খবর বাইরে বের করে দেয়। অন্তত কাবুলের সামনে অতীশের কাছে বৌরাণীর কথাটা প্রকাশ করতে পেরে মনে মনে কিছুটা আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে।

গাড়িটা তখন রাজবাড়ির মুখে বাঁক নেবে। ওরা সবাই দেখল ঠিক ঢোকার মুখে সেই পাগল ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাবুল গলা বার করে বলল, এই হরিশ পালা। দাঁড়া এক্ষুনি পুলিশে খবর দিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে কাজ। হরিশ দৌড়ে পাশের দেবদারু গাছটার নিচে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল।

আর কিছু পরেই ঢুকছে বৌরাণীর গাড়ি। রাস্তা থেকে গাড়ির হর্নেই টের পায় আসছে। কিন্তু মাঝপথে যেন গাড়ি আটকে গেল। হরিশ ঊর্ধ্ববাহু হয়ে আবার দাঁড়িয়েছে। এই পাগলের উৎপাতে আর শহরে থাকা গেল না। শম্ভু দরজা খুলে লাফিয়ে নামল। তারপর একটা ব্যাটন নিয়ে এগিয়ে গেল। কিন্তু হরিশ নড়ল না। সে ব্যাটনটা চেপে ধরল যেন পেয়ে গেছে। দম সাদা দমের লাঠিটা রাজবাড়ির লোক তালে চুরি করেছে। সে ব্যাটনটা চেপে ধরল। এবং ঈষৎ গণ্ডগোল হচ্ছে ভেবেই দারোয়ান দৌড়ে গেল। টের পেয়ে অন্য পাইকরা দৌড়ে গেল। ঠেলেঠুলে থাবড়া মেরে হরিশকে বসিয়ে দিল সবাই। হরিশ সেই কখন থেকে খুঁজছে। পেয়েও পেল না। সে রাজবাড়ির দিকে মুখ করে দাঁড়াল। তারপর থুথু ছিটোতে থাকল।

তখন অতীশ সিঁড়ি ভেঙে উঠছে। যেন সে অন্ধকারে ধাপ খুঁজে পাচ্ছে না। হাতড়ে হাতড়ে উঠে যাচ্ছে। অন্ধকারে বোধ হয় চামচিকে উড়ছিল। একটা এসে নাকে মুখে গোঁত্তা খেয়ে পড়ল—সে কোন রকমে বলল, যা পালা। তারপর আবার সিঁড়ি ভাঙতে থাকল।

অন্ধকারেও অতীশ ভারি সতর্ক—কেউ দেখে ফেলতে পারে, সে টলে টলে উঠছে। বাইরে থেকে আলো পড়ছে—সিঁড়িটা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পা টেনে টেনে সে উঠে এল। মানসদা দেখে ফেললে ভারি অস্বস্তিতে পড়ে যাবে। এই মানুষটাকেই সে এখন এ-বাড়িতে একমাত্র সমীহ করে। আর সব কেন জানি মনে হয় ফালতু—মনে হয় সকাল সন্ধ্যা কেবল ধান্দায় ঘুরছে। তালা খুলে ঘরের ভেতর ঢুকতেই দেখল, একটা চিঠি—নীল খামের চিঠি মেঝেতে পড়ে আছে। নির্মলা চিঠি লিখেছে। বড়ই ছেলেমানুষের মত চিঠিটা তুলে নিল। ঘাম হচ্ছে—জবজবে ভিজা শরীর। ফুল স্পীডে পাখা চালিয়ে সে গড়িয়ে পড়ল বিছানায়। সারা শরীরে ক্লান্তি। চোখ বুজে আসছে—কেমন অসাড় লাগছে। তার জুতো মোজা খোলার পর্যন্ত যেন শক্তি নেই। অথচ চিঠিটা পড়া দরকার। বাড়ির খবরের জন্য উদ্বিগ্ন ছিল। টুটুল মিণ্টুর কথা মনে হলেই সে অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। এত প্রিয় চিঠিটা পর্যন্ত পড়ার জন্য সে কেন জানি আকর্ষণ বোধ করছে না। মেজাজটা কেমন বোঁদা মেরে আছে। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে পারলে ভাল হত। স্নান করলে সে আরাম পেত। এমন আলস্য শরীরে যে তার এক পা উঠে গিয়ে কিছু করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এত প্রিয় চিঠি সে এখনও অবহেলায় ফেলে রেখেছে। এভাবে কতক্ষণ ছিল সে জানে না, সহসা দরজায় খুটখুট শব্দ হতেই ওর যেন হুঁশ ফিরে এল—কে! কে!

—আমি নব।

অতীশ বুঝতে পারল সারা দিন এই ভয়টাই তাকে তাড়া করেছে। নব আসবে। নবর বাবাকে সে কথা দিয়েছে। নব এলে কি বলবে। নব বিশ্বাস করবে না, সুরেন বিশ্বাস করবে না চাকরি দেবার কোন ক্ষমতা তার নেই। রাজবাড়ির সে একজন ক্রীতদাস। এই ভয়ংকর তাড়না তাকে শেষ পর্যন্ত কাবুলবাবুদের কাছে নিয়ে গেছে। নবর কাছ থেকে পালিয়ে যাবার এছাড়া তার যেন কোন উপায় ছিল না। না কি সে বুঝতে পারছে, নিয়তি তাকে এই বড় শহরে টেনে এনেছে। জীবনের এক পরিমণ্ডল থেকে অন্য এক পরিমণ্ডলে। মানুষের নিয়তি এই রকমের, বিশ্বাস করতে পারলে তার কষ্ট থাকত না, এর

জন্য সেই দায়ী—এবং এসব ভাবনা আরও তাকে পেয়ে বসল, নব ফের ডাকল, স্যার সুখবর দিতে এলাম। দরজাটা খুলুন।

নবর জীবনে সুখবর, কেমন এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা, সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে সরে দাঁড়াল। মুখে মদের গন্ধ পেতে পারে। সে বিছানায় এসে বসল। নবকে অন্য সময় হলে বলতে পারত, এখন না কাল এস, কিন্তু সকাল থেকেই সে নবর কাছে একটা বড় রকমের কথার খেলাপ করে অপরাধী সেজে বসে আছে। তার মুখে বড় কথা শোভা পায় না। ছোট কথাও না। সে বলল, কি খবর নব?

নব বসল না। দরজার কাছে দাঁড়িয়েই কাঁচুমাচু মুখে বলল, দশটা টাকা সাহায্য দেবেন স্যার। সাহায্য কথাটা যেন খুবই কৃপাপরবশ হয়ে নব বলল। সোজা বললেও যেন দোষের হত না। —দশটা টাকা ছাড়ুন তো। কেরামতি অনেক দেখা গেল। দশটা টাকা এখন দরকার। দিন।

অতীশের কাছে দশটা টাকা অনেক। এখানে সে খুব টিপে টিপে চলছে। দশটা টাকা চাইলেই হুট করে দিতে পারে না। কিন্তু যেন যকের মত নব দরজায় ঠাণ্ডা মেরে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ মুখ স্থির। ভয়ে ভয়ে সে বলল নব কাল হলে চলে না। এখন ত টাকা নেই।

—কালই দেবেন স্যার। শনিপূজা করব। মূলধনের অভাব। বাবা বললেন, নতুন স্যারকে বলেছি, তোকে যেতে বলেছে। আমি কিন্তু স্যার গেলাম না। রাজার কারখানা সব লাটে উঠছে। ভাঙা কপাল, আর ভাঙতে চাই না স্যার। তাছাড়া বামুনের ছেলে, পূজাপার্বণে লেগে থাকাই ভাল। সবার কাছ থেকে চাঁদা তুলছি। এই চাঁদাটা মূলধন হিসাবে। তারপর আপনাদের সঙ্গে পার্টনারশিপ বিজনেস স্যার। মোট ত্রিশ টাকা দরকার। একটা পুরোহিত দর্পণ, শনির পাঁচালী, বলে নব এগিয়ে এল। তাঁর বিজনেস প্রোগ্রামের খাতাটা খুলে দেখাল, বিশ্বাস না হয় দেখুন, এ ছাড়া আতপ চাল, কলা, বাতাসা দুখানা সন্দেশ, এক কেজি দুধ, চালের গুঁড়ো সিন্নি প্রসাদের জন্য, ফুল-ফল আমের পল্লব, ঘট হরতকি তামা তুলসী এসবে মোট খরচ আঠার টাকা বাষট্টি পয়সা। একটা আসন, মূর্তি গড়া ঢাকের খরচ বাবদ সাত টাকা। মিসলেনিয়াস খরচ আরও পাঁচ টাকা। ত্রিশ টাকা মূলধনে বিজনেস। কনসার্নের নাম নবর শনিপূজা। আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে। রোজ শনিবার। শনি ঠাকুরকে সব শুয়োরের বাচ্চা ভয় পায় স্যার। মোক্ষম লাইন ধরেছি। কি বলেন স্যার। বলে নব কাছে ঘেঁষে

আসতে চাইলে, অতীশ সরে বসল। বলল, তুমি ওখান থেকেই বল। হ্যাঁ হ্যাঁ সব বুঝছি। ভাল ব্যবসা।

—আপনার দশ টাকা শেয়ার। বাবার দশ টাকা শেয়ার, হাবুবাবু দেছেন পাঁচ টাকা, দু টাকা মতিপিসি, এক টাকা নধরবাবু, এক টাকা রাধিকাদাদু। এই ছজন শেয়ার হোল্ডার। আর চারজন শেয়ার হোল্ডার টাকা দিচ্ছে না। যার দোকানের সামনে ফুটপাথ, সে একটা শেয়ার চাইছে। বাকি তিনটে শেয়ার নিজের। আমি স্যার অ্যাকটিং পার্টনার। আপনি ভাল মানুষ বলে দশ টাকার শেয়ার দিচ্ছি।

নব তাকে মুক্তি দিয়েছে ভাবতে গিয়ে অতীশের চোখে কেন জানি জল এসে গেল। বলল, আমি এক্ষুনি দিচ্ছি। তুমি নিয়ে যাও নব। তোমার ভাল হোক।

—ভাল আমার হবেই স্যার। আমি এই দিয়েই বিপ্লবের কাজটা শুরু করব। আতঙ্কে ঘুম আসবে না চোখে। শনিঠাকুর বলে কথা। হাজার হাজার মানুষ যাচ্ছে। পাঁচ পয়সা দশ পয়সা দিলে তখন ভেবে দেখুন কত পয়সা। একটুও ব্লাফ দিচ্ছি না স্যার। তারপর পরামর্শ নেবার মত গলা বাড়িয়ে আরও কাছে আসতে চাইলে অতীশ আবার দূরে সরে একেবারে খাটের কোণায় চলে এল। তারপর এগোলে তাকে দেয়ালে ঠেস দিতে হবে।

—আচ্ছা স্যার কার্ড ছাপলে কেমন হয়। নবর শনি পূজা। স্বপ্নে পাওয়া। তিনি জাগ্রত, মানুষের দুঃখ দুর্দশায় বিচলিত হয়ে নবর আশ্রয়ে হাজির। এই এমন সব বিজ্ঞাপন দিয়ে একটা কার্ড ছাপালে কেমন হয়।

অতীশ বলতে পারত—কিছু হয় না। আবার হয়ও। কিন্তু কথা বললে কথা বাড়বে। সে বালিশের নিচ থেকে মানিব্যাগ বের করে দশটা টাকা দিয়ে সারা দিনের গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে চাইল।

নব বলল, স্যার আপনি দেখবেন, কি করি। সারা শহরটা শনির আখড়া বানিয়ে ছাড়ব। দরকার হলে পার্টনারশিপ থেকে প্রাইভেট লিমিটেড, ব্যবসা বড় হলে পাবলিক লিমিটেড করে ফেলব। উত্তর কলকাতা মধ্য কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতায় আমরা অফিস খুলব। পাড়ায় পাড়ায় সমাজসেবা কেন্দ্র খুলব। ভিখারীদের জন্য লঙ্গরখানা। অনেক স্বপ্ন স্যার, আশীর্বাদ করবেন যেন সার্থক হয়।

মদের ঘোরে অতীশ বলল, তোমাকে আশীর্বাদ করছি নব। আমার বাবা এখানে থাকলে তিনিও তোমাকে আশীর্বাদ করতেন। ভারত জননী বেঁচে

থাকলে তিনিও তোমায় আজ আশীর্বাদ করতেন। তুমি এবারে যাও। শুভ কাজ ফেলে রেখ না।

নব চলে যাবার পরই অতীশ কেমন হাল্কা হয়ে গেল। শরীরে জড়তা নেই। সে কেমন মুক্ত পুরুষ। তার চান করা দরকার। সে চান করে এল। খুব ফ্রেস লাগছে শরীর। ঘড়িতে দেখল এগারটা বেজে গেছে; পাশের ঘরগুলি থেকে কেউ দেখে না ফেলে, সেজন্য সে বারান্দার জানালা-দরজা বন্ধ করে রেখেছে। পেছনের জানালা খুলে দিয়েছে। খুলে দিলেই বড় একটা ডুমুর গাছ, আর তার পাশে সেই অতিকায় জেলখানার পাঁচিল। পলেস্তারা খসে পড়ার শব্দ, কীট-পতঙ্গের শব্দ। তখনই মনে হল নির্মলার চিঠি। তার দুই জাতক, বাবা-মা ভাইদের খবর, বাবার অনুমতির খবর এসব এই চিঠিটা পড়লে জানতে পারবে।

খাম খুলে সে দুটো চিঠি পেল। একটি বাবার, একটি নির্মলার। নির্মলার চিঠি খুলে দেখল; কয়েক লাইন লেখা। টুটুলের জ্বর সেরেছে। বাবার খুব ইচ্ছে নয় আমরা কলকাতায় যাই। কিন্তু আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। তোমাকে ছেড়ে একদণ্ড থাকতে পারবো না। তালে মরে যা'ব। দাদাকে ফোন করেছিলে কিনা জানিও।

বাবার চিঠি খুবই দীর্ঘ। লিখেছেন, পরমকল্যাণবরেষু। বাবা অতীশ, তোমার পত্রে সব অবগত হলাম। বৌমাদের নিয়ে যেতে চাইছ। তুমি জানিয়েছ সেখানে তোমার বিনা পয়সায় একটি থাকবার বাসস্থান মিলেছে। বৌমার ইচ্ছা যায়। আমারও অমত নেই। তবে বড় আশঙ্কা তুমি না আবার দ্বিতীয়বার ছিন্নমূল হও। সংসার থেকে মানুষ আজকাল বিচ্ছিন্ন হতে ভালবাসে। এটাই রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে। নাড়ির টান ছিঁড়ে গেলে মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা বাড়ে। মানুষের মহত্ত্ব ছোট হয়ে যায়। ওরা চলে গেলে বাড়িটা খালি হয়ে যাবে এই কষ্টটা বাজছে। যাই হোক আমার কোন অমত নেই। তাছাড়া আর একটা দিকও আছে। সেটাও ভেবে দেখলাম। বৌমা কাছে থাকলে তোমার বাইরের আকর্ষণ কমবে। আমার নাতি-নাতনীরা কাছে থাকলে তুমি পথ পরিবর্তন করতে ভয় পাবে। নিজের আত্মীয়পরিজনের সঙ্গে এজন্যই ঘনিষ্ঠ থাকা দরকার হয়ে পড়ে। অশুভ প্রভাব থেকে এই ঘনিষ্ঠতা মানুষকে বাঁচায়।

বাবা কি টের পেয়েছেন, সে কখনও কখনও অশুভ প্রভাবে পড়ে যাচ্ছে। বাবা তো বলেন, তিনি সব টের পান। বৌরাণী কমলকে দেখে তার ভেতরে কিছু একটা হচ্ছে এটা কি বাবা ধরে ফেলেছেন। কিংবা বাবা কি তারপরের

চিঠিতে লিখবেন, অতীশ তুমি প্রলোভনে পড়বে না। হাসিরাণীর নথ যে তোমাকে নাড়া দিচ্ছে। বাবার এই ধরনের সাধুবাক্যের প্রতি তার সহসা কেন জানি ভারি উষ্মা জন্মাল। যত্ত সব। যত না বৌরাণীর জন্য, তার চেয়ে বেশি বাবার এই চিঠিটা তাকে পাগলা ঘোড়ার মত তাড়া করতে থাকল। কখনও মনে হয়েছে বোকামি, কখনও মনে হয়েছে না সে ঠিকই করেছে। ইস্কুলের কাজটা ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় এসে সে ঠিকই করেছে। কাজের ক্ষেত্রে কোন সরল বিশ্বাসের ক্ষেত্র থাকবে না সে ভাবতে পারে না। অতীশ পরমুহূর্তেই বুঝতে পারে বয়সেরই দোষ এটা। অথবা বাবার জীবন যাপন—অঋণী অপ্রবাসী থাকতে চেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু প্রবাসে তাঁকে আসতেই হয়েছে। ঘাড়ধাক্কা খেয়ে প্রবাসে এসেছেন। প্রবাসে এসেও অঋণী থাকার কি হাস্যকর প্রচেষ্টা। চিঠিটা পড়তে পড়তে বাবার ওপর কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে গেল এসময়। বাবা সামান্য অসাধু হলে পৃথিবীর আর কতটা ক্ষতি হত। আর এরই নাম বোধ হয় রক্তে বীজ বপন করা। বাবার সব সংস্কার সে রক্তে ধারণ করে আছে। মাঝে মাঝে গা ঝাড়া দিয়েছে—বাড়তি কিছু ফেলেও দিয়েছে।

যেমন তার খুব শৈশবে উপনয়ন হয়েছিল। আহ্নিক করা, দু বেলা আহার, একাদশীর দিনে শুধু ফলমূল আহার—তাকে কিছুটা সংশয়ে ফেলে দিয়েছিল। জীবনে এটা বড় কৃচ্ছ্রতার দিক। বড় হবার বয়সে সে মাঝে মাঝে গা ঝাড়া দিত—বাবা তখন আরও ধার্মিক হয়ে যেতেন। তাকে কাছে ডেকে প্রাচীন ঋষি পুরুষদের কথা বলতেন। তাঁদের কাম লোভ মোহ সম্পর্কে জাগতিক সরল ব্যাখ্যা দিতেন। এভাবে বর্ণাশ্রম থেকে আরম্ভ করে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যে চলে আসতেন। শ্লোক উচ্চারণ করতেন গম্ভীর গলায়। বেদ উপনিষদের সব গুহ্য কথা আওড়ে যেতেন। ধর্ম মানুষকে বড় করে দেয়। ছোট করে না। এ-সবও বলতেন। তবু সে কেন জানি নিজের বিবেকের সঙ্গে ঠিক ঠিক সমঝোতা না হওয়ায় জাহাজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উপবীত ত্যাগ করেছিল, শরীরে অপ্রয়োজনীয় বাড়তি কিছু রাখা আদপেই কেন জানি তখন তার পছন্দ হত না। জাহাজ থেকে ফিরে এসে বাবার সঙ্গে প্রথম খটাখটি সেই নিয়ে। এভাবে এক অদৃশ্য দ্বন্দ্বযুদ্ধ পিতা-পুত্রের মধ্যে চলছিল।

কিন্তু তার মনে হয় বাবাই শেষ পর্যন্ত জিতে গেছেন। এই যে সে কিছুকাল আগে স্কুলের কাজে ইস্তফাপত্র দিল, তারও মূলে বাবা। আসলে তার অহংকার সততার অহংকার, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবা কেন যে বললেন না, কিছু না

কিছু মানুষকে অসাধু হতেই হয়। এবং মানুষ এই অসাধু হবার প্রবৃত্তি থেকে রেহাই পায় না।

এসব কারণেই বাবার যৌবনকাল সম্পর্কে সে উদাসীন থাকতে পারত না। বাবার সঙ্গে যখন মুখোমুখী হবার বয়সে, তখন বাবার ঠিক যৌবনকাল ছিল না। খুব প্রৌঢ়ও নন। বাবার ঠিক যৌবনের কোন আচরণেরই সে সাক্ষী থাকে নি। থাকলেও মানুষের সেই কূট রহস্য বোঝার বয়স তার হয়নি। তা না হলে বুঝতে পারত কোন প্রলোভনে পড়ে গেছিলেন কিনা তিনি। হঠকারী এমন কি কিছু ঘটনা নেই, যা মানুষের বেঁচে থাকার পক্ষে অতীব প্রয়োজন—মানুষ কখনও না কখনও হঠকারি কিছু করেই থাকে—সব বাবাদের জীবনেই এটা ঘটে থাকে এবং সব বাবারাই পরে সাধুপুরুষ সেজে যান। সে এনিয়ে মাঝে মাঝে মার সঙ্গে কথা বলবে ভাবছে। কিন্তু সেটা এখনও হয়ে ওঠে নি। এমনিতেই মা বাবার ওপর খড়্গহস্ত—একরোখা রক্ষাকালীর মতো সব সময় জিভ ব্যাদন করে আছে। কেন এটা হয় সে বুঝতে পারে না। তার দিকে তাকিয়ে একদিন মা কেঁদেই ফেলেছিল, তোর বাবার সব সহ্য হয়—কিন্তু এমন নিস্পৃহ স্বভাবের মানুষকে কেউ সহ্য করতে পারে না। ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষ হওয়ায় বাবার কর্মক্ষমতায় যেন কোথায় ঘুণ ধরেছিল। এবং ঈশ্বর সম্পর্কিত চিন্তা, ভাবনায় যত মশগুল হতে জানতেন, কাঠখড় কেরোসিনের ব্যাপারে তত তিনি অনাগ্রহী। কৈশোর থেকেই পিতা-পুত্রের এজন্য লাঠালাঠি। সে যতবার খোলা আকাশের নিচে দাঁড়াতে চেয়েছে, বাবা ততবার হাত ধরে নিয়ে গেছেন ঘরে। বাবার যৌবনকালের কোন অসাধু আচরণের খবর পেলে অন্তত হাতটা ছাড়িয়ে নিতে পারত। কিন্তু বহু চেষ্টায়ও সে সেটা পারে নি। আর পারে নি বলেই এখনও পিতার কাছে নতজানু হতে তার ভাল লাগে।

চিঠিটা খোলা পড়ে আছে। খুব জড়ানো লেখা। পড়তে পড়তে তার অভ্যাস হয়ে গেছে বলে কোন কষ্ট হয় না, সে চিঠিটা ফের তুলে দেখল, বাবা লিখেছেন, তোমার কোষ্ঠী সুবলকে দেখিয়েছি। সে বলল, এখন তোমার গ্রহ সন্নিবেশ খুব ভাল নয়। সাবধানে থাকবে। পারো তো হাতে একটা গোমেদ নেবে। এ-সবে অবশ্য তোমার বিশ্বাস কম, তবু এটা করবে, না পার একটা লোহার আংটি পরবে। তাতেও যদি আপত্তি থাকে ওটা কোমরের তাগাতে বেঁধে রাখবে। এতে জানবে গ্রহের প্রকোপ কমবে। এঁরা শান্ত থাকলে জীবনে শুভ হয়।

তার কেন জানি মনে হল আসলে বাবা খুবই একা পড়ে গেছেন। সোনা জ্যাঠামশাই বড় জ্যাঠিমা ছোট কাকা সবাই নিজেদের ভিন্ন আস্তানা গেড়েছে। বড়দার কাছে সোনা জ্যাঠামশাই আছেন। অন্তত সোনা জ্যাঠামশাই বাবার কাছে থাকলে বোধ হয় এত ভীতু হয়ে পড়তেন না। সংসারে বড় বৃক্ষের একটা প্রয়োজন থাকে। এখন যেমন বাবা তার কাছে বড় বৃক্ষের মতো তেমনি সোনা জ্যাঠামশাই বাবার কাছে ছিলেন। এদেশে এসে সব ছত্রখান হয়ে গেল। বাবার ভরসা বলতে গৃহদেবতা। তার বালিশের নিচে কিছু ফুল বেলপাতা রয়েছে। শুকিয়ে কাঠ। তার ডাইরিতেও বাবা ফুল বেলপাতা গুঁজে রাখতে বলেছেন। সে এসব মানুক না মানুক তাকে সবই রাখতে হয়েছে।

তারপর বাবার চিঠিতে, আছে বাড়ির সব খবর। ধলীর একটা ব্যাঁটে কি হয়েছে—দুধ দোওয়ানো যাচ্ছে না। উত্তরের জমিতে বীজধান পুঁতে দেওয়া হয়েছে। প্রহ্লাদের স্ত্রীর অসুখ। সে ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে। দুটো বেড়ালের একটার কদিন থেকে খোঁজ নেই। হাসু-ভানু পড়াশোনা করছে না। কেবল মাছ ধরে না হয় ক্লাব-ঘর বানায় এমন সব অভিযোগ। মার শরীর ভাল যাচ্ছে না। অলকা ফিরে এসেছে। ঘরের চালে দুটো কুমড়ো ফলেছে, আমের কলম করেছেন কটা, প্রতি বছরই তিনি তাঁর ফল গাছগুলোর কলম বানান এবং যজমানদের বাড়ি বাড়ি বিলিয়ে দেন। এই সব খবর লেখার পর পুনশ্চ দিয়ে লিখেছেন, এটা শ্রাবণ মাস—পার ভ সন্ধ্যের অন্ধকারে আকাশের দক্ষিণে যে তারামণ্ডল আছে তা দেখ। এটির নাম বৃশ্চিক রাশি। গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে মানুষের যোগ অমোঘ। ওকে অবহেলা কর না। রাশিটির উত্তরে ঠিক মাঝ আকাশে সামান্য পশ্চিম ঘেঁষে আছে স্বাতী। তার উত্তরে সাতটি তারা নিয়ে সপ্তর্ষি আর ধ্রুবতারা নিয়ে শিশুমার। পশ্চিম দিকে তাকালে বড় একটা গ্রহ দেখতে পাবে। ওটা শনিগ্রহ। ওটা আছে সিংহ রাশিতে। এই সব গ্রহলোক অবলোকনে তোমার শরীর ভাল থাকবে। মন প্রসন্ন হবে। অশুভ প্রভাব থেকেও রক্ষা পাবে—ইতি আং তোমার পিতৃদেব।

অতীশ চিঠি দুটো ভাঁজ করে তোশকের নিচে ফেলে রাখল তারপর মাথার জানলা খুলে দিল। সারা রাজবাড়িটা নিঝুম। রাস্তার আলো জ্বলছে। প্রাসাদের গাড়ি বারান্দায় বলের মত আলোটা বাতাসে দুলছে। শ্রাবণী পূর্ণিমা আসছে। কোথাও মাইকে গান ভেসে আসছিল। বাবা তারকনাথের মাথায় জল দিতে যাবে, নতুন গামছা, সাদা প্যাণ্ট পরনে ছেলে-ছোকরারা মাইকে হল্লা

জুড়ে দিয়েছে। বড় বিশ্রী এবং বিরক্তিকর—মানুষের তীর্থযাত্রার আগে এই উল্লাস কেমন তাকে পীড়িত করছিল। আর এ-সময়ই মনে হল জ্যোৎস্নায় প্রাসাদের ছাদে কোন নারী ঊর্ধ্বমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন গ্রহ-নক্ষত্র দেখছে। এত দূর থেকে স্পষ্ট নয়—তবু কমলের মত লম্বা কোন যুবতী, কোন দূর গ্রহলোকে দৃষ্টি এবং স্থির—অতীশ ভাবল কমলই হবে। এই প্রাসাদে আর কে আছে, রাণীমা এখানে নেই, তিনি কাশীতেই থাকেন। এক মাসে সে যা খবর জেনেছে তাতে করে সে জানে এই প্রাসাদে কমল বাদে আর কোন যুবতী বিচরণ করে না। এই পরিবার সম্পর্কে নানা রকম রহস্যময়তা জড়িয়ে আছে। মানসদা এ বাড়ির প্রতিপক্ষ শুনে সে প্রথমে কিছুটা হতভম্ব হয়ে গেছিল। কুম্ভবাবুই আজ খবরটা দিয়েছে। সে প্রশ্ন করতে পারত, তিনি একা কেন, তালাবন্ধ অবস্থায় থাকেন কেন? মাথার গোলমাল দেখা দেয় কেন? কিন্তু সে কোন প্রশ্নই করে নি। কারণ কাবুলবাবু এ-সব পছন্দ নাও করতে পারে। বাড়ির কেচ্ছা-কাহিনী কে সামনে বসে শুনতে ভালবাসে!

এ-ছাড়া আরো যা খবর, তাতে সে কমল সম্পর্কে কেমন আবেগ বোধ করেছে। গুজব কমল রাজেনদার ধর্মপত্নী না হয়েও এ-বাড়ির বৌরাণী! রাজেনদার ধর্মপত্নী আত্মহত্যা করার পরই কমল এ-বাড়িতে আসে। বাড়ির আনাচে কানাচে এমন খবর ছড়িয়ে আছে। একটু সতর্ক থাকলেই কানে আসে। খুব সাদামাটা একটা রেজিস্ট্রেশন, তারপর পার্টি এবং কমল এ-বাড়ির বৌরাণী। এ-বাড়িতে কমলের পাঁচ বছর কেটে গেছে। কমল এখনও নিঃসন্তান। কমল এবং রাজেনদার ওপর কিছুটা বিরক্ত হয়েই রাণীমা প্রাসাদ ত্যাগ করেছেন! এখন রাণীমার মহলে কিছু দাসীবাঁদী থাকে। রাণীমা কমলকে এ-বাড়ির বৌরাণী স্বীকার করে নিতে পারেন নি। কমলকে এ-বাড়িতে এনে বংশের ঐতিহ্যে রাজেন চিড় ধরিয়েছে। বড় অসুখী রাণীমা। রাজবংশের প্রতিপত্তি এভাবে একজন সাধারণ রমণীর কাছে বিকিয়ে যাওয়ায় তিনি রাজেনকে কুলাঙ্গার ভেবেছেন। এবং এই মতান্তর থেকেই তাঁর কাশীবাস।

অতীশ কান পাতলে, এ-সব কাটা-কাটা কথা সে শুনতে পায়। সহ্য হবে কেন। রাজার ছেলে তাই। শুভাশুভ বলে কথা। কোন মন্ত্রপাঠ নেই, অগ্নিসাক্ষী নেই। বৌরাণী করে ঘরে নিয়ে এলেই হল। কোথাকার কোন এক পরিবার তার কি ঐতিহ্য, তার বংশাবলী কি, কোন ঘরাণার কিছুই বাছ বিচার নেই! এ-বাড়ির বৌরাণী হয়ে আসা কি চাট্টিখানি কথা। খানদানী বংশ দেখে

বেছে বেছে এ-বাড়ির বৌরাণী করা হয়েছে। আর তুই কি না রূপ দেখে ভুলে গেলি। বংশের মুখে চুনকালি দিলি।

অতীশ বুঝতে পারে না, এতে ব্যভিচারের কি আছে। তবু খটকা থেকে যায়, অতীশ বারান্দা থেকে এবার ঘরে চলে এল। এই নিয়ে সে-এত ভাবছে কেন? কমল তাকে আর ডাকে নি, কিছু বলেওনি আর। তবু তার মনে হয় এই তাড়াতাড়ি কোয়ার্টার পাওয়ার পেছনে কমলের হাত আছে। কমল তাকে চিঠিতে কি লিখেছিল! সেই চিঠি, সেই কবেকার চিঠি, সে তখন ভাল করে বুঝতেও পারত না এ-সব। তারপরই কেমন একটা বিভ্রমে পড়ে যায়। চিঠিটা কমল দিয়েছিল না অমলা। সেই শ্যাওলাধরা ঘরটায় অমলা নিরিবিলি জড়িয়ে ধরেছিল না কমলা। কত দূর অতীতের স্মৃতি। সে ঠিক বুঝতে পারছে না। কখনও মনে হয় কমল, কখনও মনে হয় অমল। মাথার ভেতরে তার সেই ঘণ্টা বাজছে। বিভ্রমে পড়ে গেলেই এই ঘণ্টা বাজতে শুরু করে। সে যতবার ভাবে এ-নিয়ে আর কিছু ভাববে না ততো কেন জানি বার বার একই গোলকের মতো দুলতে থাকে, কমল না অমল। এদিকে এলে কমল, ওদিকে গেলে অমল। অমলের চুল নীল, না কমলের চুল নীল। কার চুল সোনালী ছিল? বড় ফ্রক পরা মেয়েটার না, ছোট ফ্রক পরা মেয়েটার? এত আভিজাত্য ছিল ওদের অথচ এ-বাড়িতে কমল আসায় সবাই কেমন রুষ্ট।

অতীশ আলো নিবিয়ে উপুড় হয়ে শুল। পাখা চালিয়ে সে শোয় না। অভ্যাস নেই বলে, দু-এক রাতে চালিয়ে সে বেশ কষ্ট পেয়েছে। সারা শরীরে কেমন হাড় মুড়মুড়ি ব্যথা হয় পাখার হাওয়ায়। কিন্তু ভ্যাপসা গরম। তাছাড়া মাথাটা গরম হয়ে গেছে। আবার চিঠি, নবর শনিপূজা, রাস্তায় মাইকের হল্লা, প্রাসাদের ছাদে কোন রমণীর ছবি তাকে কেমন কাতর করে দিয়েছে। সে চোখ বুজে বলল, কমল তুমি আমার সঙ্গে তঞ্চকতা করেছ। তুমি কমল নও। তুমি অমল। তুমি ভেবেছ আমি সেই শ্যাওলাধরা ঘরটার কথা ভুলে গেছি। কমল আমি ভুলে যাইনি। তোমার মাথায় সোনালী চুল ছিল না কমল। কমলের মাথা ভর্তি ছিল নীলাভ রঙের চুল। তুমি আমার কাছে সতী সেজে থাকতে চাইছ। সতী কথাটা সে বারবার বিড়বিড় করে বকতে থাকল। প্রায় মন্ত্রোচ্চারণের মতো।

॥ এগার ॥

এই পাগল কতকালের চেনা। গাছের নিচে বসে ফকিরচাঁদ হরিশের দিকে তাকিয়ে থাকল। বুড়ো অথর্ব ফকিরচাঁদকে হরিশ এই সেদিন সারা দিনমান জ্বালিয়েছে। কথা নেই বার্তা নেই উর্ধ্ববাহু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। ফকিরচাঁদ অভিশাপ দিয়েছে, হরিশ তোর মরণ ফুটপাথে। বেজন্মার বাচ্চা তুই, ভাবিস মরণ নাই। স্বার্থপর তুই—খাওয়া ছাড়া আর কিছু বুঝিস না। ঝুপড়িতে কে কোথায় কি লুকিয়ে রাখে তক্কে তক্কে থাকা। পাগল সেজে বেশ কালাতিপাত করে গেলে হে। চ্যামনামি করে গেলে হে।

হরিশ তেরিয়া হয়ে গেল। কুকথা বলছে ফকরা। সে দু ঠ্যাং ফাঁক করে চিৎকার করে উঠল, ফকরা তোর মুখে চুনকালি পড়বে।

পাশে হবু যুবতী চারু চিৎকার শুনে উঠে বসেছিল। এবং পিতামহের হাত ধরে ফুটপাথের অন্য প্রান্তে চলে গিয়েছিল। ওরা হরিশের ঝোলাঝুলির মধ্যে সতী বিবির ঝোলাঝুলির মধ্যে পচা গন্ধ পাচ্ছিল কারণ এই ঝোলাঝুলি বরফ ঘরের মতো। সবই দুর্দিনের জন্য সংগ্রহ করা এবং কত রকমের যে উচ্ছিষ্ট খাবার! পাগলিনী সতীবিবি পাশেই চিৎ হয়ে শুয়েছিল। মাংসের হাড় অনবরত চোষার জন্য গালের দু ধারে ঘায়ের মতো সাদা দাগ। শরীরে দীর্ঘ দিনের ময়লার পলেস্তারা মুখের অবয়বকে নষ্ট করে দিয়েছে। চেনা যাচ্ছিল না ওরা জন্মসূত্রে কোনো গ্রাম্য গৃহস্থের ঔরসজাত না অন্য কোনভাবে অথবা কোন অলৌকিক ঘটনার নিমিত্ত এই ফুটপাথ সংলগ্ন অসংখ্য ডাকবাকসের মতো পাতলা অস্থায়ী প্লাইউডের ঝুপড়িতে বসবাস করছে।

পাশের বাড়িটা চারতলা এবং নিচে ফুটপাথের ওপর ছাদের মতো গাড়ি-বারান্দা। সামনে হাসপাতাল এবং রাজবাড়ি। সদর দরজায় কোন এক গোপন চক্রান্তকারী এক হাত লম্বা গণ্ডারের ছবি ঝুলিয়ে রেখে গেছে। কেউ লক্ষ্যই করছে না দেউড়ির মাথায় বাঘ সিংহের পাশে ছবিটা লেপ্টে আছে। রাজবাড়ির ছাদের কার্নিসে কার্নিসে সব পরীদের মূর্তি। ওরা যেন বসনভূষণ আলগা করে বাতাসে উড়ে যেতে চাইছে। সময়ে অসময়ে বুড়ো ফকিরচাঁদ সেইসব বৈভবের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। হাসপাতালের বাড়িটাও দীর্ঘদিন খালি পড়েছিল, শুধু কাক উড়ত ছাদে এবং পাঁচিলের পাশের পেয়ারা

গাছটাতে এক জোড়া ঘুঘু পাখি আশ্রয় নিয়েছিল। ইদানীং চুনকাম হবার সময় মোষের মতো এক ইতর ছোকরা কিছু চুনগোলা জল ছাদ থেকে নালির ফুটোর মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। মোষটা চারুকেও চেটেপুটে রেখে গেছে। সেই থেকে গাছটায় পাখিরা আর বসবাস করে না। সময়ে উড়ে এসে বসে, সময়ে হাওয়া পেলে উড়ে চলে যায়। কেউ আর গাছটায় বাসা বানায় না। নিচে চারু মাঝে মাঝে ছায়া পেলে গামছা পেতে শুয়ে থাকে।

আর এই বাড়িটার জন্যই ভোরের দিকে সূর্যের উত্তাপ ছাদের নিচে নামতে পারে না। অথবা লম্বা হয়ে যখন সূর্য হাসপাতালের মৃত মানুষের ঘর অতিক্রম করে পেয়ারা গাছটার মাথায় এসে নামে তখন ছাদের ছায়া পুরো ফকিরচাঁদকে রক্ষা করতে থাকে। এই জন্যে অভ্যাসের মতো এই জায়গাটা বসবাসের পক্ষে ফকিরচাঁদের পক্ষে বড়ই উপযোগী। স্টেশন থেকে সে বেশিদূর হেঁটে যায়নি। কাছেই জায়গাটা পেয়ে গিয়ে ফকিরচাঁদ হাতের কাছে স্বর্গ পেয়ে গেছিল। বাসস্থান মিলে যাওয়ায় সে আর নিজেকে উদ্বাস্তু ভাবতে পারে না। প্রায় নিজের ফেলে আসা বাড়ি ঘরের মতোই জায়গাটাকে সে ভালোবেসেছে। কেবল উপদ্রব বলতে এই পাগলাটা। যখন তখন সামনে এসে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পচা দুর্গন্ধে তখন টেকা যায় না।

চারু পাশে নেই। কোথাও আহারের জন্য অন্ন সংস্থান করতে গেছে। একটা শতচ্ছিন্ন তালিমারা চাদর ফুটপাথে ছড়ানো। সে তাতে শুয়ে আছে। পাশে গোটা গোটা অক্ষরে লিখে রেখেছে জীবনের কিছু সুসময়ের কথা। পথচারীরা যায়, দেখে—কেউ দয়াপরবশে দু পাঁচ পয়সা ফেলে দিয়ে যায়। সকাল থেকে একটা পয়সাও পড়ে নি। ফলে ফকিরচাঁদ মানুষজনের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে।

কি আর করে ফকিরচাঁদ। প্রচণ্ড দাবদাহ যাচ্ছে। অনাবৃষ্টি। একটা ছেঁড়া কাগজে সে ফসলহানির কথা পড়ে ভারি চিন্তান্বিত। সবার হলে, খেয়ে পরে বাঁচলে তবে তার বরাদ্দ। সবাই ভাল থাকলে, খেতে পেলে সে খেতে পাবে। কিন্তু অনাবৃষ্টিতে ফসলহানি হলে, তার চলবে কেন। কিছু তুকতাক মন্ত্রপাঠ সে জানে। সে বিশ্বাস করে, এই জাদুটোনা করতে পারলে আকাশ উপুড় হয়ে ঢল নামাবে। সে পানের দোকান থেকে চুনের টোফা চুরি করে এ জন্য কাল রাত থেকে নিজের খুপড়িতে লুকিয়ে রেখেছে। রোদ উঠলেই সেটা নিয়ে সে যায়। হরিশ ব্যাটা ঠিক টের পেয়ে গেছে ও বেটা আরও বড় গুনিন। হিতে বিপরীত হতে পারে ভেবে টোফাটা রোদে রাখার সময় ভারি সতর্ক—দেখে

ফেললেই গেল। সে বাণ মেরে তার অভিসন্ধি উড়িয়ে দিতে পারে। ফকির-চাঁদ বড়ই অস্বস্তিতে আছে। মন দিয়ে বাবা দয়া করেন পুত্র কন্যা সুখে থাকবে, মঙ্গল হবে আপনার ঠিকঠাক বলতে পারছে না। বড়ই সমস্যা তার। চুনের টোফায় লোহা ডুবিয়ে তাতে দিলে বরুণদেবের কলিজা ফেটে যায়—ভয়ে বৃষ্টি নিয়ে আসে এমন বিশ্বাস ফকিরচাঁদের। কিন্তু তাতে দিলেই ঢ্যামনা হরিশ ঠিক টের পেয়ে পালটা তুকতাক করে ফেলতে পারে। বেটা মনুষ্যজাতির অপোগণ্ড। ভাল চায় না। রসাতলে সব গেলে সে হাহা করে হাসতে পারে। ফকিরচাঁদ মানুষের ভালর জন্য বৃষ্টি নামাচ্ছে জানতে পারলেই ধুন্ধুমার কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে। সেদিন যেমন লাঠি নিয়ে পড়েছিল, আজ ফকিরচাঁদকে। পুলিশে জানাজানি হলে জেল হাজতবাস হতে পারে। না বলে না কয়ে টোফা চুরি অসাধু কাজ।

সব কিছু রোদের উত্তাপে পুড়ে যাচ্ছে। বর্ষাকাল কে বলবে! গ্রীষ্মের মতো পিচে কাদা ধরেছে। চটচট করছে। বাস ট্রাক গেলে চটর চটর শব্দ সে শুনতে পায়। কর্পোরেশনের গাড়ি রাস্তায় বালি ছিটিয়ে যাচ্ছে। তখন পাগলা হরিশ পিচগলা পথে, মাথায় দুপুরের রোদ, লাঠিতে পাখির পালক বাঁধা—বিজয় গর্বে হেঁটে যাচ্ছে। যত শহরটা দাবানলে পুড়ছে তত হরিশ উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে।

দূরে অদূরে সব ডাস্টবিনের জংশন এবং সেখানে হয়ত চারু পোড়া কয়লা, ছেঁড়া কাগজ, লোহার টুকরো খুঁজছে? ফকিরচাঁদের বিশ্বাস খুঁজতে খুঁজতে একদিন চারু ঠিক শহরের গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে যাবে। এই আশায় ফকিরচাঁদ এখনও বেঁচে আছে—না হলে সে কবেই মরে যেত। ফকিরচাঁদ এবার উঠে পড়ল। এক মগ চা এ-সময়টায় সে খায়। চা চেয়েচিন্তে কিছু পয়সা দিয়ে নিয়ে এসে বসতেই মনে হল ঢ্যামনা হরিশ এদিকটায় আসছে। বড় জ্বালা হয়েছে। কিছু মুখে দিতে পারে না। সে হামাগুড়ি দিয়ে খুপরির মধ্যে ঢুকে ঝাঁপ টেনে দিল। আর তখনই মনে হল টোফাটা রোদের তাতে রয়েছে। ওটা হরিশ এই ফাঁকে তার ঝোলাঝুলিতে পুরে ফেলতে পারে। এতবড় একটা শত্রু পক্ষ তার—মোকাবেলা করতে পর্যন্ত ভয় পায়। সে চা খাবে না টোফা তুলবে। কোনটা আগে দরকার। আসলে শরিকী ঝগড়া। ফকিরচাঁদ ভাবে এলাকাটা তার, হরিশ ভাবে তার। এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে কতদিন থেকে একটা অদৃশ্য যুদ্ধ চলছে শহরের মানুষেরা যদি টের পেত। তাদের কি, খায় দায়—আছে সুখে। গাড়ি বাড়ি করে আছে বেশ। ঝামেলা ঝঞ্ঝাট কিছুই পোহানোর নেই। বুঝত, ঠ্যালা বুঝত, যদি হরিশের মতো থাকত একটা বড়ই হিসেবী শত্রুপক্ষ।

না হরিশ টের পায় নি। সে চা খাচ্ছে টের পায় নি। সে টোফা রোদে পিঠ দিয়ে বসে আছে টের পায় নি। যাক নিশ্চিন্তি। পরম আরাম। হরিশ উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে যাচ্ছে। গির্জার ওদিকটায় চলে যাচ্ছে। পথ থেকে সে তার অমূল্য আসবাবপত্র কুড়িয়ে নিতে ভুলছে না। কোনটা কখন কি মহার্ঘ কাজে লেগে যাবে কে জানে।

রাতের আহারের জন্য খড়কুটো অথবা পাতলা কাঠ সংগ্রহ করতে হয়। চারু সাঁজবেলায় গাছতলায় আগুন দেয়। হাঁড়িতে চাল দিয়ে কুমড়ো আলু কাটতে বসে। কোত্থেকে পচা মাছটাছও নিয়ে আসে চারু। খুবই সংসারী। চারু যে ঘরে যাবে, আলো হয়ে যাবে সে ঘর। বুড়ো ফকিরচাঁদ চোখ বুজে সুখের স্বপ্ন দেখে।

বুড়ো ফকিরচাঁদ এবার পা দিয়ে নিজের হস্তাক্ষর মুছে দিল। পাঁচিল সংলগ্ন ওর ছোট প্লাইউডের সংসার। বসবাসের উপযোগী নয়, শুধু তৈজসপত্র রাখার জন্য পাতলা প্লাস্টিকের চাদর দিয়ে সব ঢাকা। ফকিরচাঁদ কি মনে করে আজ সব টেনে বের করতে থাকল—হাঁড়ি পাতিল, ছেঁড়া কাঁথা, ভাঙা জলের কুঁজো সবই চারুর সংগ্রহ করা—ডাস্টবিন থেকে। মেয়েটার সারাদিন ঘুরে ঘুরে ঐ এক সংগ্রহের বাতিক—ঠিক ঢ্যামনা হরিশের মতো। এবং চারুই স্টেশন থেকে এই বাড়ি সংলগ্ন পরিত্যক্ত গাড়ি বারান্দা আবিষ্কার করে ফকিরচাঁদের হাত ধরে চলে এসেছিল এবং জায়গাটার দখল নিয়েছিল। দখল নিলেই হয় না, তাকে রক্ষা করতে হয়। এক বছরে পাঁচ সাতবার এই রাজ্যটার ওপর নানারকম আক্রমণ ঘটেছে। চারুর চোপার গুণে কেউ তিষ্ঠোতে পারে নি। মেয়েটার চোপা ছিল বলেই এ-যাত্রা ফকিরচাঁদ বেঁচে গেল। পরজন্মে চারুর মতন একটা নাতিন যদি না মেলে জীবনে হেনস্থা আছে। সে-জন্য সে হরিশের মতো চুরি-চামারি করতেও ভয় পায়। ভগমান বড়ই সতর্ক প্রহরী।

ফকিরচাঁদ এ-সময় চারপাশটা দেখল। কত বড় শহর, কত লম্বা ট্রাম লাইন, কত মানুষজন, কেবল যাচ্ছে আর আসছে। শেষ নেই। সকাল থেকে মানুষের পেছনে কোন এক অদৃশ্য শক্তি তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কাউকে নিস্তার দিচ্ছে না। তাড়া খেয়ে কেবল ছুটছে। দুদণ্ড অবসর নেবে তাও সময় নেই। এইসব মানুষের জন্য ফকিরচাঁদের কষ্ট হয়। কে সেই কাগতাড়ুয়া যে মানুষকে স্বস্তি দিচ্ছে না। মানুষজন, বাস, ট্রাম, ঝোলাঝুলি দেখতে দেখতে এ-সব মনে হয় ফকির-চাঁদের। তার হাই ওঠে। মগের চা কিছু খেয়ে কিছুটা চারুর জন্য রেখে দিয়েছে।

একটু দূরেই হরিশের আস্তানা। দুজনের একজনও কাছে ভিতে নেই। দু'জনই সারা রাস্তায় ঢ্যামনামির জন্য বের হয়ে গেছে। দুজনই কোমর দুলিয়ে পাগলামি করে হোটেলের উচ্ছিষ্ট খাবার নিয়ে আসতে গেছে।

আর তখনই গাড়ি থেকে একটা সুন্দর মতো বৌ নেমে বলল, পাগলা বাবা কাঁহা?

ফকিরচাঁদ বৌটাকে চেনে না। কে জানে কি বিশ্বাস, বৌটা এক ঝুড়ি ফলমূল হরিশের আস্তানায় রেখে দাঁড়িয়ে থাকল। সঙ্গের চাপরাশিটাকে বলল, দেখত পাগলা বাবা কাঁহা?

ফকিরচাঁদ বলল, দে যান আমাদের, হরিশ এলে দেব। হরিশ কবে থেকে পাগলা বাবা হল! নধরকান্তি বৌটির নাকে নথ দুলছে! ফকিরচাঁদকে হয়ত ফেরেববাজ ভাবছে। বৌটি কিছু বলল না। চাপরাশি এসে বলল, গির্জার ওদিকটায় হাঁটু মুড়ে বসে আছে। এবার গাড়ি থেকে এক স্থূলকায় বাবু নামলেন, তিনি হনহন করে হাঁটতে পারেন না, বৌটি হনহন করে হাঁটতে থাকল। তারপর সেই পাগলা বাবার পায়ে গড় হতেই হরিশ বুঝল আরে সেই নারী, যারে সে মুতে দিয়ে বলেছিল খা, দেখবি তোর ভাল হয়ে যাবে। কে জানে কি হল, বৌটা সত্যি সামান্য কণিকামাত্র ধূলিকণার মতো আঙুলে তুলে মুখে মাথায় দিয়েছিল। স্বামীর বাড়াবাড়ি তা নিয়ে সে গেছিল ঠনঠনে। সেখানে পূজা দিয়ে ফেরার সময় পাগলা বাবার দেখা। পাগলা বাবা তার বিড়ম্বনা টের পেয়ে সাধু বাক্য উচ্চারণ করেছে। রমণী সবই সেই বিধাতার নির্বন্ধ ভেবে মুখে দিয়ে বাড়ি ফিরেছিল এবং অলৌকিক কিছু প্রায় তার স্বামীর শরীরে ঘটে গিয়েছিল। মানুষটা চোখ মেলে তাকিয়েছে। সেই থেকেই হরিশের খোঁজ। খুঁজে খুঁজে পেয়েও গেল একদিন। পাগলা বাবার জন্য হাঁড়ি পাতিল ভর্তি দই সন্দেশ ফলমূল নিয়ে এসেছে। হরিশ দেখেই হাঁ হাঁ করে তেড়ে গেল। পাগলামি আরও বাড়িয়ে ফেলল। রাস্তায় অপোগণ্ড সব হাজির। দু হাতে সে সব বিলিয়ে দিয়ে খালি পাতিল মাথায় টুপির মতো পরে দৌড়াতে থাকল। তারপর গলি ঘুজিতে ঢুকে উঁকি দিতে থাকল, বাবু মানুষের বৌটা আর খুঁজছে কিনা। উঁকি দিয়ে দেখতে থাকল।

অতীশ অফিস যাবার মুখেই দেখল, দেবদারু গাছটার নিচে পরিচিত কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে। আর এ যে শেঠজী! সিট মেটালের এক নম্বর খদ্দের। এত বড় মানুষটা এখানে! মাঝে খুব অসুখ শুনেছিল। কুম্ভবাবু খুব যাতায়াত

করত তখন। তাকেও বলেছিল, চলুন। সময়ে অসময়ে কোম্পানির টাকা যোগায়। লোকটার ভাল মন্দের সঙ্গে কোম্পানির নসিব জড়িয়ে আছে। অতীশ যার যাব করেও যেতে পারে নি। সেই মানুষ দেবদারু গাছের নিচে! সে ট্রাম রাস্তা পার হতেই শেঠজী তাকে দেখে বলল, বাবুজী আপ!

—আপনি!

—আর বলবেন না। বহুৎ মুসিবৎ মে গির গিয়া। পাগলা বাবা থুথু ফিক দিয়া। কাঁহা চলে গেল!

রাস্তায় লোকজন জমা হয়ে গেছে। কারণ এই রাস্তার পাগলটাকে খাওয়াবার জন্য খানদানি ঘরের বৌ একজন ছুটাছুটি করছে। পাগলটা সব রাস্তার অপোগণ্ডদের দিয়ে থুয়ে খালি পাতিল মাথায় দিয়ে কোন দিকে চলে গেল! অতীশ শেঠজীর এই পাগল প্রীতিতে কিছুটা অবাক হয়ে গেল। দু' নম্বরী কাজ করে মানুষটা বছর দশেকের মধ্যে কলকাতায় মোকাম, দেশে মোকাম ইস্কুল, মন্দির বানিয়ে ফেলেছে। এবং সিট মেটাল না থাকলে এটা সে পারত না। কোম্পানি ফাঁক পেলে দু' নম্বরী মাল তৈরি করে। অতীশ গতকাল এটা টের পেয়েই মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছে। তেল পাউডার, ওষুধের সব ডিব্বা বানিয়ে দিতে হয়। ছাপ নম্বর হুবহু এক থাকে। আজ এ-নিয়ে সে রাজেনদার সঙ্গে কথা বলেছে। রাজেনদা খুব দূর থেকে দেখার মতো দার্শনিক গলায় জবাব দিয়েছেন, চারপাশটা ভাল করে দেখ। বোঝ সব। আরও কিছুদিন লাগবে দেখছি তোমার।

অতীশ বলেছিল, এতে জেল হাজতের ভয় আছে। ধরা পড়লে।

—বিশ বছর ধরে এই হচ্ছে। কেউ ধরা পড়েছে বলে ত জানি না! তুমি পড়বে কেন? সব দিকে নজর রাখ, ঠিকঠাক রাখ, তবে দেখবে কেউ কিছু করতে পারবে না। তারপরই বাঙালীর অধঃপতন নিয়ে কিছু ভাষ্য—এর জন্যই জাতটা গেল। বাইরের লোক এসে দু' দিনেই টু পাইস করে ফেলছে। দেশের লোক, নিজের শহর, রামমোহন বিদ্যাসাগর মশাই এ শহরে বড় হয়েছেন, তোমরা তার উত্তরাধিকার, কিন্তু সব লুটেপুটে নিচ্ছে—আটকাতে পারছ না।

শেঠজী কানে কানে বলল, ই রাজবাড়ি হ্যায়। কেতনা বড়া মোকাম। রাজাবাবু কো একদিন দেখিয়ে দেবেন।

অতীশ বলল, দেব।

—বহুত পুণ্যবান আদমী। দর্শনে মুক্তি ভি হয়।

অতীশ বলল, হয়।

অতীশ তারপর বলল, রাস্তায় লোক জমে যাচ্ছে। গিন্নিকে নিয়ে বাড়ি যান।

—হামার বাত ও শুনবে! পাগলা বাবা পাগলা বাবা করে ওয়ার ত জান গেল!

এই হচ্ছে মানুষ, অতীশের এমনই মনে হল। নিজের জন্য সব পাপ কাজ করছে—পুণ্য কাজও করছে। সেও ভালো নেই। একটা চক্রান্তের মধ্যে সে নিজেও জড়িয়ে পড়ছে। এখান থেকে সে নিস্তারও পাবে না। এক জটিল আবর্তে সে পড়ে গেছে। আর এ-সময় কেন জানি নির্মলার ওপর সে খেপে গেল। তারপর ভাবল যেভাবেই হোক বাজারে দু' নম্বরী মাল সাপ্লাই সে বন্ধ করবে। আর দেখা গেল সেই জনতার ওপর দিয়ে কেউ দুই অতিকায় বাহু বাড়িয়ে দিয়েছে আকাশে। সে তখনই শেঠজীকে বলল, চলি।

শেঠজী বলল, নেহি নেহি। হামারা সাথ যানে হোগা। এ ভজনলাল, তেরা ভাবিকো বোলা। বাবুজী ইশ্বর হায়।

কিন্তু ভাবিজীর এখন মাথা খারাপ। পাগলা বাবা খেপে গিয়ে কিছু খেল না। সে পাগলা বাবাকে খাওয়াতে পারল না। নসিবে কি আছে কে জানে। কোথায় আবার কোন অপদেবতা এসে ভর করবে সংসারে। সেই ভয়ে ভাবিজীর চোখ মুখ উদ্বিগ্ন। কাছে এলে শেঠজী তার বহুকে বলল, বাবুজী। দেবতা আছেন।

অতীশ কোন উত্তর করল না। হাত তুলে নমস্কার করল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে এই আলাপ তার খুব ভাল লাগছিল না। চারপাশের মানুষজন লক্ষ্য করছে। সে কিছুটা অস্বস্তিবোধ করছিল। গাড়ি এলে উঠে বসল। শেঠজী তাকে সিট মেটালে নামিয়ে দিয়ে চলে যাবে।

শেঠজীর বহু সারাটা ক্ষণ ঘোমটা টেনে বসে থাকল। বয়স শেঠজীর তুলনায় খুব কম। চোখ দুটো ছোট, বেঁটেখাট, ঠোঁট ভারি, ভরাট যৌবন। এই যুবতী এত ধর্মাপরায়ণ, ভীরু ভাবতে কেমন অতীশের কষ্ট হচ্ছিল। মানুষ সম্পর্কে অতীশের এমনিতেই নালিশ কম, সে মানুষকে খুব ছোটও ভাবতে পারে না, শেঠজী আসলে যে একজন প্রতারক সেটা সে স্পষ্ট করে ভাবতে পারছে না। বরং মনে হল, সে নিজেই প্রতারক। দু' নম্বরী মাল তার কোম্পানী সাপ্লাই দিয়ে যাচ্ছে। সে সব বন্ধ করে দিতে পারে—ফলে সে এর সঙ্গে শুধু নিজেকেই বিপন্ন করে তুলবে না, যে মানুষগুলি এই কনসার্নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাদের

জীবনও বিপন্ন করে তুলবে। কাল সারারাত সে ঘুমাতে পারে নি, মাথা গরম। মাথা গরম হলেই কেমন এক অন্ধকার গ্রহনক্ষত্রের দেশ তাকে গ্রাস করে। তার মনে হয়েছে সহসা সে কিছু করতে পারে না। তাকে ধীরে ধীরে এগোতে হবে। তার প্রথম কাজ কস্টিং। সে কালি, টিন, বার্নিশ ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট এবং মিসলেনিয়াস খরচাসহ প্রতিটি আইটেমের একটি তালিকা তৈরি করেছে। সারা-রাত জেগে এই কাজটা করেছে। তাকে গোপনে এ-সব করতে হচ্ছে। কারণ কুম্ভবাবুর পছন্দ না, এক্ষুণি মালের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হোক। যে কটা কাস্টমার আছে তবে তারাও থাকবে না বলে কুম্ভবাবু অতীশকে ভয় দেখিয়েছে।

অফিসে ঢুকে অন্য দিন, একবার সব শেডগুলি ঘুরে দেখে। কোথায় কি কাজ হচ্ছে, ছাপাখানায় কি ছাপা হচ্ছে, একবার ঘুরে না দেখলে সে স্বস্তি পায় না। কিন্তু আজ কেন জানি কোন শেডে ঢুকতে ইচ্ছে হল না। সুইংডোর ঠেলে সোজা নিজের ঘরে ঢুকে গেল। এক গ্লাস জল রাখা থাকে। সে বসে জলটা খেল। টেবিলের ওপর কিছু ফাইল, বিল ভাউচার। ক্যাস-বুক। বাইরে সুধীর বসে আছে। ভারি ভীতু মুখ ছেলেটার। সব সময় কেমন মুখ গোমড়া করে রাখে। আজ এক মাস হয়ে গেল, অতীশ কখনও ওকে হাসতে দেখে নি। কুম্ভবাবু সব সময় ধমকের ওপর রাখে। কাজে ত্রুটি বের করে পেছনে লাগে। এখানে আসার পর অতীশের কেন জানি ছেলেটির প্রতি একটা মায়া জন্মে গেছে। একবার চুপি চুপি ডেকে বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, অত ভয় পাস কেন। কিসের ভয়। কত মাইনে পাস যে ভয় পাবি। আমার মতো বেশি মাইনে পেলে না হয় চাকরির ভয় ছিল। তাছাড়া বিয়ে থা করিস নি। ছেলেপুলে হয় নি। এখনই ত সময় মাথা উঁচু করে চলার। কিন্তু সে বলতে পারে নি। এ রকমেরই স্বভাব তার। মনে মনে অষ্টপ্রহর সব অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, খোলাখুলি সে প্রতিবাদ করতে পারে না।

এখানে এসে সে আজ পর্যন্ত একবার নির্মলার বাপের বাড়ির খোঁজ নেয় নি। নির্মলা প্রতিটি চিঠিতেই লিখেছে, তোমার ফোন নম্বর জানাচ্ছ না কেন। দাদাকে লিখেছি, তুমি কলকাতায় কাজ পেয়েছ। দাদা তোমার ওখানে ঘুরেও এসেছে। পায় নি। তোমার একবার যাওয়া দরকার ছিল। বাপ মাই বা কি ভাববেন। আসলে সে এই কাজটা নেবার পর কেমন হতাশ হয়ে পড়েছে। এই গোল্ড মাইনে এসে বুঝেছে, স্বর্ণ অন্বেষণে এখানে কুম্ভবাবুর মতো লোকেরই লেগে থাকা সম্ভব। যত দিন যাচ্ছে, তত জটিলতা উপলব্ধি করতে পারছে। রবিবার সন্ধ্যার

গাড়িতে নির্মলাও চলে আসছে। সে মুখ ফুটে বলতেই পারবে না, নির্মলা আমি এখন একজন প্রতারকের ভূমিকা পালন করছি। টুটুল মিন্টুর দিকে সে আর সহজে যেন চোখ তুলে তাকাতে পারবে না। শিশুরা বোধহয় সবচেয়ে বেশি বুঝতে পারে সব। তারাই প্রথম বুঝতে পারবে তাদের বাবা ভাল নেই। ঠিকঠাক বেঁচে নেই। এখানে আসার পর একটা লাইন সে লিখতে পারে নি। দু' একজন লেখক বন্ধু বান্ধবকে সে ফোন করেছিল। তারা তার সঙ্গে কফি হাউসে দেখা করেছে। কেউ কেউ অফিসেও এসেছিল। এই বয়সে এমন একটা ভাল কাজ পাওয়ায় কেউ কেউ ঈর্ষা বোধও করেছে। অথচ সে তাদেরও বলতে পারে নি, আমি ভাল নেই। আমি ঠিকঠাক বেঁচে নেই। অর্চির প্রেতাত্মা আমাকে আবার গোলমালে ফেলে দিল।

সুইং ডোর ঠেলে কেউ ঢুকছে। চোখ তুলে দেখলে বুড়ো দারোয়ান রঘুবীর। ফতুয়া গায়ে হাঁটুর ওপর কাপড়। সে ঢুকে এক বাণ্ডিল টাকা রেখে বলল, মণ্টু সাহা দিয়ে গেছে।

—কত টাকা ?

—আঠারশ টাকা। আরও দশ হাজার সুরমা নেবে বলেছে। বাজার ফিরতি দেখা করে যাবে।

অতীশ টাকাটা গুনে উল্টে রেখে দিল। ক্যাশবুক খুলে টাকাটা মণ্টু সাহার নামে জমা করে ভাবল একবার বিলগুলি চেক করে দেখে। তখনই সুধীর মুখ বাড়িয়ে বলল, দুজন লোক দেখা করতে চায়।

—ডাক।

দুজন দু রকমের মানুষ। দু রকম মানুষ ঘরে ঢুকে দুটো চেয়ারে বসতে বসতে বলল, রাম রামজী।

এই ধরনের অভিবাদনে সে আজকাল অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মধ্যবয়সী মানুষের একজনের হাতে ছটা আংটি। মুখে খৈনি। ধুতি পাঞ্জাবি পরনে। পায়ে বুট জুতো। অন্য জনের মুখে কেমন শয়তানের ছাপ। কথা বলতে বলতে একটা কনটেনার পকেট থেকে বের করে বলল, এ-রকম মাল চাই।

অতীশ দেখল একটা চালু ওষুধের কৌটা।

সে বলল, হবে।

—ঠিক এরকম হবে না বাবুজী।

—কি রকম হবে ?

—একটা হসস্থ বাদ। লাল মার্জিন থাকবে না।

অতীশ বুঝল সেই নকল মালের পার্টি। মেজাজটা কেমন বিগড়ে গেল বলল, হবে না।

—বাবুজী ভাল দাম দেব।

—হবে না। এখানে দু নম্বরী মাল হয় না।

এ-কথা শুনে লোকটা মুচকি হাসল। বলল, বিশোয়াস কা বারে মে কৈ হুজ্জুতি নেই হোগা।

অতীশের মনে হল লোক দুটো শয়তানের প্রতিভূ। সব খবরা-খবর নিয়ে এসেছে। এদের পাশাপাশি আরও একজন অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে শীতল চোখে তাকিয়ে আছে। যেন বলছে, ছোটবাবু আমি এদের চেয়ে খারাপ ছিলাম না। জাহাজে তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলে, মুখে বালিশ চাপা দিয়ে খুন করছে। সবার অলক্ষ্যে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে। এখন কি করবে ?

অতীশ মুখ নিচু করে বসে থাকল।

তখনই ঢুকল কুম্ভবাবু। লোক দুটোকে দেখেই অবাক হয়ে গেছে যেন। আরে আপনারা। কি ব্যাপার।

—মাল চাই। লিকিন বাবুজী বলছেন হোবে না।

কি মাল যেন কুম্ভবাবু কিছুই জানে না।

ওরা টেবিল থেকে মালটা তুলে নিয়ে দেখাল।

কুম্ভবাবু অতীশের দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের ডাইস আছে। হবে ন কেন ?

অতীশের কেন জানি এ-সময় চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হল। বলতে ইচ্ছা হল, দু নম্বরী কারবার সব বন্ধ করে দেব ভাবছি। নতুন কোন আর অর্ডার নেব না। কিন্তু বলতে পারল না। শুধু বলল, ওরা দু নম্বরী মাল চায়।

কুম্ভ বলল, তালেত মুশকিল। আমরা করি না সে স্পষ্ট করে বলতে পারল না। তাকে আরও চতুর হতে হবে। সে সোজাসুজি ওদের সামনে বলতে পারল না, হবে। সেই যে পাঠিয়েছে, কপিলদেব তাকে ধরেই যে এই দুজন লোককে পাঠিয়েছে তাও বুঝতে দিল না। শুধু বলল, আসুন। আমার সঙ্গে আসুন।

ওরা বের হয়ে গেলে অতীশ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এত গরম লাগছে কেন। এই শহরে গরম কি খুব একটা বেশি। ফুল স্পিডে পাখা চালিয়েও সে রেহাই পায় না। এবং তখনই আবার কুম্ভবাবু হাজির। বলল, ভাল রেট দেবে। দেড়

গুণ রেট। মোটা অ্যাডভান্স দেবে। কাল মাইনে। টাকা নেই। বুঝতেই পারছেন, সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা ঠিক হবে না।

অতীশ বলল, মণ্টু সাহা কিছু টাকা দিয়ে গেছে। কপিলদেবের লোক আসার কথা। আর ব্যাঙ্কে যা আছে হয়ে যাবে।

—এরাই কপিলদেবের লোক।

সে আর কোন কথা বলল না। কিছু জেনুইন কাস্টমার আছে। সে তাদের একজনকে ফোন করে ধরার চেষ্টা করল। বৈদ্যনাথ সাধনার কিছু মাল কোম্পানি সাপ্লাই করে থাকে। যোগেশবাবুকে ধরতে পারলে কাজ হয়। এবং ফোনে পেয়েও গেল। সে তার অসুবিধার কথা বললে, তিনি তার রেট আরও কমাবার সুযোগ নিলেন। অতীশ হতাশ গলায় বলল, তাই হবে।

কুম্ভবাবু আজ কিছুতেই অতীশকে দিয়ে অর্ডার বুক করাতে পারল না। লোকসানের কোম্পানিকে আরও লোকসানে ফেলে দিচ্ছে। কুম্ভ ভীষণ অপমানিত বোধ করল। পার্টিদের কাছে তার প্রভাব অতীশের চেয়ে বেশি। সততার ঢ্যামনামি কুম্ভ একদম পছন্দ করে না। সে বিকেলেই এই নিয়ে বেশ কড় রকমের একটা গোলযোগ বাধিয়ে তোলার জন্য অফিস ফেরত সোজা সনৎবাবুর কাছে চলে এল।

সনৎবাবু দোতলার বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে আরাম করছিলেন। পাশে বড় ছেলের নাতিন। সামনে গ্যারেজ, পাশে লম্বা দুটো তালগাছ। একটা পাখি ডানা মেলে এসে বসল। নাতিন দুধ খাচ্ছে না। ছোটাছুটি করছে, দাপাদাপি করছে। তিনি পাজামা পাঞ্জাবি পরে সন্ধ্যের সময় সমুদ্রের হাওয়া খাওয়ার মতো একটা টেবিলে পা তুলে বসে আছেন। খুব বড় ঝড় গেল কদিন। বস্তিগুলি হাত ছাড়া হতে যাচ্ছিল। প্রাইভেট লিমিটেড করে দিয়ে আপাতত ঠেকা কাজ দেওয়া গেছে, বছরকার আয় লাখ টাকার ওপর রক্ষা পেয়ে যাওয়ায় কুমার বাহাদুর এ মাস থেকে আরও দুটো ইনক্রিমেণ্ট দিয়েছেন। এখন রিটায়ার করার বয়স, এই বয়সে যত তিনি কাজের মানুষ প্রতিপন্ন করবেন, তত বাড়তি সুযোগ। সরকারী কাজে যে যাননি, যোগ্যতা থাকতেও এই রাজবাড়িতে এসে যে প্রথমেই অফিসার পদে চাকরি পেয়ে গেছিলেন, সেটা আজ মনে হচ্ছে বড়ই সৌভাগ্য। পাশে কিছু আঙুর আপেল এবং বেদানার কোয়া। এক গ্লাস দুধ। কুটকুট করে খাচ্ছেন। রোগা কাল ছিমছাম চেহারা। মাথা ভর্তি সাদা চুল। খুব প্রাজ্ঞ মানুষের মতো মুখের অবয়ব। টেবিলের একপাশে একটা ইংরেজী

পত্রিকা। ওপরে ওয়ালেস স্টিভেনসের কবিতা সংগ্রহ। এটা পড়বেন বলে এনেছেন। নানারকম আইনের মার-প্যাচ মাথায় ঘোরার জন্য তিনি এ'কদিন বইটি উল্টেও দেখেন নি। কুমার বাহাদুরের প্রিয় কবি। কুমার বাহাদুরই পড়তে দিয়েছেন। এবং এটা পড়ে নতুন কিছু আরও আবিষ্কার করতে পারলে বিদ্যের দৌড়ে এই বয়সেও কম যান না তিনি আন্দাজ করতে পারবেন। সুতরাং আর দশটা রাজকীয় কাজের সঙ্গে সম্প্রতি কবিতা পাঠও যোগ হয়েছে।

সিঁড়ি ধরে কেউ উঠছে। পুত্রবধূ ফিরতে পারে। কলেজ করে বাপের বাড়ি হয়ে আসার কথা। শম্ভু ফিরতে পারে অফিস ছুটির পর। কিছু টুকিটাকি বাজার সেরে ফেরার কথা। কিন্তু এই পায়ের আওয়াজ তিনি ঠিক ধরতে পারছেন না। খুব সতর্ক পা ফেলে কেউ উঠে আসছে। তারপরই বুঝতে পারলেন, কুম্ভ। এ বাড়িতে সিঁড়ি ভাঙার সময় কুম্ভই একমাত্র টেনে টেনে পা তুলে হেঁটে আসে। এ-বাড়িতে কে কি খায়, কার দু পয়সা ফাউ রোজগার আছে তলে তলে সবারই জানার আগ্রহ। এবং তিনি একজন সৎ এবং অভিজ্ঞ মানুষ হিসাবে সম্মানীয় ব্যক্তি—প্রায় কুমার বাহাদুরের পরই। তবু এত সব ভাল খাবার দেখলে কুম্ভর চোখ টাটাতে পারে। বাপকে বলতে পারে—স্যারেরও বেশ দু পয়সা আলগা তালে হচ্ছে। তিনি তৎক্ষণাৎ খাবারের প্লেট ঘরে পাঠিয়ে কবিতার বই খুলে গম্ভীর মুখে বসে থাকলেন। কারণ এইমুখোশটাকে রাজবাড়ির সবাই বড় ভয় পায়। এটি তার প্রিয় মুখোশ।

ভিতরে ঢুকলে, সনৎবাবু বই থেকে মুখ না তুলেই বললেন বস। কুম্ভ বসল, কিছু বলল না। স্যার বইয়ে নিমগ্ন। বড়ই অসময়ে এসে গেছে। কিন্তু এখন উঠে চলে যেতেও পারে না। এই লোকটার হাতে অনেক ক্ষমতা। এর পরামর্শ ছাড়া সিট মেটাল সম্পর্কে কুমার বাহাদুর কোন সিদ্ধান্ত নেন না। তাছাড়া সে যে চোর-ছ্যাচোড় জাতের লোক স্যার তা আন্দাজ করে ফেলেছে। দু-একবার হাতেনাতে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে। এজন্য কুম্ভ খুব সরল বিনয়ী এবং বাধ্য ছোকরার মতো এখন চেয়ে আছে কখন মুখ তুলে একটু কথা বলবেন।

সনৎবাবু এবার বইয়ের পাতায় একটা বাসের টিকিট গুঁজে দিলেন। তারপর বই বন্ধ করে বললেন, কিছু বলবে?

—স্যার কোম্পানি লাটে উঠলে আমায় দোষ দেবেন না। কাস্টমাররা সব খেপে যাচ্ছে। অতীশবাবু অর্ডার নিচ্ছেন না। ভাল ভাল অর্ডার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। এই বলে চুপ করে থাকল। সনৎবাবু বললেন, খুলে বল সব।

এতে কি আমি বুঝব। কুম্ভর ভেতরে যে অপমানের দাপাদাপিটা চলছিল সেটা কিছুটা প্রশমিত হচ্ছে। সে বুঝতে পারছিল—তার কথাবার্তা এখন অনেক স্পষ্ট। এবং সনৎবাবু সব শুনে কিছুক্ষণ দু আঙুলে চোখ টিপে ধরলেন। গভীর বিষয়ে চিন্তা করলে এটা তাঁর হয়। কুম্ভ মনে মনে আর কিভাবে লাগান যায়, আর কি অসহনীয় সব ব্যবহার সে লক্ষ্য করেছে অতীশের এবং কোম্পানির পক্ষে তা কত মারাত্মক হতে পারে এই নিয়ে বক্তব্য রাখার একটা পরিকল্পনা করতেই মনে হল তিনি ওর দিকে চোখ মেলে তাকিয়েছেন।

সনৎবাবু উঠে দাঁড়ালেন। রেলিং-এ ঝুঁকে দেখলেন কিছু। বৌমা এখনও এল না। শঙ্করও ফেরার সময় হয়ে গেছে। গিন্নি শনিপুজা দিতে গেছে কোথায়। বাড়িতে চাকর নাতিন এবং নিজে। সমস্যা একের পর এক। তিনি বললেন, কাল অফিসে এস। রাজার সঙ্গে কথা বলে রাখব। আমার মনে হয় সবার কাছেই বিষয়টা পরিষ্কার হওয়া দরকার।

কুম্ভ বুঝল জল ঘোলা করে তুলতে পেরেছে। এবং পরদিনই সে সেটা টের পেল। সকাল নটায় দুজনেরই ডাক পড়েছে। বারান্দায় অতীশবাবু একটা হলুদ কলার দেয়া গেঞ্জি গায়ে বসে। সে কাছে গিয়ে বলল, দাদা কি ব্যাপার আমাদের সহসা এত্তেলা।

অতীশ দেখল কুম্ভ ভারি প্রসন্ন আজ। তলে তলে যে ঠাণ্ডা যুদ্ধটা চলছে অতীশ আজ টের পেতে দিল না। আসলে সে নিজেও ধূর্ত হয়ে উঠছে। ধূর্ত না হলে সে হেসে বলতে পারত না, বোধহয় রাজবাড়িতে নেমন্তন্ন। আমাদের খেতে ডেকেছেন। তারপরই অতীশ সুরেনকে ডেকে বলল, কি হে পাত পাড়বে কখন?

নধরবাবু জানকীবাবু আছেন। বের হলেই স্যার পাত পড়বে।

একটু পরে সনৎবাবুই মুখ বার করে বললেন, তোমরা এস।

সনৎবাবু আগে, মাঝে কুম্ভবাবু, সে পেছনে। দরজার গোড়ায় জুতো খোলার পাট। সে তা করে না। সে পেছনে দাঁড়িয়ে দেখছে। প্রথম দিন থেকেই সে এই দাস মনোভাব থেকে আত্মরক্ষা করে আসছে। বাড়ির আমলারা কেউ এটা পছন্দ করছে না—কিন্তু রাজার মর্জি বোঝা ভার। এই আমলারা ভেতরে ঢুকে সামনের চেয়ারে বসারও সাহস পায় না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ সেরে আসে। সনৎবাবু একমাত্র বসতে পারেন। তিনি ভিতরে ঢুকে প্রথম গড় হলেন। কুম্ভ আরও বেশি মাথা নুয়ে গড় হল। খালি পা দুজনের পেছনে অতীশ একটা তামাশা দেখার মতো দাঁড়িয়ে। রাজেনদা তাকে দেখেই বললেন, আরে এস এস। কি

খবর, সদলবলে দেখছি। সে পাশের চেয়ারটা দখল না করে মাঝখানেরটায় গিয়ে বসে পড়ল। সনৎবাবু পাশে বসলেন। কুম্ভ বসতে ইতস্তত করছিল। আশ্চর্য রাজেনদা কুম্ভকে বসতে বলছেন না। অতীশের নিজেরই গায়ে কেমন লাগছে। সে বলল, বসুন না।

রাজেনদা যেন বাধ্য হয়ে বললেন, বোস বোস।

কুম্ভ বড়ই বিনয়ী এখন। যেন জীবনে কোন কুবাক্য শোনেনি। যেন পৃথিবীটা সাধুজনেই ভরে আছে।

অতিকায় টেবিলটার ওপাশটায় একজন সাধারণ মানুষের এত প্রভাব। ফুলকো লুচির মতো টাক। জুলপি এবং গোঁফে চুলের খামতি ঢাকার চেষ্টা রাজেনদার। তিনি সনৎবাবুর মুখ থেকে একটা বিস্তারিত রিপোর্ট শুনলেন। হুঁ হা করছেন। কথার মাঝেই একবার অতীশকে বললেন, বৌমা কবে আসছে? তোমার বাবা-মা কেমন আছেন। আরে তোমার ঐ গল্পটা নিয়ে এক ভদ্রলোক খুব তারিফ করলেন—এ রকমের কিছু কথাবার্তা। সাংঘাতিক বিচারালয়ে এমন হাল্কা মেজাজে কেউ সব অভিযোগ শুনতে পারে অতীশের কেমন অবিশ্বাস ঠেকছিল। এবং পরে রাজেনদা শুধু বললেন অতীশ এ শহরে লোকে খালি হাতে আসে। ফুটপাথে থাকে। তুমি খালি হাতে আসনি! এটা তোমার জীবনের পক্ষে বড় সৌভাগ্য ভাবতে পার।

অতীশ বুঝতে পারছে রাজেনদা তাকে তিরস্কার করছেন। তার তিরস্কারের ভঙ্গীটাও মনোরম। তবু সে বলে, চোখ মুখ লাল হয়ে উঠছে। সে মাথা নিচু করে বলল, আমাদের অ্যাকুমুলেটেড লস দু' লাখের উপর। এটা এ-বছর আরও বাড়বে। কাস্টমার ব্যাঙ্ক সর্বত্র দেনা। জাল মাল করলে কাস্টমারদের হাতের মুঠোয় চলে যাব। পরে দেখবেন ওখানটায় একটা অশ্বত্থ গাছ আছে। আর কিছু নেই।

কুম্ভবাবু একটা কথাও বলছে না। সে আগেই সব বলে রেখেছে। সে কেবল রাজার নির্দেশ জানতে চায়। কোম্পানির প্রতি তার এতদিনের প্রচেষ্টা সফল দেখতে চায়। সে নিজের জন্য অভিযোগ দায়ের করেনি। যেন তার মূল লক্ষ্য কোম্পানিকে সমূহ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা। কিন্তু অতীশবাবু একটা বেশ বড় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাল। রাজার মাথায় কি গেছে কথাটা! শুধু একটা অশ্বত্থ গাছ থাকবে। ওটা রাজাকে একটা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানোর সমান। রাজা এটা বুঝছে না কেন!

অতীশ আগে একবার সব হজম করে গেছে। আজ কেন জানি সে তার সিদ্ধান্ত থেকে নড়তে চাইল না। সে তেমনি ঠাণ্ডা গলায় বলল, দু আড়াই মাস আগে যা ছিলাম এখন আর তা নেই। কিছু কিছু আমিও বুঝি। তারপর থেমে গেল। যেন বাকিটা বললে অশোভন হবে। সে বলতে চেয়েছিল আপনার হাতে অন্যে তামাক খেয়ে যাবে কেন। তামাকটা আপনিই খান।

সনৎবাবু বললেন, তুমি বোঝ না কে বলেছে ?

—না কেউ কেউ এমন ভেবে থাকতে পারে।

কুম্ভর মনে হচ্ছিল সে হেরে যাচ্ছে। সে বলল, এই মুহূর্তে মালের দাম বাড়াবার আমি পক্ষপাতি নই স্যার।

অতীশ বলল, আমি পক্ষপাতি। কস্টিং করে দেখলাম মার্জিনাল প্রফিট দূরে থাক খরচাই ওঠে না।

কুম্ভ বলল, আরও তো কারখানা আছে। তারা কি রেটে কাজ করে দেখুন না।

—কেউ বলে না কি রেটে কাজ করে।

—কাস্টমারদের জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন।

অতীশ বেশ দূর থেকে যেন বলল, ওরা রেট নিয়ে মিছে কথা বলে। কম বলে। পার্টিদের এত অ্যাডভান্স রাখার কি কারণ থাকতে পারে। যদি একদিন সব পার্টি অ্যাডভান্স ফেরত চায় কোম্পানির ঘটি বাটি বিক্রি করে দিতে হবে।

রাজেনদা কি যেন বুঝলেন। দুজনই কোম্পানির ভাল চায় দুজনই দু-রকমের কথা বলছে। সনৎবাবু অভিযোগ দায়ের করার পর চুপ। তবু অতীশ নতুন। রাজেনদা অতীশকে বললেন, আপাতত নকল আসল সব অর্ডারই বুক কর। কাজ চালু রাখতে হবে ত!

অতীশ কেমন মরিয়া হয়ে বলল, নকল অর্ডার আমি বুক করতে পারব না। কুম্ভবাবু যদি করেন করুন। অর্ডার বুকের বই ওঁকে দিয়ে দিচ্ছি।

কুমারবাহাদুর সনৎবাবুর দিকে তাকিয়ে কি যেন জানতে চাইলেন। অতীশের মুখ থমথম করছে। তখনই একটা চিরকুট কেউ দিয়ে গেল কুমারবাহাদুরের হাতে। তিনি বললেন, অতীশ ভিতরে যাও। তোমাকে ডাকছে। শঙ্খ হাজির। অতীশ বের হয়ে গেলে কুমারবাহাদুর বললেন, ভীষণ সেনসেটিভ ছেলে। টেকল করা মুশকিল। কি করবেন ?

আসলে মানুষ শৈশবে ফিরে যেতে বারবার ভালবাসে। এই মুহূর্তে অতীশের সব রাগ ক্ষোভ কেমন উবে গেল। অমল তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। সেই যেন বিশাল ছাদের কার্নিসে দাঁড়িয়ে আছে অমল। কখন সেই ছেলেটা আসবে বলে দাঁড়িয়ে আছে। তার কাছে যাচ্ছে অতীশ। আপনজন বলতে এ বাড়িতে তার অমল। এবং এ-মুহূর্তে এটা মনে হতেই চোখমুখে রক্তচাপ বেড়ে যেতে থাকল। চারপাশে জাঁকজমক—ধনাঢ্য পরিবারগুলোর যা হয়—ঘরের পর ঘর।

আশ্রিতজনেরা একসময় এই বাড়ির তলাকার অসংখ্য ঘরে গিজগিজ করত। এখন তারা নেই। বৈভবের শেষ পর্যায় চলছে বোধহয় এটা। আর দু এক পুরুষেই এরা আর দশজনের মতো নামগোত্রহীন হয়ে যাবে!

শম্ভু আগে যাচ্ছে। যেন অনেকদূর কোথাও আজ অতীশকে নিয়ে যাবে বলে সে রওনা হয়েছে। কোথাও বেশ অন্ধকার কোথাও আসবাবপত্র ঠাসা ঘর, তারপরই সিঁড়ি, নীল সবুজ আর লাল গালিচা পাতা সিঁড়ি ধরে উঠতে থাকল। সেই গন্ধটা চারপাশে। লেভেণ্ডারজাতীয় গন্ধ—অথবা ধূপদীপের মতো গন্ধ—কিন্তু ধূপদীপ নয়—সে উঠে যাচ্ছে। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতেই ঝাউ-গাছগুলোর ফাঁকে সূর্য দেখতে পেল। একেবারে শেষ মহলায় তাকে নিয়ে আসা হয়েছে। বিরাট প্রাসাদে মানুষজন কম। চাকর চোপদার, খাজাঞ্চি নায়েব গোমস্তা অথবা সেরাস্তায় যেসব লোক থাকত তারা আর তেমনভাবে জাঁকিয়ে বুঝি নেই। মাঝে মাঝে দু-একজন দাসী বাঁদি চোখে পড়েছে—অতীশ আসছে দেখেই ওরা মুহূর্তে অন্ধকারে কোথায় লুকিয়ে পড়ল।

শম্ভু বলল, যান ভিতরে বৌরানী আছেন।

সামনে বিশাল লম্বা বারান্দা। কারুকাজ করা মোজেইক। নীলরঙের চিক ফেলা। কথা বললেই গমগম করে বাজছে। শম্ভুর গলা সে বড়ই গম্ভীর শুনতে পেয়েছিল।

অতীশ ইতস্তত করছিল। ভেলভেটের পর্দা প্রকাণ্ড দরজায় ঝুলছে। এর ভেতরে যেতে হবে তাকে। এতক্ষণ মনটা যেভাবে হাল্কা হয়ে গেছিল, এখানে এসে আবার তা গম্ভীর হয়ে গেল। তার মনে হল সহসা, সে আর সেই নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে নেই। অনেক দূর অতীতে সে পা ফেলে এসেছে। আর তখনই পর্দা তুলে বৌরানী বলল, আয়।

যেন নির্দেশ। তার কিছু করণীয় নেই।

যেতে যেতে বৌরানী বলল, খুব খেপে গেছিস শুনলাম।

সব খবর এখানে আগেই পাচার হয়ে যায়। সেদিন যে সে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরেছিল, তার খবরও বোধহয় রাখে।

বৌরানী আগে আগে যাচ্ছে। এখন সে এই রমণীকে অমল কিংবা কমল কিছুই ভাবতে পারছে না। লম্বা দৃঢ় মজবুত রমণী। পুরো শরীর হাল্কা সবুজের ওপর লাল ফুল ফল আঁকা ম্যাকসিতে ঢাকা। ইতিহাসের পাতার ছবির মতো কোন সম্রাজ্ঞী যথার্থই তার সামনে হেঁটে যাচ্ছে যেন। ম্যাকসির ঝালর মেঝের অনেকটা ছড়িয়ে চলে যাচ্ছে। রুপোলী চুমকিতে সারা অঙ্গ জলজল করছিল। কোমর এবং বাহু দুই ভারি কামনার উদ্রেক করে। অতীশ ভয়ে রমণীর দিকে তাকাচ্ছে না। সে দেয়াল এবং দুপাশের বিদেশী শিল্পীদের আঁকা ছবি দেখতে দেখতে চলে যাচ্ছে। কেমন সামান্য বেহুঁশের মতো হেঁটে যাচ্ছিল।

দরজা ঠেলে পর্দা তুলে ফের বলল, আয়।

সে ঢুকলে বলল, বস। তারপর জরুরী কাজ পড়ে আছে মতো অন্য দরজার দিকে এগোলে, অতীশ বলল, আমি কিছু বুঝতে পারছি না অমলা, তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এলে কেন!

বৌরানী কেমন সহসা অতর্কিতে ফিরে দাঁড়াল। বলল, ঠিক বলছিস আমি অমলা?

—হ্যাঁ, তুমি অমলা। অমল। কমলা নও। কমলার চুল নীল ছিল।

—তাহলে তোর সব মনে আছে?

—আছে?

—ছাদের কথা?

—মনে আছে।

—নদীর ধারে সেই কাশবন···

—মনে আছে।

—ল্যাণ্ডোতে পূজা দেখতে বের হয়েছিলাম তোকে নিয়ে···

—মনে আছে।

—স্টীমার ঘাটের সেই আলো তারপর সেই বনটা—কত শত পাখি, রাতের জ্যোৎস্না···

—সব সব।

—সব মনে আছ তোর! যেন এবারে অমলা বলতে বলতে চিৎকার করে উঠবে—মনে আছে তোর সেই শ্যাওলাপিচ্ছিল ধুসর পৃথিবীর কথা! কিন্তু বলতে

পারল না। গ্রীক রমণীর মতো চোখেমুখে এক আশ্চর্য মুহ্যমান দৃষ্টি। ওর মজবুত দৃঢ় লম্বা শরীরের দিকে তাকিয়ে কেমন অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে উঠল, অতীশ তুই একটা দস্যু। তুই দস্যু অতীশ। কেন তুই এখানে মরতে এলি অতীশ!

॥ বার ॥

অন্যদিনের চেয়ে চন্দ্রনাথের আজ আরও সকালে ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। খালি পা। হাঁটুর ওপর কাপড়। পায়ে খড়ম। বাইরে বের হয়ে সব আকাশটা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। পূব আকাশটা এখনও ফর্সা হয়নি। নিঃশব্দ ব্রাহ্মমুহূর্ত। এই মুহূর্তটি তাঁর অতি প্রিয়। কোথা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়। রাত শেষ হয়ে আসছে, কিছু নক্ষত্রের শেষ ঝিকিমিকি। কীট-পতঙ্গের ডাক তেমন শোনা যাচ্ছে না! আবছা অস্পষ্ট আলো পৃথিবীতে জেগে উঠছে। তিনি সোজা দাঁড়িয়ে থাকলেন! গলায় উপবীত। আবছা অস্পষ্ট আলোয় ঈশ্বরের মহিমা। জায়া জননীর মতো এই নিবাস। সব কিছুর মধ্যে চন্দ্রনাথ অনুভব করলেন অশেষ করুণা তাঁর। তিনি প্রতিদিনের মতো নতজানু হলেন, তারপর উঠোন থেকে নখাগ্রে মাটি তুলে কপালে তারপর জীভে এবং বাকিটুকু মাথায় ঘষে দিলেন।

চারপাশে গাছপালা আকাশ সমান উঁচু হয়ে উঠতে চাইছে। বাতাস বইছিল। সামান্য হাওয়ায় গাছগুলির শাখা-প্রশাখা আন্দোলিত হচ্ছে। এই সব গাছপালা সবই তাঁর রোপণ করা। ঘন জঙ্গল কেটে তিনি এখানে তাঁর ঘর-বাড়ি তৈরি করেছিলেন। যখন যেখানে খবর পেয়েছেন সুস্বাদু আম জামের গাছ আছে, সেখানে ছুটে গেছেন। একবার তিনি বালির ঘাট থেকে একটি আমের কলম নিয়ে এসেছিলেন। হাতে পয়সা ছিল না। দশ ক্রোশ রাস্তা হেঁটে সেই কলম কাঁধে করে নিয়ে এসেছিলেন। সব ফলমূলের গাছগুলিই এখন সজীব। তারা এই বাড়িঘরে এরা সন্তান-সন্ততির মতোই বেঁচে আছে। একটা ডাল ভেঙে ফেললে কেউ তিনি খেপে যান। ভারি মনঃকষ্টে ভোগেন। শেকড় ক্রমেই গভীরে প্রবেশ করছে।

এই ব্রাহ্মমুহূর্তে তিনি কেন জানি আজ সব গাছপালার নিচ দিয়ে হেঁটে যেতে থাকলেন। গাছগুলো ছুঁয়ে দেখলেন। পর পর আমগাছ, তারপর দু'টো

কাঁঠাল গাছ। নারকেল গাছের সারি পশ্চিমের দিকে। বাঁদিকে দুটো সফেদা ফলের গাছ, লিচু গাছ। কাঠাখানেক জুড়ে লেবু গাছের ঝোপ। এদিকটায় তিনি গন্ধপাঁদালের লতা লাগিয়ে রেখেছেন। কাঠাখানেক জুড়ে আছে বাঁশের ঝাড়। তার এই গাছপালার মধ্যে তিনি এক আশ্চর্য সবুজ ঘ্রাণ অনুভব করেন। এত প্রিয় এই সব কিছু তার অথচ সবই চলে যায়। চন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে এসে এবার করবী গাছটার নিচে দাঁড়ালেন। দূরবর্তী বড় সড়কে গরুর গাড়ির আওয়াজ উঠছে। সদরে যাবে বলে শাক-সবজি বোঝাই করে চাষী মানুষেরা বের হয়ে পড়েছে। আর মাথার ওপরে পাখিদের ডানার শব্দ। এরা বোধহয় সবার আগে টের পায়, রাত শেষ হতে বেশি দেরি নেই। যে যার জায়গা মতো চলে যাবার জন্য আকাশের প্রান্ত দিয়ে উড়ে যায়।

চন্দ্রনাথ সকলের অলক্ষ্যে প্রতিদিন এই ঘোরাঘুরিটা করেন। মানুষ জানেই না এই সময়টাতে ঈশ্বরের কাছাকাছি আসার প্রকৃষ্ট সময়। এই সময়টায় মানুষের সব রকমের লোভ মোহ কাম কেটে যায়। এই সময়টায় পৃথিবীর রূপ বদল ঘটে। চন্দ্রনাথ এসব ভাবতে ভাবতে খালের পাড়ে এসে দাঁড়ালেন। ওপারে তাঁর বিঘে কয় ভূঁই—ধানী জমি, সবুজ আভা নিয়ে চারা বড় হচ্ছে। হাত দিলেই টের পাওয়া যায় পাতায় পাতায় শিশির ভেজা আশ্চর্য এক সমারোহ। প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করেন চন্দ্রনাথ, বড় মূল্যবান সময় চলে যাচ্ছে। ঘোরাঘুরি করে এসব না দেখলে বোঝাই যায় না, কত মূল্যবান এই চাষ আবাদ। সব সময় উত্তেজনা। সেই কাদান থেকে আরম্ভ করে বীজ বপন, তার বীজতলা থেকে চারাগাছ তুলে রুয়ে দেওয়া, তাদের জমিতে লেগে যাওয়া, বড় হওয়া, কি এক বড় প্রতীক্ষা যেন। এই প্রতীক্ষার মতো অমূল্য ইচ্ছে মানুষের আর কি থাকতে পারে চন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন না। এর মতো প্রবল আকর্ষণ মানুষের আর কি থাকতে পারে। অতীশ এসব উপেক্ষা করে চলে গেল। আজ বৌমা দাদু দিদিভাইও চলে যাবে। তাই কদিন থেকেই চন্দ্রনাথের নাড়িতে বড় টান ধরেছে। সকলের অজ্ঞাতে দিশেহারার মতো নিজের আবাসে ঘোরাঘুরি শুরু করেছেন।

কিছু কাক তখন কা-কা করে উঠল। তিনি দাঁড়িয়ে কাকের শব্দ শুনলেন। কাকেরা নানাভাবে ডাকে। এদের ডাকে শুভ অশুভ ধরা যায়। এদের ডাকে কখনও প্রবল দীর্ঘশ্বাস থাকে। বড়ই আর্ত সে ডাক। গেরস্থের তাতে অমঙ্গল বাড়ে। কাকের ডাকে মানুষ টের পায় আর শুয়ে থাকার সময় নেই।

তিনি তার আগেই উঠে পড়েছেন। কিছু ঘাস মাড়িয়ে তিনি খালি পায়ে এখন হেঁটে যাবেন। শিশির ভেজা ঘাসে হেঁটে বেড়ালে আয়ু বাড়ে তাঁর এমন একটা বিশ্বাস আছে। রোগভোগ কম হয়। ধানের আলে তিনি নেমে গেলেন। গাছের গোড়ায় পরিমিত জল আছে। কিছু আগাছা জন্মাচ্ছে। এগুলি সাফ করা দরকার। যত গাছ বাড়ে যত কালো হয়ে ওঠে ধানগাছের গুচ্ছ তত তিনি ছেলেমানুষের মতো পুলক বোধ করেন। মনে হয় ঈশ্বরের মতো নিজেও সৃষ্টি করে যাচ্ছেন একটা নতুন পৃথিবী। এই পৃথিবীর বাসিন্দা রামি ভামি গোলা পায়রার দল, দুটো কুকুর, একপাল হাঁস, তিনটে গাভী এবং ধনবৌ সন্তান-সন্ততি আর নিরিবিলি নানাবিধ ফলের গাছ। দূর থেকে নিজের আবাসের প্রতি তখন তাঁর ভারি মমতা বাড়ে। লোকজনে ভরে আছে—সেই বাড়িটা আজ অনেকাংশে খালি হয়ে যাবে। এই দুঃখে তিনি ভারি পীড়িত হচ্ছিলেন।

পূব আকাশ ফর্সা হয়ে উঠছে। আকাশের নিচের গাছপালা এবং পাখিদের এবার স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে। কেমন যেন গভীর স্বপ্ন থেকে এটা তাঁর ধীরে ধীরে জেগে ওঠা। একটায় ট্রেন। প্রহ্লাদ সঙ্গে যাবে। লটবহর কাল রাতেই বাঁধাছাঁদা হয়ে গেছে। কালই বৌমাদের যাত্রা করিয়ে রেখেছেন। অলকার সঙ্গে উত্তরের ঘরে আজ বৌমা শুয়েছে। বড় ঘরে আজ আর তারা আসতে পারবে না! মিন্টু অতসব বোঝে না। বড়ই অবুঝ। তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ চন্দ্রনাথের বিশ্বাস, বড় ঘরে এলে যাত্রার বিঘ্ন ঘটবে।

একবার ভেবেছিলেন, নিজেই সঙ্গে যাবেন। কেমন জায়গায় অতীশ তার আবাস ঠিক করছে, নিজে দেখে এলে শান্তি পেতেন। কিন্তু সন্তোষের মাতৃবিয়োগ হওয়ায় যাওয়া হচ্ছে না। কাল ষোড়শ শ্রাদ্ধ। যজমানের শান্তি অশান্তি বলে কথা। তিনি অন্য পুরোহিতের কথা বলেছিলেন, কিন্তু সন্তোষ মুখ ব্যাজার করে ফেলেছিল। আর ওর মার পূজাপার্বণে বড় খুঁত-খুঁত স্বভাব ছিল। যত দেরিই হোক, যত উপবাসে কষ্টই পাক, তিনি ফুল বেলপাতা না দিলে বৃদ্ধা তৃপ্তি পেত না। কিছু আহারও করত না। লাঠি ঠুকে ঠুকে সকালবেলায় চলে আসত ওর মা। ঠাকুর প্রণাম, চন্দ্রনাথের পায়ের ধুলো নিয়ে ঠুকঠুক করে আবার চলে যেত। গাছের যা কিছু কর্তাকে না দিয়ে নিজে খেয়ে তৃপ্তি পেত না। এ একটা ঠেক রয়ে গেছে বলেই চন্দ্রনাথ নিজে যেতে পারছেন না। মনে মনে অস্বস্তি বোধ করছেন।

আর সকাল থেকেই চন্দ্রনাথের হাঁক-ডাক, ও বৌমা ওঠো। প্রণাম সেরে

ফুল বেলপাতা তুলে দাও। পূজার ঘরে একটু সকাল সকাল ঢুকতে হবে বোমা। কি রে হাসু ওঠ। রাধানাথকে বলবি যেন তিনটে রিকশ আনে। প্রহ্লাদ তুই বাবা ঘাসপাতা কেটে রেখে যা। বাড়ি থাকবি না, গরুগুলি খাবে কি। এই বলে তিনি টং থেকে কবুতরগুলো ছেড়ে দিলেন। পায়ে পায়ে সেই শ্রাবণীর কুকুর দুটো ঘুরছে। শ্রাবণীর মেলা থেকে আসার পথে কেন জানি কুকুর দুটো তাঁর পিছু নিয়েছিল। যতই তিনি দুরছার করেন, নড়ে না। হাঁটতে থাকলে, কুকুর দুটো পেছনে হেঁটে আসে। বাড়িতে ফিরে দেখেন, ওরা তেমনি আসছে। সেই থেকে ওরাও এবাড়ির বাসিন্দা হয়ে গেল। আগের কুকুরটা নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার পর যে জায়গাটা সংসারে খালি পড়েছিল, এরা আসায় তা আবার ভরভর্তি হয়ে গেছে। তিনি সেই কুকুরটাকে আর খুঁজেই পেলেন না। প্রথম মনে হয়েছিল বেইমান, পরে মনে হয়েছে, দূরের রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ে মরে থাকলে কে টের পাবে। কেউ লোভ দেখিয়ে নিয়েও যেতে পারে। বড় সাবলীল ছিল কুকুরটা। এই শ্রাবণীরা আসায় তাঁর সেই দুঃখটা এখন অনেক কমে গেছে। রামিটা দুদিনের জন্য কোথায় চলে গিয়েছিল, আবার ফিরে এসেছে। যে যায় সে ফিরে আসে না, এই ভয়টা বড়ই তাঁর বেশি। বড় ছেলে সতীশ কী রকমের হয়ে গেল। অতীশ চলে গেল। বৌমা চলে যাচ্ছে। নাড়ির টান ছিঁড়ে গেলে কে আর সুস্থির থাকতে পারে! তিনি আজ সকাল থেকে আরও বেশি চঞ্চল হয়ে উঠেছেন।

হাসুর সহজে ঘুম ভাঙে না। সে শুয়ে উ আঁ করছে। উঠছে না। চন্দ্রনাথ বললেন, ও ধনবৌ তোমার সন্তানেরা তো কেবল ঘুমাতে শিখেছে। আর কিছু শিখল না। কখন থেকে ডাকছি, কিছুতেই উঠছে না।

ধনবৌ অন্যদিন হলে বিরূপ আচরণ করত। কিন্তু আজ ভারি চুপচাপ। সংসারে ত কাজের শেষ নেই। এখন ছেলেদের নিয়ে পড়লে অশান্তি বাড়বে। টুটুল ঘুম থেকে উঠেই ঠামা ঠামা করছিল। গোটা তিনেক কথা টুটুল বলতে পারে। মা বাবা ঠামা। দাদু বলতে পারে না। এজন্য ধনবৌ মনে মনে খুশী। দেখ সংসারে কার টান কত বেশি। শুধু ঈশ্বর ঈশ্বর করে সারাটা জীবন কাটালে। দুটো পয়সা সঞ্চয় করলে না। ছেলের হাত তোলার ওপর বাঁচতে হবে ভেবেই ঘাবড়ে গেছ। বুঝি না কিছু মনে কর। বড়টা তো কবেই সম্পর্ক ছিঁড়েছে। শুধু চিঠিপত্র আর অসুখ-বিসুখের খবর দেয়। অভাবের খবর দেয়। এখন দেখ এরা গিয়ে কি করে। সকালবেলায় ধনবৌ বিরূপ হয়ে উঠলে এসবই

বলতেন। কিন্তু আজ এরা চলে যাবে। সকালবেলায় ঝগড়া করতে মনটা সায় দিচ্ছিল না।—বাসি কাপড় ছেড়ে ঠাকুরঘরে ঢুকে গেল। ঠাকুরের বাসনপত্র, তামার টাট কোষাকুষি সব বের করে সোজা ঘাটে। অলকাকে ডেকে তুলে দিয়ে গেল। বলল, টুটুলকে নিয়ে একটু গাছতলায় বেড়া। আমার কাছে এখন আর আনিস না।

চন্দ্রনাথ আজ নিজেই গুণে গুণে একশ একটা তুলসী পাতা তুললেন। পাতাগুলিতে আবার কোন খুত না থাকে। তুলসীপাতা কলাপাতায় ভাঁজ করে ঠাকুরঘরে রেখে এলেন। শালগ্রামের মাথায় এই একশ একটা তুলসীপাতা তিনি উৎসর্গ করবেন। রাস্তাঘাটে কত রকমের চোর-জোচ্চোর অগ্নিকাণ্ড, দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কলকাতায় পৌঁছাতে যাতে কোন অসুবিধা না হয়, এজন্য তিনি তার হাতের পাঁচ কাছে রেখে দিচ্ছেন। তা না হলে নিশ্চিন্তে রাতে ঘুমাতে পারবেন না। আত্মীয় অনাত্মীয় প্রতিবেশীর বেলায় যেমন তিনি ঠাকুরের সামনে বসে খুব নিমগ্ন হলে চোখের ওপর ছবি ভেসে উঠতে দেখেন—নিজের সন্তান-সন্ততির বেলায় সেটা সহজে দেখতে পান না। ফলে বয়স যত বাড়ছে তত আরও বেশি ধর্মভীরু, তত উচাটন, তত যেন কঠিন হয়ে পড়ছে ঘরবাড়ি ঠিক ঠিক রেখে যাওয়া। শত্রুপক্ষ চারিদিকে। কে কখন কি তুলে নেবে—ঈশ্বর নিজেও কম যায় না। তার কোপকেই সব চেয়ে বেশি ভয়। ফলে সকালবেলায় তিনি ঠেঙিয়ে গেছেন বুড়ি-বিবির হাতায়। হাতার দীঘি থেকে দুটো পদ্ম তুলে এনেছেন, লক্ষ্মী জনার্দনের পায়ে দেবেন বলে। গাছ থেকে নিজেই আজ গোটা গোটা সব পদ্ম তুলে আর কি করণীয় কাজ বাইরের পড়ে থাকল—ফুল বৌমাই তুলবে—বাড়তি আর কি কাজ আছে, বিগ্রহ আর কি পেলে আরও বেশি খুশি—এইসব চিন্তার জটিল গ্রন্থিগুলো থেকে মুক্তি পেলে মনে হল সামান্য তামাকু সেবনও চায় ঠাকুর। প্রহ্লাদকে তামাক সাজতে বলে নিজে একটু কুশাসনে পদ্মাসন করে বসলেন। সকালবেলায় বিগ্রহের পূজা না হওয়া পর্যন্ত জল গ্রহণ করেন না। মাঝে মাঝে তামাকু সেবন। তিনি চোখ বুজে তামাকু খাচ্ছিলেন—তখনই মনে হল টিকিটা ধরে কে টানছে! চোখ মেলে দেখলেন টুটুল। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এসেছে। পিঠে ভর দিয়ে উঠে এসেছে। পিঠে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে টিকি টানছে।

—ও বৌমা দেখ, আবার আমার টিকি টানছে। আমি কিন্তু চিমটি কাটব। আ আমার লাগছে!

টুটুল অ আ তু তু করছে। বিচিত্র রহস্য টের পায় বুঝি টুটুল এর মধ্যে। চন্দ্রনাথ ভারি আরাম বোধ করছিলেন। গায়ে গা লেপ্টে আছে। টুটুলের শরীরে আশ্চর্য উষ্ণতা আছে। চন্দ্রনাথ চোখ বুজে টের পাচ্ছিলেন—বংশের পিণ্ডদানের প্রথম অধিকারী এখন তার গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এতে তিনি কেমন এক পরম নির্ভয় পান। মানুষের আর কি লাগে। বড়টার কেবল মেয়েই হচ্ছিল। তিনি মেয়েদের ব্যাপারটাকে কিছুটা অচ্ছুতের মতো মনে করেন। এদের পিণ্ডদানে আত্মা পরিতৃপ্ত হয় না। যেন কোন দূর গ্রহলোকে বসে আছেন চন্দ্রনাথ। তাঁর এত কষ্টের ঘরবাড়ি দেখতে পাচ্ছেন। পূর্ব পুরুষদের জল দেবার অধিকারী এই শিশু। এবং মনে হয় দূরের গ্রহলোক থেকে তার পিতামহ প্রপিতামহ সবাই দেখছে, চন্দ্রনাথের পাশে তার নাতি অভীক দীপঙ্কর ওরফে টুটুল বসে বসে তার টিকি টানছে।

চন্দ্রনাথ বললেন, দাদু পারবি ত ঘাড় দিতে।

টুটুল আরো সজোরে টিকি ধরে টান দিল। খুব বড় নয়, লম্বা নয় বেঁটে-খাটো টিকি। টুটুল ওটাকে কব্জা করতে পারছে না। ব্রহ্মতালু থেকে টুটুল বোধহয় চায় ওটা তুলে নিতে। বার বার চেষ্টার পরও যখন পারল না, তখনই টুটুল ভ্যাক করে কেঁদে দিল।

চন্দ্রনাথ নাতিকে কি আর করেন। কাঁধে তুলে নিয়ে বের হয়ে গেলেন। কোথাও যাবেন মনে হয়। আসলে তিনি এই বাড়ি-ঘরের জন্য যে মায়া বোধ করেন এই উত্তরাধিকার তেমনি মায়া বোধ করুক মনে মনে বোধ হয় এমন চাইছিলেন। গাছপালায় ভর্তি বাড়ি-ঘর। পাখ-পাখালি কত—প্রজাপতি ফড়িং কীটপতঙ্গ সব মিলে এক প্রবহমান জীবনধারা। এই জীবনধারায় তার এক বছরের নাতি অভীক দীপঙ্করকে নিয়ে পরিভ্রমণে বৃত হলেন। তিনি হেঁটে যাচ্ছেন, পায়ে পায়ে শ্রাবণীরা আসছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। চারপাশের মাঠ গাছপালার ভিতর দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন, আর অজস্র কথা বলছিলেন। কথাগুলো বড়ই অকিঞ্চিৎকর। তবু কেমন গভীর এবং তীক্ষ্ণ।

চন্দ্রনাথ বললেন, কত বড় আকাশ দেখ।

আবার বললেন, সামনে কি বিস্তৃত মাঠ!

বললেন, এখানেই আমরা ঘোরাঘুরি করব। কেউ বেশি দূর যাব না। বেশি দূর যেতে পারি না। পরমায়ু শেষ হলে আমি তোমাদের সবাইকে দেখতে পাব। সুখে থাকলে আত্মা শান্তি পাবে।

ধীরেনের মা সামনে পড়ে গেছে।—ওমা কর্তার ঘাড়ে এ কে গ। কি কথা বলছেন গ ঠাকুর।

চন্দ্রনাথ বড়ই লজ্জায় পড়ে গেলেন।—আর বলিস না। ঘাড়ে চড়ে ঘুরবে বলছে। খুব কান্নাকাটি করছিল।

—বৌমারা নাকি চলে যাবে আজ।

—হ্যাঁ।

—এই ত সংসার গ কর্তাঠাকুর। কে কোনদিকে যায় ঠিক থাকে না। মরণ আপনার। জ্বালায় জ্বলবেন।

অলকা তখন মিন্টুকে খাওয়াচ্ছিল। দুধ মুড়ি কলা। মিন্টু খাচ্ছে আর বলছে; আমরা বাবার কাছে আজ চলে যাব না মা?

নির্মলার সামান্য গোছগাছ বাকি। সেটা সকাল সকাল সেরে নিচ্ছিল। আজ আড়াই মাস মানুষটা নেই। এদিকে একবার আসেওনি। কত সহজে ভুলে থাকতে পারে। অভিমান, বড় অভিমান, কেন যে ভিতরে এই চাপা অভিমান—কোন প্রকাশ নেই। কাছে গেলেও প্রকাশ করতে পারবে না। এত দিন থাকি কি করে! তুমিই বা থাক কি করে! এবং অভ্যন্তরে কেমন রোমাঞ্চ। মানুষটাকে কত দীর্ঘকাল যেন না দেখে আছে! দু আড়াই মাস সময়টা এত দীর্ঘ হয় এই প্রথম সেটা টের পেল নির্মলা। আর কি যে হয়, যেন সময় শেষই হচ্ছে না। তারপর যাত্রা, রিকশ, ট্রেন উন্মুখ আকাজ্ক্ষা—এই নিয়ে সে কতকাল যেন প্রতীক্ষায় বসে থাকবে। মনের মধ্যে এক অব্যক্ত সুখানুভূতি যা পরম এবং চরম, কদিন থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। যেন স্টেশনে নামলে নির্মলা চোখ তুলে মানুষটার দিকে তাকাতেই পারবে না। সে কত দীর্ঘ চিঠি দিয়েছে। চিঠিতে মাঝে মাঝে সে নির্লজ্জ বেহায়ার মতো তার রাতে ঘুম হয় না জানিয়েছে। আর কত ইচ্ছের কথা ছিল—ভাবতেই কেমন লজ্জা বোধে নির্মলা পীড়িত হতে থাকল। চিঠিতে অত উতলা না হলেই যেন তার ভাল ছিল। চার বছরে তাকে মানুষটা যা না চিনেছে, এই আড়াই মাসে চিঠির মারফতে তাকে যেন আরও বেশি চিনে ফেলেছে। এবং সেখানে কিছুটা এমন ইচ্ছের প্রকাশ ছিল, যা ভাবলে চোখে-মুখে রক্তচাপ বেড়ে যায়। ফলে নির্মলা সকাল থেকেই একটু বেশি চুপচাপ আজ। কারণ তার মনে হয়, এই পরিবার থেকে ছিন্ন হবার সময় তাকে কিছুটা দুঃখী দেখানো দরকার।

চন্দ্রনাথ আজ সকাল সকাল হাতার পুকুর থেকে স্নান সেরে এলেন। স্নান

সারতে সারতে তিনি নিত্যকালী স্তোত্র, সূর্য কবচ গায়ত্রী কবচ পাঠ করেন, আজও সেই মন্ত্রোচ্চারণ—কেমন গম্ভীর নিনাদের মতো শোনায়। বাড়ির মানুষজন প্রাণিকুল সহ এই গাছপালা মাঠ, প্রতিবেশীজনের মঙ্গলার্থে তার বিশ্বাস এই মন্ত্র পাঠ, মানুষের অকাল মৃত্যু অপমৃত্যু বিনাশ করে। জনপদ শস্যহানি থেকে বেঁচে যায়। দুর্ভিক্ষ মহামারী দেখা দেয় না। নিরন্তর বিশ্বাসের মধ্যেই তার এই মন্ত্রোচ্চারণ। ধরণীর শান্তি বজায় রাখার এটি তাঁর কাছে অমোঘ আয়ুধ। আজ আরও বেশি এ বিষয়ে তিনি কেমন সচেতন হয়ে পড়েছেন। কারো সঙ্গে তিনি এখন একটা কথাও বলছেন না। পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঠাকুরঘরে এক সমাহিত মানুষের মতো বসে থাকবেন। ঠাকুরঘরে ঢোকার সময় নির্মলা শুনতে পেল বাবা বলে চলেছেন—ব্রহ্মোবাচ—গায়ত্রী কবচং বক্ষ্যে ধর্মকামার্থ সিদ্ধিদম্। তারপর তিনি দরজা ভেজিয়ে দিলেন। নির্মলা আগেই স্নান সেরে নিয়েছে। আজ তাকে অন্যদিনের চেয়েও পবিত্র দেখাচ্ছিল। কপালে গোল লাল বড় সিঁদুরের টিপ, সূর্যাস্তের মত সিঁথিতে লাল আভা। লাল পেড়ে শাড়ি পরনে, ভেজা চুল সারা পিঠে ছড়ানো। সে আগেই ফুল ফল নৈবদ্য সব সাজিয়ে রেখে এসেছে। যেখানে যা দরকার দূর্বা আতপচাল, হরীতকী তিল তুলসী সব। পঞ্চ দেবতার উপচার সহ ঠাকুরের আলাদা আলাদা নৈবদ্য। এছাড়া সন্তানের শুভ কামনায় তিনি স্থির করেছিলেন, সামান্য ভোগ দেওয়া হবে লক্ষ্মীজনার্দনকে। ফলে আরও সকালে মা স্নান সেরে ভোগের রান্না সেরে ফেলেছে। এবং এগারটা না বাজতেই চন্দ্রনাথ পূজা-আর্চার কাজ সেরে ঘণ্টা কাঁসি বাজালেন। শঙ্খে ফুঁ দিলেন। এই সব তার করার অর্থ, যত দূর এই শব্দ তরঙ্গ যাবে, তত দূর মানুষজনের কোন আপদ-বিপদ থাকবে না। ধর্মবিশ্বাসী মানুষটা এতক্ষণে যেন কিছুটা বিচলিত ভাব কাটিয়ে উঠেছেন। হাসিমুখে পূজার ঘর থেকে বের হয়েই ডাকলেন, টুটুল কৈ রে।

টুটুলকে ভানু কোলে নিয়ে ঘুরছিল, সে দাদুর ডাকে ঠিক সাড়া পায়। সে বুঝতে পারে, দাদু তাকে কিছু এখন খেতে দেবে। ভানুর কোল থেকে জোরজার করে নেমে হেঁটে যাবার চেষ্টা করলে, চন্দ্রনাথ এসে ধরে ফেললেন—এখনও খুব ভাল হাঁটতে পারে না। কিছুটা গিয়েই পড়ে যায়। কিন্তু শিশুও ঈশ্বরের মহিমা বুঝি টের পায়। ঠিক হাত তুলে বলছে, আমা আমা। অর্থাৎ প্রসাদ দাও। আমি খাব। মিন্টু কোথায় খেলছিল, সেও দৌড়ে গেছে। দৌড়ে এসেছে প্রতিবেশীদের বালক বালিকারা। তারা হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। সবার হাতে হাতে চন্দ্রনাথ

ঈশ্বরের মহিমা বিতরণ করতে লাগলেন। বললেন, তোরাই আমার ঈশ্বর। চাল কলা নারকেল এবং সামান্য পায়েস সবাইকে বিলিয়ে দিয়ে বললেন, ওদের খেতে দিয়ে দাও ধনবৌ। প্রহ্লাদ কোথায় রে? খেয়ে নে। সময় হয়ে গেছে।

হাস্থ ভান্থ আজ বাড়ি থেকে নড়েনি। সারাটা সকাল ভাইপো ভাইঝিকে নিয়ে পড়েছিল। অলকা একবার চিৎকার করে বলেছে, মা এখন আর কার তুমি নাক টানবে। ধনবৌ রান্নাঘরে—কোন সাড়া দেয়নি। অলকা আবার বলেছে, মা তোমার নাতির বোঁচা নাক তুলতে পারলে না! এ সংসারে সবারই নাক দীর্ঘ। টুটুল মায়ের গড়ন পেয়েছে। নির্মলার নাক কিছুটা চাপা। ধনবৌর কাজই ছিল স্নানের আগে টুটুলের সারা শরীর ভাল করে তেল মালিশ করে রোদে ফেলে রাখা। দু আঙুলে তেল নিয়ে নাকটাকে টেনে তোলা। নিত্য কাজের মধ্যে এই বড় কাজটা আজ থেকে আর করতে পারবে না। বোঁচা নাক নিয়েই টুটুলটা আজ চলে যাবে। এজন্য ধনবৌ বড়ই কাতর হয়ে পড়েছে। চোখে তার জল এসে গেছিল।

দেশ ভাগের পর সংসারটা অগাধ জলে পড়ে গেছিল। কিনা দিন গেছে! কত জায়গা ঘুরে শেষ পর্যন্ত এই আবাস, বাড়ি ঘর। সুখে দুঃখে সব সন্তান-সন্ততি নিয়ে এই বাড়িটা যখন ডালপালা মেলে দিচ্ছিল, তখনই সতীশ লিখল, মেসের খাওয়া সহ্য হচ্ছে না। সে বাসা করেছে। মানুষটা চিঠি পেয়ে গুম হয়ে বসেছিল। তারপর সব খালি করে ওরা চলে গেল। অতীশ নেই। সবে এদেশে আসার বছর তিন পরেই উধাও। তারপর খোঁজ নেই। তখন মানুষটা একদণ্ড স্থির থাকতে পারত না। কখনও ইস্টিশনে কখনও পোড়ো বাড়িতে কখনও রাস্তায় ফেলে তাদের কোথায় না কোথায় চলে গেছে মানুষটা। তারপর ফিরে এসেছে আবার! মাথায় বড় পুঁটলি। তারপর এই বাড়িঘর—সেও কত অনটনের মধ্যে। যখন সুখের মুখ দেখার কথা তখন আবার অন্য রকম এক কষ্ট। মানুষের কপালেই বুঝি এমন থাকে। মুখ গুঁজে ধনবৌ রান্নাঘরে কাজ সারতে সারতে এমনই ভেবে যাচ্ছিল—আর মাঝে মাঝে কেন যে চোখ জলে ভার হয়ে আসছে।

যেন সেই মা মা ডাকটা ধনবৌ এখনও শুনতে পায়। গভীর রাতে দরজায় দাঁড়িয়ে কেউ ডাকছে, মা মা আমি। আমি ফিরে এসেছি। বাঁশের মচান থেকে ধড়ফড় করে জেগে উঠেছিল ধনবৌ। পাশের মানুষটাকে ঠেলে তুলে বলেছিল, হ্যাগ অতীশ ডাকছে। শুনতে পাচ্ছ। চন্দ্রনাথ এটা আগেও দেখেছে, ধনবৌ হঠাৎ হঠাৎ রাতে জেগে উঠে বলত, ঐ শোন, অতীশ ডাকছে না! কাজেই

মানুষটার বিশ্বাসই হয়নি। মনের ভুল। সেদিন মানুষটা বলেছিল, ঘুমোও। মন হাল্কা কর। ঈশ্বরকে ডাক। তিনিই তোমার সন্তান আবার ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু সেদিন ধনবৌ কোন কথাই শোনেনি। নেমে দরজা খুলে দাঁড়াতেই—বারান্দার অন্ধকারে ছায়ামূর্তি—দেখেই বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। —ওগো আমি ভুল বলিনি? এস না।

চন্দ্রনাথ, অন্ধকারে ধনবৌ কি সব হাবিজাবি প্রলাপ বকছে ভেবে নিজেও দ্রুত পায়ে নিচে নেমে গেলেন। দেখলেন অন্ধকারে কেউ ধনবৌর পায়ে পড়ে আছে। ক্ষমাপ্রার্থীর মতো। চন্দ্রনাথ বলেছিল, কে?

—অতীশ। তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না। অলকা ওঠ। আলোটা জ্বাল। আলো জ্বাললে চন্দ্রনাথ পুত্রের লম্বা চওড়া সাহেব-সুবো চেহারা দেখে বিশ্বাস করতে পারেননি, এ তার অতীশ। কৈশোরে হারিয়ে যাওয়া এ তার মেজ পুত্র। যেন যৌবনে সেই বড়দা এসে হাজির হয়েছেন আবার। বড়দা পাগল হবার আগে কলকাতা থেকে ফিরলে এমনই একটা মানুষের চেহারা পেয়েছিল। পরে সবই ভেঙে বলেছিল মানুষটা। ধনবৌ বলেছিল, ঠিক বলছ! বড় ভাশুরঠাকুর যৌবনে এমন দেখতে ছিলেন!

—ঠিক এই রকম। এই রকম উঁচু লম্বা মানুষ। এমনই বড় বড় চোখ। ভারি সুন্দর পোশাক ছিল গায়ে।

অতীশকে নিয়ে সেই থেকে কেমন একটা আশঙ্কা ধনবৌর মনে। কারণে অকারণে অতীশের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখত—যদি সেই সব চিহ্ন অবিকল কখনও ধরা পড়ে যায়। এই ভয়ে সে বেশিক্ষণ অতীশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেও পারত না। বুকটা কখনও হিম হয়ে আসত। পরিবারে কে কখন যেন বলে গেছে বংশে বড় অভিশাপ। কেউ না কেউ পাগল হয়ে যাবেই। যদি বংশদোষে অতীশ পাগল হয়ে যায়—সুপুরুষ—ভারি সুপুরুষ হয়ে গেছে অতীশ। তিন বছরে শরীরে ভারি পরিবর্তন এসে গেছে। ঠিক সেই পাগল মানুষটার মতো আচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসে। বড় গভীর চোখ। গভীরে কোথাও কিছু বুঝি বাজে। সেটা কি কখনও ধরতে পারেনি। চুপচাপ শান্ত নিরীহ—আবার পড়াশোনা, কাজ এবং সংসারে লেপ্টে থেকেও যেন সে ভারি আলাদা মানুষ। অতীশকে ধনবৌ কিছুতেই বুঝতে পারত না। আবার জাহাজে যেতে চেয়েছিল, বাপের ইচ্ছে নয় পরিবারের কারো ইচ্ছে নয়, ধনবৌ না পেরে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছিল—তারপরই অতীশ অবাধ্য হতে বুঝি সাহস পায়নি। এখানেই থেকে

গেল। গাছপালার মতো শেকড় গজিয়ে দিল। সে ঘরবাড়ি ছেড়ে কখনও খুব বেশিদূর হেঁটে যেত না। কেমন আচ্ছন্ন থাকার স্বভাব। কিন্তু কেন সে এত আচ্ছন্ন থাকে চুপচাপ থাকে, বড় বিষাদ চোখে মুখে—তার কারণ ধনবৌ এতদিনেও টের পায়নি! মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক থাকলে বলেছেন, তুই এত কি ভাবিস?

অতীশ বলেছে, কৈ কিছুই নাত।

—তুই আমার পেটে হয়েছিস না আমি তোর পেটে হয়েছি! আমি বুঝি না!

অতীশ তখন হেসে ওঠার চেষ্টা করত। মার ভয় দূর করার জন্য বলত লীলাময় বলেছে, ওর জামাইবাবুকে বলে কোন স্কুলে ঢুকিয়ে দেবে।

—হ্যাঁ বাবা, এখানেই দেখ কিছু একটা হয় কিনা। তুই ছিলি না—তোর বাবা কেমন জলে পড়ে গেছিল। কাছে থাক, খাই না খাই শান্তি।

তারপর ধনবৌর মনে হয়েছিল বিয়ে থা দিলে হয়ত চোখ মুখের আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে যাবে। আর গাছের নিচে চুপচাপ বসে থেকে বিকেলটা কাটিয়ে দেবে না। কিংবা একা একা হেঁটে বেড়াবে না কোথাও। নির্মলা আসার পরও সেই ভাবটা গেল না। মিণ্টু হবার পর ভেবেছিল ঠিক হয়ে যাবে। মিণ্টু টুটুল হবার পর ধনবৌ লক্ষ্য করেছে অতীশ কিছুটা স্বস্থির বোধ করছে। এভাবে যদি সেরে যায়। ইদানীং মনে হয়েছে ধনবৌর সেরে গেছে। কিন্তু নির্মলা সেদিন চুপি চুপি বলতেই বুকটা আবার কেঁপে গেছে। নির্মলা বলেছে আমি বলেছি বলবেন না। ও বলতে বারণ করেছে। কিন্তু বড় ভয় হয়?

—কি ভয়!

—ও রাতে মাঝে মাঝে ঘরে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে বসে থাকে।

—ধূপকাঠি জ্বালিয়ে বসে থাকে!

—হ্যাঁ, মা।

—তুমি কিছু বল না?

—কি বলব! এমন চোখ-মুখ, বলতে আমার সাহস হয় না।

ধনবৌ চন্দ্রনাথকে ডেকে বলেছিল, শুনছ!

চন্দ্রনাথ হাতে দা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। হাতে পায়ে ঘাস পাতা লেগে আছে। ধনবৌ চাল বাছছিল, সেসব ফেলে রেখে ফিসফিস গলায় বলেছিল, বৌমা কি বলছে!

—কি বলছে!

—অতীশ মাঝরাতে ঘরে ধূপকাটি জ্বালিয়ে বসে থাকে।

নির্মলা বলেছিল, চোখে মুখে একটা আতঙ্ক। ভয় পেলে, ঘাবড়ে গেলে যেমনটা হয়।

—কবে থেকে হয়েছে?

—স্কুলের ঝামেলার পর থেকেই।

চন্দ্রনাথ দা'টা পাশে রেখে বারান্দায় বসে পড়েছিলেন—কিছুক্ষণ মাথাটা নিচু করে দূর অতীতে কোন পাপ কাজ করেছিলেন কিনা যেন স্মরণ করার চেষ্টা। না। তেমন কোন কাজ তিনি করেন নি। তাঁর পুত্র পাগল হয়ে যাবে তিনি ভাবতে পারেন না। শুধু বললেন, কিছু বল না। আমি দেখছি। তারপর একদিন খেতে বসে এটা-ওটা নিয়ে কথা হবার সময় চন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি কি ভয় পাও?

—ভয় পাব কেন?

—দেখ অতীশ জীবনে নানাভাবে গোলযোগ দেখা দেয়। তুমি বাঁচবে, অথচ কোন গোলযোগ পোহাবে না সে হয় না। তোমার ভীতির কোন কারণ আমি বুঝতে পারছি না।

অতীশ বুঝতে পেরেছিল, নির্মলা ভয় পেয়ে সব বলে দিয়েছে। সে বলল, মাঝে মাঝে নাকে কিসের দুর্গন্ধ লেগে থাকে। ঘুম ভেঙে যায়। আর ঘুম আসে না। তখন ধূপকাঠি জ্বালাই। স্বস্তি বোধ করি।

—দুর্গন্ধটা কিসের?

অতীশ চুপ করে থাকল।

—দুর্গন্ধটা কিসের বলবে ত!

—মানুষের। অতীশ কেমন মরিয়া হয়ে যেন না বলে পারল না।

—আমার গায়ে কি সেটা পাও? তোমার মার! বৌমার! পুত্রকন্যার!

অতীশ ভাত নাড়ছিল। খাচ্ছিল না। বড় কঠিন প্রশ্ন তুলেছেন বাবা। সে কি জবাব দেবে বুঝতে পারছিল না।

চন্দ্রনাথ কিছুটা দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, জবাব দাও। কথা বলছ না কেন? পাপ কাজ করলে মানুষের শরীরে দুর্গন্ধ থাকে। সবাই টের পায় না। কেউ কেউ টের পায়। তবে আমার বিশ্বাস মানুষের একটা পাপ কাজের দুর্গন্ধ দশটা ভাল কাজে মুছে যায়।

অতীশ ক্রমেই গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল।

চন্দ্রনাথ ফের বললেন, বুঝলে পৃথিবীতে যখন এসেই গেছ, তখন প্রশান্ত চিত্তে সব ভাল মন্দ মেনে নাও। এতে কষ্ট কম পাবে।

অতীশের মনে হয়েছিল, যেন সেই স্যালি হিগিনস তাকে পৃথিবী সম্পর্কে সুপরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। সে খেতে খেতেই বুড়োর সেই মন্ত্রোচ্চারণের মতো কথাগুলি হুবহু মনে করতে পারছিল—ছোটবাবু মনে রাখবে গুডম্যান ইট টু লিভ, ব্যাডম্যান লিভস টু ইট। সে বলল, গন্ধটা সব সময় পাই না। এখানে এসে ভালই ছিলাম। কিন্তু কটুবাবুদের মিথ্যে অভিযোগের পর থেকেই এক রাতে ঘুম ভেঙে গেল বাবা। ওরা মিথ্যে করে আমার নামে ডি পি আইয়ের কাছে অভিযোগ করেছে। যাতে কাজ ছেড়ে দি সে-জন্য। মানুষের নীচতা আমাকে বড় কষ্ট দেয়।

—তারপরই বুঝি গন্ধটা পাচ্ছ।

—তাই।

—মনে কর না, তারা তোমার কিছু অনিষ্ট করতে পারে না। তিনি যদি অনিষ্ট না করেন তাদের কি ক্ষমতা অনিষ্ট করার। মনে কর না এটাও তোমার জীবনের পক্ষে তাঁর কোন শুভ ইচ্ছার প্রকাশ।

অতীশ হেসে দিয়েছিল। কারণ এছাড়া তার যেন অন্য কোন উপায় ছিল না। সে বলেছিল, আপনার একটা আশ্রয় আছে। আমার তাও নেই।

চন্দ্রনাথ জানেন শৈশব থেকেই তার এই পুত্রটি ঈশ্বরের প্রতি বিরাগ। পরিবারের আর দশজনের মতো তার ধর্মবোধ গড়ে ওঠেনি। আচার বিচার নিয়ে মাঝে মাঝে পিতাপুত্র কথা কাটাকাটি হয়েছে, ঈশ্বর আছেন, এও তার পুত্র বিশ্বাস করতে কষ্ট পায়। মৃত্যুর পর সব শেষ সে এমন ভেবে থাকে। আত্মা এবং পরলোক সম্পর্কেও ভারি অবিশ্বাস। তিনি কিছু বইয়ের উল্লেখ করে বলেছিলেন, এসব পড় জানতে পারবে।

অতীশ ভিতর থেকে ভীষণ বেয়াড়া হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, মৃত্যুর পর কি আছে কেউ জানে না বাবা। যদি কেউ কিছু বলে থাকে, মিছে কথা বলেছে। আমার বোধ-বুদ্ধিতে তোমাদের ঈশ্বরকে ধরতে পারি না।

—এখন পারবে না। আর একটু বয়েস হোক সবই পারবে। তারপরই চন্দ্রনাথ কিছুটা বিচলিত বোধ করেছিলেন। যদি সেটা না হয় অতীশের, তবে মানুষের দুর্গন্ধ তার নাকে লেগেই থাকবে। এবং এই দুর্গন্ধটাই তাকে শেষ পর্যন্ত পাগল করে দিতে পারে। তিনি বললেন, তোমার জন্য তিনি না থাকুন, তোমার

সন্তান-সন্ততির জন্য অন্ততঃ তিনি থাকুন। চন্দ্রনাথ কিছুটা বিরক্ত হয়েই যেন পুত্রকে এমন কথা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অতীশ শুধু বলেছিল, আমারও ভরসা এরা যদি বেঁচে থাকে ভাল হয়, সজ্জন হয়, তবে তা আপনার পুণ্যফলেই হবে।

চন্দ্রনাথ আবার অনেক সুদূর থেকে কথা বলছিলেন যেন, আমি চাই আমার পাপ-পুণ্য বলে যদি কিছু থাকে তা তোমাকে স্পর্শ করুক। ঈশ্বর তোমাকে এই দুর্গন্ধ থেকে মুক্তি দিন।

নির্মলা পাশের ঘর থেকে শুনতে শুনতে কাঠ হয়ে গেছিল। এমন ঈশ্বর-বিহীন মানুষ নিয়ে তাকে সারা জীবন ঘর করতে হবে। ভাবতে গিয়ে ভয়ে কান্না উঠে আসছিল। তবু আশা বাবা বলেছেন, তাঁর পাপপুণ্য বলে যদি কিছু থাকে তা মিণ্টু টুটুলকে স্পর্শ করবে। সেই আশায় আজ যাবার সময় বাবার দেওয়া সবকিছু যত্নের সঙ্গে নিয়ে নিল। বাবার হস্তাক্ষরে লেখা কালীর স্তোত্র, গায়ত্রী-কবচ—কবচ পাঠ করতে বলেছেন, বিপদে আপদে কবচ পাঠ করলে সব আপদ কেটে যায়। আর ঠাকুরের ফুল-বেলপাতা—সেও সঙ্গে দিয়েছেন। সব শেষে তিনি যাত্রা করার আগে টুটুলকে বারান্দায় বসিয়ে তার মাথার ওপর গোটা পাটা তুলে দিয়ে বলেছেন, ঈশ্বর তোমাকে অনুসরণ করুক। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।

সারি সারি তিনটে রিকশা যাচ্ছে। গাছপালার অভ্যন্তরে তিনটে রিকশা চলে যাচ্ছে। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন চন্দ্রনাথ ধনবৌ অলকা এবং প্রতিবেশীরা। চন্দ্রনাথ হাত তুলে দিয়েছেন। টুটুলও মায়ের মাথা ডিঙিয়ে পিতামহের প্রতি হাত তুলে দিয়েছে। নির্মলা পেছন ফিরে শুধু দেখল। যাত্রা আরম্ভ। কোথায় শেষ সে জানে না। তার চোখে জল নেমে এল।

॥ তের ॥

এই কলকাতা শহরে তখন একজন ভোজবাজিওয়ালা খেলা শুরু করার পাঁয়তাড়া কষছে। ডুগডুগি বাজছিল। বাঁশের খুঁটি পোঁতা হয়ে গেছে। লোকজন জমছে না। সে হাঁকছিল, খেলা শুরু হ'গেল। রূপয়াকা খেলা জাদুকা খেলা। মরণ তারের খেলা। চাকতি কা খেলা। এবং বিবি বাচ্চা লেড়কি সব হরদম সং সেজে নাচছিল। হারমনিয়ম বাজছিল।

লোকজন সব নানা ধান্দায় ছুটছে। সময় নেই। শুধু রূপায়া চাই। চাই জৌলস। মানুষেরা তবু কেউ কেউ কেন যে কৌতূহলী হয়ে যায়—সূর্য ডোবার আগে এই নিরস ইট কাঠের শহরে পরম রোমাঞ্চ বোধ করে দাঁড়িয়ে যায়। লোকটির পরনে হাফ হাতা জামা প্যান্ট, মাথায় জোকারের টুপি—পেটে চুন কালি দিয়ে মানুষের কংকাল—হারেরে হাভাতে—বড়ই মরণ আমার। বাচ্চাভি রূপয়াকা জাদু ঘুচক লিয়া। এই ঘুচক লিয়া শব্দেই অতীশ থমকে দাঁড়িয়েছিল। শহরের এদিকটায় একটা বড় খাল পাড়—ব্রীজের মুখে কেউ ঘুচক লিয়া বলছে। সে সবার মতো ভিড়ের ভেতর নিজেও উঁকি দিল। বছরখানেকের বাচ্চা একটা ফুলপরীর মতো সাজিয়ে ছেড়ে দিয়েছে ফুটপাথে। চোখ কালো কাপড়ে বাঁধা। একটা রুপোর টাকা লোকটা দৌড়ে দৌড়ে বসিয়ে দিচ্ছে। বাচ্চাটা হামাগুড়ি দিয়ে ছুটছে ঠিক সেদিকে।—টান বুঝেন বাবু। টেনে লিয়ে আসছে। ও বাচ্চাকা কৈ তরিকা নেহি বাবু। যো কুচ তরিকা ই রুপিয়াকো? তারপর হাত তুলে নেচে নেচে সে বলছিল, খানদানি বলেন, আমদানি বলেন, জামদানি বলেন, সব রূপায়াকা মেহেরবান। পয়দা হোয়া ও রোজ। লেকিন রূপয়া চিন লিয়া।

অতীশ সত্যি আশ্চর্য হয়ে গেল দেখে, সেই সেদিনের পয়দা, ভাল করে হামাগুড়ি দিতে শেখেনি, কিন্তু টাকা চিনে গেছে। চোখ বাঁধা। অথচ লোকটা যেখানে যেদিকে টাকাটা রাখছিল বাচ্চাটা হামাগুড়ি দিয়ে সেদিকেই ছুটে যাচ্ছে। হামাগুড়ি দিতে দিতে টাকাটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। এবং টাকাটা হাতে নিয়ে আর দিতে চাইছে না। সে খেলাটা দেখে সত্যি তাজ্জব বনে যাচ্ছিল। তার তাড়া আছে। সে সকাল সকাল অফিস থেকে বের হয়েছিল। আরও কিছু কেনাকাটা বাকি। আজ নির্মলা আসবে। দু-তিনদিন ধরে তার কি উত্তেজনা! নির্মলা, সেই সুন্দর দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি এই বড় শহরে চলে আসছে। মিণ্টু টুটুল আসছে। প্রহ্লাদ কাকা নিয়ে আসবেন। দু তিন দিন ধরেই নির্মলার জন্য চোখে ঘুমটুম গেছে। কাল রাতে কি যে গেছে! এত বড় একটা বাসা বাড়িতে সে একা কাটিয়েছিল। সারাটা রাত তাকে আর্চি বনি নির্মলা টুটুল মিণ্টু ঘিরে রেখেছিল! সে টুটুলের কথা ভেবে কেমন ভয় পেয়ে গেছিল। কারণ সে স্পষ্ট দেখেছে, রাতের আঁধারে কেউ তার পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। কোন ছায়ামূর্তি। সে মনের ভুল ভেবে আলো জ্বালিয়েছিল। না কিছুই নেই। কিন্তু দরজার ওপাশে কোন মৃত হাত ঝুলে থাকলে যেমন দেখা যায় তেমন একটা হাতের ছায়া। সে চিৎকার করে উঠেছিল, কে ওখানে

দাঁড়িয়ে! হাতের ছায়াটা দুলছে। বড় বড় তিনটে ঘর—সামনে বিশাল বারান্দা, পাশে রান্নাঘর। প্রাসাদের পেছনের দিকে ওকে থাকতে দেওয়া হয়েছে। ঘরগুলো কত লম্বা উচ যেন! সে মই দিয়েও ছাদের নাগাল পাবে না। কথা বললে গম-গম করে উঠেছে। সে জোরে কথাও বলতে পারছিল না। চিৎকার করতে গিয়ে বুঝতে পেরেছিল, খুবই তীক্ষ্ণ হয়ে যায়—ঘুম ভেঙে যেতে পারে সবার। সে ধীরে ধীরে আবার বলেছিল, তুমি কে। অন্ধকার থেকে হাত বের করে ভয় দেখাচ্ছ?

তখনি হাতের ছায়াটা অদৃশ্য হয়ে গেল। ওতে অতীশ আরও ভয় পেয়ে গেছিল। সারা শরীরে ঘাম। সেই প্রেতাত্মার কোন প্রভাব টভাব হবে। সে সাহসী মানুষের মতো দরজাটার কাছে এগিয়ে গেল। না কিছু নেই। দুটো টিকটিকি তাড়া খেয়ে ছুটছে। সামনের দরজা খুলে সে বারান্দায় বের হয়েছিল। কেউ যেন বারান্দা দিয়ে চলে যাচ্ছে। কোন ছায়া নেই অথচ ছায়ার মতো, জলীয় বাষ্পের মতো কোন অবয়ব। ঠিক মানুষের অবয়ব। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস সে দেখেছে। প্রায় তার মতো হাওয়ায় ভেসে গেল! এবং বাইরে পাতাবাহারের গাছগুলির মধ্যে ঢুকে কেমন মিশে গেল সব কিছু। জ্যোৎস্না এবং হাওয়ায় তখন শুধু পাতাবাহারের গাছগুলো দুলছে। অতীশ দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে এসেছিল। সে গাছের পাতায় হাত দিতেই আতঙ্কে হিম হয়ে গেল। পাতার গায়ে সগু লেগে থাকা জলকণা। আর্চিকে সে কখনও আর এ-ভাবে প্রত্যক্ষ করেনি। আর্চি যাবার আগে আর কখনও এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ রেখে যায় নি! তারপরই যা হয় ভয়ে সে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে সারারাত বসেছিল। নির্মলা টুটুল মিণ্টুকে সে রক্ষা করতে পারবে কিনা জানে না। আর্চি বনিকেও এ-ভাবে তাড়া করেছে শেষ পর্যন্ত। —ঐ দেখ দেখ, জ্যোৎস্নায় কি ভেসে বেড়াচ্ছে!

সমুদ্রে দৃশ্য দেখে সে ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল। বিশাল সমুদ্র—রাতে ঝড় গেছে। ঝড়ের সময় বোটের সামনে অয়েল ব্যাগ ঝুলিয়ে দিয়েছিল। সারা আকাশময় জলকণা ভেসে বেড়াচ্ছে। তালগাছ প্রমাণ সব উঁচু ঢেউয়ে বোট আছাড় খেয়ে পড়ছে। অতীশ হাল ধরে বসে আছে পাথরের মতো। বনি ছইয়ের নিচে বসে অন্ধকারে চোখ বুজে। এত অন্ধকার যে বোটের ও-পাশটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। কিছু গড়িয়ে পড়েছিল। বনি লাফিয়ে বের হয়ে টর্চ জেলে পাটাতন তুলে দেখতে গেছে কি পড়ে গেল! না, কিছুই পড়েনি। সব ঠিকঠাক। আবার পাটাতনের নিচে হুড়মুড় শব্দ। অতীশ বিপদে পড়ে যাচ্ছিল।

পাটাতনের নিচে কে এত দাপাদাপি করছে। সে বলল, নিচে ঢুকে দেখ। আসলে সে হাল ছেড়ে উঠে যেতে পারছিল না। বড় বড় ঢেউ থেকে অজস্র জলকণা তার গায়ে এসে লাগছে। ঢেউয়ে বোট একটা তালপাতার ডোঙার মতো দুলছে। হাল বেসামাল হলেই ওরা সেই অন্তহীন গভীর সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। অতীশ সে-জন্য হাল ছেড়ে যেতে পারছিল না। সে বনিকে বারবার ধমকাচ্ছে। ও-কি করছ বনি। দেখ না। দেখ। নিচে দেখ।

বনি আবার পাটাতন তুলে বলেছে, না কিছু পড়ে যায়নি ছোটবাবু। জায়গারটা জায়গায় আছে।

তারপর সারারাত ঝড় আর এই হুড়মুড় শব্দ। ঝড় উঠলেই এলবা আর বোটে থাকে না। আকাশে নিরন্তর ঢেউয়ের মাথায় ডানা ঝাপটায়। কখনও নেমে আসে, কখনও উঠে যায়। এই করে সারা আকাশময় সমুদ্রময় তখন তার খেলা। না কি এলবাও টের পেয়েছে, আর্চির আক্রমণ ঘটেছে বোটে। ভয়ে সেও পালিয়েছে।

সকালের দিকে ঝড়টা থেমে গিয়েছিল। সমুদ্রকে চেনাই যাচ্ছিল না। শান্ত বালিকার মতো সে যেন হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। মৃদু হাওয়া, এবং পালে সামান্য হাওয়া লাগায়, বোট ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। সকালে ওরা আশা করেছিল, দ্বীপটিপ পেয়ে যাবে। চারদিন হয়ে গেল অথচ কোন কিছুর চিহ্ন নেই। শুধু দিগন্তব্যাপী আকাশ আর সমুদ্র। দিগন্তব্যাপী অসীম শূন্যতা। আর ভয়ংকর কঠিন এক মৃত্যুর যেন হাতছানি। তবু বনি অন্যদিনের মতোই উনুন জেলেছিল। চাপাটি করেছে। ঝড়ে গোটা দশেক উড়ুক্কু মাছ এসে পড়েছিল বোটে। সেই মাছভাজা আর চাপাটি। সকালে শুধু মাছ ভাজা দিয়ে ব্রেক-ফাস্ট, দুপুরে চাপাটি মাছ ভাজা। রাতে চাল ডালে খিচুড়ি মাছ ভাজা। এবং জ্যোৎস্নায় যখন নিরিবিলি, বনি অতীশকে বুকে নিয়ে বলছে—আমরা তো বাঁচব না। এ-কদিন যা কিছু আমাদের প্রিয় খেলা আছে খেলে নেই। এবং সেই পরম মুহূর্তে সহসা চিৎকার করে উঠেছিল বনি, ঐ দেখ। দেখ ছোটবাবু আকাশে কি ভেসে রয়েছে।

ঠিক সেই মুখ। জলীয় বাষ্পের মতো আর্চি ভেসে ভেসে চলে আসছে অথবা নেমে আসছে। কিছুটা দূরে এসেই সেটা কেমন স্থির হয়ে থাকল। নড়ল না। তারপর যেমন ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় তেমনি আকাশের নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেতে থাকল। একদিকে মুণ্ডুটা ভেসে গেল, একদিকে পা, হাত আঙুল সব

ছিন্ন ভিন্ন হয়ে আকাশের গায়ে পেঁজা তুলার মতো উড়ে বেড়াতে থাকল। বনি তাড়াতাড়ি গাউন টেনে ছোটবাবুকে ঠেলে দিল, ছোটবাবু, কেন কেন তুমি ওকে খুন করতে গেলে। কেন? কেন?

ছোটবাবু একজন নাবালকের মতো মুখ করে বসে ছিল। জবাব দিতে পারেনি। অতি দূর থেকে সেই সতর্কবাণী, কেউ যেন অনুচ্চারিত কণ্ঠে বার বার প্রতিধ্বনি করে যাচ্ছে, ছোটবাবু তোমার ক্ষমা নেই। আর্চি তোমাকে ক্ষমা করবে না। সেই দূর অতীত থেকেই, তিনি যেন আবার বলছেন, মানুষের এই ভাগ্য ছোটবাবু। সে এ-ভাবেই জীবনে জড়িয়ে যায়।

আর তখনই অতীশের চোখ মুখ অস্থির হয়ে ওঠে। আসলে সে যত বড় হচ্ছে, বয়স বাড়ছে, দায়দায়িত্ব গ্রহণ করছে তত এক অদৃশ্য ভয় তার চারপাশে বেড়াজালের মতো গ্রাস করছে। কেউ জানে না সে খুনী। তবু ভয় পায়। কেউ সাক্ষী নেই, তবু সে ভয় পায়। সেই সমুদ্রে আর্চির শেষ অস্তিত্বটুকু অতিকায় মাছেরা গ্রাস করেছে। লণ্ডভণ্ড করে খেয়েছে তার শরীর। ওদের রক্তে আর্চির কোন অণু-পরমাণু বেঁচে থাকলেও থাকতে পারে। আর্চির শরীর ওদের প্রোটিন যুগিয়েছে। নতুন রক্ত কণিকার জন্ম দিয়েছে। তারাই একমাত্র সাবলীল এখনও। সে ভেবেছিল, মাছে খেলেও শেষ হয়ে যায় না। মানুষ মরেও শেষ হয়ে যায় না। কোথাও না কোথাও ধূলিকণায় সে পড়ে থাকে। বৃষ্টিপাত হয়, মাটির উর্বরা শক্তি বাড়ে। ঘাস জন্মায়। ঘাস মাটি থেকে রস শুষে নেয়। সেই মানুষের অস্তিত্ব তার শরীরে—গাভীরা ঘাস খায়, দুধ দেয়। মানুষ আবার প্রোটিন সংগ্রহ করে। এবং শরীরে তার বীজের জন্ম হয়। সে এ-ভাবে কোন পুনর্জন্মের কথা ভেবে থাকে—এ-ছাড়া মানুষের অন্য কোন পরলোকে তার বিশ্বাস নেই। সে তার জীবনের সবটুকু অনুভূতি দিয়ে এটা বার বার ভেবে দেখেছে। এত সব সত্ত্বেও কি করে সে আর্চির প্রেতাত্মায় বিশ্বাসী বোঝে না।

সে তার জীবনের এই কালো দিকটার কথা পৃথিবীর কাউকে বলেনি! বাবাকে না, নির্মলাকে না, কাউকে না। বাবাকে বললে, জানে শান্তি পেত। তিনি তাকে নানাভাবে দৈবের কথা বলে অনুপ্রাণিত করতে পারতেন। ঈশ্বরের কথা বলে ভয় কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু সে জানে, বাবা শুনলেই বলবেন, এ-বেশ হয়েছে তোমার। ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই, ভূতে তোমার বিশ্বাস আছে। অর্থাৎ বাবা বলতে চাইবেন, যেমন পৃথিবীতে ঈশ্বর আছেন, তেমনি ভূতও আছে। একজনকে বাদ দিয়ে আর একজনকে স্বীকার করা যায় না। সুতরাং

এই ভয় দূর করতে হলে তোমার ঈশ্বর বিশ্বাস দরকার। তা না হলে খোলা মাঠে বীজ রোপণ করা যায় না। গাইগরুতে তা বিনষ্ট করবেই।

অতীশ স্ট্যাণ্ডে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। সোজা স্টেশনে যাবে। চারপাশে মানুষজন পোকার মতো থিকথিক করছে। বাসগুলিতে ওঠা যাচ্ছে না। বাসের পাদানিতে পর্যন্ত একটু ফাঁকা নেই। অনেকদিন সে বাসের ভিড় এড়াবার জন্য হেঁটে চলে যায়। কিন্তু আজ তাড়া আছে। আশেপাশে একটাও ট্যাকসি নেই। রিকশতে যেতে পারে। তাতে আর কতটা সময় বাঁচবে। সে তারপর ভাবল, বাসে না গিয়ে ট্রামে গেলে হয়। ভিড়টা কম মনে হল ট্রামে। কোনরকমে সে গুঁতোগুঁতি করে একটা ট্রামে উঠে গেল। নানারকম কথা হচ্ছে। সরকার কম্যুনিস্টদের গ্রেপ্তার করছে। কে যেন বলল, চীনের দালাল এরা। এবং এ সময়েই মনে হল, দেয়ালে ভেসে উঠছে লেখা, চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। এটা মনে হবার কারণ কি সে বুঝতে পারল না। তবু এইসব ভাবনা তাকে স্বস্তি দেয়। অফিসে বোনাস নিয়ে কোন প্রকার গণ্ডগোল হয়নি। গত বছরের এগ্রিমেন্ট ছিল। সেই সুবাদে সব হয়ে গেছে। এ-ভাবে নিজেকে আর কি ভাবে অন্যমনস্ক রাখবে বুঝতে পারছে না। অমলার কথা তাদের বৈভবের কথা ভাবতে পারে। এখন অন্য যে কোন ভাবনাই তাকে আর্চির অস্বস্তির হাত থেকে রক্ষা করবে। কিংবা আড়াই মাসে টুটুল আর কতটা বড় হয়েছে! বাবাকে চিনতে পারবে ত! কারণ টুটুল মিণ্টু জানেই না তারা যত বড় হচ্ছে তত সে অসহায় বোধ করছে। নিরাপত্তার অভাব এত বেশি এই শহরে যে মানুষগুলোকে পাগলা কুকুর বানিয়ে ছেড়েছে।

তখনই ট্রামটা স্টপেজে এসে গেল। ঘড়িতে পাঁচটা বেজে গেছে। সে কেমন দৌড়ে যাচ্ছিল। চারপাশের মানুষজনের প্রতি কোন তার ভ্রূক্ষেপ নেই। এখনই এনকোয়ারিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে, ক নম্বর প্ল্যাটফরমে ট্রেনটা আসছে। লেট আছে কিনা। একটা প্ল্যাটফরম টিকিট কাটতে হবে। এগুলো সে স্টেশনে ঢুকেই সেরে ফেলল। ঘড়িতে দেখল, আরও আধ ঘণ্টাখানেক সময়। এই সময়টা সে কি করবে! এই সময়টা সে ভাবল মানুষজনের মুখ দেখে কাটিয়ে দেবে। অবশ্য এত নোংরা প্ল্যাটফরম যে পা ফেলার জায়গা নেই। দলে দলে উদ্বাস্তু আবার আসছে। সারা স্টেশন জুড়ে বাকস প্যাঁটরা মলিন পোশাক পরা উদ্বাস্তুর দল। সেও এ-ভাবে তার বাবার সঙ্গে এ-দেশে এসেছিল। এখনও সেই মিছিল চলছে। এত ভালমানুষ জন্মায়, অথচ মানুষের নীচতা তাতে

নষ্ট হয় না। ঈশম দাদার কথা আজ অনেকদিন পর হঠাৎ কেন জানি মনে পড়ে গেল। তিনি কেমন আছেন কে জানে। এরা কোথা থেকে এসেছে জিজ্ঞেস করলে হয়। —কোথা থেকে।

—ফরিদপুর বাবু।

লোকটা আরও কথা বলতে চাইছিল। কিন্তু অতীশ জানতে চায়, সেই সোনালী বালির নদীর চরের কাছাকাছি কেউ আছে কিনা। থাকলে যেন প্রশ্ন করত, ফতিমাকে চেনেন? সামসুদ্দিনকে। ঈশম দাদাকে। তারপরই মনে হল সবটাই সে কোন অদৃশ্য প্রেতাত্মার ভয় থেকে করছে। এইসব মানুষেরাও এক অদৃশ্য প্রেতাত্মার শিকার। ঈশ্বর এবং প্রেতাত্মা কেউ কম যায় না। এরা ঈশ্বরের নামে তাড়া খেয়ে ভিটে মাটি ছেড়েছে। এবং এই সময় সে কেমন তার বাবার ওপর কিছুটা বিজয়ী। সে মনে মনে বলল, বাবা আপনার ঈশ্বরের অবস্থা দেখে যান। আপনার ঈশ্বর ঈশমদাদার ঈশ্বরের এই পরিণতি।

সে তারপর আর দাঁড়াল না। দেখল সামনে সংখ্যায় প্ল্যাটফরম নম্বর ঝুলছে। ভিতরে ঢুকে গেল। কোথায় দাঁড়ালে ঠিক হবে বুঝতে পারছে না! পাশের প্ল্যাটফরমে একটা লোকাল গাড়ি এসে ভিড়ছে। মুহূর্তে প্ল্যাটফরমটা মশামাছির মত ভনভন করতে থাকল। চিৎকার এবং গুঞ্জন, ট্রেনের হুইসিল কানে প্রায় যেন গরম ইস্পাত ঢেলে দিচ্ছে। এবং কি ভয়ংকর উত্তেজনা তার। সে পায়চারি করছিল, আর ভাবছিল, কখন নির্মলার মুখ দেখতে পাবে। নির্মলা জানালা দিয়ে যেন উঁকি দিচ্ছে, আমরা এখানে। আগের দিকে থাকবে, না পেছনের দিকে থাকবে সেটা চিঠিতে জানালে ভাল করত। সে-ভাবে সে জায়গা ঠিক করে নিতে পারত। এবং সে বেশ অস্থির হয়ে পড়ছিল। পুত্র কন্যার মুখ দেখার জন্য অধীর হয়ে পড়ছে। কিছুটা সে বিচলিত বোধ করছে। দীর্ঘদিন পর স্বামীস্ত্রীর সঙ্গে দেখাদেখির বিষয়টা তার জানা নেই। আজ কেন জানি নির্মলার জন্য বড় বেশি আবেগ তার। কাল রাতেও। কিন্তু সবটা মাটি করে দিয়ে গেছে আর্চির প্রেতাত্মা। এখন আবার সেই জুজুর ভয়টা গ্রাস করতে চাইলে সে জোর করে ভাবল, সব মনের ভুল। সব সে ভুল দেখে। পাপবোধ তাকে পীড়ন করে চলছে। যে ভাবেই হোক তাকে মনের জোরে লড়ে যেতে হবে। সে খুবই স্বাভাবিক মানুষ। কাল রাতে জাগরণ গেছে নির্মলাকে কিছুতেই টের পেতে দেবে না। নির্মলা তবে ভেঙে পড়বে। এখানে ভেঙে পড়লে নির্মলাকে দেখার কেউ নেই। ওখানে অন্তত আর কেউ না থাকুক তার বাবা ছিলেন।

অতীশ মনে মনে বলল, কিরে টুটুল আমাকে চিনতে পারবি ত। ভুলে যাসনি ত আমাকে। হামাগুড়ি দিতে দিতে উঠে দাঁড়াস। দু হাত তুলে বা বা করিস। সে নিজের সঙ্গে নিজে যখন এ-ভাবে কথা বলছিল তখনই ট্রেনটা প্ল্যাটফরমের ভেতরে মাথা বাড়িয়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে ছেলেমানুষের মতো ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল। সে জানালাগুলো দেখে যাচ্ছে। কত মানুষ, ভদ্রজন ভেণ্ডার চাষী শ্রমিক স্ত্রীপুত্র নিয়ে পরিবার যুবক যুবতী বুড়ো বুড়ি এবং হল্লা চেঁচামেচি—সব আছে কেবল নির্মলা নেই। সে শেষ কামরা পর্যন্ত ছুটে গেল। না নেই। ওরা তাহলে আসেনি। চারপাশে মিছিলের মতো মানুষজন। বেগে ছুটে যাচ্ছে। আহাম্মকের মতো কতবার যাত্রীদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি খেয়ে যখন একেবারেই নিরাশ, ফিরে যাচ্ছে তখনই চিৎকার, মেজদা এদিকে। ঐ ত নির্মলা। প্ল্যাটফরমে বাক্স পেঁটরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। টুটুল কোথায়? মিণ্টু! কিছুটা দূরে থেকেই মিণ্টুকে দেখতে পেল। টুটুল দু হাতে মায়ের পা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তাড়াতাড়ি বের হওয়া দরকার। মানুষটা ছুটে আসছে। সারা রাস্তার ক্লান্তি উদ্বেগ মুহূর্তে নির্মলার জল হয়ে গেল। মানুষটা আসছে। প্রায় ছুটে আসছে। নির্মলা তাড়াতাড়ি টুটুলকে কোলে তুলে নিল।

অতীশ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, তোমরা এত সামনে থাকবে বুঝব কি করে। ওদিকে খুঁজছি। প্রহ্লাদ কাকা সব নামিয়েছে ত। হাস্থ একবার দেখে আর কিছু আবার পড়ে থাকল কিনা।

এই মানুষের এত সংসারী হওয়া দেখে নির্মলা মুচকি হাসল। বলল, সব নামিয়েছি।

আর তখনই আশ্চর্য সেই টুটুল কেমন সহসা মার কোল থেকে অতীশের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল। টুটুল, দু হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বাবাকে দেখে। এতটুকু শিশু বোঝে কি করে সে বাবা। সে তার প্রিয়জন। অতীশও দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছে। টুটুল অতীশের কোলে উঠেই গলা জড়িয়ে ধরেছে। অতীশ বলল,—তুই আমাকে চিনতে পারলি। আমার কত ভয় ছিল, আমাকে ভুলে গেছিস হয়ত।

নির্মলা বলল, কাণ্ড দেখ ছেলের। আমরা যেন কেউ না।

অতীশ নির্মলার কথায় হাসল। সে এই প্রথম নির্মলার দিকে চোখ তুলে তাকাল। লক্ষ্য করল নির্মলা ওর দিকে ভাল করে তাকাতে পারছে না। ক্লান্তি

অথচ চোখ মুখে বড় বেশি অধীরতার ছাপ। সে বুঝতে পারছিল, নির্মলা ওকে গোপনে দেখছে। তাড়াতাড়ি সে কিছুটা অন্যমনস্ক হবার মতো বলল, নাও হাঁটো।

কুলিরা মাথায় দুটো নীল রঙের ট্রাংক বিছানা তুলে নিয়েছে। মিণ্টু পা পা হেঁটে যাচ্ছে। টুটুলটা ভীষণ পাজি। বাবাকে দখল করে বসে আছে। ওর ভারি হিংসা হচ্ছিল! সে কাছে গিয়ে বলল, বাবা আমি মিণ্টু।

—হ্যাঁ মা। তুমি আমার মিণ্টু। বলে সে নুয়ে আর এক হাতে মিণ্টুকেও বুকে তুলে নিল। এবং দুজনেই পরম নির্ভয়ে বাবার গলা জড়িয়ে কেমন শরীরে বাবা বাবা গন্ধ শুঁকছে। যেতে যেতে অতীশের মনে হচ্ছিল, শিশুরা বোধহয় গন্ধ শুঁকে টের পায় কে তার আপনজন। টুটুল কত কথা বলছে যার মাথামুণ্ডু সে কিছুই বুঝছে না। এক অতিকায় শেডের নিচে সে তার পুত্রকন্যাকে বুকে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। পরম গভীর উষ্ণতায় অতীশ জীবনের অন্য এক মহিমা অনুভব করল আজ। যেন কতকাল ধরে এদেরই প্রতীক্ষায় সে এই পৃথিবীতে বসেছিল।

হাস্থর হাতে একটা অ্যাটাচি, একটা লেদার ব্যাগ। প্রহ্লাদ কাকা নিয়েছে বড় একটা পুঁটুলি। মার দেওয়া সব টুকিটাকি জিনিস আছে ওতে। প্রহ্লাদ কাকার কাছে ওটা খুবই মহার্ঘ বস্তু। সব ফেলে গেলেও যেন কিছু আসে যায় না। কিন্তু এটা বাসায় পৌছে দেওয়া তার বড় দরকারী কাজ। নানারকমের আচার, আমসত্ত্ব লেবু আনারস ভাল দুটো গাছের, পেয়ারা, ক্ষেতের মুসুরি মুগ ডাল, কিছু সুগন্ধ আতপ চাল—ছেলে খেতে কি ভালবাসে না বাসে, সব ঐ পোঁটলাটা খুললেই বোঝা যাবে। সুতরাং প্রহ্লাদ কাকা খুব প্রফুল্ল চিত্তে এখন যেতে পারছে। সে এই কলকাতা শহরে কখনও আসেনি। দরজার গোড়ায় সব নামিয়েই বলল, মেজবাবু আমাকে একবার কালীঘাট দর্শন করিয়ে দেবেন।

নির্মলা শেষ পর্যন্ত এত বড় বাসা বাড়ি দেখে অবাক। পুরোনো বাড়ি, নতুন চুনকাম করা, দু-ঘরে দুটো তক্তপোশ। একটা টেবিল, বসার দুটো চেয়ার এবং বাসাটার পক্ষে এগুলি খুবই অকিঞ্চিৎকর—কারণ, সোফা সেট, বাতিদান নেই। জানালায় পর্দা কেনার পয়সা মানুষটার হয়নি। গাঁয়ের বাড়িতে একভাবে কেটে যায়। শহরে এলে যেন এসবের দরকার বোধ হয়। কিন্তু নির্মলা মানুষটাকে জানে—চলে যাবার মতো হলে সে বেশি কিছু চায় না। নির্মলার বাপের বাড়ির আত্মীয়স্বজন বড়ই প্রতিষ্ঠিত জীবনে। ওদের নিজেদের যেমন গাড়ি বাড়ি আছে, আত্মীয়স্বজনদেরও তেমনি। সেদিক থেকে তার মানুষটা

প্রায় খুব গরীবই বলা চলে। এবং মানুষটার এ-জন্যই তার বাপের বাড়ির প্রতি একটা তাচ্ছিল্য ভাব আছে। গরীবের অহংকার তো ঐ এক জায়গায়। সব কিছু তুচ্ছ করে দেখা। এবং তার মানুষটার ধারণা দেশটা যা তাতে গাড়ি বাড়ি সোফা সেট মানুষের মানায় না। যে পারে তাকে কিছুটা অধার্মিক হতেই হয়। কোন না কোনভাবে সে শোষণের হাতিয়ার হয়ে পড়ে।

এই রাজবাড়ি, বাসা এবং সামনে পাতাবাহারের গাছ, কিছু দূরে বড় এক শেফালী ফুলের গাছ, তারপরে বাগান, বাবুর্চি পাড়া, পুকুর, মাঠ এবং ছোটখাট একটা ঈশ্বরের বাগান এটা—চিঠিতেই জানতে পেরেছিল নির্মলা। মনে মনে সে এমনই আশা করেছিল। বাতিগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কুম্ভবাবু খবর পেয়ে এসে গেছে টুটুলকেও কোলে নিয়ে আদর করছে। নির্মলাকে বৌদি বৌদি করছে। ওর বৌ এসে ঘরদোর ঠিকঠাক করতে লেগে গেল নির্মলার সঙ্গে। অতীশ হাসুকে স্নান করে নিতে বলল। স্টোভে চা বসানো হয়েছে। সবই সে এনে রেখেছিল। মাছটাছ আনেনি। ডিমের ঝোল ভাত। কুম্ভবাবুর কথাবার্তা শুনে নির্মলা খুব খুশী। মানুষটা তাহলে একজন ভাল সহকারী পেয়ে গেছে। শহরে এ-সবের বড়ই দরকার।

অতীশ বলল, প্রহ্লাদকা, এখন একটু চা মিষ্টি খাও। তারপর রান্না হলে খাবে।

—নাগো মেজবাবু। সারা রাস্তায় বৌমা বড়ই খাইয়েছে। মিষ্টি খেয়ে সুখ পাব না। রাত হলেই খাব।

টুটুল কখন তক্তপোশের নিচে গিয়ে বসে আছে। মিণ্টু টুটুলের ঠ্যাং ধরে টেনে আনছে। আর ডাকছে বাবা বাবা টুটুল কথা শুনছে না। দুষ্টুমী করছে। আমাকে কামড়েছে।

নির্মলা বলল, তোরা এসেই লাগালি।

অতীশের এসব বড় ভাল লাগছিল। এতদিন সে যেন বনবাসে ছিল। মনমরা, কেউ নেই, কেমন সম্পর্কহীন হয়ে পড়ছিল। আর্চি এই সুযোগে তার ওপর বেশ হামলা চালিয়ে গেছে। এখন আর্চি আসতে ঠিক ভয় পাবে। আর কাউকে না পাক টুটুল মিণ্টুকে পাবে। কারণ এ-বয়সে এরা বড়ই পবিত্র। ফলে আর্চির আক্রোশ থাকারও কথা নয়। তারপরেই কেন জানি মনে হল, এরা তার জাতক, যদি আর্চি এদের কোন অনিষ্ট করতে চায় : যদি আর্চি টের পেয়ে যায় তার পৃথিবী বলতে এরাই। সে কিছুটা তক্ষুনি কেমন ম্রিয়মাণ হয়ে গেল।

সামনেই বড় সেই পুকুর। কালো জল। হেঁটে হেঁটে যদি চলে যায়, যদি পড়ে যায়, অথবা কে জানে, কোন এক অদৃশ্য আক্রোশ কখন কিভাবে কাজ করবে। পুকুরটা যে এত ভয়ের হতে পারে, সে টুটুল মিন্টু আসার পরই কেমন টের পেয়ে গেল সেটা।

নির্মলা তখন চা করে এনেছে। কুম্ভবাবু বলল, বৌদি কেমন লাগছে জায়গাটা ?

—খুব ভাল। আর একটা মিষ্টি দি।

কুম্ভ বেশ মনোযোগ সহকারে খাচ্ছে। অতীশকেও দেওয়া হয়েছে। চা নিয়ে তক্তপোশে বসতেই কোথা থেকে ঠিক গন্ধ পেয়ে টুটুল টলতে টলতে চলে আসছে। এক মাথা চুল, চোখ টানা। আর চাপা নাক বাদে এই ছেলের আর সবই বাপের মতো। অতীশ ছেলেকে ভাল করে দেখছিল। টলতে টলতে এসে হাঁটুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অতীশ ছেলেকে পাশে বসালে টুটুল গা বেয়ে উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে বাপের চা টেনে নিতে চাইল। মিষ্টির প্লেট টেনে ফেলে দিতে চাইল। বাধ্য হয়ে অতীশ কিছুটা মুখে দিতেই টুটুল শান্ত চুপচাপ। আসনপিঁড়ি হয়ে ভাল ছেলে হয়ে গেল টুটুল। কেবল মুখের খাবার শেষ হয়ে গেলেই অস্থির হয়ে পড়ছে। মিন্টু টুটুলের এটা সহ্য করতে পারছিল না। সে বড় হয়ে গেছে এ-বোধটুকু খুব প্রবল। কাছে এসে বলল, নাম নাম। বাবা খাচ্ছে। খেতে নেই। কিন্তু জোরজার করেও নামাতে পারছে না। টুটুল বাপের জামা খামচে ধরে রেখেছে।

অতীশ এবার মিন্টুকে তুলে নিল আর এক পাশে। এবং মিন্টুর মুখে দিতেই সেও খুব ভাল মেয়ে হয়ে গেল। বলল, বাবা পুতুল দেবে। আমি পুতুল নেব। বাবা, একটা না বড় সাপ, মাকে ভয় পায়। তুমি ভয় পাও না বাবা।

—হ্যাঁ মা আমিও ভয় পাই।

—টুটুলটা দুষ্টু, ও ভয় পায় না।

দিদির এসব কথা টুটুল গ্রাহ্যই করছে না। সে প্রাণপণ বাপের সঙ্গে খেয়ে চলছে। নির্মলা একবার এসে ধমক লাগাল, মানুষটাকে বসে তোরা শান্তিতে একটু খেতেও দিবি না। নাম বলছি। অতীশের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কি! নিজে খাচ্ছ না কেবল ওদের খাইয়ে যাচ্ছ। পেট ছাড়লে আমি কিছু জানি না বাপু।

সবই এত ভাল লাগছে কেন। এই যে সামান্য অভিমান নির্মলার তাও

এত মধুর মনে হচ্ছে কেন! সে নিজে আরও উপভোগ করার জন্য টুটুলের মুখে সামান্য সিঙাড়ার কুচি দিতেই ঝাল খেয়ে থুথু ছিটাতে থাকল। তারপর না পেরে বাপের ধোয়া জামায় মুখ ঘষতে লাগলে জামাটায় হলুদ ছোপ ধরে গেল। নির্মলা এসে যখন দেখল, রেগে কাই।—দাগটা উঠবে ভাবছ!

অতীশের সবই ভাল লাগছিল। বড় ভাল লাগছিল। জীবনের এই ভাল লাগাটার দাম সামান্য দাগে কিছু আসে যায় না। সে বলল, কুম্ভবাবু হাসিরানীকে একটা লক্ষ্মীর পট কিনে দেবেন। মাঝে মাঝে কেন জানি মনে হয় সংসারে এই পটটা বড়ই দরকার।

কুম্ভ মনে মনে বলল, সবই দেব। আগে আপনাকে কি দিই দেখুন। তার এখন কাজ এ লোকটাকে বাগে আনা। সেই যে কি বলে না, ঘোড়া হাতি গেল তল, তারপরের লাইনটা সে মনে করতে পারল না। প্রথম রাউণ্ডে সে জিতেছে। নবর কাজে বাগড়া দিয়েছে। সনৎবাবুর ইগোতে ধুনি জ্বালিয়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয় রাউণ্ডটা জটিল ছিল বলেই পারেনি। রাজার কাছে ফয়সালার সময় সে আর সনৎবাবু এক পক্ষ থাকবে এমনটা তার মনে হয়েছিল—কিন্তু স্যারটি বেশ কায়দা করে ধরি মাছ না ছুঁই পানির মতো ভণ্ড সেজে বসেছিল। ফলে দ্বিতীয় রাউণ্ডে তার হার হয়েছে। তাছাড়া এই লোকটার পেছনে বৌরানী আছে। রাজা একটা ম্যাড়া। কি যে তুকতাক করেছে—বৌরানীর ওপর এখন রাজবাড়িতে কারো কথা নেই। শেষপর্যন্ত জাল মাল তৈরী করা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। যুদ্ধক্ষেত্রে জয় অনিবার্য সে জেনে এসেছে। এতে তার সহায় মা তারা। সকালে উঠেই স্নান সেরে মার পায়ে রাঙাজবা দেয়। ভুলণ্ঠিত হয়। মা, মাগো আমার কি অপরাধ বল। অজ্ঞানের জ্ঞান তুই-মা তার। ভুল হলে পথ দেখাস মা। সে হেরে গিয়ে মায়ের কাছে প্রায় হত্যা দিয়ে পড়েছিল। বুড়ো ম্যানেজারকে তাড়ানো থেকে লেবার প্রব্লেম ট্যাকল করা কত ওস্তাদী লাগে হাসিরানী যদি বুঝত! সবই মায়ের কৃপা। এখন কৃপা পরবশে সে বুঝেছে, কিছুদিন এই লোকটার হিতৈষী সেজে থাকা ভাল। কোনদিকে কে ধোঁয়া দেবে কে জানে। সে বলল, কি যে বলেন না দাদা। হাসিকে লক্ষ্মীর পট দেবেন তা আবার আমাকে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে।

—না যদি কিছু মনে করেন আবার!

—এই বোঝলেন, বৌদি দেখুন বৌদি, ও বৌদি আমাকে কেমন পরপর ভাবছে।

নির্মলা সব গোছগাছ করছিল সে শুনতে পাচ্ছে সব। ও-ঘর থেকেই বলছে, আপনার দাদার আবার ঈশ্বর বিশ্বাস কবে থেকে হল। ওতো এসব কিছু মানে না।

অতীশের কোলে টুটুল। হাস্নুর স্নান হয়ে গেছে। নির্মলা ও-ঘর থেকে কথা বলছে। ঈশ্বর বিশ্বাস নিয়ে কথা বলছে, টুটুলকে কোলে নিয়ে সে কেমন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আসলে আশ্রয়। হাসিরানীর কিছুটা আশ্রয়ের অভাব আছে। কাবুলবাবুর সঙ্গে সম্পর্কের কথাও তার মনে এসেছে। সেই থেকে কেন জানি মনে হয়েছে—একটু আশ্রয় পেলে প্রলোভনের হাত থেকে হাসি মুক্তি পাবে। মা জ্যাঠিমারা যেমন সব প্রলোভন থেকে নিজেদের আত্মরক্ষা করতে শিখেছিলেন, হাসিরানীও তেমনি তার প্রলোভন থেকে মুক্তি পাক।

মানুষের শুভাশুভের বিশ্বাস থেকেই কথাটা বলা। এটাকে অতীশ সেভাবে ঠিক ঠিক ঈশ্বরে বিশ্বাস ভাবে না।

কুম্ভবাবু ভূত দেখার মতো অতীশকে দেখছে। মানুষের ঈশ্বর বিশ্বাস না থাকলে সে শুনেছে শয়তান হয়ে যায়। একমাত্র শয়তানেরই ঈশ্বর বিশ্বাস থাকে না। আর সেই উটকো সব কম্যুনিস্ট আছে তারাও এটা করে না। কুম্ভর কাছে কম্যুনিস্ট আর শয়তান এক। সে তাদের ফারাক বড় বেশি বোঝে না। সে বলল, দাদা আপনি তালে কম্যুনিস্ট।

অতীশ হা হা করে হেসে উঠল। বলল, সুযোগ পেলাম কোথায়। দাড়ি গোঁফ না গজাতেই পেটের টানে বের হয়ে পড়েছি।

—কিন্তু এটাত ভাল কথা নয়। তারপর তলে তলে কুম্ভর কূট অভিসন্ধি কাজ করতে থাকে। এই শয়তানের ভয় রাজবাড়িকে বড়ই কাবু করে রেখেছে। গন্ধ পেলেই হল। এবং এই সুযোগটা হাতছাড়া করা তার বোকামি হবে। সে আরও সামান্য রগড়ে দেখতে চাইল, বলল, ঈশ্বর ত কারো ক্ষতি করে না দাদা। তিনি মঙ্গলময়। সন্তান-সন্ততি নিয়ে ঘর করেন, ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না, অসুখে বিসুখে ভরসা পাবেন কিসে।

অতীশ বলল, এখনও ভেবে দেখিনি সেটা।

যাই হোক কুম্ভ বুঝতে পারল, সহজে নড়ে বসবে না। ধীরে ধীরে চামড়া খসাতে হবে। একদিনে হবার নয়। সে উঠে যাবার সময় বলল, দাদা যাই। তারপর টুটুলকে চুমু খেল। মিণ্টুকে দুবার লাফিয়ে ওপরে তুলে ধরে ফেলল। নির্মলা বলল, মানুষটি বেশ।

অতীশ কিছু বলল না। সে জানালায় দেখল সেই পাতাবাহারের গাছ। সবাই শুয়ে পড়লে সে গোপনে বের হয়ে দেখবে—আজও পাতায় জল লেগে আছে কিনা। তারপর কেমন ভীতু গলায় নির্মলাকে ডেকে বলল, সামনেই পুকুর। টুটুল মিণ্টুকে চোখে চোখে রেখো। পুকুরটা ভাল না। প্রায় বছরেই কেউ না কেউ ডুবে যায়।

॥ চোদ্দ ॥

চার-পাঁচ দিন ধরে কি বৃষ্টি। সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। পথঘাট ট্রাম-বাস বাড়ি-ঘর সব বৃষ্টিতে লেপ্টে ছিল। সকালের কাগজে শুধু এক খবর। দেশের কোথায় বন্যা, কোথায় ব্রিজ ভেঙে গেছে, কোথায় ট্রেন অচল হয়ে থেমে আছে তার খবরে সকালের কাগজটা ভরা। বড় বড় হেড লাইন, যেন কাগজে তখন এই খবরটাই মানুষের পড়ার কথা। সব কাগজগুলোয় সংবাদদাতাদের নিদারুণ অভিজ্ঞতার বর্ণনা, শস্যহানির খবর। গবাদি পশু সব ভেসে গেছে। জলবন্দী মানুষজন উদ্ধারের জন্য মিলিটারি নেমেছে। বর্ষাকাল এলেই এই সব খবর। তারপর হেমন্ত আসে। সোনালী ধানের মাঠ তখন দিগন্তব্যাপী। বান বন্যায় ভেসে গিয়েও মানুষের জন্য কিছু না কিছু আবাদ টিকে থাকে।

মানসনারায়ণ চৌধুরীর ঘরেও আজকাল কেউ কাগজ দিয়ে যায়। সে বাথরুম থেকে ফিরেই দেখতে পায় কাগজটা পড়ে আছে। আজকাল সে আর উত্তেজিত হয় না। উত্তেজিত হলেই মাথার মধ্যে অযথা সব রেলগাড়ি ঢুকে যায়। সে ঠাণ্ডা মাথায় আজকাল কাগজ পড়তে পারে। এখন তার ঘরে তালা পড়ে না। সে ইচ্ছে মতো, রাস্তায় বের হতে পায়। একদিন গড়ের মাঠে গিয়েও বসেছিল। বাইরে যেতে চাইলে তাকে পুরনো ভকসল গাড়িটা দেওয়া হয়। বাহাদুর তাঁকে শহরটা ঘুরিয়ে দেখায়। কোনো পার্কে তার পায়চারি করতে ভাল লাগলে রাত করে ফিরতে ভালবাসে। কিন্তু রাজেনটা আবার কি মনে করবে—সেতো স্বাভাবিকভাবেই সব করে যায়, কিন্তু ঠিক সময় না ফিরলেই একটু বেশি হাঁটাহাঁটি করতে চাইলেই কেমন সংশয়ের চোখে তাকায় সব। সে বড়ই কুকর্ম করে ফেলেছে।

বৃষ্টির জন্য কদিন এই ঘরেই বন্দী হয়ে আছে। কাগজটা সারাদিন উল্টে-পাল্টে

দেখে। কখনও কখনও একই লাইন বার বার পড়ে। নবীন যুবক ঐ দিকটায় চলে গেল। তার ঘরটায় গিয়ে আগে বসাটসা যেত। নবীন যুবকের পাশে বসে থাকলে সে কেমন স্বস্তি পেত। ওর চোখের ভেতর এমন কিছু আছে যা তাকে বেঁচে থাকার জন্য প্রেরণা দেয়। সেটা কি সে ধরতে পারে না। বেচারা পঞ্চানন বলেছে, হুজুর অতীশবাবুকে বলেন ত ডেকে দি। পঞ্চানন কি বুঝতে পেরেছে সে অতীশের জন্য টান বোধ করে। সে ত কখনও কাউকে কিছু বলে নি। কিছু দিন মাত্র ছিল। ওর ছবির খুব প্রশংসা করেছে অতীশ। বলেছে, দাদা আপনি কেন ছবি আঁকা ছেড়ে দিলেন। ওটা ছাড়বেন না। মানুষের ত বেঁচে থাকার জন্য কিছু একটা চাই। কত দিন পর যেন সে শুনতে পেল সে সত্যি ভাল ছবি আঁকে। তাঁর হাত পরিষ্কার। মাষ্টারমশাইরাও এমন বলতেন। মডেলের ক্লাসে তার মত সাবলীল ভঙ্গীতে কেউ তেমন করে সুষমা-মণ্ডিত ছবি আঁকতে পারত না। সবচেয়ে ওটাই ছিল তার প্রিয় ক্লাস। ইদানীং সে আবার ছবি আঁকা শুরু করেছিল। বৃষ্টিতে বের হতে পারে নি। সরকার-বাবুর কাছে পঞ্চাননকে দিয়ে একটা লিস্ট পাঠিয়েছিল। একটা ইজেল, কিছু জলরঙ এবং বুরুশ। এই সব দিয়ে গেছে কদিন হল। বৃষ্টির কদিন তার নিরন্তর ছুটি। অন্য দিনগুলি তার অনন্ত কাজ। তার মাথার মধ্যে রেলগাড়ি ঢুকে না গেলেও পাশ দিয়ে চলে যায়। সে সে-জন্য কিছুই করতে পারে না। উগ্রতা যখন চরমে তখনই সে হাবিজাবি দেয়ালে লিখতে শুরু করে দেয়। যেন গত জন্মের কথা লিখে যাচ্ছে। সেই কথাগুলো রাজেন এত ভয়াবহ ভাবে কেন সে বোঝে না। ঘরে যারা ঢুকতে পায় তারা দেখে ফেলবে ভয়েই রাজেনটা তালা দিয়ে দিতে বলে? তারপর আবার নদীর জল সরে গেলে যেমন বালিয়াড়ি পড়ে থাকে তেমনি কখনও সে গত জন্মের কথা ভুলে গেলে, ভাল পোশাক, বনেদীয়ানার সব পুরস্কার কপালে—আর তারপরই ঘরে চুনকাম হয়ে যায়। বার বার, পাঁচ-সাত-বার বছরে ঘরটা চুনকাম করা হয়ে যায় এভাবে। মানস খুবই এতে মজা পায়।

কিন্তু সেই যে নবীন যুবক উসকে দিয়ে গেল, প্রায় আগুনে ঘি ঢালার মত, বলে গেল মানসদা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য এটা বড় দরকার। আপনার কি হারিয়েছে আমি জানি না, মানুষ কিছু না হারালে এমন হয় না। আপনার ছবি আঁকা খুব দরকার। অভ্যাসটা রাখুন। অন্য এক রহস্য খুঁজে পেলে যা হারিয়েছেন তা আবার ফিরে পাবেন।

অতীশ চলে যাবার পর সে পঞ্চাননকে দিয়ে একটা ফিরিস্তি পাঠিয়ে

দিয়েছিল। ঘরে এখন ইজেল, রঙ, বার্নিস যা দরকার সব আছে। বৃষ্টির কদিন সে একটা মাত্র ছবি আঁকার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কি এঁকেছে সে নিজেই বুঝতে পারছে না। সে প্রথম আঁকতে চেয়েছিল, নদীর পাশে রাজবাড়ি, সামনে বালির চর, দুজন অশ্বারোহী যুবক রাজবাড়ির দিকে উঠে আসছে। ঘোড়া দুটো কদম দিচ্ছিল। প্রথম ছোট একটা আর্ট পেপারে স্কেচ করতে গিয়ে মনে হল একটা ঘোড়ার মুখ বড়ই লম্বা। আর একটা বড়ই বেঁটে। তারপর মনে হল, ঘোড়ার মুখই হয় নি কেমন জিরাফের মুখের মত লম্বা। তবু রঙ তুলি নিয়ে যখন বসল—সেটা শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াল বুঝতে পারছে না। আবছা অন্ধকারে এক বিশাল রাজবাড়ির ছায়া, আরও অস্পষ্ট দুটো ঘোড়া, অশ্বারোহী আছে কি নেই বোঝা যায় না, কেবল সাদা বালিয়াড়ি আর নদীর জল স্পষ্ট। তার মনে হল, কাগজে রঙ দেয় নি বলে বালিয়াড়িটা সাদা দেখাচ্ছে। সেটা এই ছবির সঙ্গে বেমানান। সে সেখানে কিছু পিংক কালার এবং ব্লু রঙে আবছা ছাই রঙ করে দিতেই গোটা ছবিটা মনমরা হয়ে গেল। মনে হল ঘোড়ায় চড়ে ফেরার পথে প্রাসাদ অলিন্দে কিরানা ঘরানার ধারক কোন সঙ্গীতশিল্পীর সুর ছবিতে জেগে উঠছে না! গোটা ছবিটাই তার কাছে কেন জানি অর্থহীন মনে হচ্ছে।

মানস ছবিটা দু দিন ফেলে রেখে অন্য একটা ছবিতে মন দিয়েছিল। কিছু কাঁচের গ্লাস। লাল মদ। দুজন প্রবীণ মানুষ দরজা দিয়ে ঢুকছেন। একজনের মাথায় উষ্ণীষ, গায়ে রাজার পোশাক। অন্যজন টাক মাথা বেঁটে-খাটো মানুষ। ধুতি পাঞ্জাবি গায়ে। কিন্তু মুখটা একজনের উটের মত হয়ে গেল। অন্যজনের বাঘ। সে বুঝল, হবে না। সে তারপর কদিন কিছুই আঁকে নি। কদিন থেকে অতীশের পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না, যে তাকে ডেকে দেখাবে। সে দেখলে বুঝতে পারত ছবিটা কিভাবে শেষ করা যায়! মাথায় এক রকমের চিন্তা থাকে, ছবিটা আঁকতে গেলে সেই চিন্তা গুলিয়ে যায়। তখন আর মনে করতে পারে না আসলে সে কি আঁকতে চেয়েছিল।

পঞ্চানন সকালের খাবার নিয়ে এসেছে। ওর খাওয়া হলে সব নিয়ে যাবে। সে খেতে খেতে বলল, অতীশবাবুকে ডেকে আনবি বলছিস?

—হুজুর আপনার চোখ মুখ ভাল না। অতীশবাবু ছিলেন বলে বেশ ভাল ছিলেন।

—তা ছিলাম। কিন্তু বেচারা বৌ-ছেলেপিলে নিয়ে এসেছে। কারখানার কাজের চাপ। রাত-দিন পড়ে থাকছে শুনছি, বাড়িতে কি পাবি?

—হুজুর দেখে আসব।

—আয়।

—কিছু বলব ?

—আজ রববার না ?

পঞ্চানন বলল, আজ্ঞে।

—দাঁড়া। বলে মানস একটি চিঠি লিখল—অতীশ, তুমি আমাকে ভুলে গেছ। আমি তোমার মানসদা। বড়ই বিপদে আছি। সময় এবং সুযোগমতো একবার পারলে এস।

পঞ্চানন ফিরে এলে দেখল, অতীশ পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। কেমন অভিমান হল দেখে। মানস অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, খুব ব্যস্ত।

অতীশ ভিতরে ঢুকে দেখল, মেঝেতে অজস্র ছবি ছড়ান। সে খুব আগ্রহের সঙ্গে একটা তুলে নিয়ে দেখল—বিরাট ফাঁকা ঘরে দুজন সারেঙ্গিবাদক বসে আছে। নামাজ পড়ার মত হাঁটু ভাঁজ করে বসার ভঙ্গী। চোখ ঊর্ধ্বনেত্র। ছাদের ফুটো থেকে একটা হাত বের হয়ে আসছে। ঠিক এমনই একটা ছবি বিলিয়ার্ড টেবিলটা যে ঘরে আছে সেখানে বাঁধান রয়েছে। অতীশের মনে হল, তবে সেই ছবিটাও এই মানুষ এঁকেছেন। ছবিটা দেখে সে প্রথম ভয় পেয়ে গেছিল। একটা কাল কোট তার হাত দেয়াল ফুটো করে বের করে দিয়েছে। নিচে নিস্তরঙ্গ জল। ছবিটা দেখে ভয় পাওয়ার চেয়ে শরীর বেশ শিরশির করে উঠেছিল।

অতীশ বলল, অনেক ছবি দেখছি।

—অনেক কোথায়। দুটো ত।

সে বলল, এই যে।

মানস বলল, ওগুলো কিছু না। তুমি এটা দেখ। কিছু হয়েছে কিনা দেখ।

অতীশ দাঁড়িয়ে দু' হাত মেলে ছবিটা দেখছিল।

—বসে দেখ না। এই পঞ্চানন, চেয়ারটা এগিয়ে দে না।

অতীশ বসতে বসতে বলল, আপনি করেছেন কি!

মানস কিছুটা যেন শঙ্কা বোধ করল। তাহলে কি সে সত্যি যা আঁকতে চেয়েছিল সেটাই ফুটে বের হচ্ছে। আর অতীশ সেটা বুঝতে পেরে ভয় পেয়ে গেছে। রাজবাড়ির চেহারাটা অতীশ তাহলে দেখতে পাচ্ছে। সে বলল, তুমি ভয় পাচ্ছ ?

অতীশ মানসদার কথার অর্থ ধরতে পারল না। ছবিটা থেকে মুখ তুলে মানসদার দিকে তাকিয়ে থাকল।

—ভাবছিলাম ভয় পাচ্ছ কিনা। ছবিটা তাহলে যা আঁকতে চেয়েছি তাই হয়েছে বলছ। রাজেনটা তবে ক্ষেপে যাবে। কি যে করি।

অতীশ ভারি অবাক হল। বলল, ছবিটা আমাকে দিন। বাঁধিয়ে রাখব। দেয়ালে টাঙাব। রাজেনদা রাগ করবে কেন।

—কি জানি। আমি ত রাজেনকে ক্ষমাই করে দিয়েছি।

তার বলতে ইচ্ছে হল, রাজেনদা আপনার কে হয়! এ-বাড়িতে এসে বুঝেছি, সবাই এখানে বুঝে ফেলেছে, এই শেষবেলা, যে যে-ভাবে পারো গুছিয়ে নাও। সিগনাল ডাউন হল বলে। একমাত্র আপনিই নির্বিকার। রাজার সব লোক এখন টের পেয়েছে—এদের যা অবশিষ্ট আছে তার কিছুটা লুটেপুটে নিলেও তিন পুরুষের নিশ্চিন্তি। কিন্তু আপনি বসে আছেন। আপনি এই রাজবাড়িতে আশৈশব মানুষ। পুরানো লোকেরা কিছু খবর রাখে। কুম্ভ মাঝে মাঝেই বলে, বলতে পারি বলব না। এ-ব্যাপারে আমার আগ্রহ অনাগ্রহ সমান। ভয় যদি কুম্ভ আপনাকে ছোট করতে চায়, রাজেনদাকে ছোট করতে চায়। মানুষ ছোট হয়ে যাচ্ছে দেখলে আমার কেন জানি কষ্ট হয়।

—এই কি তুমি ছবিটা নিজেই কেবল দেখছ। কি দেখছ বলছ না কেন!

—একটা বড় স্মৃতিসৌধ মনে হচ্ছে আঁকতে চেয়েছেন।

—গভীর অন্ধকার থেকে দু'জন অশ্বারোহী পুরুষ উঠে আসছে। পেছনে সাদা বালিয়াড়ি। বোধহয় জ্যোৎস্না পড়ায়। সেটা হয়েছে। আকাশ আবছা মেঘে ঢাকা। ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না বৃষ্টির জলের মতো নেমে আসছে। তার পেছনে নদী—ওপরে অস্পষ্ট কুয়াশা। সময়টা শীতকাল—ছবিটা দেখে এই মনে হচ্ছে।

মানস ছবিটা ওর হাত থেকে টেনে নিল। নিজে ভাল করে দেখল, আবার। কিন্তু কিছুই মিলছে না। সেই কুমারদহ রাজবাটীর ছবি এটা যেন নয়। সে ত এখন ভগ্ন প্রাসাদ। দেবোত্তরের সেবাইত, দু'জন গোমস্তা একজন খাজাঞ্চি মাত্র থাকে। বিরাট সব আম বাগান, শহরে কিছু বাড়ি ভাড়া, একটা বাজার কিছু বালির চর এবং বড় বড় সব তৈলচিত্র, মাঝে মাঝে রাজেনটা বিদেশে গিয়ে কি করে সব, তারপরই সাহেব-সুবোরা আসে। গাড়ি করে চলে যায়—কাঠের কাজ করা বাতিদান থেকে মিনে-করা সব সৌখিন আসবাবপত্র, পূর্বপুরুষদের সংগ্রহ করা ছবি পাচার করে দেয় তারা। এই রাজবাড়ির ঘরে ঘরেও জমে

আছে সব এমন কত অমূল্য বিষয়-আশয়। সব খালি করে দিচ্ছে রাজেনটা। সে তা আঁকতে চায় নি। আঁকতে চাইলে শস্যবিহীন একটা মাঠের সে ছবি আঁকত। তাতেই বড় রকমের শূন্যতা ধরা যায়। আসলে যে পাপ বাপ-পিতামহের আমল থেকে জমা হয়ে আছে তার কিছুট প্রথা-প্রকরণ মেনে ছবি আঁকা ছিল তার বিষয়বস্তু। অতীশ ধরতে পারছে না। না সে নিজেই সব ভুলে গিয়ে মানুষের ভুলে থাকা ভালবাসার এক মহান চিত্রপট তৈরি করতে চেয়েছিল। ঘোড়ায় সে এবং রাজেন। পেছনের অন্ধকারে খুব আবছা মতো নারী মূর্তি—সেটা অতীশ কেন খেয়াল করল না। পেছনে সব ফেলে সেই নারীর আবছা অন্ধকারটা রাজপ্রাসাদ গ্রাস করছে সেটা অতীশের নজরে এল না কেন!

অতীশ অন্য সব ছবিগুলিও তুলে তুলে দেখছে। ছবিগুলির নাম দিয়েছেন সাদা ফুল। বসন্ত। নদীতটে আমি জারজ সন্তান। কালের ঘোড়া। পতিতালয়। এমন সব কত হিজিবিজি নাম। ছবির সঙ্গে নামগুলির প্রায় কোন দিক থেকেই মিল নেই। যেমন 'বসন্ত' ছবিটাতে শুধু কালো কিছু ফুটকরি। আঁকাবাঁকা গাছের অভ্যন্তরে কোন পক্ষী শাবকের লেজ। ছুটো সরীসৃপ গোড়ায় ওৎ পেতে বসে আছে। অতীশ এ-বয়সেই কিছু কিছু শিল্পীর জীবনী পড়েছে। কোন না কোনভাবে এরা অধিকাংশই অর্ধ-উন্মাদ। সে এবার মানসদার দিকে তাকাল। মানসদা হাতে ছবিটা নিয়ে কেমন আবিষ্ট হয়ে বসে আছেন। কিছু তাকে বলেছেনও না। কোথাও যদি আরও ছবি থাকে—সেখানে যদি মানসদা নিজেকে তুলে ধরেন। সে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকল। একটা ছবি আশ্চর্য লাল রঙে আঁকা। আগুনের লেলিহানে গ্রাসের মধ্যে নির্বিঘ্নে এক উলঙ্গ নারী, মুখ চোখ আশ্চর্য রকমের শান্ত। নাম দিয়েছেন ব্যভিচারিণী। একমাত্র এই ছবিটার সঙ্গে নামকরণের আশ্চর্য সার্থকতা পেয়ে বলল, মানসদা এ ছবিটা কবে আঁকলেন।

ছবিটা দেখে বলল, ও ওটা অমলার ছবি। ফেলে দাও। আমার কাছে ছবিটার কোন দাম নেই। ইচ্ছে করলে নিয়ে যেতে পার। তোমার সঙ্গে শুনেছি খুব ভাব। তারপরই কেমন সচকিত হয়ে গেলেন। কি যেন মনে পড়েছে। কি যেন তার জিজ্ঞেস করার আছে অতীশকে। মানসদা এবার হাত থেকে ছবিটা ঝেড়ে ফেলে দিলেন। এতক্ষণ যেন বড়ই অপবিত্র বিষয় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছিলেন, বললেন, অমলাকে তুমি চেন শুনেছি।

—কার কাছে শুনলেন?

—আমার কাছে সবাই খবর দিয়ে যায়। ও বাবু এবারে আবার খেলা জমে উঠল।

অতীশ বলল, একথা কেন ?

—এই আর কি। ওরা বোঝে রাজেনটা আমাকে ঠকাচ্ছে। আমাকে সম্পত্তির ভাগ দিচ্ছে না। আমাকে ওরা খুব ভালবাসে।

অতীশ এইসব পারিবারিক রেষারেষি শুনতে কখনও আগ্রহী হয় না। বিষয়-আশয়ের প্রতি এমনিতেই একটা তার উদাসীনতা আছে। সেটা বোধহয় সে বাবার কাছে থেকেই পেয়েছে। মানুষের চলে যাবার মতো উপার্জন থাকলে খুব ছোটাছুটি তার পছন্দ নয়। সে তা করেও না। অথবা তার মনে হয়, এ-বাড়ির সবাই সত্য মিথ্যা বানিয়ে বলতে ওস্তাদ। আসলে রাজেনদা কিংবা তার পূর্বপুরুষরা বৈভব রক্ষা করতে গিয়ে দেওয়ান থেকে ম্যানেজার সবার হাতে গুটি বনে যেত। সংসারে ব্যভিচার ঢুকলে যা হয়। সেটা টাকার হতে পারে, নারীর হতে পারে, যেমন এখন সে বুঝেছে যে কোনভাবে সব সম্পত্তি স্বনামে রাখা আর রাজেনদার নিরাপদ নয়। তার সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য সবাই উদ্যত। আইন বদলাচ্ছে। এবং এমন একসময় আসবে যখন বসবাস এবং উপার্জনে চলে যায় মতো সম্পত্তি ছাড়া তার আর কিছুই থাকবে না। রাজেনদার বাবার ঠাকুর্দা দুটো কোলিয়ারি বিক্রি করে এই এস্টেট গিলেণ্ডার কোম্পানী থেকে উদ্ধার করেছিলেন। তারপর থেকেই বাড়িয়ে যাওয়া ছিল স্বভাব। প্রভুত্ব এবং পৌরষ এই দুই মিলে এস্টেটের যখন রবরবা তখনই স্বাধীনতা। জমিদারী চলে গেল। সরকারি কমপেনসেসন বাদে যা থাকল তাও কয়েক কোটি টাকা। খেলিয়ে তুলতে পারলে অনেক। বার চোদ্দ বছরে রাজেনদা বুঝি সব বুঝে ফেলেছেন, অকর্মণ্য সব মানুষজন পুষে রেখেছেন, সব ব্যবসাই যেতে বসেছে—এবং এ-জন্য দায়ী তার সব আমলারা। আসলে আভিজাত্য যে জীবনে কাটা হয়ে আছে সেটা রাজেনদা বুঝতে পারছেন না। ফলে বেনামে সম্পত্তি বিকি বাট্টার সময় বেশি টাকাটার হিসেব থাকে না। পচা টাকায় এই রাজপ্রাসাদ ভরে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে এই পচা টাকার গন্ধ সে পায়, মানসদা পায়। সুরেন পায়। তারপরই মনে হয় বড়ই বিদ্‌ঘুটে সব চিন্তাভাবনা। এগুলি নিয়ে তার মাথাব্যথা থাকার কথা নয়। কিন্তু সে বুঝতে পারে আগুনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে শরীর পুড়বে না, এমন রসিকতার কথা কবে সে শুনেছে। সেজন্য অতীশ ভারি বিমর্ষ বোধ করছিল।

মানসদা বললেন, নবীন যুবক তোমার কপালে সন্ন্যাস টন্ন্যাস নেই ত!

অতীশ হাসল।

—কথা বলছ না কেন। মাথা গুঁজে ছবিতে এত কি দেখছ। যা দেখছ তা ঠিক। এই জরুলটাও জঙ্ঘায় আছে। হাত দিলে টের পাবে। আমি মিছিমিছি ছবি আঁকি না।

আসলে আগুনে উবু হয়ে বসে থাকা নারীমূর্তিটি অতীশকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। অমলার সঙ্গে মানসদার কোন গভীর সম্পর্ক আছে।

ছবিটা যে কোন নারীমূর্তিরই হতে পারে। কারণ উবু হয়ে বসা। মুখ দেখা যাচ্ছে না। চুল আগুনের মধ্যে ঝলকাচ্ছে। এবং পেট জঙ্ঘা বাহু সবই স্পষ্ট। ছবিটা একবার দেখার পরই চোখ সরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু মাথা তোলেনি বলে মানস ভেবেছে, সে ছবিটাই দেখছে। মানসদার কথায় অতীশ ফের ছবিটা দেখে আঁৎকে উঠল। তার মনে হল সত্যি অমল তার সামনে উলঙ্গ হয়ে বসে আছে। সে ভিতরে ভিতরে কাঁপছিল।

—তুমি অমলাকে তবে চেন?

অতীশ বলল, চিনি।

—কবে থেকে।

—অনেককাল আগে। আমি তখন খুব ছোট। ওদের জমিদারিতে বাপ জ্যাঠারা কাজ করতেন।

—তাহলে এখন থেকে তুমিই আমার হয়ে অমলাকে যা বলবার বলবে।

অতীশ চুপ করে থাকল।

—কী চুপ করে থাকলে কেন?

—ওকে ত আমি দুদিনের বেশি এখানে দেখিনি। তাছাড়া আমার সঙ্গে দেখাও হয় না।

—হবে।

—হলে বলব।

—কি বলবে শুনলে নাত।

—কি বলব!

—শুধু বলবে আমি সত্যি পাগল নই। ওকে এটা তোমায় বোঝাতে হবে।

—আপনি সত্যি তো পাগল নন।

—সে তুমি বললে হবে কেন? পৃথিবী শুদ্ধু সব লোক বললেও হবে না।

তারপরই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। জানালায় গিয়ে কি দেখার চেষ্টা করলেন। গলা বাড়িয়ে ডাকলেন, পঞ্চানন। পঞ্চানন এলে বললেন, আমাদের একটু চা খাওয়া।

অতীশ কেমন আবার বিভ্রমের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। সে বলল, আচ্ছা মানসদা, বড় হলটায় একটা ছবি দেখলাম। একটা কোটের কালো হাতা, কাঠের বেড়ার ফুটো দিয়ে বের হয়ে আছে। ওটা আপনার আঁকা?

—মনে করতে পারছি না।

—বিলিয়ার্ড টেবিলটা যে-ঘরে আছে।

—অমলা হয়ত এখনও দু একটা ছবি রেখেছে। হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। রাজেনটা আমার কিছু রাখতে দেয় না। ছেলেবেলা থেকেই ও বড় হিংসুটে স্বভাবের ছিল। আমার সব কিছু কেড়ে নিতে চাইত। তারপর সামান্য থেমে কেমন নির্লিপ্ত গলায় বললেন, তুমি পল সেজনের নাম শুনেছ?

অতীশ বলল, না।

—সে যাই হোক। ছবিটা দুই নারীর। সম্ভবত মা মেয়ের। সম্ভবত দুই বোনের। কি ছবি এখন আমি স্পষ্ট মনে করতে পারছি না। কিন্তু চোখ দুটো আমি নিবিষ্ট হলে এখনও দেখতে পাই। সেই চোখ বালিকার সেই চোখ যুবতীর, চোখ মায়ের, চোখ বারবনিতার! এতগুলো চোখ সেই দুই নারীর চোখে তিনি এঁকে ছিলেন। এক জোড়া চোখ কখন কেমন হবে বলতে পার না।

অতীশের সব কথাবার্তা শুনতে শুনতে কেমন মাথা ধরে যাচ্ছিল। এই মুহূর্তে সে যা ভাবেছে, তিনি সেখান থেকে তাকে কত সহজে অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন। সে বলতে চেয়েছিল, সেই হাতটা আপনার আঁকা কি না। সেই হাতটাই আমি ভুলে নির্মলার আসার আগের দিন রাতে দরজার পাশে ঝুলতে দেখেছি কি না। সেই হাতটাই আমার মাথার মধ্যে আর্চির প্রেতাত্মার ভয় আবার ঢুকিয়ে দিয়েছে কিনা! কিন্তু বলে লাভ নেই। আমলই হয়ত দেবেন না। আর্চির কথাটা তাঁকে বললে কেমন হয়। কারণ এই মানুষ তার কাছে প্রথম যেন কত গোপন খবর এ বাড়ির বলে দিল। অথবা দৈন্যের কথা, পরাজয়ের কথা—এসব কথা সহজে মানুষ অন্য মানুষকে বলতে চায় না। মানসদা তাকে বেশ স্পষ্টই যেন বলে দিল, তোমার কাছে আমার কিছু গোপনীয় নেই। তোমাকে অতীশ আমি বিশ্বাস করি।

অতীশ বলল, আপনার প্রেতাত্মায় বিশ্বাস আছে?

মানসদা উঠে দাঁড়ালেন, চোখ বড় বড় করে বললেন, সেটা আবার কি?

অতীশ একেবারে জলে পড়ে গেল। এমনভাবে সে বোকা বনে যাবে বুঝতে পারে নি। সে তবু মরিয়া হয়ে বলল, কালো কোট গায়ে একটা হাত শুধু আঁকলেন কেন! কি অর্থ এ ছবির।

—দেখ সত্যি আমি মনে করতে পারছি না।

—আপনি সব পারেন। ইচ্ছা করলে সব পারেন। ভূতেও বিশ্বাস করতে পারেন। আপনি পারেন না এটা আমি বিশ্বাস করি না।

পাজামা পাঞ্জাবি পরা মানুষটিকে বড়ই সুদীর্ঘ এক মহিমময় পুরুষের মতো মনে হচ্ছে। এবং তখনই মনে হল, মৃত রাজার চেহারার সঙ্গে মানসদা'র বড় বেশি মিল। কিন্তু সে শুনেছে, রাজেনদা একমাত্র তার উত্তরাধিকার। রাজার সঙ্গে রাজেনদার চেহারার অমিলটাই বেশি। আদৌ দীর্ঘকায় নয়, গৌরবর্ণ নয়, বড় চোখ নয়, নাক, নাকটা কার মতো? কারো মতো নয়। মানুষের মতোও নয়। কিছুটা শিম্পাঞ্জির মতো। এত চাপা নাক নিয়ে রাজেনদাকে শেষ পর্যন্ত মোটা গোঁফের আশ্রয় নিতে হয়েছে।

অতীশ চা খেয়ে উঠে পড়ল।

—তাহলে তুমি কিন্তু বলবে।

অতীশ মনে করতে পারল না তাকে কি বলতে হবে। কারণ কালো কোট এবং হাত, আগুনে ছবি দুই নারী এবং দুই অশ্বারোহী ক্রমাগত তার মাথার মধ্যে ঠোকাঠুকি করছিল। এখানে এসে আর্চির প্রভাব বেড়ে যাওয়ায় সে সব সময় শঙ্কার মধ্যে থাকে। প্রথম দিন থেকেই এখানে একটা কালো হাত মাথার মধ্যে ঢুকে বসে আছে এবং ওটাই ওকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। মানসদার ছবিগুলি না দেখলে সেটা যেন মনে হত না। অন্ততঃ একটু যুক্তি খাড়া করতে পেরে সে নিশ্চিন্ত হতে গিয়ে কি বলতে হবে ভুলে গেছে। সে কিছু না ভেবেই বলল, বলব।

নিচে নামতেই নবর সঙ্গে দেখা। সে বলল, স্যার, আপনার কাছে যাচ্ছিলাম।

নব একটা ধুতি ফেরতা দিয়ে পরেছে। খালি গা। গলায় পৈতাটা ভারি চকচক করছিল। সে আজকাল খালি গায়েই ঘোরাফেরা করছে। পৈতেটা রোজই বোধ হয় মাজে। একদিন মিণ্টুকে ডাকতে গিয়ে দেখেছিল পুকুরে নাই-জলে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে মন্ত্রপাঠ করেছে। অতীশ বুঝতে পেরেছিল নব এখন তার কাজে কর্মে খুব আন্তরিক। এই সময়টায় দেখা হয়ে যাওয়ায় সে বলল, ভাল আছ।

নব ও-সব কথার উত্তর দিল না। —একদিন গেলেন না স্যার।

অতীশ বলল, যাব।

—স্যার জমে উঠেছে খুব!

নব তার শনিপূজার কথা বলছে,

—পয়সা হচ্ছে?

—একাউন্ট রাখছি। তবে সবই পাঁচ পয়সা দশ পয়সা। গুড বিজনেস সেন্টার। কমপিটিশনও আছে স্যার। আমার দেখাদেখি ও-পাশটাও ঢাক গুড়-গুড় হচ্ছে। পাল্লা চলছে খুব। আসছে শনিবারে আসুন না স্যার। তিনটি ঢাকি ঢাক বাজাবে। একটা ছিল ওরা দুটো করায় আমি তিনটে ঢাকি বায়না করেছি। আপনারা পূজার সময় থাকলে শোভা বাড়ে। বৌদি যদি যান! আপনারা গণ্যমান্য লোক যদি পূজার সময় কাছে থাকেন গুডউইল বাড়ে।

সে নবর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই বলল, যাব এবং সে বাসার দিকে হাঁটা দিলেই নব ছুটতে ছুটতে আবার আসছে।—স্যার, এখানে বলব কি বাসায় গিয়ে বলব?

—কী বলবে!

—চলুন। খুব জরুরী কথা।

ভারি ঝামেলা করছে নব। কিন্তু কাজের কথা দিয়ে রাখতে পারে নি অতীশের এই একটা অস্বস্তিও আছে। সে সোজা বলতে পারল না এখন নয়। আমার কাজ পড়ে আছে। সে বলল, এখানেই বল না!

—স্যার, আপনার তো রাজার সঙ্গে খুব ভাব। রাজার সঙ্গে এখানকার এম এল এর ভাব। ওরা মিলে যদি উদ্বোধন করে আমার পূজাটা।

—সে এখন কি করে হবে? পূজা ত তুমি আরম্ভই করে দিয়েছ।

—পঞ্চম হপ্তা পূর্তি এই সিলভার জুবলি টুবলির মত! এই উপলক্ষে যদি...

অতীশ বিরক্ত হচ্ছিল। আবার মজাও পাচ্ছিল। কিন্তু তাকে নির্মলার কাজের বিষয়ে একজন স্কুল সেক্রেটারির সঙ্গে আজ দেখা করার কথা। খুবই গণ্যমান্য লোক। রাজেনদা নিজেই চিঠি দিয়েছেন। এখন এসব নিয়ে তার ভাববার একদম সময় নেই। সে বলল, কাল সকালে এস। আলোচনা করা যাবে।

তবু নব যায় না। —স্যার, ওরা মাইক লাগিয়ে শনিমাহাত্ম্য প্রচার করছে। ওরা স্যার এম এল একে দিয়ে উদ্বোধন করিয়েছে, ইস মাইরি স্যার কি যে ভুল হয়ে গেল!

অতীশ ছাড়া পাবার জন্য বলল, তুমি তো সপ্তাহ পূর্তি করছই তখন না হয় ভেবে দেখা যাবে।

হঠাৎ নব প্রায় পায়ে গড় হয়ে পড়ল। স্যার আমার প্রেস্টিজ নিয়ে টানাটানি। আপনি আমাকে বাঁচান।

অতীশ বলল, আমার ত কোন পরিচিত এম এল এ নেই। পাবলিক ফাংসন করে এমন লোককে ধর।

নব কিছুটা হতাশ গলায় বলল, হামুবাবুকে বলেছি। তিনি পারেন। কিন্তু টাকা চায়। অত টাকা দেব কোত্থেকে।

অতীশ দেখল নবকে ভারি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে। আসলে কাকে ধরলে কিভাবে হবে সেটা নব ঠিক জানে না। অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে। কাছে তাকে পেয়ে ভেবেছে এই সেই লোক—একে ধরলে হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অতীশ তাকে কোন ভরসা দিতে পারছে না। এবং পরদিন সকালে শুনল অতীশ, নব কাকে ধরে একজন হবু কবি ঠিক করেছে। তিনিই বক্তৃতা করবেন। তারপর সে আরও এক সকালে শুনল নবকে ধরে পাড়ার ছেলেরা খুব পিটিয়েছে। তার জায়গা কেড়ে নিয়েছে। এত পয়সা হচ্ছিল নবর সেটা তাদের সহ্য নয়। অবশ্য পরে নব তাকে বলেছে আসলে প্রতিপক্ষ দলের কারসাজি। পাড়ার ছেলেরা মিলে দুটো জায়গাই দখল করে নিয়েছে। বেকার যুবক শুধু তুমি না আমরাও। বে-পাড়া থেকে এসে লুটেপুটে খাবে সে হচ্ছে না। নব শেষে বাধ্য হয়ে তার পুরানো প্রফেসানেই আবার ফিরে এল। সে কিছুদিন ধরে মনোযোগ দিয়ে আবার অঙ্ক কষে যাচ্ছে। অঙ্ক কষলে মাথা পরিষ্কার হয়, এমন একটা সুন্দর প্রফেসান হাত ছাড়া হয়ে গেছে শুধু নিবুদ্ধিতার জন্য। মাথা সাফ না থাকলে কিছু হবে না। সে মাথা সাফ করার জন্য আবার বসে যেতেই কুম্ভবাবু বলল, বুঝলেন দাদা নবর হয়ে গেল!

কত মানুষেরই এভাবে হয়ে যাচ্ছে। অতীশ বলল, কার কবে হবে ঠিক কি! নব কি···

—না না খুন-টুন হয়নি। গাড়ির তলায়ও পড়েনি।

অতীশ ফোনে কথা বলছিল। ঠিক মন দিয়ে শুনতে পারছে না। কুম্ভবাবু ইতিমধ্যে আরও কিছু ঝামেলা তৈরি করেছে। কাস্টমারদের দিয়ে কিছু মিথ্যা অভিযোগ তৈরি করিয়েছে। মাল পাঠালে রঙ ঠিক হয় নি, কামড়ি খুলে যাচ্ছে, ঢাকনা আলগা এমন সব রিপোর্ট দিয়ে মাল ফেরৎ পাঠাবার বেশ একটি পাকা

ব্যবস্থা তলে তলে করে এসেছে। অতীশকে এ-জন্য সব সময় সতর্ক থাকতে হচ্ছে। সুপারভাইজারকে বলেছে, সব ডাইস মেরামত করান। কোটার টিন থেকে খরচ করুন। বাজারের টিন থেকে কাজ করবেন না। এক গেজের মাল দিন। আর এ সময়ই কুম্ভবাবু বলল, নবর হয়ে গেল।

ফোন ছেড়ে দিয়ে বলল, নবর কি হয়ে গেল!

—নব দেশ ভ্রমণে বের হয়ে গেল।

—সে খুবই ভাল কথা।

টেপিটাকে বলেছে আমার বৌর কাছেই রেখে দেবে। খেতে দিলেই হবে। বৌদির কাছে সুখীকে রাখুন না। সুখীর রান্নার হাত ভাল। সুরেন ত পাগলা কুকুর হয়ে গেছে। কাকে এখন কামড়ায় দেখুন। হামু কাকা বলেছে বাতাসীর খোরাক পোশাক দেবে। অতীশ বলতে পারত, বাগড়া না দিলে নবটার দেশ ভ্রমণ হাতে লেখা থাকত না। সুরেনটাও হাঁফ ছেড়ে একটু বাঁচত। তারপরই মনে হল মানুষের মধ্যে কি যে থাকে! কুম্ভবাবু সত্যি সুরেনের ভাল করার জন্য বেশ চিন্তিত। তার কথাবার্তা খুবই আন্তরিক যেন দায়টা সুরেনের নয় তার নিজের। কুম্ভবাবুকে আজ বড় ভালমানুষ মনে হল তার। শেষে বলল, আপনার বৌদিকে বলে দেখি।

—বৌদির চাকরি হলেত লোক লাগবেই। রাজার চিঠি নিয়ে গেছেন যখন······

অতীশ বলতে পারত, হবে না। সবারই নিজেদের লোকজন আছে। ওদের না হয়ে নির্মলার হবে সে আশা করে না। সংসারে বেশ টানাটানি। মাসের শেষটা আর কাটতে চায় না। লেখা থেকে টাকা পেলে চলে যায় না হলে নির্মলার সংসার টানতে কষ্ট হয়। প্রাচুর্য থেকে এলে মানুষ সেই কষ্টটা আরও বেশি টের পায়। মাঝে মাঝে নির্মলার মুখ দেখলে সে সেটা ধরতে পারে। নির্মলা শান্ত স্বভাবের মেয়ে তবু গত মাসে বলেছিল, টুটুলের জুতো নেই বাবাকে কটা কম টাকা দাও। অতীশের মনে হয়েছিল, নির্মলা বাড়ির দিকটা বুঝতে চাইছে না। টাকা কম দিলে বাবা কষ্ট পাবেন। বাবা কষ্ট পেলে কোথায় যেন সে জোর হারিয়ে ফেলে। শুধু বলেছিল লেখা থেকে কিছু টাকা আসবে। ও দিয়ে করে নিও।

নির্মলা বলেছিল, কোন সঞ্চয় নেই। অসুখ বিসুখ হলে কি করবে! কত রকমের দায় অদায় থাকে।

তখনই কুম্ভ বলল, আপনি আমার মেয়ের নামটা আর দিলেন না। আপনারা আলাদা জাতের মানুষ, হাসির খুব ইচ্ছে আপনি নাম রাখেন।

অতীশের মুখে কুট হাসি ফুটে উঠল। এই মানুষটাই তাকে সর্বক্ষণ বিড়ম্বনার মধ্যে দেখতে চাইছে। এই মানুষটাই তার সবচেয়ে উপকারী লোক। কারণ এই মানুষটাই তাকে ব্যাঙ্কে একটা একাউন্ট খুলে দিয়ে বলেছে, টাকা পয়সা চেকে আসে, এখানে জমা রাখুন। টাকার জন্য তাহলে মায়া বাড়বে। মায়া বাড়লে সংসারে মন বসবে। আপনি বড় অসংসারী লোক মশাই। তখন মনেই হয় না, কনটেনারের দাম বাড়িয়েছে বলে, সে পার্টিদের ঘরে ঘরে গিয়ে পরামর্শ দিয়ে আসছে। আগরয়াল কিছু মাল ফেরতও পাঠিয়েছে। সে বড় বিপদের মধ্যে আছে। ভয়ে ভয়ে আছে। আবার কে কখন ফোন করে বলবে, এই ছাপা ? চলবে না। ঢাকনা লুজ চলবে না। খুঁত বের করলেই হল !

এমনিতেই দাম বাড়াবার জন্য অডারপত্র কম আসছে। এতেও কুম্ভবাবুর হাত আছে কিনা কে জানে। ওভারটাইম কমে গেছে। ভিতরে ভিতরে শ্রমিক অসন্তোষ বাড়ছে। অতীশ অফিস ঘরে বসেই সেটা টের পায়। আসলে সারাদিনে যা কাজ দেয়, তিনঘণ্টা ওভারটাইম দিলে তারা প্রায় সেই কাজটা তুলে দেয়। উৎপাদন বাড়াতে না পারলে সে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে না। মাইনে বাড়াবার দাবী করেছিল, সে বলেছে, সব হবে, আগে ঠিক হক, কতটা তোমরা মাল বানাতে পার। ওরা বলেছে, যা হয় তাই। আর এক পিস বেশি বাড়বে না। অতীশ বলে দিয়েছে, মাইনে যা আছে তাই। এক পয়সা বাড়বে না। কুম্ভ দুদিকেই তাল দিচ্ছে। সে যেকোন ভাবে গণ্ডগোল পাকাতে চায়। অতীশ বুঝতে পারে তার চারপাশে তখন আর্চি ঘোরাফেরা করে। সে সুদূরে দেখতে পায়, বনি হাঁটু মুড়ে বসে বাইবেল পড়ছে। প্রার্থনা করছে বনি, ঈশ্বরের কাছে নতজানু হয়ে বসে আছে। ছোটবাবুর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছে দুহাত তুলে।

চারপাশে শান্ত সমুদ্র। বাতাস পড়ে গেছে। এক ফোঁটা মেঘ নেই আকাশে। আগুনের মতো সমুদ্রের জলে তাত। বনি ছোটবাবুকে বলছে, এস পাশে বস। আমাদের এখন আর ঈশ্বর ছাড়া কেউ নেই। শুধু প্রাণ বলতে জলের নিচে কিছু পারপয়েজ মাছের ঝাঁক। এলবা দুদিন হল নিখোঁজ। সে আর রাতে ফিরে আসছে না। একটু থেমে কি ভেবে বনি আবার বলল, ছোটবাবু, কবরে আমার ছোট্ট একটু জায়গা দরকার।

ছোটবাবু বুঝতে পারছিল না, বলল, বনি এ-সব আজেবাজে বকছ কেন! তখনই ছোটবাবু শুনতে পেল, হাই। সেই কণ্ঠস্বর ঠিক অবিকল সে মনে করতে পারছে। স্যালি হিগিনস শেষ বারের মতো সব বলে যাচ্ছেন, আর্চিকে তুমি খুন করেছ, সে তোমাকে ক্ষমা করবে না। সুতরাং সমুদ্রের অতীব মায়ায় পড়ে গেলে মরীচিকা দেখতে পাবে। তেষ্টায় যখন বুক ফেটে যাবে সমুদ্রে স্নান করে নিতে পার। ঘামে যে নুন বের হয়ে যাবে, শরীর ঠাণ্ডা হলে তা লাঘব হবে। সামান্য লোনা জলও খেতে পার। ঘাম কম হবে। তবু পিপাসা না গেলে বুঝতে পারবে চোখ মুখ বসে যাচ্ছে—গলা শক্ত হয়ে যাচ্ছে কাঠের মতো। তখন যদি পার কোন মাছ শিকার করে ইউ ক্যান সাক হার ব্লাড। মনে রাখবে যা হয়ে থাকে, মানুষ দিশেহারা হয়ে যায়। পাগল হয়ে যায়। পাশের লোকটির ওপর ঝাঁপিয়ে তার টুঁটি কামড়ে ধরে। তুমি বনিকে অনায়াসে ধরতে পার। ইউ ক্যান সাক হার ব্লাড। তাহলে তুমি আর মরীচিকা দেখতে পাবে না। প্রাণ ফিরে পাবে।

ছোটবাবু বুঝল সমুদ্রের হাহাকার দেখে বনি পাগল হয়ে যাচ্ছে। সে চিৎকার করে উঠল, বনি, প্লিজ মাথা খারাপ কর না। আমরা শিগগির গাছপালা মাটি দেখতে পাব।

বনি হাসল। দু চোখ বয়ে জল ঝরছে। ছোটবাবু দুটো হাত নিজের হাতে তুলে বাইবেল থেকে কিছু পাঠ করে শোনাল। ছোটবাবু বুঝতে পেরেছিল, ঈশ্বর এবং সমুদ্র সাক্ষী রেখে বনি তার সব অস্তিত্ব ওকে অর্পণ করছে। তারও মনে হল প্রজ্জ্বলিত কোন অগ্নি সাক্ষী রেখে সে সেই অস্তিত্ব যেন গ্রহণ করছে।

আবার সেই পীড়ন। অতীশ বুঝতে পারছে, ছোটবাবু তাকে পীড়ন করছে। শরীরে আবার এসে পোকার মতো উড়ে বসেছে। মগজের ঘিলু থেকে অস্থি-মজ্জায় সর্বত্র প্রচণ্ড কামড়। মাথাটা তার কেমন করছে।

॥ পনের ॥

দিন ছোট হয়ে আসছিল। রাজবাড়ির ছাদের কার্নিসে সূর্য হেলে গেলে মিণ্টু টুটুল জানলায় এসে দাঁড়ায়। সামনে পাতাবাহারের গাছ, তারপর পথ, দুপাশে রাজবাড়ির বাগান। নতুন বাড়ির পাশে রক্তকরবী গাছটায় টুটুল একটা ফড়িং আবিষ্কার করেছিল। সেই থেকে সে বিকেল হলেই, মাকে বলে, আমি দাব।

ফড়িং ধরব। দুটো একটা কথা ফুটেছে। মা শুয়ে আছে। মিন্টু টুটুল ফাঁক বুঝে নেমে এসেছে তক্তপোশ থেকে। দুবার দরজায় ছুটে গেছে। দরজা টেনেছে—মাকে ডাকতে সাহস পাচ্ছে না; পালিয়ে দুজনে ফড়িংটা ধরার মতলবে ছিল। দরজা বন্ধ দেখে ওরা কি ভাবল কে জানে, দরজা ফাঁক করে উবু হয়ে কি দেখল। একটা লোক আসছে—সেই মোটা মতো লোকটা। টুটুল ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য জানালায় ওঠে দাঁড়াল। ডাকল, অ্যাঁ অ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গে ডুমবার সিং বলল, খোকনবাবু ভাল!

টুটুল বলল, ডুমবা ভাল।

—হ্যাঁ ভাল খোকনবাবু।

মিন্টুর সঙ্গে কথা বলছে না বলে বড় অভিমান। সে বলল, ভাই আমার খাতা খেয়ে ফেলেছে।

—তাই নাকি! খুব খারাপ।

—ভাইটা না প্যান্ট পরতে চায় না।

ডুমবার বলল, ব্যাং আছে। ব্যাং ধরে নুনুতে ঝুলিয়ে দেব।

টুটুল অত সব কিছুই বোঝে না। তার সঙ্গে যে কথা বলে সেই তার বন্ধু। সারাক্ষণ তার কথা বলা চাই। না বললে দু ঠ্যাং ছড়িয়ে কাঁদতে বসে। এই যে লোকটা দিদির সঙ্গে কথা বলছে টুটুলের ভাল লাগছে খুব। সেও অজস্র কথা বলছে। হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। মিন্টু বলল, টুটুল প্যান্ট পরে আয়। ব্যাং বেঁধে দেবে।

টুটুল মুখ নাক গলিয়ে দিয়েছে শিকের ফাঁকে। সে কথাবার্তার বিষয়টা ঠিক বুঝে উঠতে পারে। ডুমবার সত্যি কোথা থেকে একটা ব্যাং ধরে নিয়ে এল তখন ভয়ে নেমে সোজা দে এক দৌড়। মার কাছে উঠে বসল চুপচাপ। তারপর দুহাতে খামচে ধরল মাকে।

নির্মলার ঘুম ভেঙে গেলে দেখল টুটুল বড় বড় চোখে বলছে—মা' ব্যাঙো। ব্যাঙো আসছে।

নির্মলা টুটুলের সব কথা বুঝতে পারে না। সে বলল, হ্যাঁ। ব্যাঙো আছে। ঘুমাতে পর্যন্ত দিস না। চোখে তোদের এক ফোঁটা ঘুম নেই! দিদি কোথায়।

টুটুল তাড়াতাড়ি মায়ের কোলে উঠে বসল, ব্যাঙো আসছে। খাবে। আমি ভাল। দিদি ভাল না।

মিন্টু তখন ভাইয়ের হয়ে ডুমবার সিংকে বোঝ প্রবোধ দিচ্ছে। ভাই

আর ল্যাংটো থাকবে না। প্যান্ট পরে থাকবে। ভাই ভাই। বগে সে তখন চেঁচাচ্ছে।

মিন্টু কার সঙ্গে কথা বলছে! তক্তপোশ থেকে নির্মলা নেমে গেল। সারা শরীরে শাড়ি জড়িয়ে বারান্দায় আসতেই দেখল, ডুমবার মিন্টুর সঙ্গে কথা বলছে। হাতে একটা জ্যান্ত ব্যাঙ। ডুমবার মিন্টুর কাছে এগিয়ে বলছে, ভাই কোথা। ভাইকে ঝুলিয়ে দেব। এবং তখনই বারান্দায় নির্মলাকে দেখে, বলল, সেলাম মাইজি, খোকাবাবু পালিয়েছে। সে হাসতে থাকল।

—আর বল না। সারাটাক্ষণ ভাইবোনে মারামারি। একটু যদি ঘুমোয়। তোমার ভয়ে তক্তপোশে বসে আছে। নামছে না। নির্মলা পেছনে তাকিয়ে দেখল, টুটুল উঁকি দিয়ে সেই ডুমবার জানালায় আছে কিনা দেখছে। নির্মলা বলল, ভাল হয়েছে। কিছুতেই জামা প্যান্ট পরবে না। সব খুলে বসে থাকে। তুমি রোজ আসবে।

ডুমবার সঙ্গে মার এত কি কথা হচ্ছে! উঁকি দিয়েই টুটুল কেমন ঘাবড়ে গেল। সেই ব্যাঙটা হাতে ধরে রেখেছে। তক্তপোশ থেকেই টুটুল বলল, জামা কৈ। আমার জামা কৈ!

মিন্টু এবার ভাইকে সাহস দেবার জন্য বলল, ডুমবার ব্যাঙো চলে গেছে।

টুটুল দিদির কথা বিশ্বাস করল না। জামা কৈ জামা কৈ করছে। নির্মলা জামা প্যান্ট পরিয়ে দিতেই সে ধীরে ধীরে যাবে কি যাবে না, কিন্তু লোকটা যে ভারি রহস্যময় জগতের বাসিন্দা টুটুলের কাছে। কিম্ভূতকিমাকার পাগড়ি মাথায়। পায়ে নাগরাই জুতো, সাদা ফতুয়া গায়ে। আর লম্বা সাদা প্যান্ট। সবচেয়ে বিরাট তার বপু আর গোঁফ। টুটুলকে একদিন ডুমবার গোঁফ ধরতে দিয়েছিল। সেই থেকেই দুজনে ভারি বন্ধুত্ব। মিন্টু বের হলেই টুটুল বলবে, ডুমবার যাব। ডুমরাই একদিন কাঁধে নিয়ে মিন্টু টুটুলকে রাজবাড়ি ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। পুকুর পাড়ের শান বাঁধান ঘাটে ডুমবার এক বিকেলে ওকে নিয়ে বসেছিল। ছোট ছোট বেলে মাছ স্ফটিক জলে দেখেছে টুটুল। গোল ঘরে দুটো খরগোশ থাকে। টুটুল তাও দেখেছে। আর হেমন্ত চলে যাচ্ছে, বেলা ছোট হয়ে আসছে, পূবের মাঠ অথবা শস্যক্ষেত্র থেকে উড়ে আসছে অজস্র ফড়িং প্রজাপতি। এই গাছপালা প্রজাপতি এবং পাখির ডাক শোনার জন্য বিকেল হলেই টুটুল ছটফট করে। মিন্টুর হাত ধরে ঘুরে বেড়ায়। খুব বেশি দূর যাবার নিয়ম নেই। ঐ রক্তকরবী

গাছটা পর্যন্ত। সেখানে গিয়েই ভাই-বোন দাঁড়িয়ে থাকে। বাবা তার এই পথ দিয়ে ফিরে আসে।

ডুমবার নির্মলাকে বলল, আমার সাথে খুব ভাব হয়ে গেছে মাইজি। গেল কোথায়। হাতে কিছু নেই। দু হাত ওপরে তুলে ভারি ছেলেমানুষের মত বলল, হাত খালি। ব্যাঙ্গে নেই খোকনবাবুর মুখ দেখ।

নির্মলা ডুমবার সব খবর শুনেছে। সেই কবে বালক বয়সে দেশ ছেড়ে রাজবাড়িতে হাজির হয়েছিল মানুষটা। তারপর থেকেই গেল। কুমার বাহাদুর আর মানসবাবুকে ছেলেবেলা কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। মানসবাবু কুমার বাহাদুরের সম্পর্কে কিছু একটা হয়। সেটা কি নির্মলা জানে না। টুটুলের বাবাই বলেছে, সম্পর্কে একটা বড় রহস্য আছে। কি সেটা টের পাওয়া যাচ্ছে না। ডুমবার কিছু বলে না। সে অনেক কথা বলে, এই প্রসঙ্গে কিছু বলে না। আর সেই থেকে ডুমবার রাজবাড়ি ছেড়ে যায় না যখন মানসদা পাগল হয়ে যায়, ডুমবার ওপর ভার পড়ে তাকে সামলানোর। সে এই পাগড়ি মাথায় নাগরা জুতো পরে। মানসদার কাছে লাঠি হাতে হাজির হয়। তারপরই মানসদা নাকি প্রকৃতিস্থ হয়ে যায়, অথবা আরও কিছু, সব সে স্পষ্ট কিছু বুঝে উঠতে পারে না। এ-বাড়িতে বৌরাণীর নিজস্ব কিছু জার্সি গরু আছে। সকালে-বিকেলে ডুমবার এক বালতি দুধ নিয়ে যায় এই জানলার পাশ দিয়ে। এইটুকু কাজ করতে দেখে। আর যখন দেখে—ভারি পরিপাটি, মাথায় পাগড়ি, পায়ে নাগরাই জুতো। এ দিকটায় এলেই হাঁক দেবে, খোকনবাবু পরী ধরে আনতে যাব। যাবে নাকি।

ডুমবার মাতৃভাষাও বুঝি ভুলে গেছে। মাঝে মাঝে কথায় কিছুটা পশ্চিমা টান থাকে। বয়স জিজ্ঞেস করলে বলে, প্রথম যুদ্ধের কথা। সেই যুদ্ধে নাম লেখাতে বাড়ি থেকে পালিয়ে বের হয়ে এসেছিল। কম বয়স দেখে পল্টনে নেওয়া হয় নি। তারপরই ডুমবার আর কি করে। দেশে ফিরে গেলে বাপ ধরে গাছ পেটা করবে—ভয়ে আর যায় নি। ডুমবার মা নেই। সে হবার পরই মা-জননী চলে গেছে এমন বলে। সবচেয়ে বিস্ময়, পৃথিবীতে লোকটার আপন বলতে কেউ নেই। কিন্তু তার জন্য তার এতটুকু দুঃখ নেই। ডুমবারকে নির্মলা সব সময় দেখেছে ভারি প্রসন্ন চিত্ত। মিন্টুকে বলেছে, পরী ধরে এনে দেবে। ফলে ডুমবারকে দেখলেই দুই ভাই-বোন পরীর কথা জিজ্ঞেস করতে ভোলে না। ডুমবারকে দেখলেই দুই ভাই-বোন জানলায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। পরীটা ধরা পড়েছে কিনা মিন্টু জিজ্ঞেস করলে বলবে, ও ধরা পড়ে যাবে। শীতকাল আসুক না। তখন কুয়াশা হয়। খুব কুয়াশা,

ভারি চাদরের মত। পরীরা রাজবাড়িতে নেমে আসে। ছাদে ঘুমিয়ে থাকে। ছোট্ট পরীটা সে ধরবে ঠিক করেছে। দু-একবার ধরেওছিল। তবে বড় কান্নাকাটি করে। মা মা রে। সে ছেড়ে দিয়েছে। শীতের কুয়াশায় পরীরা আটকে থাকে। শীত না এলে হবে না।

মিণ্টু বলেছিল, উড়ে যাবে না।

—তা কি উড়তে পারে। কুয়াশায় পাখা ভিজে যায় না মিণ্টুদিদি। উড়তে পারে না। থপ করে তখন···

মিণ্টুর ভারি কান্না পায়।—কতটুকুন দেখতে।

—এই তোমার মত। ঠিক তোমার মত দেখতে। দুটো ডানা জুড়ে দিলে মিণ্টুদিদি পরী হয়ে যাবে।

—ধ্যাৎ আমি পরী হব কেন? পরীদের মা-বাবা থাকে?

ডুমবার এমন কথায় কিছুটা বিভ্রমে পড়ে গেল। পরীদের মা-বাবা থাকে কিনা তারও জানা নেই। মা-বাবা বড়ই প্রিয় মানুষের। তার কিছুই নেই। শুধু রাজবাড়ির সব কাচ্চা-বাচ্চা তার এখন বন্ধু। তার নাগরাই জুতো মাথায় পাগড়ি দেখে ভারি মজা পায় সবাই। সে বলল, তোমার মা-বাবা আছে না!

—ঐ তো। তুমি আমার মা না?

ডুমবার বলে, না না। ও তো আমার মা।

—হ্যাঁ বলেছে। আমার মা।

টুটুল বলল, আমার মা। বলেই মাকে জড়িয়ে ধরল। যেন ডুমবার সত্যি অধিকার করতে আসছে তার মাকে। সঙ্গে সঙ্গে মিণ্টুও নেমে গেল জানালা থেকে। মাকে পিছন থেকে ধরে বলল, তোমার মা না। আমাদের মা।

নির্মলার এখন কাজ অনেক। বেলা পড়ে আসছে। ঘর ঝাঁট দেওয়া, ঘর মোছা, কলপাড়ে বাসন মাজা সব পড়ে আছে। এগুলো তাকে বেলা থাকতেই সেরে রাখতে হয়। হাতের কাজ শেষ না করে ফেললে, সন্ধ্যার পর মিণ্টুকে নিয়ে বসতে পারে না। ওকে এ-বছরই স্কুলে দেওয়া দরকার। রাস্তা পার হলে নিবেদিতা কিণ্ডার গার্টেনে ভর্তির কথাবার্তা বলে এসেছে। খুব কড়াকড়ি। মানুষটা ত অফিস থেকে ফিরেই দু দণ্ড বসতে পারছে না। হাত মুখ ধুয়ে বের হয়ে যায়। নির্মলার কাজের জন্য ছুটাছুটি করছে। কিছুই হচ্ছে না। নিত্য অভাব বাড়ছে।

নির্মলা ওদের ছেড়েও যেতে পারছে না। সংসারে কি যে হয়! চার-পাঁচ

বছর আগে এরা তার কেউ ছিল না। সে জানতও না অতীশ বলে এক যুবক তার জন্য কোথাও বড় হচ্ছে। কোথাকার কে, সে এসে এই জীবনে সবটা জায়গা জুড়ে বসে গেছে। যত মিণ্টু টুটুল তাকে তুমবার নিয়ে যাবে ভেবে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছিল, তত সে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল।

পাতাবাহারের গাছগুলির ও-পাশে তুমবারও কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে শিশুদের মত।—মাকে আমি নিয়ে যাব। আমার মা। তোমাদের মা-বাবা থাকবে আমার কিছু থাকবে না! বড়ই কাতর দেখাচ্ছে মিণ্টু-টুটুলকে।

নির্মলা বলল, ছাড়। কাজ আছে কত। আমি তোদের মা হই। তুমবারও।

এই কথায় মিণ্টু কিছুটা সাহস পায়। বলে, তুমাবার দাদা আমার পরী আছে জান।

—কোথা। কে ধরে দিল।

মিণ্টু মাকে ছেড়ে দিয়েই ছুট। সে তার ছোট্ট পুতুল হাতে করে এনে দেখাল, ছাখ। কি সুন্দর চোখ, নাক। আমার পরী। নির্মলা দেখল, টুটুল মিণ্টু আবার জানলায় উঠে গেছে। তুমবার কিছু কেড়ে নেবে না তাদের। সাহস ফিরে পেয়ে আবার জমে গেছে। এই ফাঁকে সব কাজটাজ করে ফেলা দরকার। কাজের লোক ইচ্ছে করেই রাখে নি যতটা এক হাতে পারা যায়। খরচ বাড়ছে সেই অনুপাতে আয় বাড়ছে না। মাঝে মাঝে মানুষটার মুখ দেখলে প্রাণে কেমন ভয় ধরে যায়। চোখ মুখে অদৃশ্য এক যাতনা বয়ে বেড়াচ্ছে। খুলেও কিছু বলে না। লেখার টেবিলে বসে থাকে। কি ভাবে। তারপর কোন কোন সকালে সহসা খুব প্রসন্ন হয়ে যায়। বুঝতে পারে, লেখাটা শেষ করতে পেরেছে। একমাত্র এই দিনটাতেই সে শিস দেয়, বাজার যায়। ভাল মাছটাছ কেনে। মিণ্টু টুটুলের পাশে বসে এক সঙ্গে খায়। নির্মলার সাহস বাড়ে।

কলপাড় থেকে ফিরে দেখল তুমবার নেই। পুতুলটা নিয়ে ভাই-বোনে মারামারি শুরু করে দিয়েছে। টুটুল প্রাণপণ চেপে ধরেছে পুতুলের একটা পা। মিণ্টু ভাইয়ের মুখ খামচে ধরেছে। কেউ টু শব্দ করছে না। ঝগড়া করছে—কাছে না গেলে নির্মলা বুঝতে পারত না। টুটুল ক্ষণে ক্ষণে বড় জেদি হয়ে যায়। দিদির যা কিছু সবই তার দরকার। মিণ্টু কিছু নিয়ে বসলেই টুটুল সেটা নিয়ে টানাটানি শুরু করে দেয়। কাছে গিয়ে নির্মলা ছেলেকে কোলে তুলে নিল,—এভাবে ভাইকে খামচে দেয়। মিণ্টু হেরে গিয়ে হাউহাউ করে কাঁদতে

থাকল। আমার সব কিছু ও নিয়ে নেবে। পুতুলটার হাত ভেঙে দিয়েছে। বাবাকে এলে বলব, টুটুল আমাকে মারে। টুটুল আমাকে কামড়ায়।

নির্মলা বলল, দিদিকে তুই মারিস কেন? মারলে দিদি তোকে ভালবাসবে!

মিণ্টু বলল, তোকে আজ বেড়াতে নিয়ে যাব না। ঝুমবার পরী ধরে দেবে, তোকে দেব না। রাতে শুয়ে থাকবি, ঝুমবা এসে ব্যাঙ্গো ঝুলিয়ে দেবে। যতভাবে পারা যায় মিণ্টু ভাইকে একটা ভয়ের সাম্রাজ্যে নিয়ে যেতে চায়। নির্মলা, ছেলেকে কোলে নিয়ে হাত-পা মুছিয়ে দিচ্ছে। মুখ মুছিয়ে দিচ্ছে, কাজল টেনে দিচ্ছে চোখে এবং সুন্দর পরিপাটি এক শিশু শিশু খেলায় মনটা ভরে আছে তার। মিণ্টুর রাগ এতে আরও বাড়ছে। সে ব্যর্থ হয়ে রান্নাঘরের দরজার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। যেন সে হারিয়ে গেছে। এবারে মা কাঁদুক। টুটুলটাও কাঁদুক—দিদি নেই।

অতীশ অফিস থেকে তখন হেঁটেই বাসায় ফিরছিল। তার কিছু ভাল লাগছে না। কারখানার দেয়ালে পোস্টার পড়ছে। নানা রকম দাবী। অতীশ কি করবে বুঝতে পারছে না। আসছে মাসে মাইনে দেবে কিভাবে সে জানে না। বাজারে দেনা বাড়ছে। কোটার টিন তোলার টাকা নেই। অর্ডারপত্র কম। চার পাশ থেকে সাঁড়াশি আক্রমণ। দু নম্বরী মাল করলে এক্ষুনি কিছু কাস্টমার বড় রকমের অ্যাডভান্স করতে রাজি। কিন্তু অতীশের ভেতরের সেই গোঁয়ার লোকটা মাথা পাততে রাজি হচ্ছে না। কুম্ভবাবুর কাছে তারা বার বার আসছে। বার বার ফিরে যাচ্ছে। নামী কিছু প্রতিষ্ঠান এই কোম্পানির দীর্ঘকালের খদ্দের। তারা বাজার দর শুধু দেখে না, মালের ফিনিসিং দেখে। মেটালবক্স কিংবা এই জাতের বড় বড় প্রতিষ্ঠানে সিট মেটালের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। সিট মেটালকে এদিক-ওদিক ছড়ানো-ছিটানো ছোট ছোট কারখানাগুলির সঙ্গে লড়তে হয়। প্রিন্টিং ফিনিসিং দুই তাদের বেশ ভাল। অতীশ জানে লিথো প্রিন্টিং অচল। কিন্তু আপাতত সে কিছু করতেও পারছে না। প্রিন্টিং মেশিন কিংবা কিছুটা রদবদল করে জিংক প্লেটে ছাপার ব্যাপারেও যে টাকাটা লাগাতে হবে, কোম্পানির হাতে সে টাকা নেই। এই সব চিন্তা ভাবনা মাথার মধ্যে পেরেক ঢোকায়। আর সব সময়ই মনে হয় সেই এক অশুভ প্রভাব সর্বত্র কাজ করছে।

সে ফুটপাথ ধরে হেঁটে যাচ্ছে। পাশে এত লোকজন, অথচ এরা তার কেউ না। হেমন্তকাল এটা। শীতের বেলার মতো কলকাতার মাথায় রোদ্দুর ঠাণ্ডা তাপহীন। শরীরটা ভাল লাগছে না বলে সে তাড়াতাড়ি বের হয়ে এসেছে।

এবং কি যে হয়, অফিস থেকে বের হয়ে এলেই তার মনে হয় কেমন একটা মুক্তির স্বাদ। যতক্ষণ থাকে, এক দণ্ড সে নিজের কথা ভাবতে পারে না। অজস্র সমস্যা। রঙের সমস্যা, ডাইসের সমস্যা, কামাইর সমস্যা, ওভারটাইমের সমস্যা। কেবল মনে হয়, এরা কেন ঠিকমত কাজ করে না। কেবল মনে হয়, ওরা যা পারে তার সিকি ভাগ কাজ করে না। এই দুর্বুদ্ধি তারা কোথায় পায়। সে তো জাহাজে কাজ করে দেখেছে—পুরো আট ঘণ্টা কাজ। এক দণ্ড তার ফুরসত ছিল না। কাজে কোন ফাঁকি ছিল না। মাইনে কম, কিন্তু যা পরিস্থিতি মাইনে বাড়াতে গেলেই মাল বাড়ান দরকার। সে সবাইকে ডেকে বার বার বুঝিয়েছে। ওরা বলেছে ভেবে দেখি স্যার। সে বলেছে, এত কম মাইনেতে তোমরা বাঁচবে কি করে। আমাকে বাঁচাও, আমি তোমাদের বাঁচার পথ দেখছি। খুব তখন ওরা ভাল মানুষের মত স্বীকার করে গেছে, স্যার আপনি ঠিকই বলেছেন। কেউ কেউ গোপনে বলে গেছে, স্যার লাগানি-ভাঙানি হচ্ছে। কিছু করা যাচ্ছে না।

অতীশ হাঁটতে হাঁটতে বুঝতে পারছিল, সংসারে ভাল থাকার কোন দাম নেই। সে ভাবল, কালই কুম্ভবাবুকে এই কাজে লাগাবে। কুম্ভবাবুর স্বভাব তাকে বড় করে দিলে, সে সব করতে রাজি হয়। কুম্ভবাবু চায় সবটাই তার হাত দিয়ে হোক। এবং পরদিনই সে কুম্ভবাবুকে অফিসে ডেকে বলল, আপনি দেখুন না ওদের সঙ্গে কথা কয়ে কিছু একটা করতে পারেন কি না। কুম্ভ বলল, সব বেইমান দাদা; বেটারা খেতে পেতিস না, হাতে পায়ে ধরে ঢুকেছিলি। ঢুকেই অন্য চেহারা। তা আপনি যখন বলছেন, দেখছি।

কুম্ভ জানে, তার একটা আলাদা সুবিধা আছে। সে যখন এদের টোপ দেবে, তখন অন্য কেউ আর এক পাশে টোপ ফেলে বসে থাকবে না। সব কিছু বানচাল করে দিতে চায়, আর কিছুর জন্য না, শুধু সে দেখাতে চায়, সব সেই করতে পারে। অতীশবাবু এভাবে সহজে তার কবজায় আসবে, সে কল্পনাই করতে পারে নি।

সে বলেছিল, কি ভাবে রফা করতে চান।

—আট ঘণ্টায় ওরা এ-মালটা তৈরি করতে পারে। বলে অতীশ টাইপ করা একটা লিস্ট কুম্ভবাবুকে দিল। তারপর বলল, আপনি কি ভাবেন? আপনি ত অনেকদিন এখানে। আমার চেয়ে এটা আরও বেশি ভাল বুঝবেন।

কুম্ভ তালিকাটি দেখল। যা পারে, বরং তার চেয়ে কমই চেয়েছেন। যতবার অতীশবাবু এ-নিয়ে ফয়সালা করতে চেয়েছে, ততবার সে তলে তলে বাগড়া

দিয়েছে। —তোমরা রাজি হলেই মরবে ; কোম্পানীর কাছে এটা রেকর্ড হয়ে থাকবে। এগ্রিমেণ্টে গেলেই ফেঁসে যাবে।

কুম্ভ বলল, মাইনে কি রকম বাড়াতে চান ?

অতীশ আরও একটি টাইপ করা তালিকা দিল তাকে। দুজন অফিস অ্যাসিস্ট্যাণ্ট আছে তার। সে তাদের দিয়েই সব করিয়ে রেখেছে।

তালিকাটি কুম্ভ খুব ভাল করে দেখে বলল, আপনি ত দেখছি রাজাকে দেউলিয়া করে ছাড়বেন দাদা।

অতীশ কিছুটা হতাশ গলায় বলল, এ-কথা কেন ?

—আপনি দাদা মনে মনে কম্যুনিস্ট আছেন। না হলে কেউ এমন এগ্রিমেণ্ট করে।

অতীশ বলল, মনোরঞ্জনের সঙ্গে এই নিয়েই তো কথা বলেছি। কিন্তু ওরা রাজি হয়নি। আপনি আরও কমাতে চান।

—তা না হলে অ্যাগ্রিমেণ্ট করে লাভ কি। সবটাই ওরা খাবে। রাজার থাকবেটা কি!

—রাজা তো এখান থেকে কিছুই পান না।

—কিছু পান না বলবেন না, পেতেন। আপনি আসায় সেটা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু জানেন ত এরা এ-সব শুধু দেখে দেখে আর দেখে। যদি কিছু না করতে পারেন যতই আপনার পেয়ারের লোক হোক…

অতীশ মুখ নিচু করে বসে আছে। তার যেমন জোর আছে অমলা তেমনি কুম্ভবাবুর জোর তার বাবা। সে এসে বুঝেছে এত বড় এস্টেটের এখনও যা কিছু স্থাবর অস্থাবর আছে তার বেচাকেনায় একটা বড় রকমের ব্যভিচার রয়েছে। এই ব্যভিচার শুধু ওপর মহলের দু-একজন আমলাই খবর রাখে। রাধিকাবাবু তার একজন। খুব একটা ঘাঁটাঘাঁটি করতে রাজাও তাকে সাহস পায় না।

অতীশ বলল, এটা অন্যায় মনে করেছি। স্ক্র্যাপের টাকা তিনি পেতে পারেন না। আর এতে কটাই বা টাকা, এটা পেলে না পেলে তাঁর কিছু আসবে যাবে না। আমাদের আসবে যাবে।

কুম্ভ হা হা করে হেসে উঠল।—দাদা আপনি কোন যুগের লোক। টাকা মানুষের আত্মার কাছাকাছি। এদের কাছে আত্মার বিনাশ আছে কিন্তু টাকার বিনাশ নেই। শুধু রেখে যাওয়া। বাড়িয়ে যাওয়া।

অতীশের সবই কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। এই লোকটাই রাজার হয়ে এত

ভাবে, এই লোকটাই রাজার এমন অপযশ গায়। সে বলল, কোম্পানির লাভ হলে তিনি তো ডিভিডেন্ট পাবেনই।

—ভালোই হয়েছে। এতদিন সবুর সইবে না। আর কোম্পানীর লাভ বলছেন, এত সোজা। লাভ হলেই হতে দিচ্ছেটা কে। এখন নতুন আছেন, রাজা হাত দিচ্ছেন না। পরে হাত দেবেনই। শুধু একটু রয়েসয়ে হাত বাড়াবেন এই যা!

অতীশ সবই বুঝতে পারে। যত বুঝতে পারে তত শিটিয়ে যায়। তত এক অশুভ প্রভাব টের পায় মাথার ওপর ঘোরাঘুরি করছে। ওর চোখ কেমন স্থির হয়ে থাকে। অসহায় মানুষের মতো শুধু বলে, যা ভাল বুঝুন করুন।

কুম্ভ বলল, রাজার সঙ্গে সনৎবাবুর সঙ্গে কথা বলে নিয়েছেন?

অতীশ বলল, ওরা দেখেছেন।

—কী বলল দেখে?

—বলেছেন, ঠিক আছে। যদি তোমার মনে হয় এতে সুবিধা হবে তাই কর।

কুম্ভ বলল, চা খাব দাদা। বলেই বেল টিপে সুধীরকে ডাকল। সুধীর এলে চা করতে বলা হল। তারপর ফিসফিস গলায় কিছু যেন বলল কুম্ভ। কিন্তু ও-ঘরে প্রিন্টিং মেশিন চলছে গুমগুম আওয়াজ। অতীশ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে না। সে তাকিয়ে থাকল। কুম্ভর মনে হল মানুষটা ভারি নিরুপায় এখন। এবং এখনই তাকে নিয়ে খেলা জমিয়ে তোলার প্রকৃষ্ট সময়। সে তালিকা দুটি ভাঁজ করে ব্যাগে ভরে রাখল। পরে ব্যাগের মধ্যে আর যা যা থাকার কথা দেখল ঠিক আছে কিনা। যেন একটা মোক্ষম অস্ত্র পেয়ে গেছে। সে ত আর অতীশবাবুর মতো বলবে না, আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি, সে বলবে, রাজার এই ইচ্ছে। রাজা এর চেয়ে এক পয়সাও বাড়াবে না। সে আগেই গেয়ে রেখেছিল মনোরঞ্জনকে, যাই করুন, রাজা এ-সব মানবে না। এগ্রিমেণ্টের কোনো দাম নেই। দরকার পড়লে কারখানা বন্ধ করে দেবে। ভেতরে ভেতরে অনেক কিছু হচ্ছে। আসলে সে রাধিকাবাবুর ছেলে, এবং সহজেই রাজবাড়ির অনেক গুহ্য কথা জানার তার সুযোগ আছে। মনোরঞ্জন এটা বিশ্বাস করে। মনোরঞ্জন মানেই তার কর্মীরা। ইউনিয়নের সে এক নম্বর পাণ্ডা।

কুম্ভ চা খেতে খেতে বলল, দেখতো সুধীর, আমার ওখানে কেউ বসে আছে কিনা। যদি থাকে বসতে বলবি। তারপর অতীশের দিকে তাকিয়ে বলল,

মাইনে ত দেখছি কারো কারো প্রায় দ্বিগুণ করে দিয়েছেন। যা মাল দেবে, সবটা ত ওরাই খেয়ে নিচ্ছে দেখছি।

—তা হবে কেন। কোম্পানীর অন্যসব খরচা একই থাকছে। মার্জিনেল প্রফিট বাড়বে।

কুম্ভ বুঝতে পারে, অতীশবাবুর মাথা পরিষ্কার। সব ঠিক বোঝে। সামান্য ত্যাঁদড় হলে আখের গোছাতে পারত। সেটাই নেই। এ সময়ে মানুষের যেটা সব চেয়ে বেশি দরকার। সে আবার সেই ফিসফিস গলায় বলল, আমাদের জন্য কি রাখলেন ?

অতীশের এটা মাথায় আসে নি। মাইনে বাড়লে সবার বাড়া উচিত। সে বলল, আগে এটা হোক, অর্ডার-পত্র বেশি আনুন। আমাদেরও হবে।

কুম্ভ তত সহজে বুঝবে কেন। সে বলল, আমরাও দাদা মাইনে ভাল পাই না। একজন কেরানীর মাইনেও দেন না। ওতে চলে না। আসলে সে জন্যই যে তাকে ধান্দাবাজি করতে হয় সেটা ও বলে ফেলল, মানুষ চোর হয়ে জন্মায় না দাদা। পরিবেশ তাকে চুরি করতে শেখায়। কি, আপনি মানেন কিনা বলুন !

অতীশ বলল, সব সময় নয়।

হারামি। নিজের খুঁটি থেকে এক পা নড়বে না। তারপরই মনে মনে সে প্রফুল্ল হয়ে উঠল। আজই পিতৃদেবকে দিয়ে রাজার সঙ্গে একটা গোপন সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে। তালিকা দুটো এখন তার সম্বল। সে যে রাজার দিকটা কতটা দেখে, এই তালিকা দিয়েই আর একবার তা প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। এবং সে উঠে পড়তেই সুধীর এসে বলল, বসে আছে। কুম্ভ কি ভেবে আবার বসল। লোকটা যখন এসে গেছে তখন কাজটা সেরে যাওয়াই ভাল। সে বলল, দাদা দশ টন পি সি আর সি পাওয়া যাচ্ছে। নেবেন। খুব সস্তায় হবে। পাউডারের কৌটা হবে।

—নরম মাল ত !

—নরম মাল।

—কত করে বলছে।

সে দামের কথাটা লিখে দিল।

অতীশ বলল, পঞ্চাশ টাকা কম করে হবে কিনা দেখুন !

কুম্ভর খিস্তি করতে ইচ্ছে হল। ঠিক সব খবর রাখে। তবু তার পনের টাকা

করে দালালী থাকবে। অনেক কমে গেল। অগত্যা বলল, টাকাটা আজই দিন। না হলে, রাখা যাবে না।

অতীশ বলল, মালটা পাঠিয়ে দিতে বলুন। সবটাই এক সঙ্গে দিয়ে দেব। তারপর কি মনে হতেই বলল, কত গেজ।

কুম্ভ বলল, চলে যাবে। ত্রিশ একত্রিশ হবে। এসর্টেড।

পরদিন কুমার বাহাদুরের ঘরে তিনজনের এক সঙ্গে ডাক পড়ল। সনৎবাবু ভিতরে ঢোকার আগে সবটা বুঝে নিয়েছেন। আসলে অতীশ হেলপারদের মাইনে অনেক বাড়াবার প্রস্তাব দিয়েছে। যারা সাতাশ টাকা পেত, তারা পাবে পঞ্চাশ টাকার মত। পাঞ্চম্যান, ফিটার কামড়িম্যান, লেদম্যানের মাইনে বাড়াবার প্রস্তাব দিয়েছে গড়ে কুড়ি টাকা করে। প্রিন্টার ব্লকম্যানদের আরও কম। এই এগ্রিমেণ্টে সবচেয়ে উপকৃত হবে হেলপাররা। তারাই সংখ্যায় বেশি। অতীশ এ-সব ভেবেই এটা করেছে। সে গরিষ্ঠের সমর্থন পেতে চায়। এরাই সবচেয়ে বেশি শোষিত। তালিকা তুটো করার সময় অতীশের মাথায় এই চিন্তা ভাবনাই কাজ করেছে। কিন্তু মনোরঞ্জন এবং ইউনিয়নের পাণ্ডারা সায় দিচ্ছে না। এই এগ্রিমেণ্ট মেনে নিলে, তাদের ওভার-টাইম বন্ধ হয়ে যাবে—এমন কেউ বুঝিয়েছে। অতীশ বলেছে, আমরা পার্টিদের কাছ থেকে আরও অর্ডার আনব। প্রথম দিকে অসুবিধা হলেও আখেরে তোমাদের লাভ হবে। এত সব করেও সে পারে নি। এখন কুম্ভবাবুর হাতে ভার দিতেই রাজার ঘরে ডাক পড়েছে। সে বুঝতে পারছে না, কেন আবার এই নিয়ে দরকার হবে। সিদ্ধান্ত সে একা নেয় নি। রাজেনদা এবং সনৎবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করেই এই তালিকা তৈরি করেছে।

ভিতরে ঢুকেই অতীশ দেখল রাজেনদা বড় গম্ভীর। নীল রঙের টাই পরেছেন। চোখে নীল রঙের চশমা। গোঁফে তুটো একটা পাকা চুল সে আগে দেখেছে—আজ তাও নেই। মুখে পাইপ। তিনজনেই ঢুকে প্রথমে দাঁড়িয়ে থাকল। অতীশ দেখছে, তিনি মনোযোগ দিয়ে একটা ডিডের পাতা উল্টে যাচ্ছেন। এরা যে এসেছে, দাঁড়িয়ে আছে তা যেন তিনি বিন্দুমাত্র টের পান নি। অতীশ বুঝতে পারে বড়লোকদের এটা অভিনয়। এত ব্যস্ততার কিছু থাকতে পারে না। বাড়ির তিন চার বিঘে জমির ওপর গম চাষ হয়েছে। গমের সবুজ গাছগুলির ওপর দিয়ে কিছু শালিখ পাখি উড়ে গেছিল। শহরের মানুষজন যখন ফুটপাতে বস্তিতে জায়গার অভাবে কালাতিপাত করছে, তখন তার চার বিঘে

জমিতে অমলার সখের গম গাছগুলি সহসা চোখের ওপর মাথা দুলিয়ে গেল। এ-পাশে ট্রাম লাইন, ও-পাশে রেল লাইন, উত্তরে হাসপাতাল, ইস্কুল, বস্তি বাড়ি, এবং ঘিঞ্জি শহর। কত সুন্দরভাবে এরই মধ্যে মানুষটা বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। শহরের ময়লা জল পথ-ঘাট উপচে এই বাড়িতে কোনদিন ঢুকে যেতে পারে— সেটা কুমার বাহাদুরকে দেখে কিছুতেই ভাবা যাচ্ছে না। তখনই চোখ তুলে কুমারবাহাদুর বললেন, বোস। সনৎবাবুকে বললেন, বসুন। ওরা উভয়ে বসে পড়ল। কুম্ভ তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

অন্য দিন অতীশই বলে, এ-পাশে এসে বসুন। আজ সে কিছু বলতে পারল না। সে কেমন টের পায়, কুম্ভবাবু জল বেশ ঘোলা করে দিয়েছে। রক্ত মাথায় উঠে যাচ্ছে। এবং মাথা ঝিমঝিম করছে। সে মাথা নিচু করে বসে থাকল।

কুমার বাহাদুরই বললেন, তুই আবার দাঁড়িয়ে থাকলি কেন? বোস। সেই বাড়ির ছেলের মতো, কুম্ভ যে এ-বাড়িতেই জন্মেছে, বড় হয়েছে, এ-বাড়ির জন্য তার যে একটা মায়া থাকবে তাতে আর অবিশ্বাসের কি আছে।

কুম্ভ বসতেই বললেন, তোর কি মনে হয়?

—এগ্রিমেণ্ট ঠিকই আছে তবে··· ;

—তবেটা কি বল!

—অর্ডারপত্র কম। অর্ডারপত্র না বাড়িয়ে এই এগ্রিমেণ্টে যাওয়া ঠিক হবে না!

—কেন হবে না? কুমার বাহাদুর আবার প্রশ্ন করলেন।

—কুম্ভ বলল, কাজ ঠিক-ঠাক পেলে ফাঁকা মাঠ হয়ে যাবে।

—স্পষ্ট করে বল!

—লোকজন বসে পড়বে।

অতীশের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি এ-দিকটা ভেবে দেখেছ?

অতীশ বুঝতে পারছে, কুম্ভবাবু সুযোগ সন্ধানী হয়ে উঠছে। কুম্ভবাবু অন্যভাবে বিষয়টা তার বাবাকে বুঝিয়েছে। তার বাবা কুমারবাহাদুরের সঙ্গে কাজ সেরে ওঠার সময় হয়ত বলেছিল, কুম্ভটা বলল, অতীশ ত ঠিক বোঝে না, ভাল মানুষ, ভাল মানুষ দিয়ে ত কুমার বাহাদুর সব কাজ হয় না, ঐ ত কি একটা এগ্রিমেণ্ট করতে যাচ্ছে, গোড়ায় গলদ···এবং এই সবই মাথায় অতীশের কিলবিল করে পাক খাচ্ছে। সে কি বলবে বুঝতে পারছে না। মনে হল, সত্যি সে এদিকটা ভেবে দেখে নি। সে খুবই অক্ষম মানুষ। তার পক্ষে ঠিক এ-

ভাবে এগ্রিমেণ্ট করার কথা ভাবা ঠিক হয় নি। তারপরই সে কেমন নেতিয়ে যাচ্ছিল—আর ঠিক সেই সময় মনে হল কুম্ভবাবু চায় আবার সেই দুই নম্বর মাল বানাবার সুযোগটাকে কব্জা করতে। এই সুযোগে রাজার কাছ থেকে অনুমোদনটা করিয়ে নিতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে রক্তপাত শুরু হয়ে যায়—মানুষের পক্ষে এতটা ধান্দাবাজি ঠিক না। দু' নম্বর মাল দিয়ে কি হয় সে জানে। সে পীড়িত বোধ করতে থাকল।

সনৎবাবু বললেন, প্রচুর অর্ডারপত্র হাতে থাকলেই অতীশ এটা তোমার সম্ভব।

অতীশ কোথায় যেন এবার দৃঢ়তা পেয়ে যাচ্ছে। সে বলল, যা আছে তাতে বসে যাবার কথা না।

কুমারবাহাদুর পাইপ খুঁচিয়ে আবার চোখ বুজে ধোঁয়া টানলেন। ধোঁয়া আসছে না। খুক খুক কাশলেন, কেমন একটা জব্দ করার মতলবে যেন ওরা তিনজনই ওর চারপাশে এখন কাশতে শুরু করেছে। বেশ সময় নিয়ে কুমার বাহাদুর তারপর বললেন, এরা যদি মাল বাড়িয়ে দেয়, তুমি যদি মালের দাম না কমাও যদি বাজার হাত ছাড়া হয়ে যায় তখন কি করবে?

চাপটা প্রবলভাবে আসছে। সে বলল, দাম কমালেও এর চেয়ে অর্ডারপত্র বেশি আসবে না। আমাদের নতুন কাস্টমার খুঁজতে হবে। মান্ধাতার আমল থেকে যারা আছে, তারাই নিচ্ছে।

কুমার বাহাদুর বললেন, তার কিছু ব্যবস্থা নিয়েছ?

—কিছু কিছু চিঠি পাঠিয়েছি। ধরুন কে এম পি রাজি হয়েছে! প্রিন্টিং আরও ভাল চায়। লিথো ব্লকে চলবে না। জিংক প্লেটে যেতেই হবে। কোটা, ইমপোর্ট লাইসেন্স সব দরকার। টাকা নেই।

—তুমি বেশ আছ, টাকা নেই, তুমি এদিকে সবার মাইনে বাড়াতে চাইছ।

—ওরা মানবে না। আপনাকে বাড়াতে হবেই। সেটা আজ নয় কাল।

কুমার বাহাদুর বললেন, আজ-কালের মধ্যে তফাৎ অনেক হে ভায়া। তোমরা সেটা বুঝতে শেখ নি। হাতের কাছে যা পাবে তাই নিয়ে নাও এখন। তারপর এগ্রিমেণ্টে যাও।

সেই দু' নম্বরী মালের প্রসঙ্গে আসছে। শেঠজি, রামলাল, কিশোরীলাল, পিয়ারীলালেরা ঘোরাফেরা করছে। সে বলল, আগে ইউনিয়নের সঙ্গে অ্যাগ্রিমেণ্ট হোক। তারপর দেখি বসে যায় কিনা। যদি যায় এরা ত আছেই। এখনই তাড়াহুড়ো করে খুব লাভ নেই।

এবার কুমার বাহাদুর কুম্ভবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন তাহলে ওটা করে ফেল। অতীশ ত রাজি আছে। বসে যদি যায়, তখন না হয় শেঠজীদের মালের কথা ভাবা যাবে। কুম্ভর মনে হল হেরে যাচ্ছে। সে বলল, আজ্ঞে তাই তবে হবে। কিন্তু কুম্ভর মুখ দেখে অতীশ বুঝতে পারল, সে সহজে তাকে নিস্তার দেবে না।

কুম্ভর মেজাজ বিগড়ে গেলে চোখ দুটো লাল হয়ে যায়। এটা মানুষের পক্ষে খারাপ। অতীশের কাছে এটা মনে হয় ভারি বিপজ্জনক বিষয়! সে আর্চিকেও দেখেছে, ঠিক এ-ভাবে মাথা ঠিক রাখতে পারত না। আর্চির ছিল বনির ওপর প্রলোভন। এবং প্রলোভনে পড়ে গিয়ে সে ছোটবাবুকে যখনই সুযোগ পেত নির্যাতন করত। কুম্ভবাবু টাকার প্রলোভনে সেই একই কাজ করছে। এবং এটা যে কখন নিদারুণ নিষ্ঠুর হয়ে উঠবে, অতীশ আবার দেখতে পাবে একটা বাঘের মতো মুখ—যেন ডোরা কাটা, প্রায় আর্চির মতো মাথা উঁচিয়ে বসে আছে—সে ভীত হয়ে পড়েছিল। সে মনে মনে বলল, না না, ওটা বাঘের মুখ না। মানুষের মুখ। বাঘের মুখ হয়ে গেলেই মনে হবে, হত্যায় কোন পাপ নেই। যদি আর্চির মুখে সে সামান্যতম মানুষের অবয়ব খুঁজে পেত! তবে বোধ হয় খুন করতে পারত না। সে পেছন থেকে ডাকল, কুম্ভবাবু। আসলে সে আবার মুখটা দেখতে চায়। মুখের অবয়বে মানুষের মুখ দেখতে চায়। কারণ সে নিজেকে বড ভয় পায়। নিজেকে সে বিশ্বাস করে না।

কুম্ভবাবু বারান্দায় এসে বলল, আমাকে ডাকছেন দাদা?

অতীশ অপলক দেখতে থাকল মুখটা। আর্চির মতো বেঁটে, রং ফর্সা, নাক থ্যাবড়া, চোখ গোল গোল, ঝাঁটা গোঁফ এবং মাথায় কোঁকড়ানো সেই চুল। সে বলল, গোঁফটা অত বড় কেন রেখেছেন কুম্ভবাবু।

কুম্ভ বলল, কি হয়েছে তাতে?

অতীশ ভীরু বালকের মতো বলল, আমার ভয় করে।

কুম্ভ হা হা করে হেসে উঠল। এবং সেই হাসিতে অতীশ কেমন ম্রিয়মাণ হয়ে যায়। বুঝতে পারছে, সে স্বাভাবিক কথাবার্তা বলছে না। সে এমন হয়ে যায় কেন! তার মাথার মধ্যে কে টরে-টক্কা বাজায়!

॥ ষোল ॥

জানালা থেকে রোদে নেমে গেলেই কাবুলের চঞ্চলতা বাড়ে। বড় সুসময় বয়ে যাচ্ছে। বাবুর্চি পাড়া, বাবু পাড়া, পুরান পাড়ার ঘরগুলিতে এখন পুরুষদের সংখ্যা কম। কাজে-কম্মের ধান্দায় দশটার আগেই পাড়া খালি করে তারা বের হয়ে যায়। তখন কাবুল উঁকি দিয়ে দেখে। গ্যারেজের চাবি নিয়ে আঙুলে রিঙ ঘোরায়। আর একটু সময়—কারণ হাসিরানীর বাড়িতে এখনও কিছুটা স্নান আহারের তাড়া আছে। কুম্ভর ভাই দুলাল শম্ভু কলেজে গেলেই বাড়িটা ফাঁকা। সুরেনের মেয়েটাকে কুম্ভ পাহারায় রেখে যায়। ওতে তার সুবিধাই হয়েছে। ফাই ফরমাস দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিলেই সব সুনসান। অবশ্য ইদানীং হাসি-রানীর সতীপনা বেড়েছে। মেয়েটা হয়ে যাওয়ার পরেই আর গায়ে ফায়ে বেশী হাত দিতে দেয় না। তবু কি যে হয়, হাসিরানীর গোলগাল টোবলা মুখ, চোখের সামনে ভাসে। মাথা ঝিম মেরে থাকে। কেবল জানলায় চোখ দিয়ে বসে থাকে। এই রাধিকাবাবু গেল, এই কুম্ভ গেল। শম্ভু দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। সেও বের হয়ে যাচ্ছে। বাকি থাকল এক। কাবুল বেশ অস্থির হয়ে পড়েছে। ঘরে পায়চারি করছে। কান চোখ মুখ কেমন গরম, জর আসার মতো। সে এক দণ্ড বসে থাকতে পারছে না। হাসিরানী বোঝে না কত সে করে। কুম্ভর ছ্যাঁচড়া স্বভাব। বৌরানী সব জানে, টের পায়। তার তখন এক কথা, ছ্যাঁচড়া লোকটা তোমাদের আছে বলেই সিট মেটাল টিকে আছে। সব অভিযোগ সে সময় খণ্ডন করে দেয়। এবং কুম্ভ যদি কখনও এসে দেখতে পায়, রাধিকাবাবু যদি দেখতে পায় সবটাই হজম করে নেয়। ঐ এক গেরো। সে তখন বেশ সরল মানুষের মতো হেসে দেয়। আরে কুম্ভ যে! তোমার শালা বড় খারাপ স্বভাব। বৌকে ছেড়ে থাকতে পার না। মেসোমশাইকে বলবে, চা খাচ্ছি। এ বাড়ির চা না খেলে দিনটাই খারাপ যায়। এই হাসি এত কিপ্টে কেন বাবা! এক কাপ চাও দেবে না! অথবা নানা রকমের কথা ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের কথা। সিনেমার নায়ক নায়িকার কথা। কোথাও যদি দুর্ঘটনা ঘটে থাকে তার কথা। কেবল কথা।

রাধিকাবাবু জানে, কুম্ভর চাকরি কাবুল করে দিয়েছে। রাধিকাবাবু জানে তিনি যে বিশ্বাসী মানুষ, এটা কাবুলই বলে বলে এখনও বৌরানীর কাছে ঠিক

রেখেছে। অর্থাৎ এ-বাড়িতে কি খাওয়া হয়, কি বৈভব আছে, তা বৌরানীর কানে যায় না কাবুল হাতে আছে বলেই। যা মাইনে তাতে পেট চালানো দায়। অথচ রাধিকাবাবু এখনও দেশের বাড়িতে দুর্গা পুজো করেন। মেয়েদের মাসহারা পাঠান। ছেলেদের সবার নামে ব্যাংকে একাউন্ট করে দিয়েছেন। একটা আমবাগান, নারকেল বাগান, দশ বিঘের ওপর নীলগঞ্জের কুঠিবাড়ি বেনামে কিনে নিয়েছেন রাজার কাছ থেকে। এত সব করছেন, অথচ বিশ্বাসী হতে আটকাচ্ছে না। মূলে আছে কাবুল। হাত-ছাড়া হলেই সব দাপট যাবে।

কাবুল না থাকলে কুম্ভকে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে হত। চাকরি করে দেবার পরই কুম্ভ এসে বাপকে একদিন বলল, সব চুরি হয়ে যাচ্ছে বাবা। স্ক্র্যাপ বিক্রি করছে, টাকা জমা পড়ছে না। বুড়ো ম্যানেজার মেরে দিচ্ছে।

রাধিকাবাবু বলেছিলেন, তার আমি কি করব?

—রাজার কানে কথাটা তোলেন!

—শুনবেন কেন? আমার ত ওতে কথা বলার এক্তিয়ার নেই। আসলে নিজের পাছায় ঐ যে কি লেগে থাকে না, তাই হয়েছে রাধিকাবাবুর। সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। তার ওপর পুত্রের ঝামেলা তিনি কাঁধে নিতে রাজি না। যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। দোষের কিছু না।

সুতরাং কাবুলকেই ধরতে হয়। কুম্ভর কাবুলই ভরসা। এক সঙ্গে বড় হয়েছে। এক সঙ্গে পড়েছে, ফুটবল খেলেছে। বেশ্যালয়ে গেছে কাবুলের টাকায়। এস্টেট থেকে মাসহারা পায় কাবুল। সে অনেক টাকা। যত ফুর্তি-ফার্তা কাবুলই তাকে করিয়েছে। এখনও কাবুল সহায়। কাবুলকেই সে বলে বলে কান ভারি করেছিল। তারপর কি সুসময় কুম্ভর। রাজা ডেকে পাঠিয়েছিলেন। রাজা সব খবর নিতে থাকলেন। সনৎবাবুকে ডেকে বলেছিলেন, সিট মেটালের ম্যানেজার সব ত ফাঁক করে দিচ্ছে। খবরটা রাখেন। সনৎবাবু বলেছিল, না জানি না। আমার বিশ্বাস হয় না। আমি তাকে খুবই ধার্মিক মানুষ জানি। তখন লাগে সনৎবাবুর পেছনে। এই করে এত দূরে আসা কুম্ভর। কুম্ভ তখন হাসিরানীকে বলত, কাবুল এলে আদর যত্ন কর। কুম্ভ জানত হাসিরানীর প্রতি কাবুলের কিছু দুর্বলতা আছে। কুম্ভ বাড়ি না থাকলেও সে আসত ঠিক বাড়ির ছেলের মতো। এখন যত দিন যাচ্ছে কাবুলের আকাঙ্ক্ষা বাড়ছে। আর দশজনও দেখছে, কিন্তু রাধিকাবাবু চুপ, কুম্ভ কখনও ফিরে এসে দেখলেও চুপ। ভিতরটা গুম মেরে গেলেও ওপরে ঠাট্টা তামাশা। এখন আর তত সহজে বলতে পারে

না, কুম্ভ আমার জন্য যা করেছ! কুম্ভ না থাকলে হাসিরানীর মুখে আর হাসি ফুটত না।

কাবুল এবার নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। যাক দুলালটাও চলে গেল। এখন কোয়ার্টারে শুধু হাসিরানী আর টেবি। এই দুজন। হাসিরানী ঠিক এখন মেয়েকে নিয়ে মজেছে। সে পেছন থেকে গিয়ে একটা হুঁম করবে। হাসিকে ভয় পাইয়ে দেবে। তারপর মোড়া টেনে বলবে, এই টেবি যা ত, রবির দোকান থেকে গরম সিঙাড়া কচুরি আন। হাসি চা লাগাও। যেন এই চায়ের জন্য ফন্দি ফিকির করে গোপনে ঢুকে যাওয়া। বলে রাখা, এখনও সময় হয় নি, কুম্ভকে বল, সবটাই খেলিয়ে তুলতে হয়।

তখন কুম্ভ বলল, দাদা শরীরটা ভাল লাগছে না। অফিস যাচ্ছি না। আপনি যান।

সাধারণত অতীশ এবং কুম্ভ একই সঙ্গে কারখানায় যায়। কোন দিন কাবুলের সঙ্গে। কুম্ভর রাজবাড়ির আলগা কাজ থাকলে কুম্ভর যেতে দেরি হয়। সেদিন অতীশ একা যায়। আজও হয়ত কোন কাজ টাজ পড়ে গেছে! সে বলল, কাবুলবাবুর সঙ্গে কোথাও বের হবেন!

কুম্ভ বারান্দার গোল টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে কিছু যেন ভাবছে অতীশের কথা শুনতে পায় নি। কালও রাজার সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় ঠিক। আগে মাইনে বাড়ান, মাল বাড়ান ওভারটাইম বন্ধ করুন, সব ঠিক আছে। কিন্তু অর্ডারপত্র কম। বেশি অর্ডার পত্র নিতে হলেই রামলাল পিয়ারিলালের দরকার। এত বছর এই করে চলে আসছে আজ হঠাৎ রামায়ণ গাইলেই হবে কেন! রাজাও কথা দিয়েছিল—কিন্তু তারপর সব কেমন ওলটপালট হয়ে গেছে। কে সেটা করে! তবে সে অতীশকে যতটা বোকা ভেবে থাকে, সে ততটা বোকা নয়। বোকা ঠিক নয়, যতটা ভালমানুষ ভাবে, ততটা ভালমানুষ নয়। বৌরানীর সঙ্গে কি কোন গোপন সম্পর্ক আছে! কে জানে! কুম্ভ মনে মনে ভীষণ জেদি হয়ে উঠছে। চোখ মুখ লাল। অতীশ ফের কোন কথা বলতে সাহস পেল না। সে এই সব মুখে কি ধরা পড়ে, জানে। এবং কুচক্রীকে সে ভয় পায় আর তার মুখে বাঘের মুখ দেখে ফেলে বলেই ভয়। এখন আর সে মানুষের মুখে বাঘের মুখ দেখতে চায় না। টুটুল মিণ্টু আছে। মিণ্টুর জন্য সে ভেবেছে একবার নিবেদিতায় যাবে। নির্মলার শরীর ভাল যাচ্ছে না। এখানে এসে রোগা হয়ে গেছে। নির্মলার দাদা এসে একবার কিছুদিন নিয়ে রাখতে চেয়েছিল, অতীশের অসুবিধা হবে

ভেবে যায় নি। আসলে নির্মলার এখন একার হাতে সংসার। সে টানতে পারছে না। অভাব বাড়ছে। এই সব সাত পাঁচ চিন্তা ভাবনায় সে যখন ট্রাম রাস্তা পার হচ্ছিল তখন কুম্ভ ঘরের দিকে হাঁটছে।

আসলে উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষকে কখনও কখনও ভারি গোলমালে ফেলে দেয়। এবং এই আকাঙ্ক্ষা মানুষকে কখনও কখনও বড় রক্তাক্ত করে। মেজাজ মর্জি ঠিক রাখা যায় না। কুম্ভ বাড়ি ঢুকেই মেজাজ মর্জি ঠিক রাখতে পারছে না। দাঁত চেপে হজম করে যাচ্ছে। টেবিটা নেই। সে ঢুকেই বলল, টেবি কোথায়?

কাবুলের ভেতরটা কেঁপে উঠল। কুম্ভ অসময়ে! অবশ্য অসময়ে কুম্ভ আরও এসে দেখেছে, খোস মেজাজে হাসির সঙ্গে নানা রকমের সে গুল ঝেড়ে যাচ্ছে। কাবুল জানে দায়টা কুম্ভর কোথায়। সে সহজেই খুব সরল মানুষ হয়ে যেতে পারে। কুম্ভকে দেখেই বলল, কি রে খুব জোর লেগেছে!

কুম্ভ হাসির দিকে তাকিয়ে বলল, একটু গরম জল বসাও। দাঁত ব্যথা করছে।

হাসি বলল, বসাও না। আমি কি বসে আছি। কুম্ভ কিছু বলল না। ব্যাগটা ঘরের ভিতর রেখে নিজেই কেটলিতে জল ঢালতে থাকল। হাসি যেন পাত্তা দিচ্ছে না। সে ত কাবুলকে নিয়ে কিছু করছে না, মেয়েটার গায়ে তেল মাখাচ্ছে। কাবুল পাশে মোড়ায় আছে। কে আসে কে যায় হাসির যেন মাথাব্যথা নেই।

কুম্ভ জলটা ঢেলে স্টোভে কেটলিটা নিজেই বসিয়ে দিল। খুব গম্ভীর। কাবুল লক্ষ্য করছে সব। কাবুল এটা টের পায়, কুম্ভর যতই মেজাজ বিগড়ে যাক, যতই দাঁত ব্যথা করুক এখন উঠতে চাইলেই ধরে রাখবে। বসিয়ে রাখবে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রাজবাড়ির ভেতরের খবর নেবার জন্য দাঁত ব্যথা সত্ত্বেও অনর্গল বকবে। সে বলল, কুম্ভ জলটা বেশি করে দে। তোর বৌকে ত বলে পারলাম না। একটু চা পর্যন্ত করে দেয় না এলে। আমার মূল্য ধরে দেখছে না।

—বাদ দে ভাই আমাদের কথা। সে ঘরে গিয়ে সব খুলে একটা লুঙ্গি পরে এল। তারপর কারো দিকে তাকাল না। কারণ তাকালেই হাসিকে সে নষ্ট মেয়ে ভাবছে। হাসির মুখ দেখলেই ধরে পেটাতে ইচ্ছে করছে। শরীরে তার এত কি জ্বালা! গতরের জ্বালা, সে আমারও কম নেই।

হাসি বেশ খুশি খুশি। কুম্ভর দাঁত ব্যথার জন্য এতটুকু কোন সহৃদয়তা নেই। সে মেয়েটার টুবলা গালে চুমো খাচ্ছে। দু-হাত দু-পা মুঠো করে ছেড়ে দিয়ে

বলছে, ফুক্কা। মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠছে। একবার কুম্ভর দিকে চোখ টেরচা করে চেয়েছে। তারপরই ভেবেছে, তুমি একটা ম্যাঙ্গো। আমাকে ধষ্টাবে। লোকটাকে ত কিছু বলতে পার না। ভাল লাগলে কি করব! রাজবাড়ির গন্ধ লোকটার গায়ে। সে একবার এটা বলেও ফেলেছিল, সন্দ যখন বারণ করে দাও না। তুমি না করলে আমিই করব।

কুম্ভ জলে পড়ে যাবার মতো চিৎকার করে উঠেছিল, আরে না না! চটাতে যেও না। বন্ধুবান্ধব লোক। এক সঙ্গে মানুষ হয়েছি, মা বাবা কেউ নেই, পিসতুতো ভাইয়ের কাছে আছে। আছে বলেই যে কুম্ভর রক্ষা সেটা আর বলে না। সুতরাং হাসি ভয় পায় না। বরং মজা পায়। দুজন পুরুষকে নিয়ে খেলতে মজা পায়। মেয়েটা হবার পর পুরো এক মাস সিনেমা না দেখেছিল। সাত পাকে বাঁধা বইটা হাসি চারবার দেখেছে। আবার এলে দেখবে। এসেও-ছিল। চলেও গেছে। এক মাসে হাসির জীবনে অনেক ক্ষতি হয়েছে। মেয়েটা হওয়ায় এই ক্ষতি। তার পর টেবির কাছে রেখে সেটা বাকি তিন মাসে পুষিয়ে নিয়েছে। এখন তার আকাশ বড় ঝকমক করছে ফের। সে একা কাটায় কি করে! আর মানুষের কথা সে টের পেয়ে গেছে সব। ওদের দৌড় বিছানা পর্যন্ত। যতই লম্ফঝম্প হোক রাতে সব কাত। না, শরীর ভাল্লাগছে না। আমাকে ঘুমোতে দাও। আর যায় কোথায়। সোহাগে সোহাগে তখন পাগল করে ছাড়বে। কি চাই, শাড়ি, দেব। অলংকার—দেব। সিনেমা—দেখাব। তখন আর পৃথিবীতে কিছু বাদ থাকে না—সব এনে শ্রীচরণ পদ্মে হাজির। সুতরাং হাসি কুম্ভর দাঁতের ব্যথায় গা করল না। রাত এলেই সব সেরে যাবে। ব্যথা টেথা সব পগার পার। হালুম হুলুম তখন। খাব খাব তখন।

কাবুল বলল, হাসি তুমিও পার। দাঁত ব্যথা বলতে! জলটা বসিয়ে দিতে কি তোমার ক্ষতি ছিল বুঝি না!

হাসি কাবুলের কথাও গ্রাহ্যি করল না। সে মেয়েকে চান করাতে থাকল। রোদে জল দিয়ে রেখেছিল, সেটা দিয়ে চান করাচ্ছে। তুগাছা দূর্বা দেওয়া জলে। জলে কোন সংক্রামক বীজাণু থাকতে পারে ভেবে এই দিয়ে রাখা; পুজো আর্চায় যা লাগে শিশুর স্নানে তা দিলে সংসারে পাপ থাকে না। অথচ শরীরে কি যে থাকে! শিশু বড় হয়, বালিকা হয়, যুবতী হয়। কুম্ভ হয়, হাসি হয়, কাবুল হয়। আর এ-সময়েই মনে হল অতীশও হয়। সবই হয় পৃথিবীতে। লোকটা তাকে বলেছিল, লক্ষ্মীর পট কিনে দেবে। এখন যেন সেটাই বেশি তাকে

কামড়াচ্ছে। কন্যেটির শরীর মুছিয়ে দিতে গিয়ে বিড়বিড় করছিল, কেউ কথা রাখে না। যে যার মতো মিছে কথা বলে। লক্ষ্মীর পট কিনে দেব একটা। তার আর নাম গন্ধ নেই।

কুম্ভ আর পারল না। সেই লোকটা এ-বাড়িতেও ঢুকে গেছে। রাজবাড়িতে ঢুকছে ঢুকুক। এ-বাড়িতে কেন। সে কালীঘাটের কালীর মানসপুত্র। তার পরে লক্ষ্মীর পট কেন আবার। সরল সুধা! সে সহসা চিৎকার করে উঠল, আর কিছু চাই না!

—চাইলেই দেয় কে?

কাবুলের দিকে তাকিয়ে কুম্ভ বলল, দেখছিস, দেখছিস হারামজাদী মাগী কি বলছে!

কাবুল খুব মান্যিগন্যি মানুষের মতো বিচারে বসে যায়। —অযথা মাথা গরম করছিস কেন তোরা?

—আমি করছি। বল, আমি করছি!

—কেউ করছিস না। নে, চুপ কর।

হাসি মেয়ের জন্য দুধ গরম করবে! জল গরম এখনও হয়নি। ঠাস করে কেতলি নামিয়ে দুধটা বসিয়ে দিল। মেয়েটা এক হাতে ঝুলছে।

—দেখলি ত। আমি কি তোর মাগী গোলাম।

—ছোটলোকের মতো কথা বলবে না বলে দিচ্ছি। হাসির চোখ গরম হয়ে গেল।

কুম্ভ বলল, একশবার বলব। নষ্টামীর আর জায়গা পাস না।

হাসি মেয়েটাকে খাটে শুইয়ে দিয়ে এসে বলল, একশবার করব। মুরদ থাকে ত সামলিও।

কুম্ভ কেমন বিচলিত বোধ করে। কাবুলের দিকে তাকিয়ে বলল, সব যাবে। তুই জানিস লক্ষ্মীর পট কিনে দিয়ে সে কি করতে চায়?

—সে তুমি বোঝগে। আমার সময় নেই বোঝার কি করতে চায়।

কাবুল বুঝতে পারছে বিষয়টা তাকে নিয়ে নয়। নতুন ম্যানেজারবাবুকে নিয়ে। অতীশ হাসিকে লক্ষ্মীর পট কিনে দেবে বলেছিল। সেদিন গাড়িতেই যেন কথাটা হয়েছে। অতীশকে হাত করার জন্য সঙ্গে হাসিকেও নিয়েছিল কুম্ভ। কাবুল কিছুটা রেগে গিয়েই বলল, তা কিনে দিলেই পারিস। হাসি একটা ঘরে লক্ষ্মীর পট বসাতে চায়, তা করে দিচ্ছিস না কেন? ঠাকুর দেবতা বলে কথা।

ঠাকুর দেবতাই সম্বল কুন্তর। তার এতে সায় যে নেই তা নয়। কিন্তু যে মানুষটা তার উপার্জনে বাগড়া দিয়ে যাচ্ছে, তার অমঙ্গল কামনা করছে, সেই মানুষের পরামর্শমত লক্ষীর পট কেন আসবে বাড়িতে!

সে বলল, আরে তুই মেয়েছেলে, লোকটা তোর কোন উপকারে লাগে বুঝিস না। কেবল কেড়ে নিতে এসেছে। গয়নাগাটি পরে খ্যামটা নাচ এবারে তোর বের করে দেবো। এতবড় সুযোগ নালে হাতছাড়া হয়। সময় খারাপ যাচ্ছে কাবুল। তুই যে বলছিলি, আমার হাতটা কাকে দিয়ে দেখাবি। পাথর-টাথর ধারণ করলে গ্রহের কোপ কমে যায়। সব গ্রহের দোষ হচ্ছে বুঝি। কিন্তু কি করব বল। তুমিও তো শালা কোন কম্মের নও। তোমার দাদাটি আর এক নপুংসক।

কাবুল এতক্ষণে কুন্তর জ্বালাটা কোথায় বুঝতে পারছিল। দাদাকে টেনে আনায় সে কিছুটা অস্বস্তি বোধও করছে। আজ কিছু একটা হয়েছে। কি হয়েছে সেটা সে আন্দাজও করতে পারল। ভেবেছিল কুন্ত বাপকে দিয়ে কাজ উদ্ধার করবে। রাতে খাবার টেবিলেই দাদা তাকে বলেছিল, বুঝছিস ভায়া দুটো দু'রকমের; একটা চোর ছ্যাঁচোড়, অন্যটা গোঁয়ার। কোনটাকে যে সামলাই। সে শুধু ফুট কেটে বলেছিল, অতীশবাবু যদি পারে করুক না। দু নম্বরী মাল বানিয়ে কতদিন চলবে!

আর সেই কথায় বৌদিরও সায় ছিল। বলেছিল, অতীশকে নিয়ে আসাই ভুল হয়েছে। ওর বাপ জ্যাঠাকে আমি জানি। রক্তে দোষ আছে। তাকে দিয়ে তুমি পারবে না।

কুম্ভ বলেছিল, সব হবে বৌদি। ঠেলার নাম বাবাজী। এখন হচ্ছে না, পরে হবে।

এইসব কথাবার্তা রাতে হয়েছে। সে কুন্তর পক্ষে একটা কথাও বলেনি। কুম্ভ যে চোর ছ্যাঁচোড় সেই খবরও কাবুলই দাদার কানে পৌঁছে দিয়েছিল। আর তার কাজই এখন এটা। সে সব কনসার্নে ঘুরে বেড়ায়। নিচু মহলের লোকদের সঙ্গে মিলে মিশে যেতে পারে। এবং রাজার ভাই বলে সবাই আখড়ার খবর তার মারফত সঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে চায়। বাপকে দিয়ে উদ্ধার পেতে চাইছে কুম্ভ। সেয়ানা হয়ে উঠেছে। ভেবেছে তার আর দরকার নেই। এখন বোঝ, কত ধানে কত চাল। কাবুল বলল, আমাকে আগে থাকতে বলবি ত। কি হয়েছে বলবি ত!

কুম্ভ কি ভেবে বলল, না কিছু হয়নি।

—হয়নি ত শালা অফিস যাসনি কেন! এসেই বৌর ওপর হম্বি তম্বি করছিস কেন।

—মানুষের শরীর খারাপ হতে পারে না!

—তোমার শরীর খারাপ। তালেই হয়েছে।

—কেবল রাজ-রাজড়ার বুঝি শরীর খারাপ হয়।

কাবুল বুঝতে পারল, আবার শালা দাদাকে টেনে আনবে। পরে বৌদিকে। বৌদির সঙ্গে অতীশের বাল্যপ্রণয় ছিল কিনা, তাও কুম্ভ অনায়াসে বলে যেতে পারে। মুখে ওর কিছু আটকায় না। মর্জি মতো কাজ না হলেই সব মানুষ ওর কাছে খারাপ। কাজ উদ্ধারের জন্য সে সবকিছু করতে পারে! না পারলে দুনিয়া শুদ্ধু লোক তার কাছে ইতর এবং ধান্দাবাজ। সেই লোক এখন বারান্দার এক কোনায় গুম মেরে বসে আছে।

টেবি তখনই এল একঠোঙা সিঙাড়া কচুরি নিয়ে। কাবুল হাসির দিকে তাকিয়ে বলল, কুম্ভকে দাও।

কুম্ভ টেবির দিকে তাকিয়ে বলল, নারে আমি খাব না। তোরা খা।

—আরে খা খা। মাথা গরম করিস না। মাথা গরম করলে কাজ হয় না। এই হাসি, দাও না। তোমাকে দিতে বলছি না।

কুম্ভ দেখল, হাসি দুটো প্লেটে দুটো করে কচুরি একটা সিঙাড়া রাখছে। একটা কুম্ভর দিকে ঠেলে এগিয়ে দিল। সেই এক ভয়ংকর ঘটনায় মাথাকাতা কুম্ভর ফেটে যেন চৌচির হয়ে যায়। বদমায়েশ মেয়েমানুষ, তুই আমার বৌ, না কাবুলের। তার কথায় আমাকে ঠেলা মেরে দিস। প্রায় লাথি মেরেই প্লেটটা ছিটকে ফেলে দিত। কিন্তু তখনই কাবুল প্রায় দৈব বাণীর মতো যেন বলল, আমি'ত আছি। আমাকে বললি না কেন। দু-নম্বরী মাল করাতে চাস, কোম্পানী বসে যাবে, তোর ভয়, সব বলবি ত।

কুম্ভ আর পারল না। চোখে ক্ষোভে দুঃখে জল এসে গেছিল প্রায়। সর্বত্র সে মার খাচ্ছে। ঘরে বাইরে। কাবুল যদি পারে। সে বলল, রাজার বাপের সাধ্যি নেই কারখানাকে বাঁচাতে পারে। ওটাতে কি আছে। ছাপা বার্নিশ কত সেকেলে। দু-নম্বরী মাল লোকে করাবে না'ত, এক নম্বরী করাতে যাবে। তোমার দাদা জানে না, যা ছাপা বার্নিশ তাতে এক নম্বরী মালও দু-নম্বরী হয়ে যায়। খদ্দেররা দায়ে পড়ে এখানে আসে। সস্তায় মাল পাবে বলে আসে। এদিকে গোড়া কেটে আগায় জল ঢালছে শুয়োরের বাচ্চা।

শুয়োরের বাচ্চা কথাটা অতীশকে লক্ষ্য করে। তার দাদাকে নয়। এতেই কাবুল কিঞ্চিৎ খুশী। যাক সুমতি হয়েছে কুম্ভর। সে বলল, নে এবার খা'ত। হাসি তোমার জন্য রেখেছ ত!

—রেখেছি।

কুম্ভর এটাও জ্বালা। কোন মান অপমান নেই। ঠিক নিজের জন্য রেখে দিয়েছে। কেবল খাব খাব করে। দুপুরবেলা স্নানটান করে দুপুরের খাবার খাবি কোথায়, তা না কাবুলকে দিয়ে এক ঠোঙা গরম কচুরি সিঙাড়া আনিয়েছে। আমি কি তোকে কিছু খেতে দি না। তোর নাহলে এত রস।

কাবুল বলল, কিরে খা। তুই না খেলে আমি খাই কি করে। ও টেবি নে, তুই একটা নে। কাবুল নিজের প্লেট থেকে টেবিকে একটা তুলে দিল।

কুম্ভ এখন খাচ্ছে। কচুরিতে কামড় বসিয়ে বলল, তোর দাদাকে বুঝিয়ে বলিস। খুবই ভুল করল। বলিস এগ্রিমেণ্ট আমাকে দিয়েছে ফয়শালা করার জন্য। নতুন বাবুর সেই মুরদটিও নেই। কারখানার লোকেরা সব ক্ষেপে আছে। মাইনে বাড়িয়ে ওভারটাইম বন্ধ করার তালে আছে, ওরা তো নেকু নয় যে ম্যানেজারের ফন্দি ফিকির বুঝবে না।

কাবুলের বলতে ইচ্ছে হল, তুই একটা পয়মাল! কিন্তু বলল না। রাগ করবে। রাগ পড়ে আসছে। পড়ে আসবেই। কুম্ভ আরও সব গড় গড় করে বলার জন্য জল খাচ্ছে। দাঁত ব্যথা-ফেতা কিছু নেই। কাবুল একটু এগিয়ে বসল। বলল, এগ্রিমেণ্ট তোকে দিল কেন!

—এই দেখ না। বলে কুম্ভ উঠে গিয়ে ব্যাগ থেকে এগ্রিমেণ্টের দু কপি বের করল। দেখল কিছু তারপর বাইরে এসে বলল, আমাকে দিয়েছে। পারে নি। ভেবেছিল একাই করবে। দু-চারবার কথা বলে বেপাত্তা। কি করি, এই দেখ না! তবে ভাই আমি চেষ্টা করব। সাধ্যমত করব। সে বলতে গেছিল, এটা নিয়ে ল্যাজে খেলাব, কিন্তু কি ভেবে বলল না। ভেতরের কথা সে কাউকে আর বলবে না। বৌটা যার বিশ্বাসঘাতক, সে আর অন্যকে বিশ্বাস করে কি করে! সবাইকে আপন ভেবে সে ঠকেছে।

কাবুল বলল, তুই পারবি। সেটা দাদা জানে। বোঝে।

—এইত মুশকিল, কাজ করব আমি, বাগড়া দেবে তুমি। আমি ত' মানুষ।

কাবুল চা সিঙাড়া সব খেয়ে ফেলেছে ততক্ষণে। হাসি মেয়েটাকে কাবুলের কোলে দিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল। কুম্ভ গুম মেরে গেল ফের। ওর কোলে দিতে

পারত হাসি। সে তোর কে রে! কাবুল এখন উঠে এসে মেয়েটাকে কুন্তর কোলে ফেলে দিল, নে ধর। বাপ হবি তুই, সামলাব আমি। বেশ মজা।

মেয়েটাকে কোলে নিতেই কি যে হয়ে যায় কুন্তর। কারো ওপর আর কোন যেন অভিমান থাকে না। সে মিথ্যে সংশয়ে ভুগছে। হাসিরানী পায়ে ধরে একদিন বলেছিল, তোমাকে ছাড়া আমি কিছু জানি না। আমার আর কে আছে! বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিল। গরীব ঘরের মেয়ে বলেই এই হেনস্থা। এবং তখন কুন্ত হাসিরানীর মাথা কোলে নিয়ে বার বার চুমু খেয়েছে, অভিমান ভাঙিয়ে বলেছে—তুমি ত বোঝ হাসি, তোমাকে বাদে আমি সর্বহারা। তুমি ছাড়া আমারও কেউ নেই। তারপর দুজনই ফিক করে হেসে দিয়েছিল। আলো জ্বেলে হাসি যাত্রার সখির মতো সাজতে বসেছিল। যখন সব হয়ে যায়, নিশুতি রাত, ঘুম, নাক ডাকিয়ে লম্বা ঘুম। কুন্তর পাশে হাসিরানী। একেবারে খালি গা হাত পা, শরীর ভাঁজ করে পড়ে আছে। সন্তানের জনকজননী হতে গেলে এ-সবই লাগে। কুন্ত সকালে ওঠার সময় চাদরটা শরীরে টেনে দিয়েছিল। বড় ভয়ংকর মনে হচ্ছিল তখন হাসিকে। এরা সবই গিলে খেতে পারে। সুতরাং কুন্ত নিশীথে একরকম, সকালে একরকম, সকালে তার কালীকবচ পাঠ, প্রাতঃস্নান, কালী কলকাত্তাওয়ালির ফটোর সামনে বসে অসুর-নাশিনীর ধ্যান। তারপর, দিগ্বিজয়। আজ তার দিগ্বিজয়ে বাধা পড়েছে। সে যেন হত্যা দিতে এসেছে অসুর নাশিনীর কাছে। সেটা কে? হাসি না বৌরানী! সে কেন জানি বুঝতে পারল, হাসি হলেও নিস্তার নেই, বৌরানী হলেও নেই। কিন্তু সে জানে, কত ধানে কত চাল। সেটাই তার সম্বল।

সেই সম্বল নিয়েই কুন্ত কথা শুরু করল কারখানার কর্মীদের সঙ্গে। কথা-বার্তার সময় সে আর মনোরঞ্জন। সে বলেছে, বেশি লোকের দরকার নেই। কোম্পানীর পক্ষে সে, কর্মীদের পক্ষে মনোরঞ্জন। কথাবার্তা শুরু হল এইভাবে—

—আরে মনোরঞ্জন, এস এস। খবর কি! তোমার বড় ছেলে এখন কি করছে?

—কিছু তো করছে না।

—কিছু না করলে চলবে কেন?

—কোথায় পাবে বলুন।

কুন্তর ঘরে মনোরঞ্জন বাদে এখন কেউ নেই। অতীশবাবুর ঘরে দুজন কাস্টমার। পাশের ঘরে দুজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কাজ করছে। মেশিনপত্র চললে,

এমনিতেই কিছু শোনা যায় না। দুজনের কথা অন্য কেউ শোনার চেষ্টা করছে না। করলেও শুনতে পাবে না। কারণ কুম্ভ প্রত্যেক ঘর থেকে তার ঘরের দূরত্ব এবং ধ্বনিতরঙ্গ কখন কতটা তারতম্য হয় সব মাপজোক করে বসে আছে। কোথা থেকে কতটা শোনা যায় সে জানে। তাকে এজন্য সবসময় সতর্ক থাকতে হয়। সে বলল, রাজার কাছে বলব তোমার ছেলের কথা।

—কুম্ভবাবু।

কুম্ভ চোখ তুলে চাইল।

—আপনি'ত অ্যাগ্রিমেণ্টে রাজি হতে বারণ করেছেন!

—করেছি। দরকার বুঝেছিলাম বলে করেছি। তারপরই কুম্ভ কি বলবে ভেবে পেল না। মনোরঞ্জন মুখের ওপর স্পষ্ট কথাটা শুনিয়ে দেবে সে আন্দাজ করতে পারেনি। সে মনে মনে বলল, আমি কুম্ভকুমার, আমার ডরালে চলবে কেন! ঘাবড়ে গেলে চলবে কেন! সে একটা ফস করে পকেট থেকে সিগারেট বের করে মনোরঞ্জনকে দিয়ে বলল, ধরাও। মনোরঞ্জন তার চেয়ে বয়সে বড়, লম্বা ঢ্যাঙা। শুধু হাড় ক'খানা সম্বল করে কাজ করছে। কুম্ভর হাড় মাস দুই আছে। কুম্ভ প্রবল প্রতিপক্ষ। সুতরাং সেভাবেই বলল, রাজার মেজাজ ভাল না। বড়বাবু কানে কি ফুসমন্তর দিয়েছে, কে জানে। রাজা বলেছেন, মাল না বাড়ালে কোম্পানী বন্ধ করে দেবে। আমি চাইছি আপাতত সেটা বন্ধ করতে। তোমরা মেনে নাও। পরে কত অজুহাত পাবে। যদি দেখ ওভারটাইম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তখন সুযোগ বুঝে কোপ বসাবে।

—দেখুন কুম্ভবাবু, খুব একজন বিবেচক মানুষের মতো সে বলল, ওভারটাইম আছে বলে ছেলে মাগ নিয়ে বেঁচে আছি। না থাকলে শুকিয়ে মরব।

—কেন মাইনে বাড়ছে!

—সেটা আর কত! ওতে হেলপারদের পোষাতে পারে, আমাদের পোষাবে না। আমাদের দিকটা আর একটু দেখুন।

কুম্ভ বলল, এখন আর তা হবে না। তোমাদের কথা দিচ্ছি পরে হবে। অ্যাগ্রিমেণ্ট দু বছরের। দেখই না কি দাঁড়ায়।

মনোরঞ্জন জানে, হেলপাররা একপায়ে খাড়া। আরও যারা বেশি সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে তারাও রাজি। কেবল তার মত মোল্লারা বাধ সাধবে। কিন্তু যদি ছেলেটার কিছু হয়ে যায়, যদি পরে অজুহাত সৃষ্টি করা যায়। কুম্ভবাবু তো বলেই দিয়েছেন, তোমাদের অজুহাতের শেষ নেই। দরকার মনে করলে, এটা

ওটা খারাপ দেখিয়ে যেমন খুশি মাল দিতে পার। বড়বাবুরও বলার কিছু থাকবে না। রাজাকেও কচু দেখান গেল।

মনোরঞ্জন বলল, একটা দিন আমাদের ভাবতে দিন।

একটা দিন পর কুম্ভবাবু এসে অতীশের ঘরে ঢুকে বলল, ওরা রাজি। সুতরাং মিঞা-বিবি যখন রাজি তখন শুভদিন দেখে সেরে ফেলা ভাল।

অতীশের মনে হল লোকটা ভোজবাজি জানে। কুম্ভর মনে হল সে দিগ্বিজয়ী। সে তার মতো করে সই করিয়ে নিচ্ছে। কোম্পানীর কি থাকল সেটা বড় নয়, আসল কথা সে এই কোম্পানীর কত অপরিহার্য মানুষ রাজা এবার ভেবে দেখুক।

অতীশকে খুবই তখন ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছিল। সে ভাবছিল, তার মত অপদার্থ লোক কতদিন এভাবে কাজ চালিয়ে যাবে। কারখানায় এলে নরকে ডুব দিতে হয়, সেটা যদি সে আগে জানত। শীত পার হয়ে গ্রীষ্ম আসতেই সেটা আরও টের পেল অতীশ। কুম্ভ একদিন মুখের ওপরই এসে বলল, দাদা, আপনাকে আর পারা যাবে না। আমরা কত মাইনে পাই খদ্দেররা জানে কেন? আপনি নিজের সম্পর্কে কি ভাবেন! সত্যি কথার ভাত আছে। মর্যাদা আছে। এত কম পাইনে পাই, সেটা বলার দরকার কি! লোকে শুনলে কি ভাবে!

অতীশ কি কথায় কথায় যেন সেদিন একজন খদ্দেরকে কথাটা বলে ফেলেছিল। সে ত জানে না, কুম্ভবাবু অন্যরকম বলেছে। সে বলল, যা পাই তাইত বলব!

—এতে আপনার সম্মান বাড়ল। আপনি এই পেলে আমরা কি পাব, ওরা টের পাবে না। তিনগুণ বাড়িয়ে বলি, সেটা আপনার দিকে চেয়ে, কারখানার কথা ভেবে, রাজার মানসম্মান যায় বলে। আপনি সেটাও বোঝেন না!

অতীশের মনে হল, সে ঠিক ঠিক পৃথিবীর মানুষ না। সে যে পরিমণ্ডল থেকে এসেছে, সেখানে এইসব তাকে শেখানো হয়নি। মাইনের সঙ্গে একটা মানুষের মর্যাদার প্রশ্ন থাকে সেটাও সে ভাল করে ভেবে দেখেনি। চারপাশটা সেই অজানা সমুদ্রের চেয়েও ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে তার। সেখানে জীবনমৃত্যু অহরহ সামনাসামনি হাজির। এখানে জীবনমৃত্যুর চেয়ে আরও বেশি কিছু কঠিন সত্য হাজির। দিন যত যায় আচ্ছন্নতা তার তত বাড়ে।

॥ সতের ॥

তখন দম মাধা দম, পাগলা মাধা দম, পাগল হরিশ নাচছে। ফুটপাথে লাঠি বগলে নাচছে। পালক বাঁধা দম মাধা দমের লাঠি নিয়ে গাজনের মতো শিবের নাচন নাচছে। এক পা সামনে, আবার পেছনে। ঘুরে-ফিরে নাচ। জনগণের মধ্যে তার এই কিম্ভূতকিমাকার নাচ প্রবল হাসির খোরাক জোগাচ্ছিল। সে হাঁকছে দম মাধা দম, পাগলা মাধা দম। নাচতে নাচতে নুয়ে পড়ছে। আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে। পাশে গৌরী সতীবিবি, শিব গৌরীর নাচ দেখাচ্ছিল জনগণকে। এভাবে এই শহরে গ্রীষ্মকাল পার হয়ে যায়। সে তবু নাচে। এই শহরে বর্ষাকাল পার হয়ে যায়, সে তবু নাচে। শরৎ, হেমন্ত আসে সে নেচে যায়। মাথায় পাগড়ি পায়ে কাগজের বেড়ি, হাতে বাঁশি ফুলের মালা, সে নেচে যায়। শহরের গাড়ি যায়, ট্রাম যায় বাস যায় সে নাচে। রাজার বাড়িতে ঘন্টা পেটায় কেউ, সে নাচে। গোলাপের বাগানে বৌরানী ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকে, চোখে-মুখে চাপা হতাশা কেউ টের পায় না। কি এক গোপন দুঃখ বুকে নিয়ে বসে আছে কেউ জানে না। সে নাচে।

ফুলির প্রেমিক আসে না। ফুলি বারান্দার থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুনন্দ খোঁজ-খবর নেয় না। সুনন্দ কোথায় অন্য হীরে-মাণিক পেয়ে গেছে। ফুলি সকালে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। রাতে কাঁদে। কেউ জানে না ফুলি সুনন্দর জন্য কাঁদে।

দাসুবাবু ফুঁসছে। বেটা বাঙ্গাল, নেমকহারাম। ব্যাংকে কাজ পেলি, আর এবাড়ি আসা ভুলে গেলি। এটাও একটা গোপন দুঃখ। সে জোরে বলতে পারে না, তার মেয়েটা শুকিয়ে যাচ্ছে। চোখ-মুখ বসে যাচ্ছে। রাজাকে ধরে কিছু টাকা ধার চাইবে তারও উপায় নেই। আগের দেনা শোধ দিতে পারেনি, আবার তাকে দেবে কেন? সে শাপ-শাপান্ত করছিল রাজাকে, বেজম্মার বাচ্চা বলছিল। সবাই জানে, তুমি কে! তোমার শরীর পোকায় খাবে। এত পাপ সহ্য হবে কেন? সুনন্দ থেকে রাজা, তারপর বৌ-বেটা সবার প্রতি বড় বিদ্বেষ তার। সবাই মিলে তাকে কানা করে দিল! কোন সুখ নেই, স্বস্তি নেই। অভাব থাকলে মানুষের সুখ স্বস্তি কিছুই থাকে না। সে একসময় একজন বড় খেলোয়াড় ছিল, দেখলে কে বলবে!

নধরবাবুর মেয়ে চিনু আবার সেজে-গুজে কলেজ যায়। খোঁপায় বেল ফুলের মালা গুঁজে রাখে। ভ্রূণের খবরটা জানাজানি হয়নি। সে এই পৃথিবীতে কুমারী মেয়ে ফের। বরং রাজা মতিকেই সন্দেহ করেছিল। সুরেনও জানে মতির ওপর রাজার রাগ আছে। কিন্তু বৌরানী মতিকে খুব পছন্দ করে। যতই সন্দ করুক, রাজা বৌরানী না বিগড়লে কারো হিম্মত নেই কিছু করে। তাই নির্বিবাদে মতি সন্ধ্যায় বের হয়ে যায়, সবার শেষে রাত বারোটায় ফেরে। কোনদিন ফেরে কোনদিন ফেরে না। সকাল হয়ে যায়। কখনও কখনও চার-পাঁচ দিন এমন কি মাসের জন্য দেখা যায় মতি উধাও। রাজবাড়ির গেটের খাতায় রাত বারোটায় মতি ঢুকছে, নাম তোলা থাকে না। তখনই দারোয়ান থেকে রাজা জেনে যায় মতি পর্যটনে গেছে।

সুরেন টের পায় সবার আগে। মতি বোন না থাকলে, বাজারের থলে হাতে ছোড়দি নেমে আসবে। ফ্রক গায় দেয়। ফ্রক গায়ে না দিলেই ভাল। বড় ফুলেফেঁপে থাকে। দশজন আকথা কুকথা বলে। এই সংসারটার জন্য তার মায়া হয়। দ্বিজেনবাবু অকালে মারা না গেলে এত হেনস্থা হত না মতি বোনের। মানুষের কপালে কার কি লেখা থাকে কেউ জানে না। দ্বিজেনবাবুর মনটা সব সময় বড় প্রসন্ন থাকত। টাকাটা সিকিটা বখশিশ সে কতবার পেয়েছে। ভাল মন্দ হলে সুরেনকে ডেকে খাওয়াত। এত বড় রাজবাড়িতে দিল বলতে দ্বিজেনবাবুর ছিল। সেই মানুষটা নিশ্চিন্তে স্বর্গ সুখে আছে। একবার ওপর থেকে উঁকি দিয়ে দেখেও না, খুড়িমার চলে কি করে! তখনই সুরেন বোঝে এতে কোন পাপ নেই। বরং মতি বোনকে দেখলেই সে এবাড়িতে বেঁচে থাকতে সাহস পায়। নবর খোঁজ নেই, নব মরেছে কি বেঁচে আছে তার জন্যও সে আর বিচলিত বোধ করে না। বরং সে বুঝেছে, অঙ্কের হিসেবটা গোলমেলে। সময় মতো ধরতে না পারলে এই হয়। এ জন্মটা তো চলেই গেল, আগামী জন্মে সে আর বোকামি করবে না।

সে বাজারে যাবার সময় প্রথম কফটা ফেলল, রাধিকাবাবুর দরজায়। পায়ে পায়ে ঘরে যাক। বিছানায় উঠুক। তারপর মুখে বুকে। পরের পালা, হাবুবাবুর জানালার পাশে। বাতাসে ছড়াক। বড়ই সংক্রামক ব্যাধি। সে মরেছে, সবাই মরুক। কাশছে আর কফ ফেলে যাচ্ছে। তার বড়ই আরাম। কফ ফেলতে পারলেই প্রসন্ন বোধ করে। এবারে কেষ্ট চক্কত্তির দরজায় এই করে সে রাজার ঘরে পর্যন্ত গোপনে কফ ফেলে রাখে। সে কাউকে নিস্তার দেবে না। দুটো ঘর

বাকি, নতুন ম্যানেজার আর দ্বিজেনবাবুর ঘর। সেখানে সে ফেলে না। ওর মনে হয় কোথাও যদি এতটুকু পুণ্য বেঁচে থাকে তবে ঐ ঘর দুটোয় এখনও আছে। সে সেখানে কফ ফেলতে এখনও কেন জানি সাহস পায় না। বড় অধর্ম হবে ভাবে।

তখনও পাগল হরিশ নাচছিল দম মাধা দম, পাগলা মাধা দম। সুরেন দেখল সকাল বেলায় রোদের তাপে আজ পাগলটা, পাশে পাগলিকে নিয়ে নাচছে। শিব গৌরীর নাচ। এই নাচ দেখে সেও কেমন ভেতরে খুশ পেয়ে গেল। এত তাপের সংসার থেকে বের হয়ে এখানে একটু নেচে গেলে কেমন হয়। বাজনা বাজলে, সেও বোধ হয় এক পা সামনে, এক পা পেছনে রেখে ঘুরে ফিরে নাচত। মনে মনে বলল, বড়ই সুখ। আহারের ভাবনা নেই, মৈথুনের ভাবনা নেই, শোওয়ার ভাবনা নেই, ধর্মের ভাবনা নেই। বড় সুখ হে হরিশ তোমার। তোমার এ সুখের কাঙাল আমি। তার চোখ ফেটে জল বের হয়ে এল।

সুরেন একদিন বলেছিল, বেটা পাগল, শুধু নেচেই গেলি!

হরিশ কেমন বোকার মতো তাকিয়েছিল তার দিকে!

—এত নাচে কি সুখ।

—সুখ আছে হে। দেখ না এসে! এই বলে যেন সে করতালি বাজাতে চেয়েছিল।

—বেটা মরবি ফুটপাথে।

মানুষের মরণ গাছে লেখা থাকে না। পাতায়ও লেখা থাকে না। মানুষ মরে ম'রে বাঁচে। রাজার বাড়িতেও সে যায়। লিখে দিয়ে আসে—কিছুই থাকে না হে। গাছ থাকে না, পাখি থাকে না, মানুষ থাকে না। সব মরে যায়। মরে ভূত হয়ে যায়। তুমিও মরে ভূত হয়ে যাবে একদিন। হরিশ যেন নেচে নেচে এই কথাগুলি বলতে চায়। সুরেন তখন বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। সে পাগলটার কাছে গিয়ে বলতে পারে না, মাঝে মাঝে তোর মতো হতে ইচ্ছা যায়। পারি না। সংসার বড় টানে। মরণে বড় ভয়।

তখন বৌরানীর ঘরে মানস।—তোমাকে এখানে না রাখলে কেমন হয়?

মানস বলে, তোমার ইচ্ছে!

বৌরানী হা-হা করে হাসে।—ভয় পেলে না তো?

—ভয় পাব কেন?

—কিন্তু কিছু যে করতে পারছি না। সব খুঁজছি। পাচ্ছি না।

—কি খুঁজছ?

—বারে মনে করতে পারছ না?

—না অমলা।

—সেই চিঠিটা!

মানস সহসা টের পায়, অনেকদিন আগে, যেন জন্ম-জন্মান্তরের আগের কথা। সে বলে, আমি কে?

—তুমি রাজা। তুমিই সব আমার।

—সব ভুলে গেছি অমলা।

—ভুললে চলবে কেন? এতখানি এগিয়ে আর ফিরে যেতে পারি না!

—আমার কিছু আর লাগবে না। রাজেনের স্ত্রী হয়ে আছ তাই থাক।

অমলা বলল, না, সে হয় না।

—কেন হয় না অমলা।

—রাজেন তোমাকে ঠকিয়েছে। আমি রাজেনকে ঠকাতে চাই?

—ওর কি দোষ!

—তবে কার?

—মানুষেরই এটা হয় অমলা। রাজেন ত মানুষ।

অমলা কিঞ্চিৎ মুখ তুলে মানসের দিকে তাকাল। রাজবাড়ির সদরে ঘণ্টা পড়ছে। ডালহৌসি পাড়ায় রাজেন ঠাণ্ডা ঘরে বসে এখনও বোধহয় কাগজপত্র দেখছে।

—তাহলে মাঝে মাঝে পাগল হয়ে যাও কেন?

—মানুষ হয়ে যাই বলে।

—এটা আবার কেমন কথা হল?

—ঠিক কথাই অমলা। যা দেখছি তাতে সত্যিকারের মানুষ ভাল থাকতে পারে না। মাথা ঠিক রাখার কথা না। চারপাশে কেবল দুঃখ।

—চারপাশের দুঃখ দেখ কেন?

—চোখ না থাকলে হত?

—তোমার চোখ দুটো যদি গেলে দি।

—সেটা পারলে খুবই ভাল হত অমলা!

—তুমি জান আমি পারি না। তাই এত সাহস তোমার।

—সাহসের কথা নয়। ইচ্ছের কথা। কোথাও মানুষ স্বাভাবিক আছে বল? মানুষ নরকে ডুবে থাকলে, দুটো একটা মানুষ আর ভাল থাকে কি করে?

—দেখার দোষ।

—তা হবে।

সে চোখ তুলে দেখল। সেই বিশাল লাইব্রেরী ঘর। বাপ ঠাকুর্দা করে গেছে। বিকেলে তার ডাক পড়েছে আবার এখানে। চারপাশে কোন কাক-পক্ষী সাক্ষী নেই। চুলদাড়ি কামায় না. মানস খবর এলেই এই ঘরে তার ডাক পড়ে। স্বাভাবিক কথাবার্তা বলে, অথবা ভয় দেখিয়ে ভাল করে তোলা। অতীশ আসার পর বলতে গেলে সে ভালই আছে। কোথায় যেন এই ভাল হওয়ার সঙ্গে অতীশের সম্পর্ক আছে। বৌরানী বলল, তুমি এভাবে ভাল হয়ে গেলে আমার ভয়।

—ভাল হয়ে যাচ্ছি?

—তাই ত! সবদিন দেখি না। আগের মতো রেলিঙে দাঁড়িয়ে থাক না কেন?—আমার কথা ভেবে কষ্ট হয় না?

—না।

—কিন্তু আমি যে চাই চিঠিটা বের করতে।

—রাজেন চিঠি রাখবে কেন?

—ডুমরার সিং বলেছে, চিঠিটা আছে। রাজেন চিঠিটার কথা জানে না।

ডুমরার? কতদিন পর যেন সেই বিশাল এক প্রাসাদের পাশে আবার এক ঘোড়সওয়ার, পাশে ডুমরার, দু'পাশে ঝাউ গাছ, বড় নদী জলে ছলাং ছলাং শব্দ, এবং নদীর বালিয়াড়ি থেকে ফেরার সময় দুই অশ্বারোহী। তার একজন রাজেন। ডুমরার ছায়ার মতো দীঘির পারে অপেক্ষা করছে।

মানস উঠে দাঁড়াল।—যাই।

—আর একটু বোস।

তখনই অমলা বলল, অতীশকে তুমি কি বলেছ?

—কৈ কিছু না ত।

—ছবি এঁকে দেখিয়েছ?

—আমি দেখাইনি, ওই তুলে তুলে দেখল!

—এই ছবিটা আঁকলে কেন?

সেই ছবিটা, আগুনে ছবি, দাউদাউ করে রমণী জ্বলছে। উবু হয়ে বসে আছে।—ওঃ সেই ছবিটা। কেমন হয়েছে বলত!

—আমি ছবি এখন বুঝি না।

—তুমি এত বুঝতে, একসঙ্গে এত ছবি আঁকলাম। তোমার এত বাহবা ছিল। এখন বলছ কিছু বোঝ না। তারপরই অমলার চোখ দেখে সে কেমন হিম হয়ে যায়। বড় করুণ চোখ। বড় অপার্থিব। এই চোখ দেখলেও মানুষ পাগল হয়ে যেতে পারে। সে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকল।

বৌরানী বলল, তুমি কি সত্যি চাও আমার এই পরিণতি হোক।

—জানি না।

—তোমরা কি মনে কর আমি সত্যি এত খারাপ ?

—জানি না।

—তুমি ভাল হয়ে গেলে কেন ? ভাল থাকলে তোমার মাথা সাফ থাকে। কি করতে কী করে বসবে। কে তোমাকে এমন স্বাভাবিক করে তুলল ?

—জানি না।

অমলার পাশে সেই বড় মারবেল পাথরের দেয়াল। দেয়ালে তার শ্বশুরের তৈল চিত্র। তার নিচে আর দুজন। অতীশ কেন এবাড়িতে এল। অমলা কেমন ক্রমেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। যে মানুষটাকে তার পাগল করে রাখার ইচ্ছা ছিল, না হলে মানুষটা আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে পারে, কারণ বিষয়আশয়ের মমতা মানুষের মধ্যে নরক সৃষ্টি করে থাকে, সেই মানুষটা ভাল হয়ে গেলে ভয়, হয়ত একদিন শুনতে পাবে দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে দরজা খোলা যাচ্ছে না। সেই ভয়ে ভেতরে সিলিং ফ্যান রাখা হয়নি। কড়ি-বরগা নেই ঘরের। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করারও ব্যবস্থা নেই। বাইরে থেকে তালা দেওয়া থাকে। সকালে কেউ খুলে দিয়ে আসে। রেলিং উঁচু করা, ছাদে ওঠার সিঁড়ি নেই। সেই মানুষটা একেবারে নিরাময় হয়ে গেলে যথার্থই ভয়। অমলার এটা বিশ্বাস হয়নি। আজ ডেকে স্বচক্ষে দেখতে গিয়ে বুঝতে পেরেছে, কুমবার মিছে কথা বলেনি। ওর বুকটা কেমন হিম হয়ে গেল। সে বলল, অতীশ তোমাকে কি বলেছে ?

—কিছু বলেনি তো ?

—কোন কথা না ?

—না।

—তাহলে এত স্বাভাবিক হলে কি করে ? না, আসলে তোমার এটাও এক ধরনের পাগলামি !

প্রশ্নের পর প্রশ্ন। সত্যি মানসও জানে না, এটা হল কেন ? অতীশকে

দেখার পর সে স্বাভাবিক হয়ে গেল কেন! সে কি কোন দৈববাণী শুনেছে। অতীশ কি তার হয়ে কোন দৈববাণী করেছিল, না রাস্তায় সেই পাগলাটাকে দেখে ভেবেছে, ঘাটতে গেলে তার চেয়ে ভয়ংকর জীবনের সাক্ষী লোকটা। সে কি বলবে বুঝতে পারছে না। সে কি ইচ্ছে করেই পাগল সেজে বসে থাকে!

বৌরানী ফের বলল, অতীশকে তুমি সাধু সন্ত ভেবে থাক?

—না।

—মহাপুরুষ!

—না।

—অতীশ তবে তোমাকে নিরাময় করে দেয় কি করে?

সেটা সেও ভেবে দেখেনি। তারপরই অতীশের দুটো চোখের ছবি, ভাসতে ভাসতে এগিয়ে এল। কেমন মোহাচ্ছন্ন। ভেতরে বেদনাবোধ বড তীব্র। এই চোখই মানুষকে পাগল করে দেয়। ওর কেন জানি মনে হয়েছিল, অতীশ পাগল হয়ে যেতে পারে। এই চোখ নিয়ে নিষ্ঠুর পৃথিবীতে স্বাভাবিক থাকা সম্ভব না। কেমন একটা মায়া তার জন্মে গেছে অতীশের জন্য। অতীশকে স্বাভাবিক রাখার জন্য সে এখন উঠে পড়ে লেগেছে। এটা যেন তার দায়। সে আজকাল খুব বেশি করে ফুল-ফলের ছবি আঁকছে। জলাশয়ের, শিশুর এবং মানুষের শুভ বোধের ছবি আঁকছে। অতীশ ছবিগুলি দেখলে ছেলেমানুষের মতো উল্লাসে ফেটে পড়ে।

অতীশের জন্য সুন্দর সব ফুল ফলের ছবি আঁকতে গিয়ে নিজের সব ক্ষোভ দুঃখ জ্বালার কথা ভুলে গেছে মানস। অতীশই একমাত্র বলতে পারে, যে মানুষ এত সুন্দর ছবি আঁকে পৃথিবীতে তাঁর আর কি লাগে। আমি মানসদা মানুষের এমন ছবি আঁকতে চাই। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করবেন। এত কথার পর সে আর পাগল থাকে কি করে! সে তার যে সত্য থেকে সরে গেছিল, তা আবার অতীশ ফিরিয়ে দিয়েছে।

—কি কথা বলছ না কেন?

—কি বলব?

—তুমি এই যে ভাল হয়ে গেলে, সব সহ্য করতে পারবে? মনে পড়বে না!

—না।

—তাহলে আমি কেন এত জলে নামলুম। বলেই মানসের জামা খামচে ধরল বৌরানী। আমাকে তুমি এত নিচে নামালে কেন?

—আমি নামালাম ?

—কার জন্য তবে ?

—সেটা আমি ভাবিনি !

অমলা হাউহাউ করে কাঁদতে থাকল। আমার শরীর পেলে রাজেন পাগল হয়ে যায় আর তুমি বলছ, তুমি কি বলছ! তুমি যদি কিছুই না চাও, কালই আমি চলে যাব ?

—কোথায় ?

—যেদিকে দু চোখ যায়। আমার কি দরকার এই বৈভবের।

মানস ঠিক গা থেকে পোকা ঝাড়ার মতো অমলার হাত দুটো ছাড়িয়ে নিল। বলল, পাগলামি কর না।

—অতীশকে কালই আমি চাকরি থেকে বরখাস্ত করব ?

—কেন ?

—তাহলে আবার তুমি ভুলে থাকতে পারবে সব।

—আর পারব না। কারণ আমি জানি, আমার চেয়েও বড় দুঃখ কোথাও অতীশের আছে! কি জানি, জানি না বুঝি না অথচ চোখ দেখে তাই মনে হয় আমার। এবাড়িতে এসে অতীশটাও না আবার পাগল হয়ে যায়। ওর চোখে সেটা আছে। ওর বড় সেবা শুশ্রূষার দরকার।

অমলারও মনে হল কথাটা—মানস ঠিকই বলেছে। অতীশ সব কিছু ভেঙে চুরে দিতে চায়। রাজেনের মুখের ওপর কথা বলে। বাড়ির আদব-কায়দা মানে না। এতদিন ব্যবসাপত্র যেভাবে চলছে সে তা নাড়তে চায়। পাগল ছাড়া এটা কে ভাবে। এত বড় জগদ্দল পাথর টানাটানি পাগল ছাড়া কে করে ?

বৌরানী যেন আর পারছে না। বিরাট কাঁচে মোড়া টেবিল, বাতিদান, লাল নীল রঙের কাঁচের বল, পুরানো বইয়ের গন্ধ সব সরিয়ে দিয়ে সে এবার তার অন্য এক সাম্রাজ্যে পৌঁছে যায়। কাশফুল নদীর চর বড় সাদা ঘোড়া, ল্যাণ্ডোর সেই কোচোয়ান এরপরই এক বিশাল পুরুষের ছবি চোখের ওপর ভাসতে থাকে। সে বলল, তুমি জান, অতীশের জ্যাঠামশাই পাগল ছিল।

—তবে বংশে আছে। মানস চুপ করে কিছুক্ষণ কি ভাবল। শেষে বলল, সোনায় সোহাগা।

—ওর লেখা পড়েছ ?

—মানস বলল, না।

—ওর লেখাতে পাগলের আধিক্য।

মানস এটা শুনে চোখ বুজে ফেলল। সে ইজিচেয়ারে মাথা এলিয়ে দিয়েছে এখন। বৌরানীর মর্জি না হলে সে এখান থেকে ছাড়া পাবে না। নতুন বাড়ির এদিকটায় তুমবার সিং থাকে। কাবুল থাকে। করিডোর দিয়ে ঢুকলে দুদিকে দুটো বড় বারান্দা। এবং যেটা দিয়ে ঢোকা যায় সেটা আর একটা। কুমারদহ থেকে আনা কিছু ছবি এই বাড়ির দেয়ালেও আজকাল সে দেখতে পায়। কোন ছবিটা কোন ঘরে ছিল সে যেন এখনও চোখ বুজলে মনে করতে পারে। রাজেন বিক্রি করেও শেষ করতে পারছে না। একটা দুটো নয়, যেমন যেখানে যত বাগানবাড়ি ছিল, দেওঘর, রাঁচি, পুরী, দেরাদুন, দার্জিলিং, বৃন্দাবন, সব জায়গা থেকে আনা ছবিগুলি ডাঁই মারা, কিছু কিছু বিক্রি করেছে, কিছু কিছু যেখানে ফাঁকা দেয়াল আছে ঝুলিয়ে রেখেছে। এ-বাড়ির রাজারা ছবির সমজদার ছিলেন, গানের সমজদার ছিলেন। এখন সব গেছে। আগে ফুর্তিফার্তা ছিল, সঙ্গে শিল্প বোধ ছিল। এখন রাজেনের শুধু ফুর্তিফার্তাই আছে। বাইরে থেকে ধরা যায় না। অমলার চোখ দেখলে টের পাওয়া যায়। সে বলল, আধিক্য কেন!

বৌরানী বলল, ওকে জিজ্ঞেস কর না?

মানস এবার সহসা কি মনে পড়ার মতো বলল, তাহলে আমি যাই। কাজ আছে।

বৌরানী হাসল। খুব কাজের লোক। নিজের জায়গাটুকু ঠিকঠাক রাখতে পারলে না, এত কাজ করে আর কি হবে! বৌরানী আর আটকে রাখল না। বলল, যাও। তারপরই লাল আলো জ্বলে উঠল, তুমবার প্রায় গড়িয়ে গড়িয়ে ছুটতে থাকল। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে সেলাম দিল।—বাবুকে দিয়ে এস।

মানস বলল, আমি তো ভাল হয়ে গেছি, আর তুমবার কেন?

প্রখর উত্তাপের জন্য এখন পথ জনবিরল। ট্রাম-বাস চলছে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে। দোতলায় মসজিদ, সেখানে মোল্লার আজান। এই আজান শুনলেই ফকিরচাঁদ তটস্থ হয়ে ওঠে—চারুটা গেল কোথায়! সকালে বের হয়, আজানের আগে আগে চলে আসে। আজ আসেনি! ফকিরচাঁদ উঠে দাঁড়াল। খুঁজতে হয়। কপালে হাত রেখে দেখল ট্রাম ডিপোর সামনে ডাস্টবিন। সেখানে অনেকের সঙ্গে চারু উপুড় হয়ে এখনও কি খুঁজছে। খুঁজে খুঁজে কিছু পাচ্ছে না। শুধু কিছু

পোড়া কয়লা বাদে কিছু পাচ্ছে না।, তবু খোঁজে। অবিরাম এই খুঁজে খুঁজে শহরের গভীরে ঢুকতে চায়। ফকিরচাঁদ বলেছে, বড় শক্ত কঠিন। কিছু হবে না। চারু তবু শোনে না। ফকিরচাঁদের রাগ বাড়ে। সে মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। খেতে দেয়নি। না খেলে মানুষের মেজাজ ঠিক থাকে কি করে।

ক্ষোভে দুঃখে বড় বড় সুন্দর হস্তাক্ষরে ফকিরচাঁদ ফের ফুটপাথ ভরিয়ে তুলল। প্রখর উত্তাপের জন্য সামনের বড় বড় বাড়িগুলির দরজা জানালা বন্ধ। ট্রাম ফাঁকা এবং বাসযাত্রী উত্তাপের জন্য কম। সুন্দর হস্তাক্ষরের ওপর কেউ দু দশ পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছে না। রাগটা আরও বাড়ছে। চোখে আগুন। সে তার হস্তাক্ষরের ওপর থুথু ফেলল। তারপর রাগে দুঃখে মাদুরে শুয়ে পড়ল।

চারু আসছে না। ওর গলার আওয়াজ প্রখর নয়। ফকিরচাঁদের মিনমিনে গলার ডাক চারু শুনতে পায়নি। সে নিজেকে খুবই অসহায় ভাবল—এই দুঃসময়ে সে যেন আরও স্থবির হয়ে যাচ্ছে। চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলছে। এত বেলা হল, এখনও পেট নিরন্ন—সামনের হোটেলটাতে গিয়ে দাঁড়ালে চারু কিছু ঠিক পেত। কারণ, সে বুঝতে পারে, শেষ খদ্দের চলে যাচ্ছে। এখন না গেলে আর মিলবে না।

ফকিরচাঁদ অভিমানে শুয়ে শুয়ে কাঁদল। তারপর উঠে দাঁড়াল। খিদে পেলে তার এখন শুধু কান্না পায়। কিন্তু উঠে দাঁড়াতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেল। ফের দুবার চেষ্টা, তারপর লাঠিতে প্রায় ভর দিয়ে হাঁটা। পরে হেঁটে হেঁটে রেস্তোরাঁর সামনে যখন উপাসনার ভঙ্গীতে মাথা হেঁট করে দাঁড়াল, যখন করুণাই একমাত্র জীবনধারণের সম্বল এবং আর কিছু করণীয় নেই এই ভাব—তখন সে দেখল সব সোনা-রুপোর পাহাড় আকাশে। আকাশ গুড়গুড় করে উঠল। মেঘে মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে আর বাতাস পড়ে গেল। দরজা-জানালা খুলে গেল ফের। এবং গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপের পর বৃষ্টির জন্য সর্বত্র কোলাহল উঠছে।

আর তখনই চার্চের দরজাতে শববাহী এক শকট। মাঠের মসৃণ ঘাস মাড়িয়ে সে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। তুলে নেওয়া হচ্ছে মানুষের ইচ্ছার শেষ বাসনাটুকু। অথচ মানুষ যায়, মানুষ আসে। বহুদূর থেকে তারা যেন আসে আবার সুদূর এক পরলোকে হারিয়ে যায়। ফকিরচাঁদ মৃত্যুর গাড়ি দেখে, আকাশে সোনা-রুপোর পাহাড় দেখে তার অন্নকষ্ট ভুলে যায়। তার ইচ্ছে হয় ভাবতে মানুষের যাওয়া-আসা বড় মধুর। ইচ্ছে হয়, বসে বসে অনন্তকাল সে মানুষের মিছিল গুণে যায়। মনে হয় নিজেই একজন সময়ের প্রহরী।

তখনই দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি ওর মুখে মাথায়! প্রচণ্ড দাবদাহের পর শহরের এই বৃষ্টি তাকে বড় কাতর করছিল।

বাস-স্ট্যাণ্ডে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা পর্যন্ত কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করল। কারণ, দীর্ঘ সময় ধরে খরা চলছে। ঘাস মাঠ শুকনো। আকাশ গনগনে। পিচ গলে কাদা। সারা শহরটা গরম তাপে সেদ্ধ। তখন বৃষ্টির ফোঁটা অমৃতের স্বাদ বহন করে। সব মানুষজন ঘরবাড়ি সর্বত্র এক আকাঙ্ক্ষা। আয় বৃষ্টি ঝেঁপে—সবাই যে-যার দরজা-জানালা খুলে অপেক্ষা করছে। ফকিরচাঁদও বৃষ্টিতে ভেজার জন্য খোলা আকাশের নিচে উবু হয়ে বসল।

এবং পাগল যে শুধু হাঁকছিল, 'দম মাধা দম পাগলা মাধা দম, শুধু, হাঁকছিল কে আসবি আয়, সংক্রান্তির মাদল বাজছে আয়—সে এখন কিছু না হেঁকে শান্ত নিরীহ বালকের মত অথবা কোন কৈশোর স্মৃতি স্মরণ করে আকাশের মেঘের খেলা দেখছিল। বড়ই পবিত্র—বড়ই সুখ ভেসে যায়। সে অপলক মেঘের খেলা দেখতে দেখতে বড়ই নিমগ্ন। কোথা থেকে এল ঝড়ো হাওয়া, পাখির পালক নিয়ে উধাও। তার কিছু আসে যায় না। সে কোথাও যেন দূর অতীতের মধ্যে সোনার খনির সন্ধান পেয়ে যায়। ভারি পাগল করে দেছে তারে। লাঠিতে পালক নেই। সে জানেও না প্রকৃতি এই মুহূর্তে তারে বড় নিঃস্ব করে দেছে।

তখনই কে যেন হাঁকল, যায় উড়ে যায়!

কি উড়ে যায়! পাগল চারপাশে তাকায়।

পালক উড়ে যায়। সে দেখল, সত্যি একটা পাখি মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। পালক তার পাখি হয়ে গেছে।—সে কোন্ পাখি তুমি! সংবিৎ ফিরে আসার মতো পাগল পাখির পেছনে ছোটে।

পাগলিনী নিভৃতে ট্রাম ডিপোর বাইরে লোহার পাইপের মধ্যে বসে আকাশে মেঘের ওড়াউড়ি দেখছিল। উথাল-পাতাল হচ্ছে মেঘ। সে দেখছে আর বসে বসে দাঁতে নখ খুঁটছে। কেউ চিৎকার করছে, পাখি উড়ে গেল।

সতীবিবি দু-হাতে খপ করে হরিশের এক পা চেপে ধরল। বলল, দ্যাখ, জল আসছে। ছুটছিস কোথায়?

সে কিছুই শুনছে না। তার যে কখন কি চলে যায়। নিয়ে যায় কে সব! তার এভাবে কতকাল থেকে হরণ করে নিচ্ছে কারা। তার পাখিটাও মেঘ দেখে আকাশে উড়ে গেল। সে পা ছড়িয়ে আবার ছুটতে থাকল।

বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি হচ্ছিল। চারু সেই আবর্জনা ঠেলে ছুটে আসছে। ফকিরচাঁদের কাছে এসে বলল, সব উড়িয়ে দেবে, ভাসিয়ে নেবে। তাড়াতাড়ি কর। সে প্লাষ্টিকের চাদর টেনে তার অমূল্য হাঁড়ি-এনামেলের কড়াই, কাঁথা-বালিশ ঢেকে দিতে থাকল। বৃষ্টির ছাটে সব ভিজে যায়।

বৃষ্টির ফোঁটা বরফের কুচির মতো কালো পাথরে যেন ভেঙে ছিটিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। পথের যাত্রীরা কেউ পথে নেই। সবাই বাস স্টপের শেডে এবং দোকানে দোকানে সাময়িক আশ্রয়ের জন্য ঢুকে গেল।

সুধীর তখন জানালাটা বন্ধ করে দিতে এলে অতীশ বলল, না, খোলা থাক।

—ছাট আসবে স্যার।

—আসুক।

সে সব কাজ ফেলে দূরের আকাশ দেখার চেষ্টা করল। মনের মধ্যে বৃষ্টির সহসা আবির্ভাবে আশ্চর্য সুষমা খেলা করে বেড়ায়। তার মনে হয়, এই বৃষ্টি পৃথিবীর জন্য সবুজ শস্যকণা বয়ে আনে।

কুম্ভবাবু উঠে এসে বলল, দাদা, ভিজে যাচ্ছেন ত।

—একটু ভিজি।

—কি দেখছেন? কাগজপত্র সব ভিজে যাচ্ছে।

অতীশ একটা পাট ভেজিয়ে দিয়ে বলল, ক'দিনের ছুটি নেব।

—কোথাও যাবেন?

—বাড়িতে যাব ভাবছি।

—বৌদির কাজ ঠিক হয়েছে শোনলাম।

নির্মলা কাটোয়ার কাছে একটা স্কুলে কাজ পেয়েছে। এখনও সে ঠিক করতে পারছে না কি করবে। টাকার খুব দরকার। গত মাসে বাবাকে সে টাকা পাঠাতে পারেনি। অক্ষমতা। বাবা কি না জানি ভাবছেন। বাবাকে এই নিয়ে চিঠি লিখতেও সাহস পায়নি। ইচ্ছে আছে, যদি লেখা থেকে কিছু টাকা পায় আগামী মাসে দু-মাসেরটা একসঙ্গে পাঠিয়ে দেবে। টুটুল মিণ্টু তার কাছে থাকবে। টুটুলকে নিয়ে যেতে চাইছে নির্মলা। কোয়ার্টার পাবে। সে শুধু বলল, বেশ জোরে বৃষ্টি নেমেছে।

—বৌদি একা যাবে?

অতীশ বলল, এখনও কিছু ঠিক হয়নি। দেরি আছে।

—এখানে হল না। রাজার চিঠি নিয়ে যেন কোথায় গেলেন ?

—না হল না।

—অতদূরে চলে যাবে, আপনার কষ্ট হবে না ?

কুম্ভর কথাবার্তাই এই রকমের। সহজেই সে মানুষকে আপন করে নিতে পারে। সহজেই সে মানুষকে শত্রু করতে পারে। কিন্তু সে তা পারে না। সে বলল, আপনার বৌদির শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

বৃষ্টিতে পথঘাট ভেসে যাচ্ছে। আর একটু হলেই জল জমে যাবে। কড়-কড় শব্দ করে কোথাও একটা বাজ পড়ল। অতীশ ভয়ে ভয়ে কাঠের ওপর পা তুলে দিয়েছে। সব সময় আশঙ্কা, তার কিছু কেউ কেড়ে নেবে। টুটুল মিণ্টু অত বড় বাড়িটায় এখন কি করছে কে জানে। নির্মলার শরীর দিচ্ছে না আর। একটা লোকের খুব দরকার। নির্মলা ফাঁক পেলেই শুয়ে থাকে। সে বাড়ি থাকলে বুঝতেই দেয় না, নির্মলার মধ্যে কোন অস্বস্তি আছে। ডাকতার দেখছে। পিরিয়ডের গণ্ডগোল, তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা—এবং রক্তপাত গভীর। ওর দিদিও দেখে গেছে একদিন। বলেছে, শীত এলে নিয়ে যাবে হাসপাতালে। মাইনর অপারেশন। ভয়ের কিছু নেই।

বিচ্ছু দুটো আবার না বৃষ্টিতে ভিজে বেড়ায়। দুটোই হয়েছে হাড়ে হাড়ে বজ্জাত। ফাঁক পেলেই টুক করে নেমে যাবে। পাতাবাহারের গাছগুলো পার হয়ে বৌরানীর সখের ভুট্টার জমিটার দিকে চলে যাবে। ক' বিঘে জমিতে লাঙ্গল লাগিয়ে চাষ। গম আর ভুট্টার খেত। বড় বড় পাতা, আর হলুদ রঙের ভুট্টা—বড়ই লোভ। এবং তারপরই পুকুর। পুকুরের জলে গভীর একটা অন্ধকার। এই অন্ধকারটা বাইরে গেলেই তাকে কেন যে তাড়া করে। রাতে সে টের পায়, ঘরের অন্ধকারে সেই কোন ছায়া! যে দেখা দেয় না, তবু পাশে পাশে থাকে। ছায়ার মতো, কিংবা কুয়াশার মতো। তার কি ইচ্ছে কে জানে। অতীশ বলল, কাল আসতে দেরি হবে ?

—তা আসবেন।

পরদিন রাজবাড়ির কেউ কেউ দেখল, অতীশ পুকুরে চান করতে যাচ্ছে। হাত ধরে আছে মিণ্টু। মিণ্টুকে অতীশ সাঁতার শেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। পায়ে পায়ে আসছে টুটুল। সে সবাইকে গর্ব করে বলছে, আমার বাবা। আমার দিদি।

স্থরেন বারান্দায় উবু হয়ে সব শুনছিল। ও বসে বসে কাশছে। সকালের দিকে কাশিটার প্রকোপ বাড়ে। ভোর রাতে ঘাম দিয়ে জ্বরটা সেরে যায়। হালকা লাগে শরীর। এই সময়টায় সে বড় দুর্বল বোধ করে। উঠতে ইচ্ছে হয় না। নড়তে ইচ্ছে হয় না। সংসার রসাতলে গেলেও সে চোখ বুজে পড়ে থাকতে ভালবাসে। কাশি এবং জ্বর প্রবল হওয়ায় আজ অফিস যেতে পারেনি। নতুন ম্যানেজার তার দরজার পাশ দিয়ে কোথায় যাচ্ছে। পাজামা পরনে, গায়ে গেঞ্জি এবং কাঁধে তোয়ালে। খালি পা। এদিকটায় কোনদিন তাকে এভাবে দেখা যায় না। আজ কেন? সে মুখটা লম্বা করে দিল। আর তখনই শুনতে পেল, সেই সুন্দর শিশুটি বলছে, আমার বাবা।

স্থরেন উকি মেরে বলল, না আমার বাবা।

টুটুল ঘাবড়ে গেল। সে দৌড়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমার বাবা।

পাশাপাশি ঘরগুলি থেকে সবাই তখন টুটুলকে ক্ষেপাচ্ছে, আমার বাবা।

যত সবাই বলছে, তত ত্রাহি চিৎকার টুটুলের, না আমার বাবা। কিন্তু এতগুলি মানুষের সঙ্গে সে পারবে কেন। যদি সত্যি তাদের বাবা হয়ে যায়। সে বাবাকে ছেড়ে দিয়ে দু-চোখ দু-হাতে চেপে ধরল। অতীশ বুঝতে পারছে, টুটুল তার কান্না সামলাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি ওকে বুকে তুলে নিয়ে বলল, না না, আমি তোমারই বাবা।

শিশু কি বোঝে [illegible] জানে। মুখে চোখে বাপকে জয় করতে পেরে দিগ্‌বিজয়ের হাসি। তারপরই প্রশ্ন, বাবা ওটা কি?

—ওটা গাছ।

—কি গাছ বাবা?

—কদম ফুলের গাছ।

—আমাকে ফুল দেবে।

—দেব।

ঘাটলায় এসে অতীশ বলল, তুমি এখানে বস। নামবে না কিন্তু। জলে শেকল আছে। বড় একটা শেকল। নামলেই পায়ে এসে জাপটে ধরবে। জলের তলায় নিয়ে যাবে। আমরা তোমাকে আর তবে পাব না।

টুটুল ঘাটলার সিঁড়িতে চুপচাপ বসে থাকল। কালো জল, পদ্মপাতা, দুটো-একটা পাখি, ওপারে কেউ ছিপ ফেলে বসে আছে, ঘাটলায় মানুষজন চান করছে। জলের ওপর শেকলের শুঁড় ভেসে ওঠে যদি—সে চারপাশে বড় বড় চোখে এমন

ভেবে তাকাল। যদি ওটা এগিয়ে এসে সত্যি পা জড়িয়ে ধরে। সে ভয়ে তার দু-পা চেপে ধরে বসে আছে।

তারপরও আশ্বস্ত হতে না পেরে বলল, বাবা ভয় করে।

—ভয় নেই। বোস ওখানে।

মিণ্টু ভাইকে বলল, তুই হাঁদা। বাবা থাকলে শেকল কিছু করে না, না বাবা?

অতীশ মিণ্টুকে ধীরে ধীরে জলে নামাচ্ছে। জলে নামতে তারও ভয়। কোন ফাঁকে তার পায়ে না সাপটে ধরে। অতীশ দেখল, সহসা মিণ্টুর চোখ-মুখ ভারি গম্ভীর হয়ে গেছে। সে বলল. কি হল, নামো, নামো। আমি ত ধরে রেখেছি। ভয় কি।

টুটুলের ভারি মজা। সে বলল, দিদি আমাকে মারে বাবা।

—কবে মারলাম, মিথ্যুক।

অতীশ বলল, ঠিক আছে, এবারে পা-দুটো নামিয়ে দাও। পা-দুটো নাড়। জলে না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার। এই প্রবচনটি অতীশের মাথায় খেলে গেল। সে বলল, কি হল, তুমি পা নাড়াচ্ছ না কেন? হাতে জল টান। এই গ্যাখ জল, সে কিছুটা জলে নেমে তার দুই সন্তানকে সাঁতার বস্তুটি কি তার একটা নমুনা দেখাল। আর তখনই দেখল, মিণ্টু জল থেকে উঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির দিকে ছুটছে। পেছনে টুটুল।

অতীশ হাঁ হয়ে গেল। বাসায় ফিরে দেখল, ওরা কোথাও নেই। নির্মলা রান্নাঘরে মোড়ায় বসে আছে। সে বলল, দেখলে ত কাণ্ড। জল দেখেই পালিয়েছে।

—দেখতে হবে কার ছেলে।

অতীশ বুঝল, নির্মলা ওকে ঠেস দিয়ে কথা বলছে। সে বলল, ওরা কোথায়?

—বাথরুমে ঢুকে আছে ভয়ে।

—এত ভয়!

—নির্মলা বলল, তুমি থাকলেই ভয়। ওদিকে ত তুমি জান না, মিণ্টু ফাঁক পেলেই ভাইয়ের হাত ধরে পুকুরপাড়ে চলে যায়। দুমবার বলেছে, ওখানে নাকি রাজবাড়ির পরীরা থাকে। ওরা পরী দেখার জন্য ঘাসের মধ্যে উবু হয়ে বসে থাকে।

পরীরা তবে রাজবাড়িতেও ঘোরাফেরা করে। পরীরা আকাশে বাতাসে সমুদ্রে সর্বত্র উড়ে বেড়ায়। বুঝি, মাথার মধ্যে, রক্তে নিরন্তর খেলা করে পরীরা। ওদের মতো সেও এক পরীর ঘোরে পড়ে গেছে। কতদূর টেনে নিয়ে যাবে কে জানে।

॥ আঠার ॥

সকালে দৈনিক কাগজের প্রথম পাতায় বর্ষণ এই শীর্ষক খবর এবং ঠিক প্রথম পাতার ওপরে বড় এক ছবি—যুবতী নারী জলের ফোঁটা মুখে চন্দনের মতো মেখে নিচ্ছে। পাশে ফোর্ট উইলিয়ামের ছবি, দুর্গের বুরুজে জালালী কবুতর উড়ছে। নিচে হরেক রকম পাঁচমেশালি খবর। কোথাও মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। চাষাবাদ নিদারুণ মার খাচ্ছে। মাছ আনাজ অগ্নিমূল্য। কোথাও দমদম দাওয়াই চলছে—কাজের কাজ হচ্ছে না। খাদ্যে ভেজালের মতো শস্যদানায় স্বয়ম্ভরতা, কত রকমের হরেক ভোজবাজি—মিছিল, দাঙ্গা রক্তপাত মানুষ ঠিকঠাক বেঁচে নেই।

তারপর সারারাত দিন ধরে বৃষ্টি হয়েছে। কখনও টিপ টিপ, কখনও ঘোর বর্ষণ এবং জোরে হাওয়া বইছিল। ভোরের দিকে হাজির কর্পোরেশনের গাড়ি। গাড়ি থেকে টুপটাপ লোক নেমে গেল। ম্যানহোল খুলে দিল। ট্রামবাস বন্ধ। বৃষ্টির জন্য ছাতার পাখিরা কলকাতার মাঠ পার হয়ে গঙ্গার ওপারে। হুগলী নদীর পাড়ে পাড়ে চটকলের বাবুরা বাগানে তখন ফুলের চারা পুঁতে দিচ্ছে। বুড়ো ফকিরচাঁদ কলকাতার গলা জলে দাঁড়িয়ে তখন আকাশ দেখছে। পাশে চারু। তলপেটে হাত। মাঝে মাঝে কুঁকড়ে যাচ্ছে। পেটে তার ঈশ্বর ছানা পোনার মতো বড় হচ্ছিল। মেঘ গুড়গুড় করতেই সে নেমে আসার জন্য দাপা-দাপি শুরু করে দিয়েছে।

চারুর পাতলা প্লাইউডের ঘর এখন জলের তলায়। মরা ইঁদুর বিড়াল জলে ভাসছে। জানালায় যুবতীর মুখ। বৃষ্টির ঘ্রাণে চোখ অলস। গর্ভবতী হবার বড় সুসময় এটা। বৃষ্টি এলেই মনের মধ্যে সে কথা কয়। শরীর অস্থির হয়ে পড়ে। যে কোন পুরুষই তার এখন কাম্য। সে সকালে বাবা দাস্থবাবুকে বলেছে রাতে আমার জ্বর আসে। আমার ঘুম আসে না। দাস্থবাবু বলেছে, বৃষ্টি বন্ধ

হলেই সেরে যাবে। সব সেরে যায় তখন। দাশুবাবুর মনে হয়েছে, বৃষ্টির পরে তার পাত্রের খোঁজে বের হওয়া দরকার। মানুষ ত গাইবাছুর। সময়ে পোষা জীব না দেখালে মতিভ্রম ঘটতে পারে ভারি দুশ্চিন্তা দাশুবাবুর।

চারু এবং ফকিরচাঁদ সারারাত জলে ভিজেছে। রাস্তার দুপাশে কত ঘরবাড়ি কত মানুষজন, তবু তারা এতবড় কলকাতা শহরে ডাঙা জমির খোঁজ পায় নি। শীতে কাঁপছিল। ডাঙার খোঁজে সারারাত চারু জল ভেঙেছে। অসীম সাহস বুকে নিয়ে সর্বত্র বিচরণ করতে করতে সামনের চার্চ এবং রাজাবাজারের ডিপোতে অথবা লোহার পাইপগুলো অতিক্রম করে অন্য কোথাও……চারু পরিচিত সব জায়গা খুঁজেও সামান্য আশ্রয়ের সংস্থান করতে পারেনি।

ওরা প্রায় সাঁতার কেটে রাস্তার ওপারে গিয়ে উঠতেই দেখল, বৃষ্টি ধরে আসছে। মাথার ওপর গুমোট অন্ধকারটা নেই, কিছু হাল্কা মেঘ বাতাসে ওড়াওড়ি করছে। এ-সময়ে হরিশ রাস্তায় পুরোপুরি নগ্ন। হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে আছে। ভিজে জামাকাপড় গায়ে নেই—সব হাতে। চারু নিজেও পাঁচিলের আড়ালে উলঙ্গ হয়ে শাড়ি থেকে জল নিংড়ে নিল। ফকিরচাঁদ শীতে খুবই কাবু, সাদাটে মুখ, হাতে পায়ে হাজা, কেবল চুলকাচ্ছে।

একটু ডাঙামতো জমিতে দুটো পাইপ। পাগলিটা আরামেই আছে। পাইপের মধ্যে মুখ বার করে বাসি হাড় মাংস চিবুচ্ছে। আর আকাশে মেঘ দেখছিল। রাস্তায় মানুষজনের দুর্গতি দেখছিল। হরিশের ল্যাজে গোবরে অবস্থা দেখছিল। আর হি হি করে হেসে মরছিল।

হরিশ কিছু ভিজা কাগজ তুলে নিয়েছিল জল থেকে। তাই দিয়ে তার সোনার অঙ্গ ঢাকা। সে মুণ্ডমালার মতো তাই কোমরের ধারে ধারে ধারণ করে যেন কত আয়াসে লজ্জা নিবারণ। আকাশে হাল্কা মেঘ দেখে এবং আর বৃষ্টি হবে না ভেবে ঠিক টাকি হাউজের সামনে—তেরে কাটা ধিন এইসব বোলে শরীর গরম রাখার জন্য হামেশাই নাচছে আর চিৎকার করছে, শালো কলকাতা বিষ্টির জলে ডুইবে গেল। পাখি উড়ে গেল বাতাসে। দম মাধা দম পাগলা মাধা দম। শালো সব ভেইসে যাক, ডুইবে যাক জল উঠোক, পাঁচতালা সাততালা বাড়ির মাথায় জল উঠে যাক কলকাতার সে সাক্ষীগোপাল।

তখনই চারু হরিশের পেছনে গিয়ে ঠেলা মারল, বলল, এই ল্যাংটা। হরিশ এই কথায় ভারি আশ্চর্য। একটু চিতিয়ে সে লাঠিটা মাথার ওপর তুলে দিল। কিছু নেই, সব ফক্কা ভোজবাজিয়ালা সে, কত সহজেই ফুসমন্তরে এই কলকাতায়

বানভাসি জল নিয়ে এল। এত গরিমা তার আর চারু কি যে বলে! সে অবিশ্বাসী চোখে মুখে চারুর সামনে কোমর দোলাতে থাকে। এই ছাখে চারু আর পারে না। লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

ফকিরচাঁদ রাজবাড়ির পাঁচিলের নিচে বসে আছে। সে উঠতে পারছে না। থেকে থেকে কাশি উঠছে এবং চোখ ক্রমশ ঘোলা দেখাচ্ছিল। জল কমলে ফের ট্রাম বাস চলতে শুরু করবে অথবা জল আরও হলে এইসব সারি সারি ট্রাম বাস উটের মতো মুখটি তুলে দীর্ঘ উ-টি আছে ঝুলে হয়ে থাকবে। ফকিরচাঁদ শীত তাড়াবার জন্য কাতরভাবে শৈশবের 'অয় অজগর আসছে তেড়ে, ইঁদুর ছানা ভয়ে মরে—ষা শালা বিষ্টি। ইঁদুরের ছানাকে আর বেঁচে থাকতে হচ্ছে না। সেও শহরে একটা নেংটি ইঁদুর। এখন জলে মরে ভূত হয়ে থাকবে। কিন্তু তার তো মরে গেলে হবে না—কত কাজ বাকি, চারু আসন্নপ্রসবা। চারুর সন্তান না দেখে সে মরে কি করে! গাছেরও গাছ থাকে। তার গাছ না থাকুক ফল আছে, ফলের বীজ থেকে অঙ্কুর। কত আশা তার। সে দেয়ালে এ-সময় কি লেখার চেষ্টা করল, কিন্তু বাতাসে আর্দ্রতা ঘন বলে কোন লেখা ফুটে উঠল না।

ক্রমশই মেঘ হাল্কা হয়ে উড়ে যাচ্ছে। কোথায় যে যায়। কোথা থেকেই বা আসে। ভগমানের লীলা খেলাতে রহস্তের অন্ত নাই। ফকিরচাঁদ এখন রোদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। যা সরে যা, যা মেঘ উত্তরে। যা মেঘ দক্ষিণে, আকাশ হাল্কা করে দিয়ে যা।

ফুটপাথ থেকে জল নামতে শুরু করছে। গবগব করে ম্যানহোল দিয়ে জল সেঁধাচ্ছে। ট্রাম বাস ফের চলতে থাকল। মানুষজন বাড়তে থাকল ফুটপাথে। পঙ্গপালের মতো গেছো মানুষের আটি সব এখন আবার রাস্তায়। মনে হচ্ছে আর বৃষ্টি হবে না। কেমন শরৎকালীন হাওয়া। বুড়ো এই সময় চারুকে পাশে নিয়ে বসল। চারু বসতে পারছে না। দু-পা বিছিয়ে বসেছে। বড়ই হেনস্থা করছে পেটটা। ভারি উঁচু। ভিতরে স্বর্ণসুধা। রোদ উঠবে ভেবে সে চারুকে কিছু কথা বলতে চাইল। কতদিন আর সে আছে কে বলতে পারে। সে কিছু আশার কথা বলল। কার কপালে কিডা লেখা আছে কোন মনিষ্যি জানে! তুই যে রাজরানী হবি না অ্যাডাও কেউ হলপ করে বলতে পারে না। তারপর সে গোর্কি বলে একজন মানুষের গল্প করল। তার মায়ের গল্প করল। চারুর কতদিন পর মনে হল দেশে থাকতে বুড়ো মানুষটা ইস্কুলে মাস্টারি করত।

বুড়ো এবার কি ভেবে উঠে দাঁড়াল। চারুর চোখও ঘোলা ঘোলা দেখাচ্ছে।

একটু চা খেলে চারুর শুকনো পরাণডা তাজা হবে। সে থিক থিক কাদা এবং আবর্জনা পার হয়ে এক মগ চা নিয়ে এল। দুজনে খুরিতে ভাগ করে খেল। বৃষ্টি আর আসছে না ভেবে বুড়ো অনেকদিন আগেকার কোন গ্রাম্যসংগীত মিন-মিনে গলায় গাইল। তারপর সে তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ভেতর থেকে একটা ভাঙা এনামেলের থালা বের করে নিল। বসে থাকলে চলে না। খেটে খেতে হয়। এই আপ্তবাক্য সার করে ভিক্ষা করতে বের হয়ে গেল। হোটেলে রেস্তোরাঁয় তার জন্য উদ্বৃত্ত অন্ন থাকে। জীবনটা এভাবে কেটে যাচ্ছে। জীবনটা রাজবাড়ির সদরে ঝোলানো এক হাত গণ্ডারের ছবির মতো—মাথা সব সময় উঁচিয়েই আছে।

কিন্তু কিসে কি হয় বলা যায় না। সমাজের সব ধূর্ত শেয়ালদের মতো মেঘে মেঘে আকাশটা কালো হয়ে গেল। ফের বৃষ্টি—বর্ষাকাল এসে গেল। বৃষ্টি ঘন নয় অথচ অবিরাম। ফকিরচাঁদের বসবাসের স্থানটুকু আবার ভিজে গেছে। হরিশ সতী কেউ নেই। বৃষ্টির ধান্দা দেখে ভয়ে ফের পালিয়েছে। যেমন পালায়, সময়ে অসময়ে ওদের আর দেখা যায় না। কোথায় যে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। ফকিরচাঁদ উচ্ছিষ্ট অন্ন খেতে খেতে হাঁ করে থাকল—আকাশের পরিস্থিতি ভাল না। আজ সারাদিন আবার বৃষ্টি হবে। একটু উত্তাপের জন্যে ফের কান্না পাচ্ছিল। ঠাণ্ডায় মরে পড়ে থাকলে চারুর আর কেউ থাকবে না।

চারু পাচিলের পাশে ফকিরচাঁদকে টেনে তুলল। এই শেষ শুকনো ডাঙা জমি। আর কোথাও নড়বার জায়গা নেই। দুটো কুকুর একটা ভেজা বেড়ালও উঠে এসেছে। কলকাতার বানভাসি জলে বড়ই তারা কাতর। চারুর তলপেট কুঁকড়ে যাচ্ছে এবং ভেঙে যাচ্ছে। চারু নিজের কষ্টের কথা ভুলে গেল। কুকুর বেড়ালের মাঝখানে ফকিরচাঁদকে বসিয়ে রেখেছে। কুকুর বেড়ালের গায়ের ওমে যদি দাদুটা গরম থাকে। ফকিরচাঁদের ঠাণ্ডা তবু যায় না। কাতরায়। বলে, চারু আমারে নিয়ে যা কোথাও। গরম লেপ তোশক দে। আগুন জ্বাল। নালে আমি মরে যাব। তুরে দেখবে টা কে ?

—কোথায় যাবরে! আমার শরীর দিচ্ছে নারে। যুবতী চারু তলপেটে দু-হাত রেখে কথাগুলো বলল।

ফকিরচাঁদ ফের বলল, আমারে কোথাও নিয়ে চল চারু। ভারি ঠাণ্ডা—হি

চারুর মনে হচ্ছিল তখন জরায়ুর ভিতর গাঁইতি মারছে কেউ। সে কথা বলতে পারছে না।

বাস ট্রাম যাবার সময় কাদা জল উঠে আসছে ফুটপাতে। ফুটপাত থেকে ঘোলা জল নেমে গেলে প্রায় ঘন কাদায় থিক থিক করছে। ফকিরচাঁদের এখন উঠে দাঁড়াবার পর্যন্ত শক্তি নেই। সে ক্রমেই স্থবির হয়ে পড়ছে। নড়তে পারছে না, গা হাত পা ব্যথা করছে। ঠাণ্ডায় শরীর অবশ। হিমেল হাওয়ায় তিরতির করে গাছের পাতা নড়ছে।

থেকে থেকে ট্রাম বাস চলছিল এবং ছাতা মাথায় যারা যাচ্ছে তারা ছাতার জলে আরও ভয়াবহ করে তুলছে ফুটপাত। ফকিরচাঁদ বুড়ো বলে তার রাগ হচ্ছে। অথচ কি সুন্দর ছিল তার হস্তাক্ষর, পণ্ডিত ছিল ফকিরচাঁদ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পণ্ডিত তারপর ফকিরচাঁদ পুত্র এবং পরিবারের সবাইকে হারিয়ে দীর্ঘসূত্রতার জন্য ফুটপাতের ফকিরচাঁদ হয়ে গেল।

এখন দিন নিঃশেষের দিকে। জল এখানেও ওঠে আসছে। কুকুর বেড়ালগুলো সময় থাকতেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সাঁতার কাটছে। তাদেরও চাই ডাঙা জমি। পাড়ে যেতে হবে। কুকুর বেড়াল যা বোঝে দাদুটা তাও বোঝে না। চারু ফের দাদুর হাত ধরে জল ভাঙতে থাকল। দাদুকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। কলার খোলার মত জলের ওপর দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সর্বত্র মানুষের ভিড়। পোকার মত থিক থিক করছে। কোথাও সে এতটুকু জায়গা পাচ্ছে না। সামনে পোল, পোলের ওপরে যদি গিয়ে উঠতে পারে। আগে থেকেই সবাই সব টের পায়। গাড়িবারান্দা সব জলের তলায়। মাথার ওপর এক টুকরো ছাদের বড় দরকার। চারু বুঝতে পারছে জায়গা সব গেছে। অগত্যা চারু আর কি করে, টেনে-হিঁচড়ে সেই এক জায়গায় ফিরে আসে।

ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। তখনই চোখে পড়ল একটা চালাঘর। কেউ নেই। কিছু খড়কুটো এবং উচ্ছিষ্ট ভাঙা প্রতিমা। জলে ভিজে জবজবে। তারই আড়ালে ফকিরচাঁদকে নিয়ে ঠেলে তুলল। কি করে এমন একটা জায়গা ফাঁকা রয়ে গেছে বোঝা গেল না। রাস্তার আলো এখন ফকিরচাঁদের মুখে। দাড়িতে বিন্দু বিন্দু জল মুক্তোর অক্ষরের মত। যেন লেখা, আমার নাম ফকিরচাঁদ শর্মা, নিবাস যশোহর। চোখ সেই ঘোলা ঘোলা। কিছু খেলে যদি শরীরে তাপ ওঠে। চারু ঠাণ্ডা অড়হরের ডাল রুটি ফকিরচাঁদের মুখে ডেলা ডেলা গুঁজে দিতে থাকল।

ফকিরচাঁদের চোয়াল শক্ত হয়ে যাচ্ছে। খাবার গিলতে পারছে না। সে সামান্য উত্তাপের জন্য চারুর উরুর মধ্যে হাত গুঁজে দিতে চাইল।

চারু বলল, দাদু তুই ইতর। সর। সর। কে শোনে কার কথা। চারু আর কি করে। ডাকতে থাকল, দাদু। দাদু।

ফকিরচাঁদ ঈষৎ চোখ মেলে তাকাল।

—ভাল লাগছে।

ফকিরচাঁদ বলল, হুঁ।

আর তখনই চালাটা ঝড়ো বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গেল। ফকিরচাঁদ যেন জ্বোর পাচ্ছে। সে বলল, কি হবে চারু!

চারু তাড়াতাড়ি একটু আশ্রয়ের জন্য হোক অথবা ভীতির জন্য হোক উঠে পড়ল। আশ্রয়ের জন্য ফুটপাতের সর্বত্র এমন কি গলিঘুঁজির সন্ধানে সে ছুটে বেড়াতে থাকল। চার পাশে শুধু জল, জলে থৈ-থৈ করছে। ট্রাক বাস সব আবার বন্ধ। কেমন একটা মৃত শহরে সে যেন একা। শুধু জলের আর হাওয়ার তীব্র শিস। ছলাৎ ছলাৎ জলে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। বাড়িঘরগুলো সব যেন দুলছে। চারু ইলিশ মাছ ভাজার গন্ধ পাচ্ছিল। ঠাণ্ডায় বাবুরা ঘরে জাঁকিয়ে বসে আছে। খিঁচুড়ি ইলিশ খাচ্ছে। চারুর বড় ক্ষুধার উদ্রেক হচ্ছে। হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে সে ঢোক গিলল।

আর অধিক রাতে চারু ফিরল নিরাশ হয়ে। তখন তলপেটে ফের সেই ঈশ্বরের কামড়। শরীরটা নুয়ে পড়ছিল। ইতস্তত দূরে দূরে জলের মধ্যে কিছু ট্যাকসি কচ্ছপের মত ভেসে আছে। মানুষ-জন দেখা যাচ্ছে না। দু পাশের ঘর-বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ। চারুর এখন বড় ক্লিষ্ট চেহারা, বড় করুণ। সামনে অপরিচিত অন্ধকার, চার্চের সামনে হেমলক গাছ। লোহার রেলিং টপকে গেলে ছোট ঘর এবং সেখানে কাঠের কফিনটা মাচানের মত করে রাখা। ভেতরে কবরভূমি। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু ডাঙা জমি।

চারু সন্তর্পণে লোহার রেলিং টপকে কাঠের কফিনে ঢুকে সন্তান প্রসব করবে ভাবল। তখনই মনে হল ফকিরচাঁদ তার আশায় বসে আছে। না গেলে বুড়োটা আরও হতাশ হয়ে পড়বে। হতাশ হয়ে পড়লে মানুষের বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না।

চারু ধীরে ধীরে রাজবাড়ির সদর দরজায় ঝোলান এক হাত গণ্ডারের ছবির নিচে এসে দাঁড়াল। ওর বুক বেয়ে কান্না উঠে আসছে। কে বা কারা মায়

ভগবান তার সব সুখ হরণ করে নিল। তবু সে আসছে। তাকে শক্ত হওয়া দরকার। জন্মের পর এই বুড়োটাই তার সম্বল। আর সেই মোষের মত মানুষটা যাকে সে তার সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছিল, যে চুনগলা জল ফেলে ঘুঘু পাখিদের উড়িয়ে দিয়ে গেছে অথচ আর ফিরে এল না।—সদর দরজায় এক হাত গণ্ডারের ছবির নিচে দাঁড়িয়ে চারু কাঁদতে থাকল। বৃষ্টির ঘন ফোঁটা, গাছ-গাছালির অস্পষ্ট ছায়া অথবা সাপ বাঘের ডাকের মত ব্যাঙের ডাক আর নগরীর দুর্ভেদ্য স্বার্থপরতা চারুর দুঃখকে অসহনীয় করে তুলছে। চারুর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। এমনকি কুকুর বেড়ালও এই বৃষ্টিতে বের হচ্ছে না। পুলিশ কোথাও পাহারায় নেই। চারু একা। এত বড় শহরের মধ্যে সে একা, এবং একমাত্র সন্তান যে মুখ বার করার জন্য ব্রহ্মাণ্ডের ভেতর দাপাদাপি করছে। আর তখনই চারু দেখতে পেল সেই পাগল, জনহীন নগরীতে হেঁকে যাচ্ছে দু ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর। পেছনে পাগলিনী। গভীর রাতে আজ দুজনের হাতেই লাঠি। যেন শহরের সব দুষ্কৃতকারীদের খুঁজে বের করার জন্য জল ভেঙে হেঁটে যাচ্ছে। লাঠির মাথায় পালক। চারুর বুকে সাহস জমে গেল।

চারু তাড়াতাড়ি ফকিরচাঁদের হাত ধরে টানাটানি করতে থাকল।—উঠ দাদু উঠ। যাবি। জায়গা পেয়ে গেছি।

তারপর চারু ফকিরচাঁদের হাত ধরে কাঠের দোকানগুলি টলতে টলতে পার হয়ে গেল। ওদের জামা-কাপড় জলে ভিজে সপ-সপ। শীত আরও কনকনে, বাতাস আরও প্রবল। ওরা দুজনেই এবার ঠাণ্ডা থেকে বাঁচবার জন্য নগ্ন হয়ে গেল। রেলিং টপকে গেলেই মানুষের কফিন। তার মধ্যে ঢুকে বসে থাকলে ঝড়ো হিমেল হাওয়া আর দাঁত বসাতে পারবে না। এখন ফকিরচাঁদই সব করছে। কত বড় কথা, তার গাছের গাছ সেই থেকে অঙ্কুর যেন সরলরেখার মত শীর্ণ একটা বরাবর রেখা টেনে যাওয়া। ভারি উত্তেজনা বোধ করছিল ফকির। বংশ রক্ষা হচ্ছে কত তার সুখ এখন। জল ঝড় হিমেল ঠাণ্ডায় সে আর কাবু হচ্ছে না। চারু পাশে একটা খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার ওপরে দেবদারু গাছ, পাশে কবরভূমি, ডাঙা, মাচান এবং আড়ালে-আবডালে চারুর সন্তান প্রসব।

মাচানের নিচে চারু ঢুকে যেতেই শুনল কফিনের ভেতর থেকে কারা যেন কথা বলছে।

—কে? কে! এখানেও বেদখল! ফকিরচাঁদ যুবকের মত রুখে দাঁড়াল।

কফিনের ডালা খুলে একটা কিম্ভূতকিমাকার মুখ উঁকি মারল। সেই পাগলা হরিশ। লম্বা দাঁতটা হিমেল হাওয়ায় আরও লম্বা হয়ে গেছে। তার পাশে আর একটা মুখ। চুল উসকো খুসকো। সতীবিবি যেন উঁকি দিয়ে মনুষ্যের অপোগণ্ডদের দেখছে। তাজ্জব সে। এখানেও দখল নিয়ে কাড়াকাড়ি।

ফকিরচাঁদের মনে হল, মানুষই মানুষের সহায়। সে বলল, তোরা সবাই মিলে চারুকে ধর। চারুর বাচ্চা হবে।

সতী এ-কথায় কোন এক সুদূরের ছবি দেখতে পায়। চারু মা হবে। মা হবার মত মেয়েদের বড় কিছু নেই। ঝড় জলের রেতে মনেই থাকল না মানুষের হারামিপনায় অতিষ্ঠ হয়ে সে পাগল হয়ে গেছে। মস্তিষ্কে পোকা বাসা বেঁধেছে। সে বলল, সর সর। তোরা সরে যা। তোদের দেখলে আমার বমি আসে।

কি করে আর। ফকিরচাঁদ এবং হরিশ হেমলক গাছটার নিচে গিয়ে বসে থাকল। আর সতী চারুকে বগলদাবা করে তুলে নিল মাচানে। মায়ের মত স্নেহ এবং করুণা দু চোখে। সে চুমো খেল চারুর উরুতে।

তারপর কফিনের ভেতর সন্তানের জন্ম হলে পাগলিনী গ্রাম্য প্রথায় তিনবার উলু দিল। সেই শব্দের ঝংকারে মনে হচ্ছিল সমুদ্র কোথাও না কোথাও সৃষ্টি-কর্তার ভূমিকা পালন করে থাকে, মনে হচ্ছিল এই সংসার হাতি অথবা গণ্ডারের ছবির মধ্যে কখনও লুকিয়ে থাকে। শুধু কোন সৎ যুবকের সংগ্রামের প্রয়োজন। উলু শুনে পাগল শেষ রাতের অন্ধকারে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, কে আসবি আয়, সংক্রান্তির মাদল বাজছে আয়। তখন ফকিরচাঁদ ধূসর অন্ধকারে সুন্দর হস্তাক্ষরে শিশুর নামকরণ করে অদৃশ্য এক জগতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল।

ঠিক তার দুদিন বাদে এক বিকেলে অতীশের ফোনটা সহসা কেমন পাগলা ঘোড়ার মত বেজে উঠল। সুধীর চা রেখে গেছে। একগাদা চালান সই বাকি। চা খেয়ে চালানগুলি সই করবে ভাবছিল—তখনই ফোন। সে ফোন নিজে তুলল না। কারণ ঠিক এ-সময়ে শেঠজী ফোন করে থাকে। ফোনে তাকে জ্বালায়। একবার ধরলে আর ছাড়তে চায় না। সে বেল টিপল এবং সুধীর এলে বলল, দেখত কে ফোন করছে। শেঠজী হলে বলবি, বাবু খাচ্ছেন। পরে করবেন।

সুধীর বলল, বাবু, মেয়েছেলে কথা বলছে।

মেয়েছেলে কে হতে পারে। সে চাটা রেখে ফোন তুলে বলল, হ্যালো।

—তুই কোথায় ছিলি। ফোন কে ধরেছিল!

—বৌরাণী।

—হ্যাঁ। তোমার মুণ্ডু।

—কি খবর? ফোন সুধীর ধরেছিল। চা খাচ্ছিলাম।

—সুধীরটা আবার কে? আমাকে মেয়েছেলে বলে কেন?

—বেয়ারা।

—তুমি আস্ত একটা বেয়াড়া মানুষ। তোমাকে নিয়ে অনেক ঝঞ্ঝাট। অতীশের মুখটা কেমন কাল হয়ে গেল। সে এত খাটছে, এত দৌড়ঝাঁপ করছে, কোটা, ইম্পোর্ট লাইসেন্স বাড়াবার জন্য কারখানার উন্নতির জন্য, অথচ কিছুই করতে পারছে না, সবাই আশা দেয়, আশা মত সে ভাবে, এবারে ঠিক লাইসেন্স আসবে, কিন্তু এত-কম কেন? যা দরকার তা পাওয়া যায় না কেন? কুম্ভ বলেছে, আমাকে ভার দিন, দেখুন সব হবে, আপনি পারবেন না! সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না দাদা।

—এই তুই কি কালা

—না···মানে······।

—শোন কর্পোরেশনের লোকটাকে ফিরিয়ে দিস না। ওর পাওনাটা দিয়ে দিস।

সে বুঝতে পারছে, বৌরাণী গোপনে তাকে জানিয়ে দিচ্ছে সব। হেলথ লাইসেন্স ট্রেড লাইসেন্সের বাবদ কোন ঘুষ সে দেয় নি। বলে দিয়েছিল, ঠিক আছে নতুন করে অ্যাসেসমেণ্ট করুন। যা হবে তাই দেব। তারপরই বুঝতে পারল, কে যেন অলক্ষে বলছে, এটা তোমার বাপের টাকা, তুমি দেবার কে হে। নতুন করে অ্যাসেস করালে, হাজার দেড় হাজার টাকায় গিয়ে দাঁড়াবে। সেখানে আড়াইশ টাকার প্যাকেট দিলে ঝামেল চুকে যায়।

সে বলল, দেখি।

—লক্ষ্মী ছেলে ওটা দিয়ে দে। সব কাজেই আজকাল ঘুষ দিতে হয়। তুই ত নিচ্ছিস না। কাজ উদ্ধারের জন্য দিচ্ছিস।

সে আবার বলল, আসুক তো ফের। তারপরই কেন জানি অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করে। সে বুঝতে পারে তাকে দিতেই হবে। কিন্তু না দিলে কেমন হয়, দেখা যাক না, কত দূর গড়ায়। শেষ পর্যন্ত সে দেখবে। এবং তক্ষুনি এক

নিদারুণ ছবি চোখে ভেসে ওঠে। এই কলকাতায় এসে সে এটা আরও বেশি দেখছে। রাস্তাঘাটে সে দেখছে, অসংখ্য আশ্রয়হীন মানুষ। সন্তান-সন্ততি নিয়ে প্লাইউডের বাক্সে তারা বাস করছে। ঠিক মিণ্টু টুটুলের মত শিশুরা হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে। অন্নহীন হাহাকার মুখ। বাপেরা আসছে মুখ কালো করে, মায়েরা পচা দুর্গন্ধযুক্ত আঁশ জড় করে সেদ্ধ করছে। পচা আনাজপাতি সেদ্ধ করছে। যেতে যেতে সে তখনও দাঁড়িয়ে গেছে। ভেতরে এক কঠিন অপ্রত্যাশিত ভয় নাড়া দিয়েছে তখন।—যেন সেই দুরাত্মা, তাকে শেষ পর্যন্ত একটা ফুটপাথের মানুষ বানিয়ে ছাড়বে।

আসলে অতীশ নিজেকে নিজে ভয় পায়। এবং ভয় পায় বলেই সে তখন খুব সংযত গলায় কথা বলে। সে তার নিজের জন্য ভাবে না। দিন যত যায় তত মনে হয়, দুই শিশু তার পায়ে পায়ে হাঁটছে, বড় হচ্ছে। বাবা তাদের জন্য নিয়ে আসবে একটা এলিস-ইন-ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড। সেখানে গাছ, গাছের নিচে প্লাইউডের সংসার, উস্কখুস্ক মুখে এক দীর্ঘকায় যুবক দাঁড়িয়ে আছে, ভাবলেই বুকে কি যেন নড়েচড়ে ওঠে।

—ফের আসুক না আসুক, তুই কুম্ভকে দিয়ে টাকাটা পাঠিয়ে দিস।

তার কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। তবু কেন যে বলল, আচ্ছা।

সঙ্গে সঙ্গে তার মগজের মধ্যে কে নৃত্য করতে থাকে। অট্টহাসি শুনতে পায়। এবং সেই দুর্গন্ধ। আজ আবার তাকে একগাদা ধূপকাঠি পোড়াতে হবে। সে তলিয়ে যাবে, তলিয়ে যাচ্ছে, সে এ-সব পারবে না বলে ইস্কুল ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল। অদৃশ্য দুরাত্মা তাকে দিয়ে ঠিক সেই কাজ করিয়ে নিচ্ছে। সে যেখানে, দুরাত্মাও সেখানে।

বৌরাণী ফের বলল, কদিন ছুটি নে।

সহসা এমন কথায় অতীশ শঙ্কা বোধ করল। চার্জ কি তবে বুঝিয়ে দিতে হবে। তারপর ছুটি, তারপর এসে দেখবে কুম্ভ তার চেয়ারে বসে কাজ করছে। কুম্ভ কি অত দূর যাবে—কি জানি, তার হাই উঠল। পরিচিত মানুষদের ছবি চোখে ভেসে উঠল কিছু। কার কাছে যাওয়া যায়।

বৌরাণীর আবার গলা পাওয়া গেল। ভারি সরল মেয়ের মত বলছে, পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে আমার সঙ্গে কদিন থাকবি। কেমন।

অতীশ কথাটাতে খুব হতভম্ব হয়ে গেল। নির্মলার শরীর খারাপ যাচ্ছে। রোজই আশা করে রাতে নির্মলা ও-ঘর থেকে চলে আসবে। কিন্তু আসে না।

শরীরের মধ্যে কি যে থাকে। চোখ জ্বালা করে। তেষ্টা পায়। জানলায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে শীত গ্রীষ্মের জোনাকি উড়তে দেখে। নির্মলার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। নির্মলার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পায়। কত সহজে নির্মলা ঘুমিয়ে পড়তে পারে। সন্তর্পণে হাত ধরতে চায়। কিন্তু কোথায় যেন বাধে। সে পারে না। অমলা কি বুঝতে পেরেছে, শরীরে তার হাহাকার জমেছে। সে কি জবাবে বলবে ভেবে পেল না। ফোন হাতে নিয়ে বসে থাকল।

—হ্যালো হ্যালো।

অতীশ শুকনো গলায় বলল, হ্যাঁ বল।

—ভয় পেয়ে গেলি বুঝি। আমি তোকে খেয়ে ফেলব ভাবছিস।

—না মানে, নির্মলার শরীরটা ভাল না অমল।

—ওকে নিয়ে কোথাও থেকে ঘুরে আয়। ডাল্টনগঞ্জ যাবি। ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ওখানে আমাদের একটা বাংলো আছে, কোন অসুবিধা হবে না।

এত টাকা অতীশের নেই। সে বলল, এখন এত দূরে যাওয়া সম্ভব হবে না।

—তোর ছেলেটা খেতে ফড়িং ধরে বেড়াচ্ছিল। আমাকে দেখে কি হাসি। তোর ছেলেটাকে আমাকে দেনা। ফিরে দিবি।

অমলার আজ হয়েছে কি। এক কথা থেকে আর এক কথা। সে বলল, নিও।

—ঠিক কথা দিচ্ছিস।

অতীশ বলল, একদিনেই পাগল করে দেবে। যা ছেলে।

তারপরই খুব গম্ভীর গলা শুনতে পেল বৌরাণীর!—শোন কমলা আসবে। কাল রাতে তুই খাবি আমাদের সঙ্গে। একা আসবি না কিন্তু। একা এলে ঢুকতে দেব না। তোর বৌকে আনবি। বাচ্চা দুটোকে আনবি। প্রাণ খুলে একটু আদর করব। আমার তো কেউ নেই। কমলা আছে আর তুই আছিস। রাজেনের আত্মীয়েরাও আমাকে ডাইনী ভাবে রে। শেষের দিকে অমলের কণ্ঠস্বর কেমন ধরে আসছে মনে হল অতীশের।

অতীশের কেন জানি ভারি কষ্ট হল অমলের জন্য। সেই বিরাট প্রসাদোপম বাড়ি, সামনের দীঘি, ঝাউগাছ, নদীর চর এবং কাশফুলের কথা মনে হয়। জ্যোৎস্না রাত, বিশাল ছাদ, কিছু বালিকার ছুটোছুটি, লুকোচুরি খেলার মধ্যে তার এক সময় স্বপ্নময় দিন গেছে। নতুন জায়গা, অপরিচিত মানুষজনের মধ্যে দুই

বালিকা অমল কমল তাকে ভারি আপন করে নিয়েছিল। সে তবু রাতে জ্যাঠামশাইর পাশে শুয়ে মার জন্য কাঁদত। ছেলেবেলা মা বাদে মানুষের আর কিছুই থাকে না বুঝি। অথচ এক বছরের ওপর হয়ে গেল, সে বাড়ি যায়নি। মাকে ছাড়া কোথাও এক রাত থাকতে তার ছেলেবেলাতে কত কষ্ট হত। অথচ তারপর নিরুদ্দেশ, কেউ জানে না কোথায় সে। বনি এসে জীবনে আর এক নতুন রহস্য গড়ে দিল। তার মনে হয় এভাবে মানুষ এক জগৎ থেকে আর এক জগতে নিরন্তর সরে যায়। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কেউ কেবল ডাকে। সে কখনও জননী, কখনও জায়া, এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তে। নতুন জগৎ, নতুন চমক, নতুন আকর্ষণ। মানুষ এক দণ্ডের জন্য এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না।

অমলা বলল, কথা বলছিস না কেন?

—না ভাবছিলাম...

—কি এত ভাবিস! তুই নাকি রাতে কি সব করিস?

—কি করি আবার।

—মানস বলল, ধূপকাঠি জ্বালিয়ে বসে থাকিস!

—ওটা আমার হয়!

—কেন হয়?

—কেন হয় জানি না।

—তোর জ্যাঠামশাইর মতো কিন্তু হয়ে যাস না।

অতীশ সরল বালকের মতো হেসে দিল। বলল, তোমার ভয় করে!

—আমার ভয় কি! আমি তো কাউকে পরোয়া করি না। রাজেনকেও না। মানসকেও না। তারপরই কেমন ছুম করে বলে দিল, আমি মা হতে চাই অতীশ। আমার কবে থেকে সেই ইচ্ছে। তুইতো জানিস।

অতীশের শরীরটা কাঁটা দিয়ে উঠল। সেই শ্যাওলা ধরা ঘর এবং সেই অন্ধকার এক মরীচিকার মতো, যেন সে ভিতরে ডুবে গেলে প্রথম পাপবোধের কথা এখনও মনে করতে পারে। ঘর থেকে বের হয়ে তার মনে হয়েছিল, সে সাংঘাতিক একটা পাপ কাজ করে ফেলেছে। সেদিন সে একা একা নদীর চরে হেঁটে বেড়িয়েছিল। ওর মনে হয়েছিল, বাড়ি ফিরে গিয়ে যদি মাকে আর দেখতে না পায়। ঈশ্বর বিশ্বাস ছিল তখন খুব বেশি। তিনি রাগ করে যদি মাকে নিয়ে যান। যদি গিয়ে দেখতে পায় মার শরীর সাদা চাদরে ঢাকা। সারাদিন সে

ভীতু বালকের মতো পালিয়ে বেড়িয়েছিল। অমলা কমলা ডেকে ডেকেও তার সাড়া পায়নি। সে পাগল জ্যাঠামশাইর হাত ধরে নদীর পাড়ে নেমে গেছিল। বার বার বলছিল, ভগবান আমি আর করব না। আমি ভাল হয়ে থাকব। তুমি আমার মাকে ভাল রেখ। এখন তার আর সেই ঈশ্বরও সম্বল নেই। বড় হয়ে উঠতে উঠতে পরলোক, দেবদেবী ধর্মশাস্ত্র সব মনে হয়েছে তার বানানো কথা। ভয় থেকে সব ঋষি মহাঋষিরা মানুষের জন্য নানারকমের শেষ আশ্রয় বানিয়ে রেখে গেছে। ঠিক তার লেখার মতো, মনে যা আসে, নানারকমের ছবি, অর্থাৎ সে ভিতরে ডুব দিয়ে যা দেখতে পায়, তার কথা লেখা হয়ে উঠে আসে। সেইসব দেবদেবীরাও মানুষের কল্পিত পৃথিবী। তাকে সে গ্রাহ্য করে কি করে।

অতীশের পলকেই এসব মনে চলে আসে। ভুলেই যায় সে কারও সঙ্গে কথা বলছে। আবার হ্যালো, হ্যালো।

—হ্যাঁ আমি।

—তুই কি মাঝে মাঝে মরে যাস।

—তাই বলতে পার।

—আমার মা হওয়ার ব্যাপারটা এত লঘু করে দেখছিস কেন ?

অতীশ কি বলবে! ফোনে এসব কথা বেশি না বলাই ভাল। সে বলল, তুমি তো রোজই আমার বাড়ির পাশ দিয়ে তুমবার সিং-এর সঙ্গে গোয়ালবাড়ির দিকে যাও। কৈ একবারও তো এত বড় সমস্যার কথা তোমার চোখ মুখ দেখে আমার মনে হয় নি। একবারও ডেকে কথা বলনি।

—তুই রাজবাড়িতে একটা চাকর। একথা ভুলে যাস কেন ? তোর বাসার দিকে তাকাব, কথা বলব এত সাহস হয় কি করে!

তখনই মনে হল, সত্যি সে একজন ক্রীতদাস প্রায়। তার বাড়ির পাশ দিয়ে বৌরাণী অথবা রাজেনদা গেলে সে নিজেকে আড়াল করে রাখে। যেন সে বাড়িতে নেই। তারা ডাকেও না। বরং ওরই উচিত দেখতে পেলে ছুটে যাওয়া। অন্য আমলাদের মতো দেখা হলেই হাত জোড় করে গড় হওয়া। সে সেটা পারে না বলেই যতটা পারে এড়িয়ে চলে। একবার বাড়ি ফেরার সময় দেখেছিল, রাজার গাড়ি বের হয়ে যাচ্ছে। দু পাশে যারাই রয়েছে হাত জোড় করে আছে। এমন কি ছোট ছোট শিশুরাও। সেখানে সে মিণ্টুকেও দেখেছিল। রাজার গাড়ি গেলে বাড়িতে এই নিয়ম। ছোট্ট মেয়ে মিণ্টু, যার

কচি কাঁচা দাঁত, যে ভাইয়ের হাত ধরে শুধু গাছপালার মধ্যে আমলকীর বনে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে, সেও সবার মতো হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। আর তাতেই ওর পায়ের রক্ত মাথায় উঠে যায়। ভারি অপমান বোধ করে সে।

সে মিণ্টুকে বলেছিল, এস। মিণ্টু বাবাকে দেখেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, বাবা বাবা, রাজার গাড়ি। পাশে টুটুল। মিণ্টু টুটুলের হাত ধরে হাত জোড় করা শেখাচ্ছিল। সব ওর চোখে পড়েছে। এবং সে অন্য দিনের মতো দু'জনের কাউকেই বুকে তুলে নিতে পারে নি। অপমান বোধে তার কান মাথা ঝা ঝা করছিল। সে শুধু বলেছিল, এস। কথা আছে। কিছুই বোঝে না শিশুরা। তারা দেখতে পায় তাদের এমন সুন্দর বাবা কেমন গুম মেরে আছে। ভয়ে ভয়ে পায়ে পায়ে ওরা গুটি গুটি হেঁটে আসছে। তারপরই যা হয়ে থাকে, শিশুদের মায়া অতীশের বুকে কেমন ঝড় তুলে দেয়। শিশুরা তাকে ভয় পাচ্ছে। যেন এর চেয়ে বড় অপরাধ কিছু নেই। ঝাঁপিয়ে সে ওদের বুকে তুলে নিয়ে বাসায় ঢোকার সময় বলেছিল, যখন তখন এ-ভাবে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকবে না। আমি এতে কষ্ট পাই।

টুটুল বাবার গালে চুমু খেয়ে বলেছিল, আর কব্ব না। শিশুও বোঝে বিষয়টা। অথচ সে বোঝে না, সে ভুলে যায় সব। সে বলল, আর কিছু বলবে অমলা!

—আমার খুশি বলব কি বলব না। তুই ফোন ধরে বসে থাক। যখন ঠের আমি এবার থেকে তোর সঙ্গে কথা বলব। তারপরই হাসতে হাসে টা চুরি স যায়! তোর খুব অহংকার না রে!

—কিসের অহংকার অমল!

—আছে। আছে। আমি সব বুঝি। তুইও একটা স্বৈরাচারী। যা ভাবিস তাই করিস। এক চুল নড়তে চাস না। শোন, তারপর যেন উপদেশ দেবার মতো বলল, আমরা সবাই তারের খেলা দেখাচ্ছি। যে কোন মুহূর্তে পড়ে যেতে পারি। তবে এত ভেবে মরব কেন রে! আমরা সবাই তারের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। তারপরই খুট শব্দ। অমল ফোন কেটে দিয়েছে।

॥ উনিশ ॥

ফোন ছেড়ে দেবার পরই অতীশ ঘোরের মধ্যে পড়ে গেল। এতক্ষণ ফোনে কি কথা হয়েছে বৌরাণীর সঙ্গে তার একটা কথাও মনে করতে পারছে না। কেবল কোন সুদূরে একটা বড় কাঠের ঘোড়া দেখতে পাচ্ছে। সেই অতিকায় কাঠের ঘোড়া ক্রমে বড় হতে হতে আকাশ সমান উঁচু হয়ে গেছে। সেই ট্রয়ের ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে সামনে। শৈশবে এই কাঠের ঘোড়া পেলে, তার আর কিছু লাগত না। শিশু বয়স পার হলে কেউ তার কাঠের ঘোড়াটা কেড়ে নিল। তারপর কাঠের ঘোড়া না থাকলেও সে স্বপ্ন দেখত ঘোড়াটার। তারপর সপ্তম অথবা অষ্টম শ্রেণীতে আবার কাঠের ঘোড়াটা এসে গেল। ট্রয়ের ঘোড়া, হেলেন অফ ট্রয়। আশ্চর্য এক দেশ ট্রয় নগরী। রাজবধূর নাম হেলেন। কেমন স্বপ্নময় জগৎ। তরবারি, রথ, লোহার বর্ম, প্রায়ই মনে হত, সে সেই মহাযুদ্ধের এক সৈনিক। হেলেনকে আবার সে যেন উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনছে। সেই থেকে মাঝে মাঝে স্বপ্নেও দেখত কাঠের ঘোড়াটাকে। তখন তার জীবনের সুষমা বলতে সব কিছু সেই কাঠের ঘোড়া। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তাও হারিয়েছে —হিজিবিজি হয়ে গেছে সব। কি করে যে সব হয়ে যায়, কত সব গোলমেলে তুমি তো অথবা কখনও মনে হয়েছে বনি তার সেই হেলেন, তাকে কেউ তার দিকে যাও। কে চুরি করে নিয়ে গেছে। তারপর সব কেমন আবার হিজিবিজি, সে আমার মনে ছেড়ে নতুন অন্য এক ট্রয় নগরীতে প্রবেশ করেছে। কি হবে —না।

তখনই মনে হল, ফ্যাক্টরির মধ্যে কিছু সোরগোল। সুপারভাইজার ছুটে আসছে। ধরাধরি করে কাউকে বাইরে এনে মাথায় জল ঢালছে। তার হুঁশ ফিরে আসে। সুপারভাইজার বলছে, স্যার মাধব বমি করছে।

অতীশ বলল, বমি করছে কেন?

তখন কর্মীদের বেশ একটা বড় জটলা, ওরা হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিয়েছে গেটের সামনে। সে বুঝতে পারছে না কি ব্যাপার। কোন দুর্ঘটনা হতে পারে। সেজন্য গণ্ডগোল।

মনোরঞ্জন বলল, হাসপাতালে পাঠালে ভাল হয়

—কি হয়েছে

—রক্তবমি। কাশতে কাশতে হয়েছে।

—ওকে আগেই বললাম এক্সরে কর। খুক খুক কাশি, জ্বর ভাল না।

মনোরঞ্জন হাসল। ঠোঁটে বিদ্রূপ। অতীশ সেটা খেয়াল করেছে। সে বলল, এখানে এনে লাভ কি। আমি এর কি বুঝি! ই এস আই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও।

আসলে সে ভয় পেয়ে গেছে। বাতাসে জাবাণুরা ঘোরাফেরা করে। নিশ্বাস নিতে পর্যন্ত ভয় করছিল তার।

কিছুটা বলির পাঁঠার মতো মাধবকে ধরে এনে ওর অফিসের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেন সব কিছুর জন্য দায়ী অতীশ। এই যে রাজরোগ তার মূলে সে, শোষণের ক্ষেত্র তৈরি করছে সে, বীজ বপন করছে সে। এখন সে না সামলালে কে সামলাবে। সে বলল, কুম্ভবাবু তো নেই। ও আসুক। আপাতত তোমরা ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। বলে সে দশটা টাকা ক্যাশ থেকে বার করে মনোরঞ্জনের হাতে দিল।

মনোরঞ্জন টাকাটা মেলে দেখল। চলবে কিনা, কারণ সর্বত্র জাল কারবার, কাজেই বিশ্বাস করা কঠিন, এবং যখন রিকশা করে নিয়ে চলে গেল, অতীশ কেমন কিছুটা হাল্কা বোধ করল। এতক্ষণে মনে হল, মাধবকে সে একটা কথা বলতে ভুলে গেছে। তারপরই ভাবল কথাটা কি, কথাটা কি হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়ছে, ছেলেবেলা মাধবকে কেউ কাঠের ঘোড়া কিনে দিয়েছিল কি না! সে কাঠের ঘোড়া বগলে নিয়ে হেঁটেছিল কিনা। তারপর কেউ সেই কাঠের ঘোড়াটা চুরি করেছিল কিনা! এবং কে সেই কাঠের ঘোড়া বার বার চুরি করে নিয়ে যায়! কিন্তু পরে মনে হল, এ-সব প্রশ্ন করলে তার মাথা খারাপ আছে ভাবতে পারে। অথবা বলতে পারে, স্যার ঘোড়া তো আপনারাই চুরি করেছেন।

কুম্ভ ফিরে এসে যেই শুনল, অমনি ফায়ার! দশটা টাকা দিলেন! একটা ব্যাড প্রিসিডেন্ট তৈরি করলেন।

—তা ছাড়া কি করব!

—জানেন না, ই এস আই আছে। ই এস আই সব করবে।

—জানি।

—তাহলে আমরা খরচ করব কেন! পাবলিক মানি আপনি খুশিমত খরচ করতে পারেন না।

—এ সময়ে এতটা দেখলে হয় না।

কুম্ভ বলল, যা খুশি করুন। আপনার পাঁঠা লেজে কাটেন ঘাড়ে কাটেন কারু কি দেখার আছে। দশটা টাকা জলে ফেললেন।

অতীশ কেমন একটু মাথা গরম করে ফেলল, আপনারা কি ভাবেন কুম্ভবাবু, এমন অসময়ে কিছু দিলে কোন ক্ষতি হয় না।

—জলে গেল আর কি! আগুনে পুড়িয়ে দিলেও যা এও তাই। আপনি ভাবছেন দশ টাকায় রোগ সেরে উঠবে।

—তা উঠবে না।

—তবে। দশটাকায় যখন রোগ সারবে না, দশটাকায় যখন বাঁচানো যাবে না তখন আপনার জেনে শুনে কোম্পানির টাকা নষ্ট করা ঠিক হয় নি।

আসলে কুম্ভ চায়, যে কোন লেজ ধরে ওপরে বেয়ে ওঠা। যে কোন ভাবে। এই যে এখন অতীশবাবু তাকে না বলে টাকাটা দিল, দেবার হক অবশ্যই আছে তার, কিন্তু দিলেই সে ছেড়ে দেবে কেন। সেও জানে, কি-করে কাকে সুতোয় নাতায় কজায় আনতে হয়। দোষ ধরার মতো আনন্দ কুম্ভ আর কিছুতেই উপভোগ করতে পারে না। আর এরেই বলে খেলা। এরেই বলে হাসিরাণী, তুমি তারে লক্ষ্মীর পট কিনে দেবে, আমি তারে পূজা করব। তুমি যা খুশি তাই করবে, আমি আন্ধার মতো সহ্য করব, এবং কত গুরুতর বে-আইনী কাজ, সেটা সমঝে দেবার জন্য বলল, দাদা আপনার এই একটাই দোষ। সব কিছু সংসারের নিজের ভাবেন।

অতীশের কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কর্পোরেশনের লোকটাকে সে ফিরিয়ে দিয়েছিল, আড়াইশ টাকায় রফা, তার মধ্যে লোকটা তাকে খোলাখুলি বলেছিল, একশ টাকা পেয়ে থাকি, বাকিটা কর্পোরেশনের খাতায় জমা পড়ে। কত অবলীলায় লোকটা কথাটা বলতে পারল। মানুষের সামান্য সম্ভ্রম বোধ থাকলে এ-ভাবে কখনও কথা বলতে পারে না। আর যা হয়ে থাকে ভেতরে গোঁয়ার লোকটা তখন তেরিয়া হয়ে যায়। সে বলেছিল, এখন যান। পরে ভেবে দেখব। সে এইটুকু মাত্র বলেছিল, আর তাতেই মানে লেগেছে, চা না মিষ্টি না। চা মিষ্টি খাইয়ে টাকাটা যেখানে হাত জোড় করে দিতে হত, সেখানে এই নবীন লোকটি, নবীন না ভেবে, মাথায় গণ্ডগোল আছে ভাবতে পারে, কারণ এ-কালে এমন ভাবে কেউ কথা বলতে পারে, সে বিশ্বাসই করে উঠতে পারেনি। পরে কুম্ভবাবু ক্যাচটা মিস করতে চায়নি। প্রাণপণ দৌড়ে সেটা লুফে নিয়ে গেছে রাজার বাড়িতে। প্রথমে রাধিকাবাবু, পরে কাবুলবাবু, আরও পরে সনৎবাবু—

পাবলিক মানি বলে কথা। পাবলিক মানি ড্রেনেজ হবে ভেবে কুম্ভবাবু বড়ই অস্থির হয়ে পড়েছিল। নতুন অ্যাসেসমেন্ট হলে দেড় দু হাজার সোজা কথা! তখন আবার আর এক দফা।

অতীশ গুম মেরে আছে আর কিছু চালান সই করে দিচ্ছে। কুম্ভ উঠছে না। সহজে উঠবে না। সে আবার এই দশ টাকার বিষয়টি নিয়ে সবার কান ভারি করবে। এই হয়েছে জ্বালা। এখন যেন কুম্ভ তার সামনে এক অতিকায় প্রতিপক্ষ তারে যায় না ফেলা, দিনে দিনে ঘাড়ে চেপে বসছে। কিছুক্ষণ আগে বৌরাণী ফোনে অনুরোধ করেছে দিয়ে দিতে। সে বুঝতে পারছে জল অনেক দূর গড়িয়েছে। কিন্তু কুম্ভটা উঠছে না কেন। সে যেন এই লোকটার দিকে চোখ তুলে তাকাতেও ভয় পাচ্ছে। পাছায় লাথি মেরে উঠিয়ে দিলে কেমন হয়। কুম্ভ বেশ আরাম করে তবু বসে থেকে কয়েকবার হাই তুলল। মুখের ওপর তুড়ি মারল। কিছু লোক গেটে দাঁড়িয়েছিল, তাদের কুম্ভ ধমক দিল। —তোরা এখানে জটলা করছিস কেন! তারপর প্রিন্টারকে ডেকে বলল, জনার্দন ব্রাদার্স কমপ্লেন করেছে। স্যাম্পলটা নিয়ে আসুন।

অতীশ চোখ তুলে তাকাল না। শুধু একটা মাকড়সা দেখতে পেল। মাকড়সাটা জাল বুনে যাচ্ছে। সে আরও মনোযোগী হয়ে পড়ল। যেন এক্ষুনি ক্যাশটা মিলিয়ে রাখা দরকার। চেকগুলো ব্যাংকে পাঠানো দরকার। গ্যাঞ্জেস কোম্পানীর সেলট্যাক্স ডিক্লারেশনগুলো ঠিক আছে কিনা দেখা দরকার। কুম্ভ প্রিন্টিং দেখছে দেখুক। আসলে অতীশ বুঝতে পারে কুম্ভ কিছুই দেখছে না। ক্ষোভ জ্বালা থেকে তার এসব হচ্ছে। যদি কর্পোরেশনের লোকটাকে টাকা না দিয়ে থাকতে পারে তবে কুম্ভ আরও ভয়ংকর ভাবে জেদি হয়ে উঠবে। সঙ্গে এই দশটা টাকার বিষয় মাথার ঘিলুতে লেপ্টে আছে তার।

প্রিন্টার মণিলাল, একটা সিট এনে দেখাল। সামনে কৌটার স্যাম্পল ধরে রাখল।

কুম্ভ বলল, এক রং হল! বাফ কালার ঠিক আসছে মনে করেন!

প্রিন্টার বলল, ঠিকই ত আছে বাবু।

—ঠিকই আছে! কুম্ভ কপাল কুচকাল।

প্রিন্টার অতীশের দিকে সিটটা নিয়ে গেল। স্যার দেখুন ত।

অতীশ সবই বোঝে। কিন্তু কি বলবে ভেবে পেল না। ঠিকই আছে। খুঁত ধরতে গেলে সহজেই ধরা যায়। নিখুঁত মাল এখানে আশা করা ঠিক না।

এবং এখানে সব রঙই প্রিণ্টারের ঘিলু থেকে বের হয়ে আসে। কাজ করতে করতে জেনেছে, কোন রঙের সঙ্গে কতটা অন্য রঙ মেশালে আর একটা রঙ ফুটে বের হবে। কোন নিক্তির মাপ নেই। মণিলালকে নিয়ে পড়ার অর্থ যে কোন ভাবেই কুম্ভ জেনেছে, প্রিণ্টারটি তার হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। যেমন কাবুল রাজবাড়ির এজেন্ট, তেমনি কুম্ভও এখানে তার এজেন্ট রেখে দিয়েছে। ম্যানেজারের পক্ষে কে কি কথা বলে সহজেই তার কানে আসে। মণিলালটা কুম্ভর বিরুদ্ধে ঠিক কিছু বলেছে, এবং এই মণিলালকে নিয়ে পড়ার অর্থই হচ্ছে, কেউ পার পাবে না। সাঁড়াশি দিয়ে টেনে বক্র জিভ বের করে ফেলবে! কেন যে বোকার মতো বলতে যায়! সে বলল, ঠিকই ত আছে।

ঠিক যে নেই তা প্রমাণ করার জন্য কুম্ভ এবার উঠে দাঁড়াল! বলল, দাদা বাইরে আসুন। দেখবেন। এ-আলোতে বুঝতে পারবেন না।

অতীশ বুঝল, কুম্ভ প্রমাণ করবেই। সে মণিলালকেই বলল, একটু দেখে শুনে কাজ করুন। কমপ্লেন হলে আমাদের সবার ক্ষতি। রুটি রোজগার সব ত এখানে। যান।

মণিলাল চলে গেলে কুম্ভ বলল, তবু মুখের ওপর বেয়াড়া তর্ক করে।

অতীশ ক্যাশবুক বন্ধ করে বলল, বোঝে না।

কুম্ভ সিগারেট ধরাল। বেশ দামী সিগারেট, তিন আঙুলে চারটা সোনার আংটি। চার রকমের পাথর, গোমেদ, মুনস্টোন, পলা, এবং নীলা। বছর খানেক ধরে সে নিজের গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান নিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে করতে কখন হাত দেখার চার্টটা যে তার মাথায় ঢুকে গেছিল! হাত দেখা শিখছে, কিরোর একটা বই কিনে এনেছে। অবসর সময় সে এখন এই চর্চা করছে। যেন হস্তরেখায় তার অগাধ বিশ্বাস। এবং এই রেখা সম্পর্কিত বিষয়টি অধীত বিদ্যায় মধ্যে পড়ে গেলে অনেক অনেক গূঢ় কাজ উদ্ধার করতে সমর্থ হবে। কুম্ভ বলেছিল, দাদা পৃথিবীটা বড় গোলমেলে। কিছু তুকতাক জেনে রাখা ভাল। সেই লোকটি এখন তার দিকে তাকিয়ে খোস মেজাজে বলছে, কাল শোনলাম ভোজ খাচ্ছেন।

অতীশ ভাবল, আরে এযে সত্যি অন্তর্যামী, সে তার বিস্ময় গোপন করতে পারল না। কুম্ভ টের পেয়ে বলল, ডুবে ডুবে জল খান মনে করেন সতীলক্ষ্মী টের পায় না।

অতীশ বলল, কাল অমল খেতে বলেছে।

—অমল! কুম্ভ ভীষণ স্তম্ভিত গলায় বলল, অমল মানে!

—বৌরাণী।

—দাদা, মাইরি আপনার হাতটা দিন দেখি।

অতীশ বলল, আপনি ত জানেন, আমি এ সবে বিশ্বাস করি না।

—দেখি না। এমন করছেন কেন! আপনি সত্যি পারেন। সত্যি দাদা, আপনার মতো লোক হয় না। বলেই উঠে এসে টুক করে প্রণাম সেরে বলল, পাবলিক মানি না ছাই। যা খুশি করুন। স্ক্র্যাপের টাকা আগের বড়বাবু খেত। আমি যখন চার্জে ছিলাম, কুমার বাহাদুর খেত। আপনি আসায় চক্ষুলজ্জার বন্ধ আছে। তবে বন্ধ বেশিদিন থাকবে না। থাকতে পারে না। এখন সেটা কোম্পানী খাচ্ছে। খওয়াটাই মোদ্দা কথা। কেউ খেলেই হল। না খেলে ঈশ্বরের বংশ নাশ বোঝলেন না, দিন হাতটা দেখি!

—কি ছেলেমানুষী করছেন!

—পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে যেতে বলেছে কেন বলুন ত!

—জানি না।

—ওটা লীলাক্ষেত্র। বৌরাণী লীলা করেন ওখানে।

এ-সময়ে অতীশের মাথায় আক্রোশ চেপে যায়। কার ওপর আক্রোশ সে বুঝতে পারে না। বৌরাণী, আর্চি বনি না নির্মলা! তখনই কুম্ভর সোনা বাঁধানো সামনের দাঁতটা ঝিলিক মেরে উঠল। ঠিক সেই লীলাক্ষেত্রে যেন কুম্ভ দাঁত বের করে হাসছে।

অতীশ কেমন ভয় পেয়ে গেল। কুম্ভ আর্চি পাশাপাশি দুটো মুখ, জলছে নিভছে। জোনাকি পোকার মতো উড়ে যাচ্ছে, খপ করে ধরতে চাইল একটাকে। পিষে মারতে চাইল। অথচ হাত ফাঁকা। খালি মুঠো। আকাশ নিবিড় অন্ধকার এবং বুঝতে পারছে আজ গিয়ে আবার না সেই প্রেতাত্মার ভয়ে পড়ে যায়। তার মুখ কালো হয়ে গেল। সে আর কিছু না বলে উঠে পড়ল।

সে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। মিণ্টু টুটুল ঠিকঠাক বাসায় আছে ত! যা দুষ্টু হয়েছে, কখন বের হয়ে যায়, আর সেই পুকুর পাড়ে আমলকী বনে পরী খোঁজে বেড়ায়। পরীদের নেশায় পেয়েছে টুটুলকে। আসলে এই নেশাতেই মানুষ বুঝি বড় হয়। যেন সামনে সব সময় অলৌকিক কিছু আছে, কিছু অপেক্ষা করছে তার জন্য। যেমন মনে হয় তার সে বাসায় ফিরেই কোনো সুখবর পেয়ে যাবে। কেউ তার জন্য নীল খামে সুন্দর চিঠি রেখে যাবে। চিঠিটা কার তার

জানা নেই। তবু প্রত্যাশা সব সময়, সুদূর থেকে আসবে চিঠিটা। লেখা থাকবে, সবাই ভাল আছে, সবাই মঙ্গল মতো আছে, অথবা মনে হয়, কোনো চিঠি, কোন প্রকাশক পত্রিকা তার লেখা চেয়ে পাঠিয়েছে। অথবা কোনো চিঠি নীল খামে চিঠি, সুন্দর হস্তাক্ষরে কেউ জানিয়েছে আপনার জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি।

অতীশ হেঁটে বাসায় ফিরছে। মনের মধ্যে একটা নীল পোকা হুল ফুটিয়ে বসে আছে। মাধবটার টিবি, নির্ঘাত টিবি, তার বাবা মা নেই। সে একাই থাকে, একাই খায়। দশ টাকা বড়ই অমূল্য ধন, কুম্ভবাবু এ-নিয়ে আরও বাড়াবাড়ি করত। করবে না যে তাও এখন বলা যায় না! কুম্ভবাবু সব কিছু সময় বুঝে কোপ মারে। কোপটা দিন যায় ঝুলে থাকে, কোপটা দিন যায় ওঠে নামে, তারপর অমাবস্যা পূর্ণিমা দেখে নামিয়ে দেয়। এই দশটা টাকা সে পকেট থেকে দিয়ে দেবে শেষ পর্যন্ত ভাবল। একজন রুগ্ন মানুষের জন্য কোম্পানির হয়ে তার এটাও করার উপায় নেই! সে কোন কোন পয়েন্টে আক্রমণ হবে তাও জানে। কুম্ভ করবে না। করবে সনৎবাবু। সনৎবাবুকে দিয়ে কুম্ভ সব করাবে। কাল কিংবা পরশু ক্যাশবুক যাবে। রোজকার একাউন্ট পাস করার শেষ মানুষ তিনি। নামের আদ্যাক্ষর বসিয়ে নিচে তারিখ দেবেন। তিনিই বলবেন, দশ-টাকা! দশ টাকা বলতে গিয়ে সনৎবাবুর মুখ বিস্ময়ে লম্বা হয়ে যাবে। তারপরই তার প্রশ্ন মিন্টু টুটুল তোমাদের মা কি শুয়ে আছেন! আজও পেটের ব্যথাটা কি উঠেছে। মাকে ছেড়ে কোথাও যেও না। তোমাদের মা বুঝি আর পেরে উঠছে না। তোমরা মাকে দেখ। এবং যেটা হয়, বাড়ি ফিরে কেমন এক বিষণ্ণতা, নির্মলার সেই সুন্দর হাসিখুশী মুখ নেই। নিত্য অভাব। অতীশ একে অভাব মনে করে না, কিন্তু নির্মলা মনে করতে শুরু করেছে! বিশেষ করে বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এলে তার এটা বোধ হয়। নির্মলা নিজের পছন্দ মতো মানুষকে বিয়ে করেছে। বাপের বাড়িতে অভাবের কথা বলতে পারে না। ওরা বুঝতে পারেন, কিন্তু এগিয়ে আসতে সাহস পায় না। সেখানে অতীশের অহংকার দরজায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সে হাঁটতে হাঁটতে বলল, কি করব নির্মলা, আমি ত সাঁতার কাটছি। তারপরই বলল, ঠিক পাড়ে উঠে যাব। কিন্তু তারপরই চারপাশের মানুষজন, ফুটপাথে ভিখারি, সেই গাছটা, নিচে আঁস্তাকুড় থেকে তুলে আনা খাবার সব কেমন মাথায় মধ্যে কিলবিল করে ওঠে। সে আর আগের মতো সাহসী থাকতে পারে না।

আগে থাকতেই সাবধান হওয়া ভাল। রাজবাড়ি ঢোকার মুখে একটা বড় স্টেশনারি দোকান তার চেনা। সে দুটো প্যাকেট কিনে ফেলল। এই ধূপকাঠির প্যাকেট দেখলে নির্মলা গুটিয়ে যায়। ব্যাগের মধ্যে সাবধানে রেখে দেওয়া দরকার। মিণ্টুর আবার ব্যাগ হাতড়াবার স্বভাব। বাপ কি আনল। সে তার শিশুদের জন্য টফি নিয়ে যেত, কিন্তু নির্মলা বায়োসায়েন্স পড়া মেয়ে। সে খুব অপছন্দ করে। দাঁত নষ্ট হয়, তুমি কেন যে আন। সুতরাং সে এক প্যাকেট বিস্কুট নিয়ে নিল। কিছু নিতেই হয়, এবং বেলা পড়ে আসছে। বেশ লম্বা ছায়া হয়ে গেছে গাছের। গেট দিয়ে ঢুকতে গিয়ে ভয় পায়, যেন এক্ষুণি দারোয়ান বলবে; স্যার শিগগির বাড়ি যান, এবং যখন দেখল, না আর দশটা দিনের মতোই সেলাম করছে, খুব গম্ভীর হয়ে আছে, তখন বাসায় সব কিছু ঠিকঠাকই আছে। এবং যা আশা করে থাকে, মিণ্টু, টুটুল, তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে। চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হল, মিণ্টু টুটুল তোমরা কোথায়! এখনও দু হাত তুলে ছুটে আসছ না কেন? এবং তারপরই সেই শিশুরা, মাঠ থেকে দৌড়াতে শুরু করে বাবা, বাবা। আমার বাবা। মাথার মধ্যে যা কিছু অস্বস্তি সব কেমন জল হয়ে যায়। বাবা, বাবা, আমার বাবা। অতীশ নিজের ভিতর থেকে বলে ওঠে, হ্যাঁ, আমি তোমাদের বাবা। সংসারে আমি বাদে তোমাদের কেউ নেই। তার চোখে জল আসে।

টুটুল দু হাত বাপের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। বাবাকে দেখেই সে আর হাঁটতে পারছে না। পায়ে জোর পাচ্ছে না মতো দাঁড়িয়ে আছে। অতীশ টুটুলকে বুকে তুলে নিতেই মিণ্টু বাবার পায়ে পায়ে দৌড়াতে থাকল। আর অজস্র কথা। সারাদিন টুটুল কি কি খারাপ কাজ করেছে হাজার লম্বা ফিরিস্তি। যেতে যেতে বলল, জান বাবা, বৌরাণী টুটুলকে দুষ্টুমী করতে বারণ করেছে। পুকুর পাড়ে টুটুল ঢিল ছুঁড়ছিল। বৌরাণী না বাবা, টুটুলকে বাড়ি দিয়ে গেছে। টুটুল কিছুতেই বৌরাণীর কোলে উঠবে না। সারাটা পুকুরপাড় ছুটে বেড়িয়েছে দু'জনে।

অতীশ বলল, তোমাকে নেয়নি?

—না বাবা। আমি দাঁড়িয়েছিলাম। বৌরাণী আমাকে হাত ধরে নিয়ে গেছিল। আমি ত বড় হয়ে গেছি।

—পুকুরপাড়ে ভাইকে নিয়ে যেও না। কত জল, জলের নিচে শেকল থাকে। ধরে নেয়। কত বলেছি তোমাদের।

—টুটুল না বাবা ভয় পায় না।

বাবার কোল থেকে টুটুল দিদির সব অভিযোগ শুনছে। সে কিছু বলছে না। সে শুধু হাত নাড়িয়ে বলল, এত বড় মাছ বাবা।

—ওটা মাছ না। শেকল। জলে ভেসে মানুষকে লোভে ফেলে দেয়।

—আমার কিছু করে না বাবা।

অতীশ মনে মনে ফের সেই অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল। নির্মলাকে বার বার বলেছে, দরজা বন্ধ করে রাখবে। দরজার তালা মেরে রাখলেই হয়। বার বার বলেও এটা করতে পারে নি। কিন্তু এত সবের পরে বৌরাণী এসেছিল, এই চিন্তাটাই তাকে আবার ভাবনায় ফেলে দিয়েছে, কাল খেতে বলেছে অমল। নির্মলার শরীর কেমন থাকবে কে জানে। এখানে আসার পর সহসা নির্মলা সব উদ্যম কেমন হারিয়ে বসে আছে। নির্মলার আশা ছিল, কলকাতায় সে কোন একটা ইস্কুলে চাকরি পেয়ে যাবে। দু'জনে কাজ করলে, সংসারের অভাবটা এত বড় হয়ে দেখা দেবে না। যত দিন যাচ্ছে, তত সে ভেবে নিয়েছে এখানে কিছুই হবার নয়। এছাড়া বাইরে গেলে, দু'সংসার। ছেলেমেয়েদেরই বা কার কাছে রাখবে। অতীশ নিজে খাক না খাক, কর্তব্যবোধে পঙ্গু। বাড়িতে মাস গেলে বেতনের একটা বড অংশ পাঠাবেই। বোঝে না, মিন্টু টুটুল বড় হচ্ছে। সংসারে কেউ কারো না। এই সব সাত পাঁচ চিন্তায় শরীরে ঘুণ ধরে গেছে নির্মলার। অতীশ বাসায় ঢোকার আগে বলল, মা শুয়ে আছে ?

মিন্টু বলল, মা তোমার জন্য পুডিং বানাচ্ছে।

অতীশ বুঝল, নির্মলা আজ ভাল আছে। সে সারাদিন এই একটা আশাই করে এখন। নির্মলার বিষণ্ণতা কেটে যাক। মাঝে মাঝে আজকাল কথা কাটাকাটি হয়। তিক্ততা দেখা দেয়। অতীশ বুঝতে পারে, এই তিক্ততা তার অক্ষমতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে। বাড়িতে টাকা পাঠাবার সময় নির্মলার অভাব আরও বেড়ে যায়। কেমন অবুঝের মতো হয়ে ওঠে। নির্মলা শহরে আসার আগে এমন ছিল না। তখনই মনে হয়, সে কি ছিন্নমূল হয়ে যাচ্ছে। বাবা কি এই ভয়টাই করেছিলেন। বাবা চিঠিতে বার বার লিখছেন, তুমি ভাল নেই অতীশ। শেকড় আলগা হয়ে যাচ্ছে। বাড়ি ঘুরে যাও। ভাল লাগবে। নিজেই যেতাম। ঠাকুরের নিত্য পূজা কে করে। জমিতে চাষের সময়। কখনও লেখে জমিতে ফসল তোলার সময়, তোমার মার শরীর ভাল যাচ্ছে না। তোমরা সবাই সংসার থেকে আলগা হয়ে যাচ্ছ।

দরজায় দেখল তখন নির্মলা। বেশ খুশী। রুগ্ন মুখে কোথায় যেন প্রাণের সাড়া। টুটুলকে বলল, ধেড়ে ছেলে, বাপের কোলে উঠে বসে আছ। নাম। বাবাকে কষ্ট দেয় না। টুটুল কি বোঝে কে জানে। সে নেমে পড়ল। মিন্টু, যাও, বাবার পাজামা পাঞ্জাবি বাথরুমে রেখে এস। তারপর অতীশ দেখল, নির্মলা তার দিকে তাকিয়ে আছে। ছেলেমেয়েরা কেউ কাছে নেই। লম্বা বারান্দায় স্বামী-স্ত্রী। অতীশ নির্মলার চোখে আশ্চর্য সজীবতা লক্ষ্য করে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কাছে গেল। ডাকল, নির্মলা।

—নির্মলা বলল, বৌরাণী তোমার চেনা!

—হ্যাঁ।

—তোমার দেশের মেয়ে।

—হ্যাঁ।

—কৈ আগে বলনি ত!

—বলার কি আছে নির্মলা।

—বৌরাণী ত কত কথা বলে গেল!

—সবই নালিশ তো।

—তাছাড়া কি! বলল, তোমার মরণ হল না মেয়ে, এই হতচ্ছাড়ার সঙ্গে ঘর করছ।

—তাই বুঝি! সে নির্মলার দিকে তারপরও তাকিয়ে থাকল। বৌরাণী যদি আরও কিছু বলে থাকে।

—তুমি নাকি দশটা কথা বললে একটা কথা বল।

—কি জানি, বুঝি না।

—আমাকে বার বার বলল, অতীশকে আমি এতটুকুন দেখেছি। মুখচোরা স্বভাব। দেখেশুনে রেখ। আমরা ছাদে খেলতাম, নদীর পাড়ে হেঁটে যেতাম। এ সব তুমি ঘুণাক্ষরেও বলনি।

—বললে কি হত।

—তোমাকে কত ভালবাসে! আজ ত দেখে গেল, বলল, বাসার এই ছিরি। লোক এলে বসতে দিতে পার না বৌমা। ওটা যে কবে মানুষ হবে!

অতীশের বুকটা গুরগুর করে উঠল। বৌরাণী নির্মলাকে লোভে ফেলে দিতে চায়। অমল তুমি আর যাই কর করুণা দেখিও না ওটা আমি সহ্য করতে পারি না। আমার মধ্যে স্বপ্নের এক মানুষ বড় হয়ে উঠছে। সেই শৈশব

থেকে, আমি পৃথিবীর গ্রহনক্ষত্র গুণে গুণে বড় হয়েছি। অনেক বড় আর বিশাল সেই ব্রহ্মাণ্ড। আমার মধ্যে এক সুন্দর বালিকার প্রেম রুপোর কৌটায় ভরা আছে। আমি মানুষের সামান্য করুণার ভিখিরি না অমলা। তুমি নির্মলাকে আর যাই কর লোভে ফেলে দিওনা। এমনিতেই ওর বাড়ির প্রাচুর্য তাকে কষ্ট দেয়। আমি মাথা নিচু করে দাঁড়ালে তুমি দুহাত তার ভরে দেবে যদি বুঝতে পারে তবে আমার আর দাঁড়াবার ঠাঁই থাকবে না। লক্ষ্মী মেয়ে, আর যাই কর, এত বড় সর্বনাশ কর না।

—খাবার কথা বলে যায়নি!

—বলেছে।

—তুমি যাচ্ছ ত।

—বারে যাব না। কী ভাল। বলল, আমাকে বৌরাণী ডাকবে না। পিসি ডাকবে। ওর সম্পর্কে আমি পিসি হই।

তাহলে নির্মলা ওর ভাইপোর বৌ। সম্পর্কটা বেশ পাতিয়েছে। নির্মলার সরল বিশ্বাসে সে টোক্কা মারতে চাইল না। বলল, তা পিসি হয়।

—তুমি নাকি পিসি বলে ডাক না। কত বলেছে, সেই ছেলেবেলাতে তোমাকে কত বলেছে, পিসি ডাকবি, তুমি ডাকতে না। নাম ধরে ডাকতে।

—তখন অত বুঝতাম না নির্মলা।

—এখনই বা কি বোঝ! নিজের ভালটা সবাই বোঝে, কুম্ভবাবু কত বলছে কি একটা রফা করলে তোমার অনেক টাকা হয়, তুমি কিছুতেই মাথা পাতছ না। বার বার আমাকে বলল, বৌদি দাদাকে বুঝিয়ে বলুন। কমিশানে সর্বত্র কাজ হয়। কমিশন তুমিই বা নেবে না কেন? ওটা ত আর চুরি না।

কুম্ভর কথায় মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। কিন্তু সে কিছু বলতে পারে না। কতদিন পর সে নির্মলার মুখে হাসি দেখতে পেয়েছে। চোখ সজীব, যেন বসুন্ধরার মতো শস্য শ্যামলা হতে চায়। এমন সুসময় সে মাথা গরম করে হেলায় হারাতে পারে না। মানুষের নিজের মধ্যেই থাকে বিজু বিজে ঘা। রেহাই নেই। ক্ষেত্র তৈরি থাকে, শুধু হামলে পড়া। সে কেমন নিস্তেজ গলায় বলল, তুমি কি বললে?

—বললাম বুঝিয়ে বলব। তবে জানেন ত, যা বোঝে, তার বাইরে যায় না। এমন কি বাবাও পারেন নি। বাবার এত ঈশ্বর বিশ্বাস তার ছেলে কি হয়েছে চোখের উপরই দেখছেন।

নির্মলা হাত থেকে ব্যাগটা নেবার সময় সে বলল, তাহলে কমিশন নিতে বলছ!

নির্মলা ঘরের দিকে যাচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে বলল, কুম্ভবাবু যদি নিতে পারে তুমি নেবে না কেন ?

অতীশ পেছনে পেছনে হেঁটে যাচ্ছে। সে পায়ে জোর পাচ্ছে না। তার মিণ্টু টুটুল বড় হচ্ছে। সে দেখল, টুটুল দরজার ফাঁকে দাঁড়িয়ে বাবাকে উঁকি দিয়ে দেখছে। বাবা এখন খাবে। বাবা কতক্ষণে বাথরুমে যাবে, সে আর না পেরে বাবার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বাথরুমের দিকে। এখন টুটুলের কাছে বাবার সঙ্গে খাওয়া বাদে আর কোন সমস্যা নেই। অতীশ সামান্য বিরক্ত গলায় টুটুলকে বলল, যাচ্ছি। সে এখনও নির্মলার পেছনে যেতে চাইছে। সে ফের বলল, কুম্ভবাবু যা পারে আমি তা পারি না নির্মলা।

নির্মলার গলার ঝাঁঝ শোনা যাবে ভেবেছিল। কিন্তু সে এও জানে অফিস থেকে এলে নির্মলা কোন ঝাঁঝ রাখে না গলায়। যা কিছু অভিযোগ রাতের খাওয়া হয়ে গেলে। অতীশের মধ্যে কিছু ছেলেমানুষী রাগ আছে। খুব তিক্ত-বোধ করলে, সে খেতে পারে না। মাথা গরম হয়ে গেলে সারাদিন সে না খেয়ে থাকে। এবং এটা নির্মলা জানে বলেই খাইয়ে-দাইয়ে আজকাল সব অভিযোগ তোলে। আর এও জেনে ফেলেছে নির্মলা, সে রাগ বেশিক্ষণ পুষে রাখতে পারে না।

নির্মলা বলল, হাত-মুখ ধুয়ে নাও। দাঁড়িয়ে থাকলে কেন ?

অতীশ তক্তপোশে বসে আবার বলল, কুম্ভ কখন আসে ?

—তুমি চলে গেলেই।

—আর কি বলে !

—কি বলবে ; বলে দাদাকে বলবেন, এটা কলকাতা শহর। একটা মানুষও নেই যে ধান্দায় না ঘুরছে।

—ধান্দা ! কিসের ধান্দা ?

—সে তো জিজ্ঞেস করি নি। সে তো কাল থেকে পারুলের মাকে কাজে আসতেও বলে দিয়েছে।

—কত দিতে হবে ?

—তাও বলে নি। বলল, দাদার সঙ্গে কথা হবে। তারপরই নির্মলা কেমন ঠাণ্ডা গলায় বলল, ভারি ভাল মানুষ।

অতীশ পা নিচে রেখে বালিশে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। সে অনেক দূর থেকে যেন আবার বলছে, কমিশন নিতে বলছ ?

নির্মলা ও-ঘর থেকে শুনতে পায় নি। নির্মলা বলল, কিছু বলছ ?

অতীশ উঠে বসল, বারান্দায় ছুটে গেল। রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে বলল, হ্যাঁ বলছি।

নির্মলা অতীশের চোখ দেখে কেমন অবাক। ঠাণ্ডা মেরে গেল। সেই চোখ। লাল, গোল গোল কেমন স্থির হয়ে আছে। ধূপকাঠি জেলে বসে থাকলে তার এমন হয় দেখেছে। নির্মলা হাতে প্লেট নিয়ে একেবারে হিম হয়ে গেল। যেন কেঁদে ফেলবে।

অতীশ বুঝল, এ-বাড়ির মধ্যে সে ঠিকই আছে। কুয়াশার মতো সে হেঁটে বেড়ায়। পাতাবাহারের পাতায় তারপর জল হয়ে লেগে থাকে। অদৃশ্য সেই দুষ্ট আত্মার সঙ্গে সে পারবে কেন! শুধু বলল, কুম্ভবাবুর ঈশ্বর আছে নির্মলা। তার মাথার ওপরে ঈশ্বর আছেন। সে পারে। আমার কিছু নেই। কেউ নেই। আমি পারি না। আমি একেবারে একা।

নির্মলা বলল, তুমি একা কেন ? আমরা কি তোমার কেউ না।

অতীশ এবার দুঃখে হেসে ফেলল। তারপর আর কিছু বলল না। বাথরুমে হাত-মুখ ধুল। প্লেটে পুডিং চা, তিনখানা গরম স্যাকা রুটি। একটা গোল টেবিলে রেখে গেছে নির্মলা। চা আসছে। মিণ্টু টুটুল, দু-পাশে দাঁড়িয়ে। অতীশ নিজে মুখে দেবার আগে তার দুই সন্তানের মুখে রুটি পুডিং দিল। এখন টুটুল খুব ভাল ছেলে। দু-হাত মাথায় ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাবাকে দেখছে, বাবার খাওয়া দেখছে। মিণ্টু বাবার গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কে কতটা আগে গিলে ফেলতে পারে এবং হা করা মুখ দেখলেই বাবা টের পাবে, সে খেয়ে ফেলেছে। নির্মলা জানে বলেই ডাকছে, তোমরা এখানে এস। তোমাদের খাবার দিয়েছি। কেউ গ্রাহ্যি করছে না মার কথা। নির্মলা বুঝতেই পারছে না, বাবার সঙ্গে খাওয়ার কি আরাম। সে দুই সন্তানকে আরও কাছে নিয়ে বসে থাকতে চায়। যেন ভয়, সর্বত্র, সেই যে বলে না, এক অজগর হেঁটে বেড়ায়, সে শুধু গ্রাস করে—সেই গ্রাস থেকে বাঁচবার জন্য তার নিরন্তর এক শঙ্কা। সে বলল, মিণ্টু তোমার টাস্ক করে ফেল। টুটুলকে সে এখনও মুখে মুখে পড়ায়। বিদ্যারম্ভ না দিয়ে লেখাতে পারছে না। বাবা বার বার চিঠিতে লিখেছে, তুমি আর যাই কর বিদ্যারম্ভ না দিয়ে টুটুলের পড়াশোনা শুরু করবে না। নির্মলাও বাবার এ-সব বিশ্বাসের অংশীদার। এ সময়ে ওরা দুজনই তার প্রতিপক্ষ। সে তাই বলল, পিতামহের নাম কি টুটুল ?

টুটুল ঠিক ঠিক বলল।

তোমার প্রপিতামহের নাম? বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম এই করে অতীশ তার বংশতালিকা সহ এক বিশাল পটভূমির কথা টুটুলকে বলে যাচ্ছিল। কারণ এটা হয়, সে যখন বুঝতে পারে, তার চারপাশে নিয়ত এক ভয়াবহ প্রেতাত্মা নাচছে তখন তার সম্বল সেই শৈশব এবং নদীর পাড় অথবা বালিয়াড়ি এবং শস্যক্ষেত্র। সেখানে সে বড় হয়েছিল, সেখানে সে সোনালী যব গমের ক্ষেতে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখেছিল। এ-সব কথা বংশ পরম্পরায় বলে যেতে পারলে পাপখণ্ডন হবে। তাহলে সে একদিন না একদিন সেই ভয়াবহ পাপ থেকে ঠিক মুক্তি পাবে।

নির্মলা ঠিক তখনই বলল, তোমার তো কেউ নেই? টুটুলকে কাদের কথা এত বলছ? তুমি না বলছিলে একা, খুব একা!

অতীশ তখনও বলে যাচ্ছিল, আমাদের ভারি সুন্দর একটা তরমুজ খেত ছিল। আমি যখন তোমার মতো ছোট্ট ছিলাম, ঈশম দাদা আমাকে নিয়ে তরমুজের ওপর বসিয়ে রাখত। তখন দূর দিয়ে পাগল জ্যাঠামশাই হেঁটে যেতেন। একবার একটা হাতি এসেছিল। হাতির পিঠে আমি আর পাগল জ্যাঠামশাই।

হাতির কথায় আসতেই টুটুল দুহাতে বাবাকে গলায় জড়িয়ে ধরল, বাবা আমাকে হাতি কিনে দেবে? আমি হাতির পিঠে উঠে পরী ধরব।

এই হয় মানুষের। হাতি পরী রাজহাঁস ময়ূরপঙ্খী পক্ষীরাজ কত কিছু দরকার মানুষের। টুটুলেরও দরকার। তারও দরকার, তার বাপ ঠাকুরদা সবার দরকার ছিল, এই করে মানুষ বড় হয়ে ওঠে। এই সব ধরতে ধরতে মানুষ বড় হতে চায়। অথচ শূন্য খাঁ খাঁ প্রান্তরে হেঁটে যাওয়া শুধু তারা বোঝে না। অতীশ টুটুলকে বলল, তোমাকে আর কি কিনে দিতে হবে?

—ঘোড়া দেবে। ঘোড়ায় চড়ব। গাড়ি দেবে, আমি আর দিদি গাড়ি চড়ব। মা সামনে। তুমি পেছনে বসবে। তারপর কুঁ-উ-উ-উ।

—আর?

—আর, আর? বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকল। যেন অথৈ জলে পড়ে গেছে টুটুল।

—বল, বল!

অনেক ভেবে এবং হাতড়ে শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেল টুটুল। বাবার পেটে মুখ লুকিয়ে চুপি চুপি বলল, একটা রাজার টুপি।

॥ কুড়ি ॥

অতীশ এ-সময় মনে করতে পারল না, কোথায় যেন সেই নাটক, নাটকের পাত্র-পাত্রীরা সব গণ্ডার হয়ে যাচ্ছে। শরীরে সবুজ রঙ এবং গায়ের চামড়া ক্রমশ ভারি হয়ে যাচ্ছে। নাটকের করুণ পরিণতি—বেরিনজার কাঁদছে। বেরিনজার চুল ছিঁড়ছিল। প্রাণদণ্ডের আসামীর মত দু হাত ছুঁড়ে বলছিল, ঈশ্বর আমি মানুষের মত বাঁচব। আমাকে গণ্ডার করে দিও না ঈশ্বর।

সেই দৃশ্যের ভিতর অতীশ ফোনের রিসিভারটা দেখছে। রিসিভারটা নড়ে-চড়ে উঠছে। তারপর হাত পা মুখ, গজিয়ে যাচ্ছে। আস্ত গণ্ডার। সারাটা সকাল সে রাজেনদার সঙ্গে কথা বলেছিল এই নিয়ে। শেষমেষ চুকে বুকে যাক। কেমন একটা জেদ তাকে পেয়ে বসেছিল। ভেবেছে হেস্তনেস্ত হোক। সে পারবে না। তারপরই মিণ্টু, টুটুল, নির্মলা, বাবা-মা, সে অতীশ, বাপের সুপুত্র, নির্মলার অনুগত স্বামী এবং দায়িত্বশীল পিতা হয়ে যায়। কোথায় দাঁড়াবে। ফুটপাথ, সে ত ক্রমেই লম্বা হয়ে যাচ্ছে। অসংখ্য গণ্ডার দৌড়চ্ছে। ঠিক সেই নাটকের মত মানুষেরা তার কাছে প্রায় গণ্ডারের শামিল। এবং রাজেনদাকে মনে হয়েছে আরও সাবলীল গণ্ডার। ঘাসের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে দেখছে দলবল কোনদিকে যায়। এবং ফোনটাও যখন নড়েচড়ে গণ্ডার হয়ে যেতে চাইল তখনই সে কেমন ভয় পেয়ে ডাকল, সুধীর সুধীর! সে বেল টিপতে ভয় পেয়ে গেছে। এবং সেই ঘ্রাণ। আর্চি আবার হাজির। মজা দেখছে। তার মনে হল, আর্চি তার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে আজ মজাটা দেখবে। কি রকম, কি রকম হে সাধুপুরুষ! এখন নিজেও যে গণ্ডার হয়ে যাচ্ছে! ভয় করছে না।

সে বলল, আর্চি তুমি যাও। তুমি না গেলে আমি এখানেও ধূপকাঠি জ্বালিয়ে বসে থাকব। যাও বলছি। হাসছ কেন!

—না হাসছি না। দেখছি।

—কি দেখছ?

—ঘুষ কিভাবে দাও দেখব।

—আমার জন্য দিচ্ছি না।

—কার জন্য।

—কোম্পানীর জন্য।

—বনিকে আমি ভালবাসতাম। আর্চি দাঁত বের করে হাসল।

—চউপ। অতীশ প্রায় চিৎকার করে উঠতে চাইল। ভালবাসলে শয়তানের মত কাজটা করতে না।

—বনি না ভালবাসলে কি করি! শরীর ত।

—তুমি একটা বাচ্চা মেয়েকে তাই বলে রেপ করবে!

—বাচ্চা! বনি বাচ্চা! কি বলছ! তুমি তাকে নিয়ে বোটে কি না করেছ। আমি বুঝি দেখি নি! বাচ্চা মেয়েকে ওভাবে করা যায়।

—প্লিজ আর্চি, তুমি নোংরা হয়ে যেও না। বনিকে ছোট করে দিও না।

—না না, ছোট কেন করব! মহীয়সী। মহীয়সী। মেয়েরা সব মহীয়সী! বৌরানী কেমন খাওয়াচ্ছে। কত সুন্দর করে।

—তা খাইয়েছে। ছেলেবেলা থেকে ওর ভারি টান!

—বুঝতে পারছ কি হবে বিষয়টা?

—না বুঝতে পারছি না। তুমি যাও আর্চি। আমাকে ক্ষমা কর। বনিকে ক্ষমা করে দিও। আমি এখন বাবা। দুটো বাচ্চা আমার। আমি না থাকলে ওদের কি হবে ভেবে দেখ। বাবা না থাকলে, আমাদের এখন আর কেউ থাকে না।

—সেই ত বলছি। তুমি বাবা। তবে এতক্ষণ বলছিলে কেন, কোম্পানীর জন্য ঘুষ দিচ্ছ। অজুহাত খাড়া করছ কেন। চাকরিটা ছাড়তে পারছ না। ভয় ফুটপাথে দাঁড়াবে। মানুষের টাকা না থাকলে কি হয়, বেকার থেকে কতবার সেটা বুঝেছ!

—তা বুঝেছি।

—এখন আমি চাই তুমি বেকার হয়ে যাও। আত্মহত্যা কর।

তখনই অতীশ আরও ভয় পেয়ে গেল। —না করলে!

—তোমাকে গণ্ডার হতে হবে। চামড়া ভারি হবে, টের পাবে না। বুঝতে পারবে না চামড়া পুরু হচ্ছে! পুরু হতে হতে যখন সত্যি গণ্ডার হবে তখন দেখবে কোন আর দুঃখ নেই। চারপাশে তোমার মত সব লোকজন, সমাজটাকে মনে হবে বিচরণ ক্ষেত্র। মানুষের নির্যাতন তোমার চোখে লাগবে না।

—যদি না হই।

—তবে আত্মহত্যা।

—বলছ!

—বলছি। দুটোর যে কোন একটা, বলে যেন আর্চি তার দুটো আঙুল দেখাল। ডোরাকাটা সেই বাঘের মত মুখ। সারা গায়ে কিম্ভূতকিমাকার দাগ —দুলছে, নড়ছে। দুটোর একটা। দুটোর যে কোন একটা। দুলছে। নাচছে। লাফিয়ে লাফিয়ে নাচ দেখাচ্ছে। দুটোর যে কোন একটা। অনেক দূরে কোন নীল জলরাশির ওপর অনন্ত আকাশের নিচে ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে, দুটোর যে কোন একটা। তারপর সেই গোলাকার চোখ, লাল কুট চোখ, হাতের আঙুলে ভি। ভিক্টরি! তখনই অতীশ আর পারল না। ডাকল, সুধীর সুধীর! সুধীর এসে বলল, শিগগির দু প্যাকেট ধূপকাঠি নিয়ে আয়। বলেই সে উঠে দাঁড়াল। যেন খুঁজছে! কোথায় আরও কিছু অবলম্বন পাওয়া যেতে পারে—খুঁজছে। সে অফিস ঘরেই পায়চারি শুরু করল। একবার কাঁচের জানালা দিয়ে দেখল, ঐ তো আসছে! সে জানালায় ভাল করে দেখল, হ্যাঁ আসছে। বুকটা কাঁপছিল। মানুষটা কত সহজে পান চিবুতে চিবুতে চলে আসছে। আমরা পেয়ে থাকি। কতদিন থেকে পেয়ে আসছি। যেন আর্চিই আসলে ভিন্ন ভিন্ন চেহারায় তার কাছে হাজির হচ্ছে। কখনও কুম্ভবাবু, কখনও ইস্কুলের সম্পাদক, কখনও রাজেনদা, কখনও সেই ঘুষখোর লোকটা অথবা শেঠজী। রাজেনদার রাশভারি গলা, তুমি অতীশ, কোম্পানীর তাই বলে ক্ষতি করতে পার না। টাকাটা না দিলে কোম্পানীর ক্ষতি হবে। বেশি টাকা কে দেয় বল। আইন ফাঁকি দেয় না, কে এমন আছে। শেষে যেন বলতে চেয়েছিল, আসলে তুমি গোঁয়ার। এভাবে ত কাজ হবে না। এর নাম সততা নয়।

তারপরই আবার আর্চি জানালায় দুলে দুলে নাচছে। আমার খুব কষ্ট হয়েছিল ছোটবাবু। নিশ্বাস নিতে না পারলে কত কষ্ট বল। বালিশে মুখ চেপে হত্যা করেছ। দম বন্ধ হয়ে আসছে। চোখ ফেটে বের হতে চাইছে। অতীশ তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। দম বন্ধ করে দেখল, দেখা যাক কতক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করে রাখা যায়। মৃত্যু যন্ত্রণা সে অনুভব করতে চাইছে। এই এই কি করছ! অতীশ অতীশ! কি হয়ে যাচ্ছি। আমার এটা কি হচ্ছে। সুধীর শিগগির কর। এত দেরি কেন?

অস্বাভাবিক যন্ত্রণায় সে কাতর হয়ে পড়ছিল। কষ্টটা কিসের? সম্ভ্রমবোধের! ইজ্জতের। ইজ্জত শব্দটি মাথার ঘিলুর মধ্যে পাক খাচ্ছে। ইজ্জত না পাপ। আর্চি তাকে দিয়ে সব রকমের পাপ কাজ করিয়ে নিতে চায়। বিজয়ীর মত সেই যে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকেছে আর বের হতে চাইছে না। গন্ধটা আরও

বেশি আজ ভুর ভুর করছে। সুইংডোর কেউ খুলছে। সুধীর। হাতে ধূপের প্যাকেট। সে প্রায় হামলে পড়ে প্যাকেট দুটো খুলে নাকের কাছে ধরল। তারপর যা হয় টেবিলে, কাঠের দেয়ালে, আলমারির কোণায় গুচ্ছ গুচ্ছ ধূপ জ্বালাতেই দেখল সব পরিষ্কার, সব স্বাভাবিক। টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত ফাইল এবং ক্যাশবুক। কিছু ডেবিট ভাউচার, ক্রেডিট ভাউচারের বাণ্ডিল। দোয়াত-দানিতে নানা রকমের কলম। জানালা কাঁচ দিয়ে ঘেরা। পাখাটা ভাল ঘুরছে না। সুতরাং সে নিজেই জানালাটা খুলে দিল। ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে ঢোকায় শরীরটা হাল্কা লাগছে। সামনে রাস্তা। দুজন জোয়ান লোক ঠেলাগাড়ি টেনে এনে কারখানার গেটে লাগিয়েছে। মাল যাবে। কারখানার কারিগরেরা নর্দমাতে ছেপ ফেলে সদর দরজায় ঢুকে যাচ্ছে। তারপর ঘণ্টার শব্দ, মেশিন চালু করার শব্দ। সুপারভাইজার হন্তদন্ত হয়ে ছুটছে। সুইংডোর খুলে যাচ্ছে। সব অতীশের কাছে এখন পরিষ্কার। এই ধূপকাঠি জ্বেলে দিলেই গন্ধটা মরে যায়। সে খুব স্বাভাবিক বোধ করে। সুইংডোর ঠেলে সুপারভাইজার মুখ বাড়াতেই দেখল, তার ম্যানেজার সারা অফিসে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিয়েছে। মুখ ভয়ঙ্কর গম্ভীর। সুপারভাইজার অবশ্য শুনেছিল, মাথায় বাবুটির গণ্ডগোল আছে। ধূপকাঠি জ্বালায় রাতে। কিন্তু এই দুপুরে কে এমন রাশি রাশি ধূপকাঠি জ্বালায়! সে কিছুটা বিভ্রমে পড়ে গেল। কিন্তু তখনই তাঁর গম্ভীর কথাবার্তা, কিছু বলবেন?

সুপারভাইজার অবাক। প্রখর ব্যক্তিত্বে মানুষটা কথা বলছে। সে বলল, স্যার ভিতরে আসব?

—আসুন।

—সাতজন কামাই করেছে টিফিনের পর।

—কি করব?

—এ-ভাবে ত চলে না। আপনি জোর অ্যাকশন না নিলে কি করব?

—একটা লিস্ট করে দেবেন, দেখব কি করা যায়।

—কিন্তু মেডিক্যাল দিলে কি করবেন?

—এত মেডিক্যাল পায় কি করে?

—স্যার ই এস আইর ডাক্তারদের সঙ্গে রফা আছে। ওষুধ দেয়। মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেয়। ওরা মেডিক্যাল নিয়ে অন্য জায়গায় কাজ করে। এখানে কাজ না করেও তারা হাফ মজুরি পায়। সুবিধা কত দেখুন। এখানে হাফ মজুরি অন্য জায়গায় ফুল মজুরি। কে ছাড়ে!

অতীশ বলল, আমার কিছু তবে করার নেই! আসলে অতীশের মনে হল, আচ্ছা জাঁতাকলে সে পড়েছে। এত কামাই হলে সে কি করে। সে বলল, বার্নিশ থেকে তুলে নিন।

—তিন নম্বর পাঞ্চ মেশিন খালি। প্রেস মেশিনের দুজন আসে নি। বিশ্বনাথ নিমাই নন্দ সবক'টা ডুব মেরেছে।

—চলুন ত দেখি। অতীশ উঠে পড়ল। কারখানায় ঢুকলে দেখল সব ভালমানুষ। গভীর মনোযোগ কাজে। কেউ যেন ফাঁকি দেয় না জীবনে। কামড়ি এক গাদা জমে আছে। মাল তুলে নেবার লোক নেই। হাত খালি করে চাপা মেশিনে পরাণ বসে আছে। পর পর মেশিনগুলির কাজ বন্ধ। চেন সিস্টেমে কাজ। ভ্যাকুয়ামের কাজও হচ্ছে না। কানপুর পার্টির মাল হচ্ছে। সে বলল, এই বিশ্বনাথ এদিকে আয়। বিশ্বনাথ এলে বলল, যা মাল দে। বার্নিশ বন্ধ রাখ। এই গোপাল, আমার সঙ্গে আয়। চাপা থেকে ভ্যাকুয়ামে নিয়ে যাবি। তারপর বিটের মনোরঞ্জনকে বলল, আপনারা ইউনিয়ন করেন, এদিকটা দেখেন না কেন? হঠাৎ ডুব মারলে, কোম্পানীর ক্ষতি হয় না!

মনোরঞ্জন বিট থামিয়ে বলল, দেখছেন না স্যার, কেমন দিনকাল। অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে। মাধাটাকে বের করে দিয়েছে বাড়িয়ালা। টি বি পেশান্ট রাখে কি করে!

—কোথায় আছে?

—পুরান দালানের রোয়াকে শোয়। সেখানেই থাকে।

এটা অতীশেরই দায়িত্ব। সে এখনও ই এস আইকে বলে কিছু করতে পারেনি। সে কুম্ভবাবুকে নিয়ে ক'দিন থেকে দৌড়াদৌড়ি করেছে। একটা বেডও খালি নেই। দরিদ্র বান্ধব হাসপাতালে দুটো ই এস আইর বেড আছে। খালি না হলে কিছু করা যাচ্ছে না। সকালে এসে মনোরঞ্জন বলেছিল, স্যার যাবেন একবার। দেখবেন কি অবস্থা! সে যায় নি, যেতে তার ভয় লাগে। সে জানে, এই শহরের বুকে যেমন দশটা পাঁচটা লাশ রাস্তায় পড়ে থাকে মাধবের বেলাতেও তাই হবে। রোগ নিরাময়ের সে কিছুই করতে পারছে না। দশটা টাকা দিয়েছিল, তাই নিয়ে শেষ পর্যন্ত সনৎবাবুর সেই কথা। তুমি কেন বুঝছ না, অতীশ এটা তোমার টাকা না। তোমার টাকা যে-ভাবে ইচ্ছে খরচ কর, আমরা কিছু বলব না! এ-টাকা দিতে হলে বোর্ড থেকে অ্যাপ্রুভাল নিতে হবে। এতদূর গড়াবে সে জানবে কি করে। অগত্যা সে বলেছিল, ঠিক আছে

ভাউচারটা ছিঁড়ে ফেলুন। ক্যাশবুকে খরচটা কেটে দেব। আমার যখন দায়, তখন সেটা আমার পকেটেই থাক। আর তখনই সনৎবাবু হাঁ হাঁ করে উঠেছিলেন। না না, তুমি দেবে কেন। দেখি কুমার বাহাদুর কি বলেন! দশটা টাকা এত মহার্ঘ সে আগে জানলে বোধহয় আহাম্মকের মতো কাজটা করত না। আজই সেই নিরেট গণ্ডারটি আসছে। তাকে এক দেড়শ টাকা দিয়ে যে-ভাবেই হোক খুশি রাখতে হবে। মাথার মধ্যে কি যে হয়, সে হঠাৎ চিৎকার করে উঠতে চাইল, মাধবকে বলুন না মশাল নিতে হাতে। সব বাড়িঘর পুড়িয়ে দিতে বলুন না! কি হবে শুধু শুধু মরে গিয়ে।

মাধব সেই এক মানুষ, ঢ্যাঙা পাতলা। খড়খড়ে চেহারা। আগে ফুটপাথে শুত, মাইনে পেলে স্নান আহার, হোটেলে ভাত, ঐ নির্দিষ্ট দিনেই সে শুধু ভাত খায়। থুতনিতে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চুল কাটে ছ'মাসে ন'মাসে। লম্বা চুল উস্কখুস্ক। ছেঁড়া তালিমারা জামা প্যাণ্ট। আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেই রাস্তার সেই পাগলা হরিশ। বসুন্ধরা তার করতলে। মাধবটা সেই হয়ে যেতে পারত। রাজরোগে তাকে খেয়েছে। এবং চোখ জবাফুলের মতো করে তাকালে অতীশের ভয় করত। মাইনে বাড়তে মাঝে মাঝে জুয়া খেলার নেশায় মাধবকে পেয়ে বসে। এই মানুষের যেমন আর দশটা সখ থাকে। সে হপ্তাহে একবার বেশ্যালয়ে যায়। শরীর বলে কথা, সুখ সখ বলে কথা। দুনিয়ায় এসে সুখ সখ না মিটিয়ে যায়টা কি করে! সে সহজেই বচসা করতে পারে মারামারি করতে পারে। সেই মাধা এখন চিৎপাত হয়ে আছে রোয়াকে।

অতীশ বলল, খায় কি? ওষুধপত্র কে দেয়।

—নিমাইর বৌ দুবেলা দুটো করে দেয়। আমরা পালা করে ওষুধ খাইয়ে আসি। কথা শোনে না স্যার। ঐ শরীর নিয়েই বেশ্যাবাড়ি গেছিল। নিজে বাঁচতে না চাইলে কি করি! ই এস আই থেকে কিছু হল না স্যার?

অতীশ আর কথা খুঁজে পেল না। শুধু বলল, চেষ্টা ত করছি। কিন্তু কি করব বলুন! সে জানে ঘুষ দিলে হয়ে যেত। কে দেয়! ঘুষ দূরের কথা, দশটা টাকা দেবারও তার ক্ষমতা নেই। সে আর তার দশটা টাকার কথা বলল না। এই নিয়ে তাকে কুম্ভবাবু জালিয়েছে, জানাজানি হয়েছে জানলে, কোনদিকে আবার ফণা তুলবে কে জানে। কম কথা বলা ভাল। যত দিন যায় তত এটা তার মনে হয়েছে।

তারপর সদর দরজা অতিক্রম করতেই শিবপূজনের মুখ। সে ভাঙা টুলে

বসে হাত পা চুলকাচ্ছিল। ওর চোখ মুখ টোপা কুলের মতো। হাতে ঘা। আঙুলগুলো ফুলে আছে, কাঁকড়ার মতো বেঁকে গেছে। নখ খসে গেছে। হাতে পায়ে সব সময় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। একদিন শিবপূজন ব্যাণ্ডেজ খুলে পাটা অতীশকে দেখিয়েছিল—ঘন সাদা রঙের ঘা, ক্ষতস্থানটুকুতে অবিরাম দুর্গন্ধ। আর এই সব দেখলেই গা শিরশির করে। যেন পোকাটা তার শরীর বেয়ে উঠছে। নিজের মধ্যে এক অসুখের খবর টরে টক্কা বাজায়। সে দেখি না দেখি না করেও সবটা দেখে ফেলেছিল। শিবপূজন বলেছিল, মানুষ মরে যেতে চায় না কেন বাবু। মরে গেলে রেহাই। আমার মরার ইচ্ছে কবে হবে বাবু? আমার বেঁচে থাকতে এত ভাল কেন লাগে বাবু?

অফিস ঘরে ঢুকতেই ফোনটা বেজে উঠল। অতীশ ইচ্ছে করেই হাত বাড়াল না। ইদানীং সে এই ফোনটাকে বড় ভয় পায়। অদ্ভুত সব স্বর ভেসে আসে। যেন আর্চি গলা নকল করে কথা বলছে। কেবল তাগাদা। দাও। আর দাও। সবাই তার কাছে তাগাদা মারে। মালটা গেল না। টাকাটা কবে দেবেন। না, এ-ভাবে ঘোরালে চলবে না। বার্নিশ বন্ধ করে দেব। মাল ডেমারেজ খাচ্ছে। সেলট্যাকসের কি হল! রং খারাপ। বার্নিশ ঠিক হয়নি। ঢাকনা আলগা, মাল ফেরত যাবে।

সুধীর বলল, বৌদিমণির ফোন।

ফোন! কোত্থেকে করছে। তারপরই মনে হল, অমলা তো পিসি হয়। ফোনটা হাতে নিয়ে অতীশ বলল, বল।

—শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

—সে ত আসার সময় দেখে এলাম!

—দাদা এসেছেন। আমি বরং ক'দিন মার কাছে থেকে ঘুরে আসি।

—সে ত ভাল কথা। যাও। আসলে এটাও অতীশের অভিমান থেকে বলা। সংসারে তার একটা বড় দুঃখের দিক আছে। সেটা কেউ বোঝে না। সে একা থাকলে আরও কষ্টের মধ্যে পড়ে যায়। বড় নিঃসঙ্গ লাগে। কলকাতায় এসে সে এটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। নির্মলারও বুঝি একঘেয়ে ঠেকছে তাকে। সে মাসে ছ'মাসে নির্মলাকে সঙ্গে নিয়ে বের হয়। তার সময় হয় না। তার নিজের বলতে একটাই কাজ, একটু লেখা, আর বাকিটা সে নির্মলা টুটুল মিণ্টুর জন্যে করে যাচ্ছে। অথচ নির্মলা এটা টের পায় না। নির্মলা চায় ঘুরতে ফিরতে। সে বেড়াতে ভালবাসে। নির্মলার জীবনে সচ্ছলতা দরকার।

সে এভাবে যে শেষ পর্যন্ত জীবন কাটাতে পারবে না যেন আড়ে ঠাড়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে।

অথচ নির্মলার সঙ্গে তার একটা ভালবাসার যুগ ছিল। নির্মলাই তাকে সেই বিষণ্ণতা কাটিয়ে পৃথিবী সবুজ শস্য-শ্যামলা, বৃষ্টিপাত হয় গাছপালা বাড়ে, আবার শীত আসে, পাতা ঝরে যায়; রুখো মাঠ কড়কড়ে হাওয়া, ধুলোবালি ওড়ে এ-সব শিখিয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, নির্মলা তাকে ফের কোন বড় বেলাভূমিতে নিয়ে যাবে। সেই নির্মলা এখন তাকে একা ফেলে কিছুদিন বাবা মার কাছে থাকতে চায়।

তখনই পার্ট-টাইম কাজের লোকটা এসে বলল, স্যার, সব পার্টিদের স্টেটমেণ্ট অফ একাউণ্টস ত্রিশ তারিখের মধ্যে দেওয়া একেবারেই অসম্ভব।

—কেন ?

—স্যার, একা পেরে উঠব না।

—কুন্তবাবুকে সঙ্গে নিন।

কারখানা থেকে হাপরের শব্দ আসছে। কিছু ঝালাইর কাজ থাকে মাঝে মাঝে। দূরে কোথাও বচসা হচ্ছিল। সেখানে অনেক লোক জমেছে। সে কাচের জানালায় বসে সব দেখতে পায়। সামনের অনেকটা পথ চোখে পড়ে। ভাল করে তাকালে, দূরের বেশ্যালয় চোখে ভেসে ওঠে। সেখানেও সে ভিড় দেখতে পেল। সুধীর এসে খবর দিল, স্যার, মারামারি হচ্ছে।

—মারামারি হচ্ছে কেন।

—লীলকে নিয়ে ঝগড়া। লীলা মরে গেছে।

লীলাকে সে জানে না। লীলা কোন বেশ্যারমণী হবে। সুধীর এত কথা বলতে পারে না। সে এ-পাড়ার ছেলে। ঘরদোর সব জানা চেনা। সে লীলাকে চিনতে পারে।

সে বলল, লীলাকে নিয়ে ঝগড়া কেন ?

—লীলার স্বামী এসেছে। সে তার মরা বৌকে দেশে নিয়ে যেতে চায়। ওরা বলছে দেবে না।

—ওরা কারা ?

—লীলার ঘরে যারা আসত।

কেমন একটা রহস্য টের পেয়ে ওর কত কিছু প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হচ্ছে। লীলার স্বামী আছে অথচ লীলা তবে এখানে কেন এসে উঠেছিল ! অভাব অনটন থেকে

এটা যদি হয়। মানুষ কি অভাব অনটনে পড়ে গেলে মাথা-ফাতা গুলিয়ে ফেলে। তখনই সে দেখতে পাচ্ছে কয়েকজন মাতাল যুবক লীলার খাটিয়া নিয়ে এদিকেই আসছে। একবার রাস্তায় নামাল পর্যন্ত। কি ফেলে এসেছে, কেউ তা আনতে গেছে। সে দেখল কপালে সিঁদুর, হাতে নোয়া। বড় সুন্দর মুখ। চোখ বুজে আছে মতো। লীলা স্বামীকে ফেলে চলে এল কেন? শহর কি টানে! যুবকেরা খাটিয়া বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সব যুবকেরাই লীলার স্বামী। লীলা চোখ বুজে যেন মুচকি হাসছে এমন ভেবে। ওর শরীরটা কেমন গুলিয়ে উঠল। তা তুমি যাও না! তোমার যদি নিত্য অভাব এত বেশি মনে হয়, যাও। চাকরি কর গে। টুটুল মিন্টুকে না হয় আমিই দেখব। তারপর লীলার খাটিয়া ঝুলিয়ে তারা চলে গেলে, রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। এবং পরে সে দেখতে পেল, এক ঝাঁকা ফুল নিয়ে কেউ যাচ্ছে। বেল ফুলের মালা। তার ইচ্ছে হল তাকে বলে, এই বেলফুলের মালার কত দামরে? মাঝে মাঝে নির্মলা বেলফুলের মালা পরতে চায়। সব মেয়েরাই বেলফুলের মালা পরতে চায়। সংসার ঠিকঠাক রাখতে হলে কিনে দেওয়া দরকার! নির্মলা বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এলে গোপনে কলাপাতায় সে একদিন বেলফুলের মালা কিনে নিয়ে যাবে ভাবল।

অতীশ ক্যাশবুকের ওপর এই ভেবে মাথা রাখতেই ফোনটা বেজে উঠল। সেই নীরেট গণ্ডারটি নয় তো! —স্যার যাচ্ছি। টাকাটা ঠিক রেখেছেন ত! সে কোনরকমে ফোনটা তুলে বলল, বলুন।

—আমাদের ডিজাইনটা?

কেমন সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বলল, একটু ধরুন। এই জগৎ, জগৎ। অতীশ জগৎকে গলা ছেড়ে ডাকতে থাকল। ভুলেই গেছে তার বেয়ারা বাইরে বসে আছে। ভুলেই গেছে লাল নীল আলো জ্বললে, সুধীর ছুটে আসে।

সুধীর বাইরে বসেই টের পায় সব। স্যার ভাল নেই। স্যারের কিছু আজ একটা হয়েছে। সে উঠে গিয়ে বলল, জগৎদা, স্যার আপনাকে ডাকছে।

জগৎ এলে অতীশ বলল, ধর্মবীর কোম্পানীর ডিজাইনটা হয়েছে?

—ওর কোন ডিজাইনটা? ডিজাইন তো তিনটে করতে দিয়েছে।

—গঙ্গা যমুনা পাউডারের।

—হাতে দুটো ব্লকের কাজ আছে। ওটা হয়ে গেলেই।

অতীশ বুঝতে পারে আরো বেয়াড়া প্রশ্ন করলে জগৎ আরও বেশি মিছে

কথা বলবে। অনেক অজুহাত দেখাবে। সুতরাং পার্টির কাছে কথা ঠিক রাখার জন্য বলল, আজই ওটা ওভারটাইমে করে দেবে। করে দিতে হবে। যাও।

আবার অতীশ কিছুটা অন্যমনস্কভাবে বলল, আজই করে দিতে হবে। যাও তারপর ফোনটা রাখার আগে বলল, কাল আসবেন। ডিজাইনটা এপ্রুভ করে যাবেন। তারপর সে তার টেবিলে রাখা উইকলি প্রোগ্রামটা দেখে বুঝল, টিন দরকার। খোলা বাজার থেকে টিন তোলা দরকার। পিসি আর সি হলেই হবে। সে ফোন করল, হেলো, পিসি আর সি!

—হ্যাঁ স্যার।

—আপনাদের ব্ল্যাক প্লেট আছে?

—আছে।

—কত গেজের?

—পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ অ্যাসরটেড।

—দাম কি নিচ্ছেন?

—পুরো দুই স্যার।

—পঞ্চাশ কমবে না?

—হয় না স্যার। কিছু তবে থাকবে না।

অতীশ কুম্ভবাবুকে ডেকে পাঠাল। কুম্ভবাবু সব সময় ডাকলেই আসে না, একটু দেরি করে আসে। যেন বোঝাতে চায়, ডাকলেই আসা যায় না। সবাই দেখুক, এ-অফিসে তারও দাপট কম না। অর্ডার করলেই সে দাসানুদাস হতে পারে না। তারপরই এসে বলবে, দাদা ডাকছিলেন, পে-বিল করছিলাম। যেন কত কাজে মগ্ন থাকে সে।

কুম্ভ এলে একটা চেক এগিয়ে দিল।—এটা ভাঙিয়ে আনবেন। পনের তারিখে তেষট্টির সেলটেক্স/কেস আছে। কাগজপত্র সব ঠিক করে রাখবেন। ডিক্লারেশন বাকি থাকলে আদায় করে নিন। তের তারিখে আমার টেবিলে সব প্রডিউস করবেন।

কুম্ভ চোখ টান করে ফেলল। খুব বসগিরি ফলানো হচ্ছে! খুব তেজি ঘোড়া। সে এই মাত্র এসেছে পার্টির ঘর থেকে। এসেই শুনেছে বড়বাবু ঘরে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে বসে আছে। কারো সঙ্গে আজ ভাল করে কথা বলছে না। খুব গম্ভীর হয়ে গেছে। কুম্ভ শুনে বেশ প্রফুল্ল হয়ে গেল। এ-সময়ে ঘাটাঘাঁটি করা

ঠিক না। সেই লোকটা আসবে ভয়েই জুজু হয়ে আছেন। তার ভারি মজা লাগছিল। কোনদিকে সামলাও শূয়োরের বাচ্চা এবার দেখব। জাল পাতা হচ্ছে, তুমি জান না এটা কলকাতা শহর। এটা তোমার বাইনচুত জাহাজ না। কত ধূপকাঠি পোড়াতে পার দেখি। সে বলল, কিছু ভাববেন না দাদা। সব ঠিক করে রাখব।

আর এ-সময়েই অতীশ দেখল, আসছে। বেঁটে মোটা মতো মানুষ। চুলে পাক ধরেছে। গাল গলা মসৃণ। মাথায় টাক। আর বেশ ধীরে ধীরে হেঁটে আসছে। ডোরাকাটা দাগ মুখে নেই ত! অথবা পোড়া দাগ। না কিছু নেই। সামনে এলে দেখল কপালে শুধু বড় একটা আব। ঠিক মাঝ-কপালে। সেদিন সে দেখেছিল বেশ ছোট, ক'দিনেই বড় হয়ে গেছে। মাংস হাড় ফুটে বের হয়ে আসছে। গণ্ডারের মতো খড়্গ গজাচ্ছে। যেন যতদিন যাবে, লম্বা হয়ে যাবে আবটা। এবং ধারালো হয়ে উঠবে। সে লোকটি ঢোকায় সঙ্গে সঙ্গে বলল, দেখুন এখানে আমি নতুন। কার কি প্রাপ্য ঠিক জানি না। আপনি সেদিন টাকা চাইলেন দিতে পারলাম না।

বাবুটি অসভ্যভাবে হাই তুলছিল। অতীশের কথাবার্তা কর্কশ হয়ে যাচ্ছে। ভেতরে কেমন জ্বর জ্বর ভাব। সে দেখল অজগর সাপেরা বাবুটির মুখে অনায়াসে ঢুকে যাচ্ছে। অতীশের শরীর গোলাচ্ছিল। কোনরকমে বলল, এ-ব্যাপারে ওপরয়ালার সঙ্গে কথা বলেছি।

—তিনি কি বললেন ?

—আপনারা পেয়ে থাকেন।

—আপনি নতুন আছেন।

—খুব নতুন বলবেন না। কুম্ভ পাশ থেকে বলল।

লোকটির আবার হাই উঠছে। কি জ্বালা! মানুষের এত হাই ওঠে কি করে। হাই ওঠা সংক্রামক ব্যাধির মতো। অতীশেরও হাই উঠতে থাকল।

লোকটি বলল, আপনি ত, এ-লাইনে নতুন ?

অতীশ স্বাভাবিক হতে চাইল। বলল, সব খবর রাখেন দেখছি।

—সব খবর রাখতে হয় স্যার। স্কুলে ছিলেন, বেশ ত ছিলেন। এখানে মরতে এলেন কেন ?

সেই এক কথা। স্কুলে যে এখন আর সবুজ মাঠ গাছপালা কিংবা সবুজ শস্য ক্ষেত্র নেই সেটা সে বলতে পারল না। তার মুখটা সহসা খুব কাতর দেখাল।

একজন সহকারী শিক্ষকের কাজ মোটামুটি মন্দ না। কিন্তু তা সে পাবে কোথায়! আর কতদূরে। তার মিণ্টু টুটুল বড় হয়ে উঠতেই সে কোন নিরিবিলি গ্রাম্য-জীবনের কথা আর ভাবতে পারে না। অসুখ-বিসুখ আছে। পড়াশোনা আছে। এই শহরেই তা সুলভ। কলিকাতা কলকাতা বলে সে দুবার মন্ত্রপাঠের মতো বিড়-বিড় করল কিছু।

কুন্তবাবু এতক্ষণে বাবুটির জন্য চা এবং মিষ্টি আনার অর্ডার দিয়ে দিয়েছে।

অতীশ মাথা গোঁজ করে বসেছিল। মাথার ভেতরটাতে যেন আগুন জ্বলছে। সে মাথা গোঁজ করে সেই আগুন থেকে রক্ষা পেতে চাইছে।

—আপনার সঙ্গে দেড়শ টাকায় রফা হতে পারে। দু'বছরে তিনশ টাকা দেবেন। পরে পঞ্চাশ করে দিলেই চলবে।

অতীশ কপালটা টিপে ধরল। শরীরে মনে হচ্ছে জ্বর আসছে। আর এ-সময় অযথা জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকতে ইচ্ছে হচ্ছে। কাছাকাছি সেই বেশ্যালয়ে গেলে কেমন হয়। বেশ্যালয়, হারামি, শয়তান ইতর অথবা টাকার গীদর এমন সব শব্দমালা, গলার কাছে ধরে আছে কেউ। কুষ্ঠরুগী শিবপূজন লাঠির ওপর ভর করে হাঁটার চেষ্টা করছে। চোখ মুখ বীভৎস। ফুলে ফেঁপে আছে কেমন। ভয় ধরে যায়। যেন অতীশ নিজেই কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত। সে হাতের আঙুল দেখতে থাকল। কানের লতি ধরে দেখল। ফুলে উঠছে নাত! চুলকাচ্ছে। নাকের ডগা চুলকাচ্ছে। টের পাওয়া যায় না কখন কোথা থেকে আক্রমণ ঘটবে—এবং সে নিজেই বসে আছে একা এক শূন্য ঘরে। কেউ নেই। মিণ্টু টুটুল নির্মলা কেউ নেই। ভয়ে তারা পালিয়েছে। সে ভীতু বালকের মতো চোখ মুখ করে আর একবার কর্পোরেশনের বাবুটির মুখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করল। স্বাভাবিক হতে চাইল। গা ঝাড়া দিল। তবু সংক্রামক ব্যাধির মতো আত্মায় কারা পেরেক পুঁতে দিচ্ছে। শুধু অন্তহীন এক অন্ধকার জীবনের গাক্সিলতি নামে এক পাপের ভাণ্ডারে তাকে কেউ নিক্ষেপ করছে। পাপ খণ্ডনের কি উপায় সে জানে না। এক পাপ থেকে আর এক পাপ তাকে পাগলা কুকুরের মতো তাড়া করছে।

বাবুটি বলল, আপনার শরীর ভাল নেই মনে হচ্ছে।

অতীশ এবার বাবুটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর সেই এক অন্যমনস্কভঙ্গীতে বলা, না ভালই আছে। সে দেখল, অজগর সাপের লেজটা বাবুর মুখে টিকটিকির লেজের মতো নড়ছে। লেজ ধরে সাপটাকে টেনে বের

করবার স্পৃহাতেই সে যেন উঠে দাঁড়াল। তারপরই কেমন হুঁশ ফিরে আসে। যেন বাবুটি বলছে, ওটা ঠিকই আছে। ওকে টানবেন না। টানলে অনর্থ ঘটবে। বসে পড়লে কুম্ভ বলল, দাদা আপনার চোখ এত লাল কেন? রাতে ঘুম হয় নি বুঝি।

অতীশ বলল, ঠিক জানি না। অতীশের কোন কথাই বলতে ভাল লাগছিল না। স্ত্রীর রুগ্ন শরীর ফ্যাকাসে। চোখের নিচটা সব সময় ফুলে থাকে। এই সব দৃশ্য অতীশকে তখন কাতর করছে!

তখন একটা পুরো পানামা প্যাকেট কুম্ভ টেবিলের ওপর রাখল। বাবুটি বলল, চলে না। সে তার নিজের পকেট থেকে উইলস বের করে বলল, চলে?

অতীশ বলল, না।

তারপর আর কি কথা বলা যায়। বাবুটি যেন কথা খুঁজে পেয়ে গেল, বলল, বড্ড প্যাচ প্যাচে বৃষ্টি। আর ভাল লাগছে না। এবারে রোদ উঠুক।

অতীশ বলল, রোদের দরকার। সে ক্যাশ থেকে তিনশ টাকা গুনে টেবিলের উপর রাখল। আর তখনই সুদূর থেকে যেন কেউ ডেকে উঠল, বাবা বাবা!

ডাকটা ক্রমে এগিয়ে আসছে, বাবা! বাবা! টুটুল ভয় পেয়ে কোন দুঃস্বপ্ন দেখে যেন ডাকছে, বাবা বাবা! সে পেছনে তাকাল! আবার কেউ ডেকে যাচ্ছে বাবা বাবা! এ মুহূর্তে কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি ত। বাসের চাকার নিচে টুটুল চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে। নির্মলা চুপ হয়ে গেছে। বাস থেকে নামতে গিয়ে এই কাণ্ড। সে চিৎকার করে উঠতে চাইল, টুটুল তোমাকে কি কেউ খুন করেছে। তুমি আর্তগলায় ডাকছ কেন!

বাবুটি বলল, বড় খাম আছে?

অতীশ কোন কথা না বলে, খাম বের করে দিল।

কুম্ভ গোছগাছ করে টাকাটা খামে ভরে বলল, কি যে উপকার করলেন!

অতীশ কোন আর কথা বলছে না। এ-সময় কেউ ডাকে কেন! কে ডাকে! টুটুল তুমি ডাকছ? আমি বাবা, আমি তোমার বাবা। আমি মানুষ নেই। গণ্ডার হয়ে যাচ্ছি বলে তুমি ভয় পাচ্ছ! না কি সত্যি কোন দুর্ঘটনা। তোমার দাদুর মতো দূরের কিছু কি আমি টের পাই। অতীশ কেমন চঞ্চল হয়ে পড়ল।

বাবুটি তখন সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে বললেন, ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে। সেই যেন স্যালি? হিগিনসের কথাবার্তা। ডোণ্ট বি অ্যাফ্রেড। উই আর

ওনলি ক্যারিং দ্য ক্রস। ভারবাহী জন্তুর মতো এই জীবন। শুধু পিঠে ক্রস বয়ে নিয়ে যাওয়া।

অতীশ মাথা তুলতে পারছে না। ভেতরে ছটফট করছে। যদি কোন পাপ কাজ করিয়ে নিয়ে আর্চি প্রতিশোধ নিতে চায়। এবং সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ডাকছে, বাবা বাবা। বাবা তুমি তো এমন ছিলে না। অতীশ তাড়াতাড়ি করতে চাইছে। এক্ষুনি বের হওয়া দরকার। না কি একবার ফোন করে দেখবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সে ফোন তুলে বলল, হ্যালো! কে?

—আমি বিমলা।

—ও বিমলা! শোন, টুটুল ওরা পৌঁছে গেছে?

—হ্যাঁ এই ত এল! দেব দিদিকে?

—না থাক। বলে ফোন ছেড়ে দিতেই সে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তারপর মাথা নিচু করে রাখল, জীবনে সৎ থাকার সব প্রয়াস এক অতর্কিত আক্রমণে মুছে যাচ্ছে। আর এ-সময়ই সেই বিদ্যালয়ের সম্পাদকের মুখটি মনে পড়ল। ঠিক যেন এই বাবুটির মতো, এক বিরাট অজগর গিলে বসে আছে। অতীশ লেজ ধরে টানতেই সম্পাদক মশাই তেরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, ওটা টানবেন না। অনর্থ ঘটবে।

অতীশ বলেছিল, তা হয় কি করে?

সম্পাদক বলেছিলেন, হয়। সব হয়। জানতে পারেন না। সরকার থেকে অনুমোদিত টাকা ফলস ভাউচার করে খরচ দেখান এবং টাকাটা তুলে নিন। তারপর হাসতে হাসতে বলেছিলেন, বলুন তো টাকাটা তারপর কোথায় রাখবেন?

অতীশ বলেছিল, জানি না।

সম্পাদক মশাই হা হা করে আবার হেসে উঠেছিলেন। কিছুই জানেন না দেখছি। ওটা আমার নামে ডোনেশান দেখাবেন। ডোনেটেড বাই ভুজঙ্গ-ভূষণ মজুমদার। ব্যস হয়ে গেল। বাবার নামে ইস্কুল। ডোনেশান কুড়ি হাজার থেকে বেড়ে বাইশ হাজারে দাঁড়াবে! লোকে বলবে, বিদ্যার সাগর দয়ার সাগর তুমি বিখ্যাত ভুবনে। শেষ কথাটা না বললেও অতীশ বুঝেছিল, জেলা সমাহর্তাকে সভাপতি নির্বাচন, তারপর আরও কিছু হোলসেল ডিলারশিপ। ব্যবসায়ী মানুষ! আখের ছাড়া তাঁর জীবনে আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই।

অতীশ বলেছিল, ফলস ভাউচার হবে না। অতীশ যথার্থই লেজ ধরে টান দিয়েছিল।

—তবে চলে যেতে হবে। ব্যবসায়ী সম্পাদক অমায়িক হেসে কথাটা বলেছিল। প্রভাব এবং প্রতিপত্তির কাছে অতীশ শেষ পর্যন্ত হেরে গেল। সে এখানেও হেরে গেল! তার এখন হুহু করে গায়ে জ্বর আসছে। সে শীতে কেমন কাঁপতে থাকল।

বাবুটি তখন তার সামনে বসেই হেলথ লাইসেন্স ইস্থ করছে। ট্রেড-লাইসেন্স পরে পাঠিয়ে দেবেন, এমন বলে তিনি টাকাটা সযত্নে ব্যাগে ভরে নিচ্ছেন প্রসন্ন হাসি মুখে। কুম্ভ চুপচাপ মজা উপভোগ করছে।

আর তখুনি ফোনটা ঝমঝম করে বেজে উঠল। যেন সব নড়বড়ে করে দিয়ে ফোনটা ক্রমাগত বাজছে। অতীশ আর পারছে না। অতীশ ফোনের দিকে হাত বাড়াল। বলল, বলুন! অ তুমি! বল বল।

—আজ আসবি একবার।

—কুম্ভ বলল, কার ফোন দাদা?

—অমলার। যেন কতকাল রোগভোগের পর অতীশের গলার স্বর আর স্বাভাবিক নেই।

॥ একুশ ॥

ওরা দু'জন পাশাপাশি বসেছিল। দুমবার গাড়ি চালাচ্ছে আজ। শহরের পাশেই গঙ্গা, গঙ্গার ওপারে চটকল, জেটি, চিমনি এবং পাখিদের উড়ে যাওয়া। আকাশে কোন মেঘমালা নেই। মেঘের ভাসাভাসি নেই। মানুষজন গাড়ি ট্রাম বাস নিত্যদিনের মতো চলাফেরা করছে। অমলা তাকে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে। সে অমলাকে প্রশ্ন করেছিল, আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? অমলা আড়চোখে তাকিয়ে বলেছিল, ভয় পাচ্ছিস! মেরে ফেলব না। অমল আরও কত কথা বলেছিল। যেন অতীশ এক সুবোধ বালক, কিছু বোঝে না, জানে না। কলকাতার কিছুই চেনে না। এই হর্ম্যমালার মধ্যে কত বিচিত্র মানুষ, বিচিত্র জীবন, চোখ খুলে ছাখ। জাদুঘর, হাওড়ার পুল, লাট ভবন, গড়ের মাঠ, এবং রেড রোড, তারপর সেই ফোর্ট উইলিয়ামের দুর্গ—সবটাই এক মায়াবী জগৎ। জাহাজে যাবার আগে এই রাস্তায় তার মনে হয়েছিল একবার, অমলা কমলা কত বড় হয়েছে কে জানে! অমলা কমলা এই শহরেই থাকে।

এক একটা কারণেই কলকাতাকে তার নিজের শহর মনে হয়েছিল সেদিন। না হলে, পৃথিবীর সব শহরের মতোই কলকাতা তার কাছে দূরের নগরী। সহজেই নামগোত্রহীন হয়ে যাওয়া যায় এখানে এলে। সে সেদিন নামগোত্রহীন এক তরুণ, তবু শহরটা অমলের কথা ভেবে ভারি মায়াবী লেগেছিল।

বিড়ালা প্ল্যানেটরিয়ামের পাশ দিয়ে গাড়ি বাঁক নিল। অমলা বলল, চিত্রাঙ্গদা নাটক দেখতে যাচ্ছি। একা ভাল লাগছিল না।

—রাজেনদা ?

—তোর দাদার তো কত কাজ। একদম সময় পায় না। বিকেলের ট্রেনে মাইনসে গেছে।

অতীশ জানে, এদের এখনও কিছু খনি এলাকা আছে। ভাল আয়। তবে বিহার সরকারের সঙ্গে লিজ নিয়ে কি খটমট চলছে। ক'দিন বাদে বাদেই হেডঅফিসের বাবুরা দৌড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে রাজেনদা যায়। রাজেনদার সেক্রেটারি দেবেনবাবু সঙ্গে থাকেন। সেখানে গেস্টহাউজ আছে। একবার তাকেও সঙ্গে নিতে চেয়েছিল। সব যাওয়ার পরও কত বড় অধীশ্বর তিনি তাকে যেন তাই দেখাতে চেয়েছিল। অতীশ বলেছিল, আপনি ত প্রায়ই যান, একবার গেলেই হবে। এবং অদ্ভুত সব কথা কখনও রাজেনদার, তখন মনেই হয় না এই মানুষটা তার অধীশ্বর, এই মানুষটা আগামীকাল তাকে ভিখিরী বানিয়ে দিতে পারে। বুঝলে ভাইয়া, সব চোখ কান খোলা রেখে দেন। তোমার কিছুটা গ্রাম্যতা আছে। শহরে ঘুরে ফিরে সব দেখ। আমার সঙ্গে চল। সাঁওতাল এলাকায় নিয়ে তোমাকে ঘুরব। রসদ পাবে। কলকাতা নিয়ে লেখার কিছু নেই। এখানকার মানুষ বড় অন্তঃসারশূন্য। তার স্ত্রী এই অমল। মেজাজ মর্জি বোঝা ভার। অফিসে সারাটাক্ষণ সে যে দুর্ভাবনার মধ্যে ছিল, অমলের গাড়িতে উঠতেই তা হাওয়া। অমল আজ বড় হাসিখুশি। ওর নাক ঘামছিল। নাক ঘামলে মেয়েদের বড় সুন্দর লাগে দেখতে। নাকে মুক্তোর নাকছাবি জ্বলজ্বল করছে। হাতে দুগাছা সোনার চুড়ি আর সেই হীরের আংটি এবং মুখে কেমন নীলাভ রঙ। তার হাত ধরে বলেছিল, আয়। যেন এমন ডাক কতকাল সে শোনে নি। এমন অন্তরঙ্গ আপ্যায়ন থেকে সে কতকাল বঞ্চিত।

অতীশ বলল, আমার নাটক দেখতে ভাল লাগে না অমল !

—তবে কোথায় যাবি ?

—কোথায় যাব জানি না। আমি ভেবেছিলাম, কোন জরুরী কথাবার্তা আছে, তাই ডেকেছ।

—সব সময় জরুরী কথাবার্তা থাকতেই হবে তার কি মানে আছে! আমার সঙ্গে একবেলা ঘুরতেও তোর কষ্ট। তা-ছাড়া জরুরী কথাবার্তা তোর সঙ্গে আমার কী হতে পারে! অতীশ চুপ করে থাকল।

অতীশ সামান্য আলগা হয়ে বসেছে। রাজবাড়ির গাড়িতে বৌরানীর সঙ্গে অন্য কেউ যাচ্ছে ভাবাই যায় না। এটা বাড়ির মর্যাদার প্রশ্ন। কিন্তু অমল রাজবাড়িতে তাকে তুমবারের পাশে বসিয়ে নিয়েছিল। রাজবাড়ি পার হয়ে যখন গাড়ি এয়ার ইণ্ডিয়া অফিসের কাছাকাছি এল, তখনই অমল বলল, গাড়ি থামাও তুমবার। তারপর তুমবারকে পেছনে পাঠিয়ে অমল নিজেই স্টিয়ারিং ধরল। এদিক ওদিক ঘুরল শহরের। একটা হোটেলে রিসিপসানিস্ট মহিলার কাছে গিয়ে কি বলে এল। তারপর রবীন্দ্রসদনের সামনে আসতেই আবার গাড়ি থামিয়ে তুমবারের হাতে স্টিয়ারিং দিয়ে দিল। কিন্তু তারপর অতীশের কথাবার্তা শুনে কি ভাবল কে জানে, সে কিছুটা গিয়েই ফের বলল, তুমবার তুমি বাড়ি চলে যাও। অতীশকে নিয়ে তোমার কমলা বহিনজির কাছে যাচ্ছি। শঙ্খকে বলে দিও, আমরা ওখানেই খাব। নধরবাবুকে বলে দিও, আমার ফোন এলে যেন বলে কমলের বাড়ি গেছি।

অতীশ সব শুনছিল। অমল এত সুন্দর কথা বলতে পারে, অমল এত রূপবতী যুবতী যেন হাত দিলেই কোন মিউজিকের মতো বেজে উঠবে সে। নির্মলার জন্য ভারি কষ্ট হতে থাকল। নির্মলা তাকে ফেলে চলে গেছে।

রেসকোর্সের পাশে এসেই অমলা বলল, গাড়ি চালানোটা শিখে নে না!

—কে শেখাবে?

—কেন আমি।

—তাহলেই হয়েছে।

—তুই কি ভাবিস্ বলত! গাড়ি কি ঠিক চালাচ্ছি না!

—গাড়ির আমি কিছু বুঝি না অমল।

—ক'দিন এলেই হবে।

—তোমার ত ড্রাইভার অনেক। কাবুলবাবু আছে। তাছাড়া বাড়তি আবার আমাকে কেন!

—এই মারব। তুই আমার ড্রাইভার হবি বলেছি!

অতীশ বলল, আমি এখন সব কিছু হতে রাজি অমলা। যেন সেই পাপ থেকে আরও বড় পাপে ডুব দেবে বলে সে কঠিন মুখ করে রাখল।

—একদম মুখ গম্ভীর করবি না। আয় এখানটায় হাঁটি। বলে দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে এল। খোলা আকাশের নিচে বালিকার মতো করছে অমল। এই আয় না। দৌড়াই।

—লোকজন আছে। তুমি রাজবাড়ির বৌ!

—কেউ চেনে না। বাড়ির পাশের লোকই খবর রাখে না আর এখানে! এই আয়। তোর বৌ চলে গেছে বলে মন খারাপ!

—ওতো বাপের বাড়ি গেছে!

—ওর কি অসুখ রে?

অতীশ এই কথার জবাবে বলতে পারত অনটনের অসুখ। আমার চলে যায়। কিন্তু ওর চলে যায় না। মিণ্টুকে ভাল ইস্কুলে দিতে না পারায় ক্ষোভ রয়ে গেছে ভেতরে। নীলরঙের গাড়ি আসবে, গাড়িতে মিণ্টু ইস্কুলে যাবে, আবার নীলরঙের গাড়ি আসবে, গাড়ি মিণ্টুকে দিয়ে যাবে—নির্মলা তাই চেয়েছিল। আমার ক্ষমতার বাইরে। নির্মলা হাত ধরে নিয়ে যায়, আবার হাত ধরে নিয়ে আসে। নির্মলা এটা চায় না। নির্মলার ভেতরে কষ্ট। সে বলল, অসুখটা কি জানি না। মাইনর অপারেশন দরকার। তবে এখনও নাকি সময় হয়নি।

—অপারেশন কোথায়?

অতীশ সোজাসুজি বলল, জরায়ুতে।

অমল বলল, তোর খুব কষ্ট।

—আমার কষ্ট হবে কেন?

—তুই পুরুষমানুষ না?

—অমল!

—চল হাঁটি।

খোলা মাঠ সামনে। সবুজ ঘাস। দূরে দূরে গাছপালা। টাটা সেণ্টারের অতিকায় বাড়ি। কাচের ঘর, সারি সারি সব অট্টালিকা রঙ-বেরঙের এবং মাথার ওপরে নিরন্তর আকাশ। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, লাল আভা, অদূরে কোথাও জাহাজের মাস্তুলের মাথায় লম্ফ জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নামাজ পড়ছে কেউ ডেকে। পুরানো এক জীবন, নীল জলরাশি, অমল হেঁটে যাচ্ছে বালিকার মতো। কার্পেটের চটি পায়। নরম সবুজ ঘাসে ওর পায়ের ছাপ। সুদূরের শ্যাওলা ধরা

ঘরের বালিকার এখন শরীরে অনন্ত যৌবন। গোপন অন্তর্যামীর মতো সে কোন পোকার আশ্রয়ে অমলের উরু বেয়ে এখন ওপরে উঠে যাচ্ছিল। যত যাচ্ছিল, তত শীত শীত করছে। হাত-পা ঠাণ্ডা। জ্বর আসছে মতো। সেই রাস্তার লোকটির বেলাতেও তার ভারি শীত করছিল। এখন আবার শীতটা জাঁকিয়ে বসছে। যত উরু থেকে জঙ্ঘার নিকটবর্তী হচ্ছে পোকাটা, তত সে কেমন ভিতরে ভিতরে কাঁপছিল। অমল তুমি আমাকে মেরে ফেলতে পার। মিহি নরম রাবারের মতো যা কিছু আমায় ছুঁতে দিয়েছিলে, সে এখন কেমন আছে অমল। সে অমলের সঙ্গে যেন হেঁটে পারছে না! তার পা স্থবির হয়ে আসছে কেন। সে এখানেই মাথা-কাতা ঘুরে পড়ে যেতে পারে। পোকাটা গম্ভীর চালে এগিয়েই যাচ্ছে। সে সহসা ডেকে উঠল, অমল!

অমল পিছন ফিরে দেখল। এবং ওর আঁচল শ্লথ। সুন্দর বর্ণমালার মতো সে অধীর চোখে তাকিয়ে বলল, তোর শরীর খারাপ।

—আমার শীত করছে অমল।

অমল কাছে এসে ওর কপালে হাত দিল। কিছু বুঝতে পারল না। ভেতরে কিছু হচ্ছে অতীশের। সে এবার আরও সংলগ্ন হয়ে গাল ঠেকাল অতীশের গলায়। উষ্ণতার রকমফের টের পেতে গিয়ে বুঝল, অতীশের তাপ উঠেছে! বড় সুসময়।

অমলা বলল, তা বোস।

অতীশ বসল না। বলল, আমি যাব।

—কোথায়!

—আমার কাজ আছে।

—আজকের মতো কাজটা থাক। তোর মন ভাল নেই। অফিসে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে বসেছিলি! তোর কেন এটা হয়। প্রেতাত্মা তোকে নাকি তাড়া করে।

—প্রেতাত্মা?

—নির্মলা যে বলল!

—কি বলেছে নির্মলা?

তখনই অমলের মনে পড়ল, নির্মলা সতর্ক করে দিয়েছে, ভারি গোপন, কেউ জানে না! মাঝে মাঝে আপনার ভাইপো আর্চি বলে কাউকে ডাকে। কোন এক অদৃশ্য শত্রু এই আর্চি। অতীশ বুঝতেই পারে না, সে কখনও আর্চি বলে

ডাকে। সে ত তখন কোন কথাই বলতে পারে না। যা কিছু কথাবার্তা তার ভারি গোপনে। মনে মনে! অথচ নির্মলা অনেকদিন শুনেছে, অতীশ বলছে, আর্চি তুমি আমাকে মুক্তি দাও।

অমলার প্রশ্ন, আর্চিটা কে?

—তা বলে না।

—তুমি বৌমা কঠিন হতে শেখনি।

নির্মলা বলেছিল, আপনি কিন্তু আবার ওকে ওসব বলতে যাবেন না পিসিমা।

—আরে না।

এখন অমলা বুঝতে পারল, তার কথাটা বলা ঠিক হয়নি। সে বলল, তুই এত কষ্ট পাস কেন?

—কষ্ট পাই? কোথায়!

—আমি সব বুঝি। সংসারটা সরল নয় এও বুঝি। ছেলেপেলে হয়েছে, বুঝে চলতে শেখ। তোর কিছু হলে ওরা তো ভেসে যাবে।

অমল প্রায় এবার ওর হাত ধরে জোর করে বসিয়ে দিল। শোন, আমার কথা ভেবে দেখ। আমিও ভাল নেই। কই আমি তো তোর মতো মুখ গোমড়া করে রাখি না। মাথা খারাপ করি না।

অমলা ভাল নেই কথাটা শুনে অতীশের কেমন হাসি পেল। শরীর জ্বলছে অমলার। সারা শরীরে আগুন। যে কেউ এই যুবতীকে একা গোপনে পেলে এখনই ধর্ষণ করতে পারে। সে যত সাধু-সন্ত হোক, ভাল মানুষ হোক, তার উপায় নেই। পতঙ্গের মতো উড়ে এসে পড়বেই। এবং এই অগ্নিকুণ্ডের চার-পাশে সে এখন পতঙ্গের শামিল। নির্মলা যদি জরায়ুতে অসুখ না বাধাত। আসলে মানুষের রক্তে গোপন এক জন্ম রহস্যের মন্থন চলছে। সে বার বার প্রকাশ পেতে চায়। বার বার তার অধীর আক্রমণ। আক্রমণ করতে না পারলে ভেতরের রক্ত কণিকা মরিয়া হয়ে ওঠে। ক্ষেপে থাকে। যে-কোন দুর্গম পথই সুগম করে তোলে। সে এ-মুহূর্তে আর্চির চেয়ে কম দুরাত্মা নয়। আসলে এটাই বোধহয় অমলের কাছে ভাল না থাকা।

সে বলল, আমি ভাল আছি অমল। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও।

—আর্চিটা কে বল? না বললে ছাড়ছি না।

—তুমি চিনবে না ওকে। বললেও বুঝতে পারবে না!

—তোর মনে আছে?" বলেই অমলা কেমন মাথা নিচু করে দিল।

—কার কথা বলছ ?

—যেদিন শ্যাওলা ধরা ঘরটায় তোকে নিয়ে গেছিলাম ?

—মনে আছে। অতীশও মাথা নিচু করে দিল।

—সে-রাতে তুই দুঃস্বপ্ন দেখেছিলি ?

—মনে আছে।

—সকালে নদীর পাড়ে হেঁটে গেছিলি।

—মনে আছে।

—কেন গেছিলি বল ?

—তখন একটা বিশ্বাস ছিল। তখন বড়দের সব কথাই মনে হত সত্যি কথা। মা বলতেন, দুঃস্বপ্ন দেখলে জলের কাছে নদীর কাছে সব বলে দিস। কোনো অমঙ্গল হবে না। দুঃস্বপ্ন সত্য হবে না।

—এখনও তাই। যা দেখিস, প্রিয়জনকে বল। আমি যদি না হই, নির্মলা, নির্মলা না হলে ভূইঞা দাদু। বাড়িতে এত সব পুণ্যবান মানুষ থাকতে তুই আহাম্মকের মতো কষ্ট পাচ্ছিস কেন ?

অতীশ কিছু বলল না। সে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। অমলের ভ্রূ প্লাক করা। মিহি নরম ডিমের কুসুমের মতো ভ্রূতে লাবণ্য। সারা মুখে শরীরে এই আগুনে রঙ এবং মুখশ্রীর সুষমা তার শরীরে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছে। কতদিন যেন সে নদী পার হয়ে বড় মাঠে যায় না। কতকাল যেন সে একা বসে আছে কোন নির্জন গাছের নিচে। অমলা সেই গাছের নিচে এসে হাত-পা মেলে দিয়েছে। কোন ব্যালেরিনার মতো নেচে নেচে যাচ্ছে। হাত তুলে, পা তুলে স্কি করছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোন বসন নেই, ভূষণ নেই। নারীর নগ্ন রূপ তাকে বড় কাতর করে। চোখ বুজলেই সে সব হুবহু দেখতে পায়। শীত আরও বাড়ে। আর তখনই শুনতে পায় কেউ ডাকে, বাবা। বাবা তোমার শীত করছে! বাবা আমি বুকে তোমার মুখ রাখব। তুমি উষ্ণতা টের পাবে। শীত করবে না। কার গলা! অবিকল মিণ্টু, সরল শিশু, বাবাকে ছাড়া থাকতে পারে না। কষ্ট হয়। বাবার ফিরতে দেরি হলে জানালায় ওরা উঠে দাঁড়িয়ে থাকে। বাবাকে দূর থেকে দেখতে পেলেই নাচতে শুরু করে দেয়। আমার বাবা, আমার বাবা।

আর অমল তখনই দুম করে বলে ফেলল, অতীশ, তুই আমার বাল্যসখা। ভেবে দেখ, সেই বয়সে তেমন কিছু বুঝতাম না। তোকে দেখে আমি কেমন

হয়ে গেছিলাম। তোকে দেখতে না পেলে কষ্ট হত। গোপনে সারা বাড়িতে তখন তোকে খুঁজে বেড়াতাম। কাছারি বাড়ি থেকে কমল তোকে ধরে আনত।

অতীশের সবই মনে পড়ছে। সেই গোপন গভীরে তারপর কেমন ভয় সংকোচ, পাপবোধ, সন্ধ্যায় একা একা নদীর পাড়ে দীঘির ধারে বসে থাকা। পিলখানায় পাগল জ্যাঠামশাইর হাত ধরে চলে যাওয়া। মনে বড় শঙ্কা। কিছু একটা ঘটবে। মাকে ছেড়ে দূরবর্তী এক জমিদার প্রাসাদ তখন বনবাসের মতো। কেবল ভয় তার পাপে মার যদি কিছু হয়। সে হয়ত গিয়ে মাকে আর দেখতে পাবে না। ঈশ্বর রাগ করেন যদি। রাগ করলে তার যাবার মতো মা। মা বাদে সে পৃথিবীতে তখন আর কিছু বুঝত না। এবং রাতে সেই দুঃস্বপ্ন। সাদা চাদরে ঢাকা মার শরীর। শীতকাল। কুয়াশা উঠোনে। মাকে বের করে রাখা হয়েছে উঠোনে। সে কাঁদছে না। যেন মা বলছে সোনা তুমি এটা কি করেছ। তুমি খারাপ হয়ে গেলে কেন! আমি চলে যাচ্ছি। সাদা চাদরে মার পা ঢাকা নেই। শীত করছে। পায়ে ঠাণ্ডা লাগছে। সে মার পা দুটো চাদর টেনে ঢেকে দেবার সময়ই মুখটা বের হয়ে এল। স্থির চোখ। ঘুমিয়ে নেই। আকাশ দেখছে মতো তাকিয়ে আছে। এবং তখনই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। জ্যাঠামশাই ডাকছে, ওঠ সোনা। হাত-মুখ ধুয়ে নে। সে উঠেই কাঁদতে বসেছিল। তারপরও কি কান্না।

জ্যাঠামশাই বলেছিলেন, বাড়ির জন্য মন খারাপ করছে। কাল দশমী। তার-পরই চলে যাবি। অলিমদ্দি নৌকা নিয়ে আসবে।

কমল এসে বলেছিল, ও মা তুই কি ছেলেরে? মার জন্য কাঁদছিস। আমরা মাকে ছেড়ে এসে থাকছি না। মাকে ছেড়ে থাকতে আমার, দিদির কষ্ট হয় না! আমরাও তো বাবার ছুটি শেষ হলে চলে যাব। তারপরই সেই ঘটনা। অতীশের সব মনে পড়ছে। দশমীর রাতে হাতিতে দশহরা দেখতে যাবার কথা। বিসর্জনের বাজনা বাজছিল। প্রতিমা বিসর্জন যাবে। হাতির পিঠে চড়ে ওরা যাবে দশহরা দেখতে। কিন্তু কিসে কি হয়ে গেল। হাতি আর এল না। অমলা কমলাকে সে আর দেখতে পেল না। কোথাও একটা কিছু হয়েছে। পরে সে জেনেছিল, সে-রাতেই অমলার মা মারা যায়।

অতীশ মুখ তুলে এবার বলল, সকালেই শুনলাম তোমরা চলে গেছ ভোর রাতের স্টিমারে। মাকে তুমি হারিয়েছ।

মার কথা আসতেই অমলের চোখ ছলছল করে উঠল। বলল, ওটা কি আমার পাপে ?

—ঠিক জানি না অমল। কোন পাপে কি হয় জানি না।

অমল বলল, মার একটা প্রিয় হেমলক গাছ ছিল ? ফাঁক পেলেই তার নিচে চুপচাপ বসে থাকতেন। কার জন্য যেন তার নিশিদিন অপেক্ষা। সে আসবে। সেটা কে আমরা জানতে পারি নি। বাবাও জানতেন না। বোধ হয় মার কাছে সেই ছিল ঈশ্বর। শেষ দিকে বুঝি বুঝতে পেরেছিলেন, সে আর আসবে না। মা বিছানা নিলেন। আমরা কলকাতায় ফিরে মাকে আর দেখতে পেলাম না। আমার পাপে হয়েছে আমি বিশ্বাস করি না !

অতীশ বলল, কত ছেলেমানুষ ছিলাম। এখন বুঝতে শিখেছি তিনি কেউ নন। তিনিও মানুষের সৃষ্ট আর এক প্রেতাত্মা। আমি তাকে ভয় পাব কেন ?

—কার কথা বলছিস রে ?

—এই জুজুর ভয়ের কথা। তাকে আমি আজীবন অগ্রাহ্য করে যাব।

—কেন কেন ?

গলায় ভারি আগ্রহ অমলের।—মানুষের এত বড় আশ্রয়কে তুই অগ্রাহ্য করবি। তুই কি কম্যুনিস্ট। কাবুল বলছিল ওর দাদাকে, তোমরা শেষ পর্যন্ত একটা পাঁড় কম্যুনিস্টকে ধরে এনেছ !

—আমি কম্যুনিস্ট !

—কাবুল কুম্ভ রাজবাড়ির সবাই তাই ভাবছে। তোর রাজেনদা এটাকে বড় ভয় পায়। আমাকে বলল, ছ্যাশের পোলার খবর রাখ !

অতীশ বলল, অমল জীবনে সে-সময় পাইনি। ঈশ্বর বিশ্বাস না থাকলেই কম্যুনিস্ট হওয়া যায় জানতাম না।

—ওরা তাই বলছে। তুই এসেই শ্রমিকদের পক্ষে ওকালতি করছিস। ঘুষ দিতে চাস না। দু নম্বরী মাল বন্ধ করেছিস। এ-সব করলে চলবে কি করে ! রাজেনের ত আর জমিদারী নেই, বছর বছর লোকসান দিয়ে যাবে। কোটা বের করতে হলে ঘুষ দিতে হবে, ইমপোর্ট লাইসেন্স পেতে হলে ঘুষ দিতে হবে। না দিলে খোলা বাজার থেকে বেশি দামে মাল কিনতে হবে। তুই ভেবে দেখেছিস সব। এমনিতেই রাজেনের ভয় যা দিনকাল তাতে সে কমনার হয়ে যাবে। রাতে ভয়ে ঘুমায় না। ব্যবসায় যদি কিছু হয় এই ভেবে তোকে আনা।

অতীশ বুঝতে পারছে এটা কুম্ভর কাজ। কম্যুনিস্ট বলে চালিয়ে দিতে

পারলে তার আখের তাড়াতাড়ি খুলবে। দিন রাত ফেউয়ের মতো লেগে থাকলে সে যে কি করে! এ-সময় তার মেজাজ রুক্ষ হয়ে উঠল। সে বলল, এই তোমার বলার ছিল!

—আরে না না।

অতীশ উঠে পড়ল। অমল তাকে ধরার জন্য যেন নিজেও উঠে পড়ল। প্রায় ছুটে ছুটে যাচ্ছে। আকাশে জ্যোৎস্না সামান্য। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। জোর হাওয়ায় অমলের বব করা চুল স্বর্ণলতার মতো দুলছে। এবং স্তন ভারি মজবুত। জ্যোৎস্নায় তা আরও রোমহর্ষক হয়ে উঠছে। এই সব দেখলেই শুনতে পায় কেউ ডাকে, বাবা বাবা। সে বলল, অমল, তুমি আর যাই কর, আমাকে এক পাপ থেকে আর এক পাপে নিয়ে যেও না। তাহলে আমার শিশুরা বড় অসহায় হয়ে পড়বে।

সে বুঝতে পারছে যত দিন যায় মা-বাবা দূরে সরে যায়, দূর থেকে আবার কারা হেঁটে আসে। কাছে দাঁড়ায়। দু হাত বাড়িয়ে দেয়, এই যে বাবা আমরা। মানুষ বুঝি একা বেঁচে থাকতে পারে না। এদের ফেলে সে আর কোথাও যেতে পারবে না। অমলের শরীরে যতই আকর্ষণ থাকুক সে বুঝতে পারে শুধু কাতর হওয়া ছাড়া তার অন্য উপায় নেই। সে অমলকে বলল, তুমি জান না অমল, [illegible] [illegible]। মানুষ সেখানেই যেতে চায়। কিন্তু পারে না। শরীরের রক্ত মাংসে নানাবিধ পোকা ঘুরে বেড়ায়। পোকার কামড় বড় কামড়।

অতীশই এমন কথা বলতে পারে। নানাবিধ কথাটা গুরুগম্ভীর। এই নানাবিধ বলে সে যেন অনেক কিছু বোঝাতে চাইছে। এই নানাবিধ কথার মধ্যেই আছে, ব্যক্তিগত সুখ, লোভ মোহ ইন্দ্রিয়পরায়ণ হওয়া। নিজ এলাকার মধ্যে এক বড় উঁচু পাঁচিল দাঁড় করিয়ে দেওয়া। এক দৈত্য সদর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। তার মুখ হাঁ করা। শুধু খাব খাব করে। সব খাব। সব হরণ করব। শোষণ করব। রাজেন এখন গুপ্ত প্রকারে অজস্র কালো টাকায় ভরে ফেলছে। যেখানেই হাত দেয় সেখানে ভুষো কালির মতো পাহাড় হয়ে যাচ্ছে গুচ্ছ গুচ্ছ বাণ্ডিল। বিদেশে এজেন্ট নিয়োগ, টাকা সংগ্রহ, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স এ-সবের জন্য তার ছোটাছুটির অন্ত নেই। তার ধারণা, তাকে কমনার করে দেবার জন্য সবাই উঠে পড়ে লেগেছে। তার বৈভব যত হরণ করে নিতে চাইছে তত সে মরিয়া হয়ে উঠছে। বিদেশ যাচ্ছে কথায় কথায়। যারা

এ-দেশে টাকা পাঠিয়ে, তাদের সে তালিকা তৈরি করছে। এখানে রাধিকাবাবুর কাছে থাকে আর একটা তালিকা। তালিকা অনুযায়ী বাড়ি বাড়ি সে টাকা পৌঁছে দেয়। এই গুপ্ত লেন-দেনে বড় অঙ্কের একটা টাকা বিদেশের ব্যাঙ্কগুলিতে ফেঁপে উঠছে। যে-কোন সময় তাকে যেন দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। অমলের তখন হাসি পায়। এখনও রাজেন নিজেকে রাজপুরুষ ভাবে। কুমার বাহাদুর না বললে মনে মনে চটে যায়। রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর চেয়ে কুমার বাহাদুর নামটা স্বভাবে বেশি আটকে আছে। অতীশ এসেই জারিজুরি সব ভেঙে দেবার চেষ্টা করছে। মানসও করেছিল। পারেনি। পাগল হয়ে গেল। অতীশ কতটা আর পারবে। সে অতীশের পাশে পাশে চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছিল আর এমন সব আকাশ পাতাল ভাবছিল।

গাড়ির দরজা খুলে অমল বলল, বোস। তারপর ঘড়ি দেখল।—আমরা একসঙ্গে খেয়ে বাড়ি ফিরব।

—কমলের বাড়ি যাচ্ছ ?

—না।

—তবে কোথায় ?

—চল না।

অমলের পাশে দু হাত ছড়িয়ে বসেছিল অতীশ। সেই থেকে বাবা বাবা ডাকটা শুনে আসছে। ঘুষ দেবার সময় থেকে। এখনও ডাকটা শুনতে পাচ্ছে। সে বলল, কোথাও ফোন করা যাবে অমল।

অমল কেমন চুপ করে থাকল।

আলোর মালা পরে আছে শহরটা। অমল গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। দু-পাশে অজস্র গাড়ি ট্রাম বাস। সুখী মানুষজন। ফুটপাথে অজস্র নাম গোত্রহীন মানুষ। আকাশের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে। কিছুই করার নেই। শুধু হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা। হা-অন্নের জন্য বসে থাকা। কোথাও খরা চলছে, লোকজন গাঁ গঞ্জ ছেড়ে চলে আসছে দু-মুঠো ভাতের আশায়। যেন ঠিক সেই বাবার প্রথম ছিন্নমূল হওয়ার সময়, সেই বাড়ি ঘর বানানোর সময়, এবং অন্ন মানুষের বড়ই প্রিয় বিষয়। খাপছাড়া অসংলগ্ন কিছু চিন্তা অতীশের মাথায় ঘুরছে। তার ইচ্ছা হচ্ছিল অমলকে অপমান করে। যেন তাকে অপমান করেই সব শোধ তুলতে চায়। মানসদার সেই নাক টানা, ওক কি পচা গন্ধ! পচা টাকার গন্ধ। সুখী লোকজন গাড়ি প্রাসাদ বিলাস এবং অপচয় দেখলেই তারও

গন্ধটা নাকে লাগছে। আর্চির চেয়ে সেটা কম দুর্গন্ধযুক্ত নয়। কিন্তু কি যে আছে মনে! অমলের প্রতি তার এত দুর্বলতা এতদিন কোথায় ছিল! অমলকে ত সে প্রথমে ঠিক চিনতেই পারেনি। মনের মধ্যে অমলের সেই অংকুরউদ্গমের সময় থেকে আজ তা মহীরুহ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু মাঝের এক বিরাট ফাঁকা প্রান্তরে বৃক্ষহীন হয়ে সে বেঁচে ছিল। বৃক্ষহীন কথাটা ভাবতেই তার কেমন কাঁটা দিয়ে উঠল ভিতরটা। দু হাত তুলে দূর থেকে আসছে এক বালিকা, ফ্রক গায়ে, সেই কেবিন। কেবিনের দরজা খুলেই ছোটবাবু ভূত দেখছে। সেই শয়তান ছেলেটা কেবিনে বালিকা সেজে বসে আছে। ছোটবাবু চিৎকার করে উঠেছিল, আবার তুমি জ্যাক! এবং সেই ঘণ্টাধ্বনি মাথায়, যেন অসীম অজ্ঞাত অনন্তকালের ঘণ্টাধ্বনি মাথায়। সারা সমুদ্র সফর জ্যাক তাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। সেই জ্যাক, কেবিনে বালিকা সেজে বসে আছে। সে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠতে থাকল। জ্যাক, তুমি আবার বালিকা, চাতুর্যে মনোহারিণী, তুমি আমায় আর কত নির্যাতন করবে। তারপর কেমন পাগল পাগল লাগছিল তার। সে উন্মাদের মতো বালিকার গাউন ছিন্নভিন্ন করে দিলে, জ্যাক কেঁদে ফেলেছিল। বলেছিল, আমি বনি ছোটবাবু, আমি মেয়ে, তুমি বিশ্বাস কর আমি মেয়ে।

আর ছোটবাবুর মাথায় তেমনি ঘণ্টাধ্বনি। পাহাড়ের উৎরাই পার হয়ে সে কোন জলদস্যুর মতো উঠে যাচ্ছে। হুঁশ নেই। সে দেখতেও পাচ্ছে না ঠিক হাতের নিচে সেই অসংখ্য তরঙ্গমালা সমুদ্রের, ছিঁড়ে ফেললেই প্রলয়ংকর ঘটনা ঘটে যাবে পৃথিবীতে। দু হাতে সুন্দর গাউন ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে—ছোটবাবুর সঙ্গে বনি কিছুতেই পেরে উঠছে না। দু হাতে বনি তার পোশাক সামলাচ্ছে। আর কখন যে ছেঁড়া পোশাকের ভেতর নীলাভ বর্ণমালা অবিকল যুবতীর শরীর হয়ে গেল ছোটবাবু বুঝতে পারছে না! জ্যাক—সেই ছেলেটা, সেই ছেলেটা, জ্যাক, তুমি এটা কি হয়ে যাচ্ছ! সে পাগল হয়ে যাচ্ছে না ত! অযথা অতিরিক্ত মদ্যপানে চোখে যদি বিভ্রমের সৃষ্টি হয়। ভাল করে আবার চোখ রগড়াল ছোটবাবু। সে এ-সব কি দেখছে! ছেঁড়া পাল খাটানো জাহাজের অভ্যন্তরে সাগরের তাজা মুক্তোর মতো জ্বলজ্বল করছে সব কিছু! জ্যাক নড়ছে না। তাকে ছিঁড়ে ছুঁড়ে উলঙ্গ করে দিয়েছে ছোটবাবু। যেন জ্যাকের কিছু করণীয় নেই। জ্যাক কোনরকমে দু'হাতে তার রত্নরাজি বিছানায় চাদর টেনে শুধু ঢেকে ফেলল। শেষে অসহায় বালিকার মতো কান্নায় ভেঙে পড়ল।—ছোটবাবু তুমি এত নিষ্ঠুর। ছোটবাবু!

ছোটবাবু চিৎকার করে উঠেছিল, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি জ্যাক! তুমি কে! তোমার এমন কেন! কি দেখছি এ-সব!

বনি দেখছে, ছোটবাবুর চোখে বিভ্রম! চোখে মুখে হতাশা। কেমন মায়া বেড়ে যায়। বলার ইচ্ছে, তুমি পাগল হয়ে যাওনি, তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছাখো আমি বনি। আমি মেয়ে। আমার সব কিছুর ভেতর আমি বনি। তুমি ঠিকই দেখছ। ঈশ্বর সাক্ষী রেখে আমি বলছি আমি এই। কিন্তু কিছুই বলতে পারল না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেবল কাঁদছে। ছোটবাবু যদি সত্যি পাগল হয়ে যায়। ওর চোখের দিকে কিছুতেই তাকানো যাচ্ছে না। চোখে কেমন বিভীষিকা। ছোটবাবুর কি আবার সেই মাথার আঘাত······অথবা মাথার ভেতর তার কিছু হচ্ছে। মাস্তুল থেকে পড়ে গিয়ে মাথা ফেটে গেলে যা হয়। ছোটবাবুর কি সত্যি ভাল হওয়ার আশা নেই! বনি বার বার প্রশ্ন করেও বাবার কাছ থেকে জানতে পারেনি, ডাক্তার কি বলেছে! ছোটবাবুর চোখ পাথরের মতো। শক্ত কঠিন। বনি কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

ছোটবাবুর পাথরের মতো চোখ দেখতে দেখতে সব লাঞ্ছনার কথা বনি একেবারে ভুলে গেল। ছোটবাবুকে নিরাময় করে তুলতে না পারলে সে মরে যাবে। ছোটবাবু পাগল হয়ে গেলে সে হাহাকারে পড়ে যাবে। সে কোন রকমে তার ছেঁড়া পোশাক সামলে-সুমলে ছোটবাবুর কাছে এগিয়ে গেল। ধীরে ধীরে বলল, তুমি এস। ফিসফিস গলায় বলল, আমি মেয়ে ছোটবাবু। আমি বনি। বাবা ভয়ে জাহাজে আমাকে ছেলে সাজিয়ে রেখেছে······।

তখনই অমল গাড়ি থামিয়ে দিল। বলল, নাম। বাইরে বের হয়ে গাড়ি লক করল। তারপর বড় কাচের দরজা পার হয়ে সেই নীলাভ এক ভূখণ্ডের মুখেই কাকে দেখে আঁৎকে উঠল।

অতীশ দেখল, রাজবাড়ির মতি বোন দাঁড়িয়ে। সে কোনদিনই মতির সঙ্গে কথা বলেনি। মতি সম্পর্কে আকথা কুকথা কিছু শুনেছে। তার কি হল কে জানে, সে বলল, মতি বোন আপনি এখানে?

মতি কিছুটা হকচকিয়ে গেছে। অতীশবাবুকে এখানে দেখবে আশাই করতে পারিনি। মানুষটাকে সে সমীহ করে। রাজবাড়ির গেটে যেতে আসতে মাঝে মাঝে দেখতে পায়। কেমন অন্যমনস্ক। কথা কম বলে। মনে হয় অনেক গভীরে দেখতে পায়। সে কি বলবে ভেবে পেল না। এবং ধরা পড়ে গেছে মতো অপরাধী মুখে তাকিয়ে বলল, ঘোষবাবু আমার আত্মীয়। ওর কাছে একটু কাজে এসেছি।

অতীশ ঘোষবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, মতি বোন আমি এক রাজবাবাড়িতে থাকি।

সিঁড়ি ধরে ওঠার মুখে মতিকে দেখেই অমলা নিজেকে আড়াল করে রেখেছে। অমল অতীশের কাণ্ডজ্ঞানের অভাব দেখে জ্বলে যাচ্ছে। মতির সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছে! রিসেপসানে আরও সব মেয়েরা অতীশকে দেখছিল। হাবলা একটা। তুই ওখানে কি করছিস! তোর এত কি কথা। তোর মান সম্মান বোধ পর্যন্ত নেই।

অতীশ খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল, মতি বোন আমি একটা ফোন করব।

মতি খুব কৃতজ্ঞতা বোধ করল। ভয় কেটে গেছে মতো সে ঘোষবাবুকে বলল, ফোন। অতীশ ফোন নম্বর দিলে ডায়াল ঘোরাতে থাকল ঘোষবাবু।

ফোনটা পেয়ে অতীশ একবার মতির দিকে তাকাল। তারপর বেশ জোরেই বলল, নির্মলা আছে?

—দিচ্ছি।

—নির্মলা?

—হ্যাঁ।

—টুটুল মিণ্টু কান্নাকাটি করছে না ত।

—কান্নাকাটি করবে কেন?

—না মানে……অর্থাৎ অতীশের মনে হয়েছিল, এই যে সারাদিন ধরে বাবা বাবা ডাক শুনে আসছে, সেটা মিণ্টু টুটুল বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারে না, কান্নাকাটি করতে-টরতে পারে এবং সেইজন্যই সে বার বার শুনতে পাচ্ছে এমন একটা আর্ত ডাক।

সে বলল, ঠিক আছে। ছেড়ে দিচ্ছি।

—টুটুল তোমার সঙ্গে কথা বলবে।

—বাবা! অতীশের বুকটা ভারি তোলপাড় করে দেয়।

—হ্যাঁ বাবা বলছি।

—কাল তুমি আসবে।

—যাব।

—আমার টুপি! রাজার টুপি

— হ্যাঁ হ্যাঁ ভুলে গেছি। নিয়ে যাব।

—মা বলছে, মেস থেকে খাবার আনবে।

—তা আনব।

—মিণ্টু বলল, বাবা আমি।

—অতীশ বলল, হ্যাঁ মা তুমি।

তারপরই আবার নির্মলার গলা।—চাবি দারোয়ানের কাছে আছে। সকালে সুখী সব করে দিয়ে যাবে। তোমার কলমটা ড্রয়ারে আছে।

—আচ্ছা।

আর কিছু বোধ হয় কথা নেই। সে ফোনটা ছেড়ে দেবার সময়ই দেখল অমলা কাছে কোথাও নেই। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে সবই চোখে পড়ছিল। মতি বোনকে কেউ কিছু তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। ফোন ছেড়ে দিতেই মতি বলল, রিজিয়া, কাউর, লতা। সে সবাইকে হাত তুলে নমস্কার করল। প্রায় ঘিরে ধরেছে মেয়েরা। স্বর্গ থেকে সব দেবযানীরা নেমে এসেছে যেন। আশ্চর্য ঘ্রাণ শরীরে। ভুরু কাল। চোখ টানা টানা। এই সব দেবযানীদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই সে কাকে যেন খুঁজছিল। তার কেউ যেন হারিয়ে গেছে।

মতি বোন বলল, কারো আসার কথা?

অতীশ বলল, হ্যাঁ, মানে। সে ইতস্তত করছিল।

—বাড়ি ফিরবেন।

—দেখি।

কি করবে যে বুঝতে পারছে না। অমলা তাকে ফেলে কোথায় গেল! সিঁড়ির ও-পাশে অমলা অধৈর্য হয়ে পড়ছে। উঁকি দিতেও সাহস পাচ্ছে না। মতি তাকে দেখতে পায় নি। দেখতে পেলে সব জানাজানি হয়ে যাবে। কেলেঙ্কারি। মান সম্ভ্রমের প্রশ্ন। মতি এত বড় হোটেলে আসে সে জানতই না। তার কাছে কাবুল এত খবর পৌঁছে দেয়, আর এটা পারে না! কেউ কোন কম্মের না। ভিতরে সে আজ বড়ই জ্বালা বোধ করল। এবং একবার সব তুচ্ছ করে যখন রিসেপসানে ফিরে এল, দেখল অতীশ নেই। মতিও নেই। সে ক্ষোভে দুঃখে জ্বালায় চোখের জল চাপতে পারল না।

॥ বাইশ ॥

ফুলির শরীর বেশ বাড় বাড়ন্ত। সব কিছুই একটু বেশি বেশি। বেশ নজর কেড়ে নেবার মতো। যে যায় সেই দেখে ফুলি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। এ-সময়টায় ফুলি আর কোথাও যায় না। কিছুদিন ফুলি ঘর থেকে বের হত না। কিছু একটা হয়েছিল সবাই আন্দাজে এমন ভেবে নিচ্ছিল। দাশুবাবু বলতেন, পেলেই শালাকে এক কোপে কাটব। সেটা কার উদ্দেশে কেউ বুঝত না। মাঝে একবার কোথায় ফুলির কানের দুল ছিনতাই হয়েছিল সেই থেকে মেয়ে বড় সুশীলা বালিকা। দাশুবাবু রেগে-মেগে পড়া বন্ধ করে দিয়েছেন। ঐ একটা ধান্দা ছিল মেয়েটার। পড়ার নাম করে হুটহাট বের হয়ে যেত। প্রেমও করেছিল, আগেও ছিল সব। কিন্তু চেখেচুখে রেখে যাওয়ার পর দাশুবাবু বাঙাল দেখলেই ক্ষেপে যান। নতুন ম্যানেজারকে দেখলেই বলবেন, নে শালারা লুটে খা তোদের সময় এখন, তোরা খাবি নাতো কে খাবে। বৌরাণীর সঙ্গে আজ নতুন ম্যানেজারকে দেখেই ক্ষেপে গিয়েছিল।

হামুবাবু ফিরছিল। সন্ধ্যা না হতেই ফিরে আসছে দেখে দাশুবাবু ডাকলেন, কি হামু সকাল সকাল দেখছি। খবর রাখ?

হামুর এখন খবর শোনার সময় নয়। সে সকালেই খবরের কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। কথার জবাব না দিয়েই চলে যেত। কিন্তু সামনে কমলাসুন্দরী ফুলি উদাস চোখে তাকিয়ে আছে। বিকেলে গন্ধ সাবান মেখে চান করেছিল বুঝি। কাছে আসতেই গন্ধটা নাকে লাগছে। এবং ভাল লাগছে। সে দাঁড়াল। মেয়েটাকে দেখল। কাবুলের ঘরে আজকাল মাঝে মাঝে যায়। কেন যায় কে জানে। রাজার গায়ের গন্ধ নিতে সবাই বুঝি ভালবাসে। রাজাকে পাবে কোথায়। রাজার ল্যাজুড় ঐ কাবুলটা। ফুলির সঙ্গে এখন নতুন ভাবসাব। এটা হাসিরাণীকে দেখিয়েই করে। হাসিরাণীর বুকে জ্বালা ধরিয়ে দেবার এটা একটা মোক্ষম চাল। সেও কাবুলকে উসকে দিচ্ছে। লাগুক ভেল্কি। যত ভেল্কি তত তার আমোদ। সে বলল, না দাদা, সকালের কাগজে ত জুতসই কোন খবর দেখলাম না।

—আরে খবরের কাগজে কি সব থাকে। চোখের ওপরে কি হচ্ছে দেখছ না!

—কোথায় আবার কি হল।

—তোমার বৌরাণী নতুন ম্যানেজারকে নিয়ে বের হয়ে গেল।

—পিসি ভাইপো দাদা। মন্দ দেখছেন কেন?

পিসি ভাইপো কথাটাতে কেমন ভড়কে গেল দাশুবাবু। বলল, তার মানে?

—ফুলি জানিস না? ফুলির কাছে বিষয়টা খুব পরিষ্কার। দেশের পোলা। সম্পর্কে পিসি। বৌরাণী ম্যানেজারের পিসিগ দাদা। হামু ফুলির দিকে ত্যারচা চোখে তাকাল।

ফুলি বাবার দিকে তাকাল। কিছু বলল না।

দাশুবাবু কিছুটা দমে গেলেন। কাবুলকে জড়াচ্ছে। মেয়ে তার গোপনে কাবুলের ঘরে গিয়েছিল ঠিক। সেত একটা টাইপ স্কুলের ভর্তির বিষয় নিয়ে। কাবুলের চেনা জানা জায়গা। আজায়গায় কুজায়গায় শহরটা ভরে গেছে। বাড়ির লোকের সঙ্গে জানা চেনা থাকলে যেখানে সেখানে যেতে সাহস পাবে না ফুলি। তা-ছাড়া কাবুলের চোখ দেখে বুঝেছে, ফুলিকে সে ইদানীং পছন্দ করছে। ফুলির সঙ্গে নির্দোষ ঠাট্টা ইয়ার্কি করছে। ফুলিও কাকা কাকা করে এমন নিজের করে ফেলেছে যে দু একবার গেলে দোষের হয় সেটা দাশুবাবুর মাথায় আসে নি। সে বলল, ফুলি আমার অত বোঝে না হামু। তোমাদের চোখের সামনে বড় হয়েছে। বেচাল দেখছ কখনও?

তা তোমার মেয়ে, তুমি বোঝবে বাবা! দাঁড়িয়ে আছে কেন? সেজেগুজে সাঁজ বেলায় দাঁড়িয়ে থাকে কেন। মাঠে ঘুরে বেড়ায় কেন? কাবুলের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে কেন! রাজবাড়ির উঠতি ছোকরারা শিস দেয় কেন? তুমি চাঁদু বাপ বোঝ না সেটা। হামু ব্যাগটা হাত পাল্টে বলল, ফুলির মতো মেয়ে হয় না দাদা। যে ঘরে যাবে আলো হয়ে যাবে।

ফুলি বোধহয় এমন কথায় লজ্জা পাচ্ছিল। সে বারান্দা থেকে নেমে হাঁটা দিল। দুলাল শম্ভু ফিরবে। নধর জ্যাঠার ছেলে রমেন ফিরবে। ওরা দেখবে ফুলি ফুলপরী সেজে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে ওরা ফুলিকে দেখলে দাঁড়িয়ে যায়। দুটো একটা কথা বলে। ফুলির তখন বড় শরীরে আরাম হয়। কলেজের পড়াটা বন্ধ করে দিল বাবা। অভাব অনটনের কথা পেড়ে বন্ধ করে দিল। এখন টাইপ শিখে নিতে পারলেই ফুলির ধারণা সে সুনন্দর বিশ্বাস-ঘাতকতার উচিত জবাব দিতে পারবে। তার চোখ তখন জ্বলে। জ্বালা ধরে যায়। ব্যাঙ্কের কাজটা পেয়েই সুনন্দ তাকে ছেড়ে দিল।

হামু ফের বলল, যাই দাদা। আজ আবার একাদশী। একটু ফলমূল আহার করব ভেবে বসে আছি।

দাশুবাবু তক্তপোশে বসেছিলেন। অফিস ছুটির পর এই তক্তপোশটাই যেন তার সম্বল। পানের বাটা পাশে। জাঁতা সঙ্গে। কটর কটর সুপারী কাটেন আর পান মুখে দেন। তা না হলে মাথা ঠিক রাখা যায় না। কেষ্ট পাশের ঘরে জোর হারমনিয়াম বাজিয়ে গলা সাধছে। বেতার শিল্পী হতে এসেছিল কলকাতায়। রাজার কাজটা ছিল ফাউ। এখন এটাই মোক্ষ। ফাঁকে ফোকরে গলা থেকে অদৃশ্য সাপেরা উঁকি দিলে স্থির থাকতে পারে না। গলা বড় চুলকায়। শালা তোমার গলায় জংলি কচু মেজে দেব। বুঝবে একদিন ঠ্যালা। বুঝবে দাশু বাবাজী কারে কয়!

দাশুবাবু সারাক্ষণ ক্ষেপেই থাকে! অফিসে কাজ করতে করতে ক্ষেপে যায়। কেবল গজগজ করে। সারাটা বাড়ি জুড়ে চক্রান্ত। তার হাতে পেয়ারা বাগানের আদায় ছিল। দু পয়সা আসত। রাজার কান ভাঙিয়ে সেটাও কেড়ে নিল রাধিকাবাবু। ওরই কাজ। নধরবাবু তো কাজ করতে করতে মাজা খসিয়ে দিল। কেমন বেঁকে গেছে। থেকে থেকে ভয়ংকর উদ্গার! পেটে আলসার। সারাক্ষণ পেট ধরে বসে থাকে আর কাজ করে যায়। সকাল আটটায় কাজ আরম্ভ রাত দশটায় শেষ। রমেনটা উঠতি ছোকরা। বাজারটাও করে না। রাজবাড়ির বাইরে বের হলেই দেখা যায় কলেজের সামনে ইয়ার বন্ধু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কলেজের ছুকরিগুলোর পেছনে লাগে। গোটা রাজবাড়ির পরিবেশটাই নষ্ট। কাকে আর দোষ দেবে! শম্ভু দুলাল বাপকে মানে না। কবে একদিন ঠিক লাঠালাঠি হবে। এটা হলেই সে ভেবেছে ঠনঠনে গিয়ে পূজা দিয়ে আসবে। ফুলিকে নিয়ে তোমার মাথাব্যথা শুয়োর। ফুলির কম্ম ওটা। না চিনুর! মতি বাদ যাবে কেন! না না তাকে ডেকেই শেষ পর্যন্ত রাজা শাসাল। ফুলিটাও কেমন হয়ে গেছে! কারো সঙ্গে মেশে না। কেউ ফুলির সঙ্গে কথা বলে না। তার এমন নিষ্পাপ মেয়েটাকে কলঙ্ক দিল রাধিকাবাবু। তোমার খবর রাখি না ভাব! দেব সব ফাঁস করে।

মাথা গরম হয়ে গেলে দাশুবাবু আরও বেশি পান খায়। লাগোয়া ঘরটায় সতীসাধ্বী শুয়ে আছে।, তলপেটে কষ্ট। কান পাতলেই ঘরের মধ্যে গোঙানি শোনা যায়। কান পাতলেই মনে হয় কেবল ডাকছে। সন্দ আছে। মতির সঙ্গে একটু কথা বলাবলি আছে তার। সতীসাধ্বীর তাই সন্দ। একটু চা খাবে

তাও উপায় নেই। নিজের হাতে কর। ফুলিটার এখন তো বয়েসকাল। সেজেগুজে না বেড়ালে শরীর ঠিক থাকবে কি করে। ফুলি এখন এই রাজবাড়ির মাঠেই ঘুরতে ফিরতে গেছে। তাকে ডেকে বিরক্ত করা ঠিক না। গলা বাড়িয়ে বলল, ও কেষ্টবাবু তোমার চা হচ্ছে নাকি!

কেষ্টবাবুর কাছে গান শেখার অছিলা করে আসে হাসপাতালের আইবুড়ো আয়া ময়না। কেষ্টকে দাদা দাদা করে। মেয়েটাকে দেখেই সে কথাটা বলল। কেষ্ট গলা আর সাধছে না। লুঙ্গি তুলে পরেছে। তোয়ালেটা কাঁধে ফেলে দরজাটা একটু ভেজিয়ে দিতেই দাশুর ডাক শুনতে পেল। শালা রাজার কাণ্ড। এমন কোয়ার্টার যে হাঁচি কাশি পর্যন্ত দেবার উপায় নেই। সদর রাস্তায় ঘরবাড়ি হলে যা হয়। তবু দাশুবাবুকে কেষ্ট ভয় পায়। নষ্টামির গন্ধটা পাশের ঘরে যায় সে বুঝতে পারে। অনেককালের প্রতিবেশী দু'জনে। চটাচটি হয় না। বরং দু'জনে সবসময়ই আছে বেশ। বলল, চা বানাচ্ছে। ও ময়না, এক কাপ চা বেশি কর। তোমার দাশু দাদা খাবে।

ময়না চা দিয়ে গেলে দাশুবাবু বড়ই প্রসন্ন বোধে কেষ্টর দরজার কাছে এগিয়ে গেল।—শুনলে নাকি?

কেষ্টবাবু বিছানায় বেশ আসন পিঁড়ি করে এখন চা খাচ্ছে। দু-পাশে দুটো তক্তপোশ। একটায় কেষ্ট শোয়। পাশেরটায় কে শোয় এতদিন কাছে থেকেও দাশুবাবু টের পায় না। একটা আলনা। দুটো লুঙ্গি। দুটো কোঁচানো ধুতি। বাফতার পাঞ্জাবি ঝুলছে পাশে। নিচে ছোট র‍্যাকে কলপের শিশি। ক্রিম পাউডার। বয়স হয়ে গেলেও বড় শৌখিন। ময়না খাটে বসে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে চা খাচ্ছে।

দাশুবাবুর কথা কেষ্টবাবু গ্রাহ্য করে না। কিন্তু ময়নার সামনে ওর কেন জানি দাশুবাবুকে নিজের মানুষ প্রমাণ করার আগ্রহ বেড়ে গেল। ময়না এমনিতেই এখানে আসতে চায় না। কত রকমের লোক থাকে রাজবাড়িতে। কে কি ভাবতে পারে। ময়নাকে নিয়ে কেউ কিছু ভাবে না এইটাই এখন কেষ্টর প্রমাণ করার ইচ্ছে। ভাল করে কথা বললে, দাশু ময়নার সঙ্গেও দুটো একটা কথা বলবে। যেন কত আপনার জন সবাই। তাই কেষ্টবাবু বলল, রাজার কথা বলবে ত।

—রাজার কথা বলব। অধম্ম হবে না। বলে জিভ কাটল। ময়নার সামনে বলা ঠিক হবে কিনা দেখে একেবারে চৌকাঠ ডিঙিয়ে কেষ্টর কানের কাছে নুয়ে বলল, নতুন ম্যানেজার বৌরাণীর ভাইপো।

—তা ভালই। আত্মীয় সম্পর্ক না থাকলে চলে। কিন্তু বলেই কেমন ময়নার দিকে তার চোখ পড়ে গেল।

দাশুবাবু বলল, পিসি ভাইপো কোথায় বের হয়ে গেল। বলেই হা হা করে হাসি।

আর রাত দশটায় আবার রাজবাড়ির ঘরে ঘরে খবর, ফিরেছে। গেল বৌরাণীর সঙ্গে। ফিরে এল মতির সঙ্গে। রাজবাড়ির মানুষগুলোর ঐ এক কাজ—কে কোথায় যায়। সর্বক্ষণ নজর রাখা। কুম্ভ বলল, বাবা আপনি রাজাকে সব খুলে বলুন।

—কি বলব?

—কী কাণ্ডকারখানা সব চলছে। আপনারা এ বাড়ির বিশ্বস্ত মানুষ। আপনাদের কথা ফেলতে পারবে না। বাড়ির ইজ্জত গেল।

রাধিকাবাবু ঠিক বুঝতে পারল না কুম্ভ কি বলতে চায়। খাবার পরে তিনি ইজিচেয়ারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেন। তারপরে রাজবাড়িটা ঘুরে দেখেন। কোথাও কোন ফাঁকে অনাচার ঢুকে গেল কিনা নজর রাখেন। সদর গেটের খাতা দেখেন। রাত দশটার পর কে কে ফিরল লেখা থাকে। দেখল রাত দশটার পরে সত্যি মতি এবং অতীশ একই গাড়িতে গেট দিয়ে ঢুকেছে।

কুম্ভ বলল, অতীশবাবু মদে চুর হয়ে ছিল।

রাধিকাবাবুর সামনে লম্বা ফরাস। নল মুখে তিনি হুঁ হাঁ করছেন। রাজার পরেই এ-বাড়িতে স্যার সনৎবাবু, তারপরই তিনি। খুবই আত্মপ্রসাদে ভোগেন। অতীশের খবরে খুব একটা বিচলিত বোধ করলেন না। ঘাঁটাঘাঁটি করা কতটা ঠিক হবে বুঝতে পারছেন না। রাজার বাড়িতে মাতাল হয়ে কেউ কেউ ঢোকে। তবে সেটা ভারি গোপনে। বুঝতে পারলেই অশান্তি হয়। অতীশ মতির সঙ্গে ফিরেছে। গেছে বৌরাণীর সঙ্গে। ভ্রষ্টা মেয়ের সঙ্গে অতীশ ফিরেছে। তা হবার কথা। বৌরাণীর মর্যাদাবোধ যেমন, অতীশেরও তাই, যে গাছে যে ফল ধরে। তারপরই নীতিসুধা পান করালেন কুম্ভকে। বললেন, নিজের কাজ করে যাও। কর্মই সব। মা ফলেষু কদাচন। মনে রাখবে আমার এ-জায়গায় আসার পেছনে অনেক আত্মত্যাগ আছে। কে কি করছে তোমার দেখার কি! তারই ইচ্ছে। তিনি যে পাত্রে যেমন জল রাখেন।

কুম্ভ বড়ই পিতৃভক্ত মানুষ। শোবার আগে বাপের পদধূলি গ্রহণ করে থাকে। বাপের গচ্ছিত কত টাকা ব্যাঙ্কে আছে হিসেবটা সে এখনও টের

করতে পারছে না। শম্ভুটা জানতে পারে। কনিষ্ঠ সন্তান। মমতা বেশি। কিন্তু মুখে কুলুপ। তবে হাসিরানী বড়ই চমকপ্রদ একখান খবর দিয়েছে। শম্ভুর মাথায় নাকি অতীশবাবুর মতো ফাঁকা মাঠ একখানা ঢুকে গেছে। ঈশ্বর মানে না। বলে সব ফালতু। কম্যুনিস্ট হবার উপসর্গ। এটাই সার বুঝে কুম্ভ মুখ বুজে আছে। এখন এ-সব বাপকে বলাও ঠিক হবে না। পাকা ফলটি পড়ুক। কপ করে ধরে ফেলবে একেবারে। বাবার একখানা সুমার লাথি পাছায়। বের হও অধার্মিক। রাজবাড়ির নুন খেয়ে শেষে এই। ঈশ্বর মানে না। এমন অধগতি। ত্যাজ্যপুত্র করতেও পারে।

রাধিকাবাবু বললেন, শম্ভুটা রাত করে ফেরে। বাইরে এত কি কাজ তার? ওকে ডাকত।

শম্ভু কালো ছিপছিপে তরুণ। সুন্দর নাক মুখ। দীর্ঘকায়। চোখে প্রখর দৃষ্টি। যেন কোথাও তার বাবার কথা থাকে সব সময়। বাপের সামনে এসেই বলল, আমাকে ডাকছেন?

—তুই আজকাল রাত করে ফিরছিস শুনছি।

—শুনবেন কেন। দেখতে পান না!

রাধিকাবাবু জানেন, শিশু বয়সে মাতৃহারা হলে একটু রগচটা হয়। শম্ভুর সব তিনি ক্ষমা করে দেন। বললেন, দিনকাল খুব খারাপ আসছে। বুঝে শুনে চলিস।

শম্ভু বুঝতে পারে বাবা কি বলতে চায়। সে কলেজে ইউনিয়ন করছে। বাবার কানে বোধ হয় কথাটা উঠেছে। তা উঠুক। এটা ত আদর্শের লড়াই। এই যে বাড়িতে গোপন অনাচার সবই এই সমাজব্যবস্থার ফল। কাবুলবাবুকে বাবা কতঁ আদরযত্ন করে। কাবুল যখন তখন আসে। যায়। কিছু বলে না। তারপরই হাসিরানীর মুখ উঁকি দিতেই কেমন এক অসতী মুখের ছবি। দাদার ফুর্তি ফার্তা এবং সংসারে নানাভাবে অপচয় দেখেই সে বোঝে, গোপন টাকা এ-বাড়িতে সেই কবে থেকেই আসতে শুরু করেছে। পরিশ্রমে অর্জিত না হলে যা হয়। চুরি চামারি যেমন তার বাপ করে আসছে, তেমনি বড়দা হাত পাকাচ্ছে। এই বিষয়টি তাকে এখন ভীষণ গম্ভীর করে রাখে। মাঝে মাঝে সে শুনতে পায় বড়দা অতীশবাবুর বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগ তুলছে। অভিযোগ একটাই, একটা আধ পাগলা মানুষ। ছুতমার্গ। ঘুষ দেবে না। দু নম্বরী মাল করবে না। কিন্তু আজ অন্য কথা। সে তার ঘরে বসে শুনছিল সব।

—বুঝলেন বাবা আজ দুপুরে সারা অপিস-ঘরে ধূপকাঠি জ্বালিয়েছে।

—কর্পোরেশনের লোকটাকে ফিরিয়ে দেয়নি ত!

—না।

—যাক্ বাঁচা গেল। শম্ভুর মনে হয়েছিল বাবার মাথা থেকে মস্ত বড় একটা বোঝা নেমে গেল। তারপর আরও কিছু কথাবার্তা শম্ভুর কানে আসছিল।—হাত পাকানো দরকার। ছেলেটা অন্য জগতের মানুষ। তার যখন মতিগতি পাল্টেছে, সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে তখন তর তর করে উন্নতি। মনে হয় তোদের মাইনেও বেড়ে যাবে।

কুম্ভ বলল, রাজা কিছু বলল।

—তাইত বলল, খাটছে। অর্ডারপত্র ব্যালেন্সসীট দেখে রাজা খুশী। এখন তুমি আর অতীশের পেছনে লাগতে যেও না। কিছু করতে পারবে না।

শম্ভু এবার রাধিকাবাবুকে বলল, তোমার কি মনে হয় অতীশবাবু ঠিক কাজ করেছে? লোকটাকে তোমরা সবাই মিলে নষ্ট করে দিচ্ছ।

রাধিকাবাবু পুত্রের কথায় প্রথম একটু চমকে গেল। এমন কথা কেন। কি নিয়ে এই প্রশ্ন।

রাধিকাবাবু মুখ থেকে নল নামিয়ে বলল, আমরা নষ্ট করার কে?

—তা-ছাড়া কারা করছে। ঘুষ দিতে তাকে তোমরা বাধ্য করলে কেন?

—ঘুষ!

—এই যে খেতে বসে বললে, যাক বাঁচা গেল।

তা হলে তার পুত্রটি সব আড়াল থেকে শোনার চেষ্টা করে। কুম্ভর সঙ্গে এই নিয়ে কিছুক্ষণ আগে আলোচনা হয়েছে। সব মনে করতে পেরে বললেন, যেমন দিনকাল তাতে এটা দোষের না।

—দোষের না, গুণের। এটা ক্রাইম তাও বোঝেন না।

—ক্রাইম হবে কেন! ক্রাইম মনে করলেই ক্রাইম। না হলে কিছু না। এখন এটা ঈশ্বর বৃত্তি। সবাই পেয়ে থাকে।

—আমি জানি অতীশবাবু সারারাত ঘুমাতে পারবে না। তাকে তোমরা খুন করার মতলবে আছ।

—খুন! কি বলছিস!

—হ্যাঁ খুন এটা। মানুষকে নষ্ট করে দিলে খুন করা হয়। বলেই চলে যাচ্ছিল। রাধিকাবাবু কি এক আশঙ্কায় ভয় পেয়ে গেলেন। আজকালকার

ছেলে ছোকরারা কেমন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। তাদের এ-সব কে শেখায়! তিনি দেখতে পেলেন সুদূরে এক দীর্ঘকায় ব্যক্তি ফসলের মাঠ পার হয়ে যাচ্ছে। আর যেন বলছে ফসল ফলাও, খাট, কাজ কর। পরিশ্রমের বিনিময়ে খাদ্য এবং আশ্রয় সংগ্রহ কর। রাধিকাবাবু বলল, তুমি যাচ্ছ কোথায়?

—বাইরে।

—এত রাতে বাইরে কি আছে।

—অতীশবাবুকে দেখতে যাব।

—তাকে দেখার কি আছে?

—বলে আসব দাদা আপনি নষ্ট হয়ে যাবেন না। আপনি নষ্ট হলে আমরা দুর্বল হয়ে পড়ব।

—হুঁ। রাধিকাবাবুর হুঁ শব্দটির সাহায্যে পুত্রের অর্বাচীন চিন্তা ভাবনার প্রতি শ্লেষ ছুঁড়ে দিল। বলল, এখন বের হতে হবে না। নিজের কাজ করগে। কোথাকার কে অতীশ সে মরে বাঁচে তোমার কি! সংসারে এই হয়। এখন বুঝবে না, বড় হলে বিয়ে করলে বুঝবে। সব স্বপ্ন তখন মরুভূমি। পায়ের নিচে মানুষের মরুভূমি না থাকলে ঈশ্বর বৃত্তি কেও দেয়ও না, নেয়ও না। যেন বলতে চাইল রাধিকাবাবু, বাপের খেয়ে সবাই বনের মোষ তাড়াতে পারে।

কুম্ভ মজা পাচ্ছিল। সে এটাই চায়। হাসিরানী বড়ই বুদ্ধিমতী। ঠিক টের পেয়ে গেছে। সে বলল, আপনার বৌমা আমাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছে। শম্ভুকে তোমরা দেখ। এখন বুঝছি মাথায় ফাঁকা মাঠ ঢুকেছে।

—ফাঁকা মাঠ।

—ঐ আর কি। অতীশবাবুর কথা এটা। ঘুষটুসের কথা শুনলেই কেমন মাথা নাকি তার ফাঁকা হয়ে যায়। আর কে এসে ওখানে উপদ্রব শুরু করে দেয়।

—ফাঁকা থাকলে হবে। মাথা ফাঁকা হতে দেবে না। মানসটারও তাই হয়। এখন ত ভাল আছে। কেবল ছবি আঁকছে। মাথা ফাঁকা রাখতে দিচ্ছে না।

বাপের সঙ্গে শম্ভুর কথা কাটাকাটি শুনে হাসিরানী ছুটে এসে বলল, বাবা বলছে, তুমি আবার কেন? এস! হাসিরানী কুম্ভর হাত ধরে টানতে থাকল।

কুম্ভ এতটা আহাম্মক হতে রাজি নয়। সে বলল, হাত ছাড়! তারপর বাপের দিকে তাকিয়ে বলল, কলেজের পাণ্ডাগিরি বাড়িতে যেন না ফলায়। ওকে বারণ করে দিন।

শম্ভু কলেজে সাতচল্লিশ ঘণ্টা প্রিন্সিপালকে ঘেরাও করে রেখেছিল। এই

নিয়ে কিছুদিন বাড়িতে একটা হৈচৈ গেছে। কুমার বাহাদুর রাধিকাবাবুকে ডেকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, বড়ই মাথা গরম ছোকরা। আইন-কানুনের ধার ধারে না। ওরকম করলে বাড়িতে থাকতে দেওয়া হবে না। শম্ভুকে বলে দেবেন। রাধিকাবাবু এক সকালে শুধু বলেছিলেন, তোর দিদির বাড়ি থেকে ঘুরে আয়। দেশ ভ্রমণে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

শম্ভু কোন দিকে না তাকিয়েই বলল, পাণ্ডাগিরি ফলালে এ-বাড়িতে তোমরা থাকতে পারতে না।

কুম্ভ ক্ষেপে গেল। বলল, তোর খাই। বাবার খাই। আমি রোজগার করি না। এক চড়ে সব কটা দাঁত খসিয়ে দেব।

কতদিন পরে যেন কথাটা শুনতে পেল। শম্ভু দীর্ঘকাল এমন সোহাগের কথা শুনতে পায় না। আরও ছোট বয়সে পড়াশোনা না করলে দাদা এ-ভাবে শাসন করত। তখন ছিল ভারি নির্দোষ একটা জীবন। সব মানুষকেই মনে হত ভাল মানুষ। সবাইকে প্রিয় মনে হত। দিদি বেড়াতে এলে ছাড়তে চাইত না। দিদি চলে গেলে কান্নাকাটি করত। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারছে পৃথিবীটা বড়ই স্বার্থপর। দাদা এখন আর তার জন্য কোন দুশ্চিন্তা করে না। একটা দেয়াল উঠে গেছে। বিয়ের পরই দাদা যেন আলাদা মানুষ। হাসিরানী ছাড়া তার আর কোন সম্বল নেই। সে আর একটা কথা না বলে নিজের ঘরে ঢুকে গেল। তারপর কি মনে হতেই আবার উঠে এল। বলল, বাবা কাবুল এ-বাড়িতে এলে কিন্তু খারাপ হবে। ওকে আসতে বারণ করে দেবেন।

এমন কথায় কুম্ভ রাধিকাবাবু দুজনেই হতবাক হয়ে গেল। অথচ শম্ভুকে কিছু বলতে পারল না। নাড়ির মধ্যে ঘুণপোকা কটকট করে কাটছে। কুম্ভ মাথা নিচু করে বাইরে বের হয়েই হাসিরানীর মাজায় দুম করে লাথি কষিয়ে দিল। আর তখনই বিশ্রী একখানা কাণ্ড। হাসিরানী চিৎকার করছে, বাবা আমাকে মেরে ফেলল। বাবা বাবা।

হামু বাবু উঠানের ওপাশে তখন নিজের ঘরে ফলমুল আহার করছে। মেস বাড়িতে ঠাকুর সবাইর খাওয়া শেষে আলুর দম মাংস ভাত নিয়ে খেতে বসেছে। সুরেন হামুবাবুর জানালার পাশে বসে খকখক করে কাশছে। মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখছে বাতাসীটা কি করছে! অন্ধকার থেকে দেখা যায় না সুরেনকে। ওপাশে কাবুলবাবুর ঘরে রেকর্ডের গান, এই হাম দেওয়ানা গোছের কিছু উচ্চ-

মার্গের সঙ্গীত। কাবুল একা বসে শুনছে সব। পেট্রল পাম্পের একটা দৈনিক হিসাব লম্বা হয়ে পড়ে আছে সামনে।

এত কোলাহলের মধ্যে হামু আহার শেষ করল। বাতাসীকে বলল, মনে হচ্ছে তোর বাপ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ি যা। সে কাঠ এবং চাকুটা তক্তপোশে রেখে গামছায় হাত মুছল। এখন তার ঈশ্বর সেবা হবে। তার পরই তুরীয় মার্গ। এই মার্গে পৌঁছাতে পারলে সংসার বড় অর্থহীন। কুম্ভটা কাউকে পেটাচ্ছে। আগে দৌড়ে যেত। কোথায় কার কি কখন লাগে টের পাওয়া যায় না। বাড়ির নিত্যকর্মের মধ্যেই পড়ে যখন, কেউ আর এখন দৌড়ে যায় না। সে খুব নির্বিকার চিত্তে ঈশ্বর সেবায় বসে গেল। এমন সুসময় তার খুব কম, মানুষের আরও কম। সবার দোষ ধরে ধরে যখন ক্লান্ত তখন একমাত্র ঈশ্বর সেবায় সান্ত্বনা পাওয়া যায়। কুম্ভটাকে তাই চেষ্টা করেছিল ধরাবার। উঠতি তরুণ। কিন্তু একদিন এক টান দিয়েই মাথা ব্যোম। সব ব্যোম দেখতে দেখতে মাথা ঘুরে পড়ে গেছিল। রাধিকাবাবু সেদিন খড়ম নিয়ে তাকে তেড়ে এসেছিল, হারামজাদা রাজার বাড়িতে তোমার নেশা ভাং। এখন মজা বোঝ। নেশা মানুষের কত রকমের। নতুন নেশায় কুম্ভ ফাঁক পেলেই বৌকে পেটায়। আর সকালবেলায় বৌকে সোহাগ করে ঘুম থেকে তুলে চা বানিয়ে খাওয়ায়। বাসি কাপড় ধুয়ে দেয়। বাচ্চাটাকে হাগায় মোতায়। সব কাজ তখন একা সামলায়। কে বলবে, এই কুম্ভই বৌকে ধরে রাতে পিটিয়েছে। তারপরই দে টান বলে একেবারে উপুড় হয়ে নাভির অতলে শ্বাস টেনে সব ধোঁয়া রক্ত মাংসে ছড়িয়ে দিল। নাভি থেকেই উদগার তুলে হাঁকাড় দিল ব্যোম কালী কলকাত্তাওয়ালী। শুকনো টিকটিকির মতো লম্বা শরীরটা সটান পদ্মাসনে শেষমেস ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে গেল তার।

বাতাসী কাছে গিয়ে বলল, যাই কাকা। সে বাকি ফলমূল যা কিছু ছিল কোঁচড়ে তুলে নিল। স্বরেন অন্ধকারে দাঁড়িয়েই বাতাসীকে ইশারা করছে। জ্যাবে যদি কিছু পড়ে থাকে দেখতে বলছে। হাত ঢুকিয়ে ইশারাতেই ঠোঁট উল্টে দিল। নেই। তারপর আর কি নেওয়া যায়, না আর তেমন কিছু নিতে পারে না, ধরা পড়ে যাবে। রাস্তায় নেমে আসতেই স্বরেন প্রায় হামলে এক আঁজলা কাটা শাকআলু তুলে কচকচ করে খেতে থাকল। মনে হচ্ছিল বুভুক্ষ মানুষের এই খাওয়া শেষ পর্যন্ত না পৃথিবীটা গিলে খায়।

অতীশ তখন বাসার সব আলোগুলো জ্বেলে দিয়েছে। অন্ধকারকে তার বড়

ভয়। খুটখাট আওয়াজে কেমন সতর্ক হয়ে যায়। সে একা। সারাটা দিন সে আজ ভাল ছিল না। ভাল না থাকলেই আতঙ্ক ভয় মনের মধ্যে সুরসুর করতে থাকে। বাথরুমের আলোটা নেভান ছিল। সে উঠে গিয়ে তাও জেলে দিল। ঘর থেকে পাতাবাহারের গাছগুলো দেখা যায়। সে আসার পর থেকেই গাছগুলো কেমন সজীব হয়ে উঠেছে। লকলক করে বাড়ছে। ঘন হয়ে উঠছে গাছের ঝোপঝাড়। রাধিকাবাবুকে গাছগুলো কেটে ফেলার কথা বলেছিল। রাধিকাবাবু তার কথায় ভারি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। দামী পাতাবাহারের গাছ, পরে কোথা থেকে ওই গাছের কলম আনা হয়েছিল, গোটা রাজবাড়িটাকে বাগানবাড়ি বানাতে রাধিকাবাবুর কি স্যাক্রিফাইস তার একটা জ্যান্ত বর্ণনা। অতীশ বলে বড়ই আহাম্মক। সত্যি তো তার বিবেকবুদ্ধি কম। মাথায় দোষ আছে ভাবতে পারে। প্রায় পালিয়ে বেঁচেছিল। গাছগুলি তো কোন অনিষ্ট করেনি তার। সে কেবল ভেবে থাকে, গাছগুলির এই পুষ্টি সাধন করছে আর্চির প্রেতাত্মা। তা না হলে, এত তাড়াতাড়ি বাড়ে কি করে! পাতাবাহারের গাছ বেশি বড় হয় না। গাছগুলো জানালার কত নিচে ছিল। তক্তপোশে বসলে একটা পাতা চোখে পড়ত না। জানালার কাছে গেলে দেখতে পেত নির্জীব গাছগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। আর এখন সেই গাছ জানালার বুক সমান উঠে এসেছে। যেন হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁতে চায়। সে মাঝে মাঝে খুব গোপনে গাছের ডালপালা ভেঙে রাখে। কত বাড়তে পারে সে দেখবে। একবার একটা গাছের অনেকটা ভেঙে রেখেছিল। তখনই খবর রাজবাড়ির অন্দরে, এত সুন্দর পাতাবাহারের গাছ কে নষ্ট করে রেখেছে। রাজেনদা নিজে এসে দেখেগেছেন। দুমবারকে লক্ষ্য রাখতে বলেছেন। এই গাছগুলি বাড়ির সবার বড় প্রিয়। সে কেবল দেখলে ভয় পায়। যত বাড়ে দিনে দিনে তত তার ভয় বাড়ে। যেন স্বাভাবিকভাবে এ-বাড়া নয়। কোন জল নেই সার নেই যত্ন নেই তবু হামলে উঠছে। অতীশ তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বারান্দার সবকটা জানালা বন্ধ করে দিল। সদর বন্ধ করে দিল। তারপর নাক টেনে কি শুঁকল দু বার। বারান্দায় হেঁটে গেল। নাক টানছে। সারা ঘরে হেঁটে গেল! শুঁকে যাচ্ছে। দরজার ফাঁকগুলো দেখল কোথাও কিছু যদি ঝুলে থাকে। কারণ তার মনে হচ্ছিল আজ কিছু একটা হবে।

এই হবে ভয়ে শেষ পর্যন্ত ট্যাকসিতে মতিবোনকে বলেছিল, আমি একটু বালীগঞ্জ হয়ে যাব।

মতিবোন ভারি সরল বালিকা। কত সহজে বলেছিল, তাতে কি আছে চলুন না। এই ভাই, মহানির্বাণ রোড চলিয়ে।

মতিবোন ট্যাক্সিতেই বসেছিল। সে গলির মধ্যে ঢুকে টুটুল মিণ্টুকে দেখে স্বস্তি বোধ করেছে, নির্মলা বলেছিল, একটু সময় ওদের না দেখে থাকতে পার না! শ্যালিকারা ঠাট্টা করেছিল, কি দিদির টানে আসা না! আজ কিছুতেই থাকতে দিচ্ছি না।

সে ভারি লজ্জায় পড়ে গিয়েছিল। বলতে পারেনি, সে আজ আবার একটা লোককে অজগর সাপ গিলে ফেলতে দেখেছে। তখনই বাতাসে টুটুল মিণ্টুর গলা, বাবা বাবা!

সে প্রথমে ফোন করেছিল। ফোনে কোন রঙ কানেকসান হয়নি। সোজা-সুজি সে বিমলাকে পেয়েছে, তারপরই মাঠে অমলার সঙ্গে বেড়াবার সময় মনে হয়েছে আসলে বিমলার গলা কিনা কে জানে। সে ঠিক শুনেছে ত। আবার ফোন করতেই নির্মলার গলা। টুটুল কথা বলেছে, টুটুল ফের বলেছে, বাবা রাজার টুপি আনবে। খুব সতর্ক ছিল। না, গলা ঠিকই আছে: নকল গলা নয়, আর মতির ট্যাক্সিতে উঠতেই মনে হয়েছে, যদি আর্চি গলা নকল করে থাকে, বুঝতে না দেয়, আসলে আগেই শেষ হয়ে আছে, দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, বদলা নিয়ে কিছুক্ষণ মজা দেখছে। ভুতুড়ে ফোন আশঙ্কাতেই সে সোজা নিজের চোখে দেখতে গিয়েছে সবাই ঠিক ঠাক আছে কিনা, বাড়ির সিঁড়ি পর্যন্ত যেতেই তার পা ভেঙে যাচ্ছিল! যদি কেউ বলে ফেলে, না ওরা কেউ আসেনি ত! সে কেমন অস্থির হয়ে পড়ছিল। চারপাশে সব ঠিকঠাক আছে, শুধু তারা নেই। দোতলায় উঠে প্রথমেই গলা পেল টুটুলের। দাদুর কোলে বসে ছড়া বলছে। তার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মতো। কেমন স্থবির চোখে মুখে সোফায় বসে পড়েছিল। সে এসেছে শুনে সবাই ভিড় করলে, শুধু বলেছিল, এক গ্লাস জল। সারাটা দিন ভয়ঙ্কর ত্রাসের মধ্যে কেটেছে সেটা কেউ বুঝছে না।

সে চিৎপাত হয়ে এখন শুয়ে আছে নিজের ঘরে। ভিতরে অহরহ দ্বন্দ্ব। চোখ স্থির। বুকটা ভারি লাগছে। মাথার কাছে দক্ষিণের জানালা খোলা। জানালাটা অনেক উঁচু। কিছুটা গবাক্ষ পথের মতো, টেবিল চেয়ারে উঠে না দাঁড়ালে ও পাশে কি আছে দেখা যায় না। সে একবার উঠে দেখেছিল ঠিক দেয়ালের নিচে অন্দরের বিশাল পুকুর, জল টলটল করছে। ও-পারে কিছু গাছপালা, পাঁচিল, পাঁচিলের মাথায় মাধবীলতার বেড়া, আর কিছু চোখে পড়ে না। সে জানে

তারপর মাঠ, এবং পুরানো আস্তাবল লম্বা, এখন সেটা গ্যারেজ, গ্যারেজ পার হলে বাড়ির শেষ সীমানা, এবং সেখানেও এক অতিকায় জেলখানার পাঁচিল বাড়িটাকে সুরক্ষা করছে।

জানালা দিয়ে বাতাসে এক আশ্চর্য মিউজিক ভেসে আসছিল। রাজবাড়িতে অর্গান বাজাচ্ছে কেউ। ঝমঝম করে বাজছে, রাত গভীর। কেউ এই রাজবাড়ির হলঘরে পাগলের মতো যেন, অর্গানে ঝড় বইয়ে দিচ্ছে। শুয়ে শুয়ে বুঝতে পারছে এটা অমলেরই কাজ! বুকটা আরও ভারি হয়ে ওঠে, নিঃশ্বাস নিতে পর্যন্ত কষ্ট বোধ করছিল অতীশ। কেউ যেন বুকে মুখে পাষাণ ভার চাপিয়ে দিচ্ছে। সেই আর্চির কষ্টের মতো। কিংবা অদৃশ্য কোন হাতের কাজ কিনা কে জানে! সে দেখতে পাচ্ছে না অথচ কেউ তার গলা টিপে ধরেছে। সে ধড়ফড় করে উঠে বসল। গলায় হাত দিল। এমনকি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় আঙুলের ছাপটাপ পড়েছে কিনা দেখল। না, কিছু নেই। আবার বিছানা আবার সেইরকম, কেউ তাকে যেন আজ কিছুতেই ঘুমাতে দেবে না। ভয়ে দরজা খুলে বের হয়ে যাবে ভাবল, তারপরই মনে হল সে খুব দুর্বল। দুর্বল হয়ে পড়লেই আর্চি তাকে পেয়ে বসবে, ঘুমিয়ে পড়লেই আর্চি তাকে খুন করবে। সারারাত জেগে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

এই ভেবে সে চেয়ারটায় গিয়ে বসল। টেবিলে পা তুলে জেগে থাকার চেষ্টা করছে। শুধু একটা জানালা খোলা আর সব বন্ধ। ফুল স্পিডে পাখা চলছে। ডাইরিটা ব্যাগে আছে। ডাইরিতে বাবার দেওয়া ফুল বেলপাতা। সেটা এখন ছুঁয়ে বসে থাকলে কেমন হয়। তারপর হা হা করে হেসে উঠল। আসলে কিছুই হয় নি। সে নিজেই নিজের বধ্যভূমি তৈরি করছে। এমন কি প্রেতাত্মার ভয় থেকে মুক্তি পাবার জন্য কড়িবরগাতে সে ঝুলে পড়তেও পারে। এবার সাহসী হবার চেষ্টা করল। কোন দুর্গন্ধ নেই, তবু ভয় পাচ্ছে কেন! পাতাবাহারের গাছগুলো ভয় দেখাচ্ছে। কুয়াশার মতো এক অবয়ব সে এই ঘরে একদিন স্পষ্ট ঘুরে বেড়াতে দেখেছে। তারপর তা ভেসে গিয়ে গাছের পাতায় জল হয়ে গেছিল। এমন কিছু প্রেতাত্মার গল্প তার অবশ্য বইয়ে পড়া আছে। যেমন ঈশ্বরের কথা সে এভাবেই বইয়ে পড়েছে। একটা শেকড় গজিয়ে ফেলেছে শরীরের কোষে কোষে অন্যটা নিশ্বাসেও টের পাচ্ছে না। তার ভেতরে প্রচণ্ড হাহাকার জেগে উঠল। এবং সে ঠিক দু একবার বলেও ফেলল, ঈশ্বর আপনি যদি সত্যি থেকে থাকেন, তবে আমাকে এই প্রেতাত্মার কাছ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যান।

কিন্তু সে জানে বৃথা। সেই হাহাকার সমুদ্রে বনিকে রক্ষার জন্য ঠিক এমনি পাগলের মতো চিৎকার করত, ক্রসটা পাটাতনে দাঁড় করিয়ে দিত। তারপর সেখানে নতজানু হয়ে বসত দু'জনে। বালিকা বলত, আমাদের কোন নীল ভূখণ্ডে পৌঁছে দাও। ঈশ্বর ছোটবাবুকে রক্ষা কর। ছোটবাবু চিৎকার করত, গড সেভ আজ ফ্রম অল ট্রাবলস। কিন্তু কোথাও তার কোন করুণা পরিলক্ষিত হয় নি। সমুদ্র আরও রুদ্ররোষে নিরুপায় দুই তরুণ তরুণীকে শুধু গ্রাস করতে আসছে! এ-সব দৃশ্য চোখে ভেসে উঠলে অতীশ স্থির থাকতে পারে না। স্যালি হিগিনসের সব কথাই শেষ পর্যন্ত মিলে গেছিল! সে এসে অগত্যা বিছানায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ল।

আর তখনই খুট করে কিসের শব্দ। সে উঠে বসল হুড়মুড় করে। আর দেখছে চেয়ারটা তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে আছে। চেয়ারটার মুখ ছিল দেয়ালের দিকে। বার বার সে মনে করার চেষ্টা করছে চেয়ারটা কি-ভাবে ছিল। সে কি আগেই দেখেছে এ-ভাবে না খুট করে কেউ এখানটায় তার দিকে চেয়ার ঘুরিয়ে বসল। সে কেমন নিরুপায় চোখে চেয়ারটার দিকে তাকিয়ে আছে। সামান্য একটা চেয়ার এত বীভৎস হতে পারে! যেন কেউ বসে আছে, তাকে সে দেখতে পাচ্ছে না, অদৃশ্য এক মানুষ তার সঙ্গে এখনই কথাবার্তা শুরু করে দেবে। সে সাহসী হবার জন্য চেয়ারটার কাছে উঠে গেল। এবং সেটা দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেবার জন্য আরও বেশী সাহসী হবার চেষ্টা করছে। সে ঘামছিল। গলা শুকিয়ে উঠছে। মনে হবে এত ভারি চেয়ার যে তাকে সে কিছুতেই দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দিতে পারবে না। সে থরথর করে কাঁপছিল তবু জোর করে চেয়ারটায় হামলে পড়ল। যেন সে কারো সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু তারপরই মনে হল চেয়ারটা ভীষণ হাল্কা। সে সহজেই চেয়ারটার মুখ ঘুরিয়ে দিতে পারল দেয়ালের দিকে। কেউ বসে নেই। ভারিও না। তারপরই সুদূর থেকে সেই মর্মান্তিক আর্তনাদ, ও ছোটবাবু, তুমি কি হয়ে যাচ্ছ। মুখে তোমার ডোরাকাটা বাঘের দাগ। তুমি আর্চি হয়ে যাচ্ছ।

প্লিজ বনি! তুমি এমন কর না। এখনও আমাদের খাবার ফুরোয় নি। এখনও আমরা কিছুদিন বেঁচে থাকব। নিথর সমুদ্র যতই হাহাকার করুক, এখনও আমরা আরো কিছুদিন বাঁচব। কিন্তু সে জানত বৃথা, স্যালি হিগিনসের সেই দৈববাণী সে শুনতে পাচ্ছে। হাহাকার সমুদ্রে মাথা ঠিক রাখা কঠিন। মরীচিকা ভাসতে দেখবে। দেয়ার ফোর ইফ এ ঘোস্ট রাইজ বিফোর ইউ, ইউ

হ্যাভ দা রাইট টু সে, 'সো, দেন, দ্য সুপারন্যাচারেল ইজ পসিবিল্। সুতরাং মনে রাখবে মাথা খারাপ হয়ে গেলেই সেই সব অতিপ্রাকৃত জীবেরা চোখের সামনে ভেসে উঠবে। দিস ইজ হ্যালুসিনেসান। মাথা ঠাণ্ডা রেখে সেই সব হ্যালুসিনে-সানের হাত থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা করবে। সে বলল, বনি, তুমি অমন করলে আমি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

না না ছোটবাবু, বলে সে ছোটবাবুর দু হাঁটু জড়িয়ে ধরেছিল। আমাকে একা ফেলে যাবে না।

আমি তো আর্চি হয়ে যাচ্ছি।

ছোটবাবু মুখে তোমার কিসের দাগ ফুটে বের হচ্ছে। বলেই বনি পাগলের মতো ছইয়ের নিচে ছুটে গেল। তার প্রিয় আরশিটা নিয়ে এল। কিন্তু ছোটবাবু দেখল, মুখে কোন দাগ নেই। রোদে পুড়ে বিশ্রীভাবে কালো হয়ে গেছে মুখটা। ঝলসে গেছে মতো। সে সেই ছোটবাবু। দীর্ঘদিনের উত্তেজনায় চোখ কোটরা-গত। শীর্ণকায় হয়ে গেছে কিছুটা। আর কিছু না। সে বলল, এই গ্যাখ, গ্যাখ না। কাছে এসে দেখ বনি, মুখে আমার কোন দাগ নেই। তুমি ভুল দেখছ। রোদে পুড়ে আমরা শুধু ঝলসে গেছি।

তখন সমুদ্রে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। উত্তপ্ত অসীম জলরাশি নিথর। একটা ফড়িং উড়ে গেলে পর্যন্ত জলে ঢেউ উঠে যায় মতো আর নিরালম্ব সেই সীমাহীন আকাশ কেমন উত্তাপে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। বনি পাটাতনে উবু হয়ে বসে আছে। তার নীলাভ চুল উসখো খুসখো। ক'দিন থেকে সে পড়ন্ত সূর্যের আলোতে আর সাজতে বসে না। ছোটবাবুর মনে হয়েছিল, আগে থেকেই তার লক্ষ্য করা দরকার ছিল। সে তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল, দেখবে আজকালের মধ্যেই কোন জাহাজ কিংবা জেলেডিঙি দেখতে পাব। বনিকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্য বলেছিল, হ্যাণ্ড ফ্লাসটা ঠিক আছে ত! মনে রাখবে দেখা মাত্র সেটা জ্বালিয়ে দিতে হবে। মনে রাখবে হাওয়ার বিপরীত দিকে জ্বালতে হবে। বেলারটা কোথায় রেখেছ?

ছোটবাবু, আমি সত্যি দেখলাম, সহসা তোমার মুখটা আর্চির মুখের মতো ডোরাকাটা? আমি এটা কেন দেখলাম ছোটবাবু?

ছোটবাবু বলল, বিশ্বাস কর আমি জানি না। কেন দেখলে জানি না!

বাবা কিছু বলে দেন নি!

কি বলবেন?

এই অজানা সমুদ্রে মানুষ শয়তান হয়ে যায় কি না!

ছোটবাবু অনেক করেও শেষ পর্যন্ত কিছুই গোপন রাখতে পারছে না। বনি বুঝে ফেলেছে জাহাজ থেকে ওদের দুজনকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। যত দিন যাচ্ছে বনি তত বেয়াড়া হয়ে উঠছে।

তুমি ছোটবাবু আর ছলনা কর না।

ছোটবাবু অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছিল। প্ল্যাংকাটন ধরার জন্য। নেট পেতে রেখেছে। বোটটা নড়ছে না। বোট না নড়লে, না চললে নেটে প্ল্যাংকাটন আটকাবে না। সকালের দিকে সামান্য প্ল্যাংকাটন প্লেটে নিয়ে বসেছিল। ছোটবাবু বনিকে চেষ্টা করেছে খাওয়াতে। নিজেও চেষ্টা করেছে খেতে। বনি মুখে দিয়েই ওকে তুলে দিয়েছিল।

আরে করছ কি! বাঁ হাতটা নাকের কাছে ধর। ধর না! তাহলে বমি পাবে না।

বনি চুপচাপ ছোটবাবুর প্ল্যাংকাটন খাওয়া দেখছিল। সবুজ আঠা আঠা জলজ জীব জেলির মত। বিস্বাদ এবং তিতকুটে। অথচ ছোটবাবু যে খুব রেলিশ করে খাচ্ছে!—খাও খাও না।

আমি পারব না। আঁষটে গন্ধ।

তোমরা সবই কাঁচা খাও। আর এটা খেতে আপত্তির কি!

খেলে কি হবে?

বাঁচবে।

কে বলেছে?

ছোটবাবু খুব স্থির গলায় বলল, স্যালি হিগিনস।

বাবা আর কি বলেছেন?

এতে খুব প্রোটিন আছে।

বাবা আমাদের ভাসিয়ে দিলেন কেন?

যদি কোনরকমে ডাঙা পাই।

তিনি এলেন না কেন?

ছোটবাবু কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।—তিনি না এলে আমি কি করব?

সারেংসাব?

আমি কিচ্ছু জানি না, কিচ্ছু জানি না বনি। তোমাকে যা বলছি তাই কর।

খাব না। সে প্লেট ঠেলে সরিয়ে দিল।

ছোটবাবু বলল, খাও, খেতে চেষ্টা কর। তোমার ভালর জন্যই বলছি। অসহায় ছোটবাবু আর কি বলবে বুঝতে পারল না। সকাল থেকে বনির মতো এলবারও কি যেন হয়েছে। সে আর সামনের দিকে উড়ে যাচ্ছে না। নিথর সমুদ্রে ঢুকেই সে কেমন আচমকা অন্যরকমের হয়ে গেছে। সকালের দিকে দু' একবার উড়ে গিয়েছিল, বোটটা পাক খেয়ে আবার নেমে এসেছে। যেন কোন দিকে উড়ে যেতে হবে সে জানে না। ডাঙায় ফিরে যাবার শেষ আশা বলতে এই এলবা। হাওয়া নেই, পালে বাতাস লাগে না, উত্তপ্ত কাঁসার থালার মতো সমুদ্র আকাশ গনগনে হয়ে আছে। এক ভয়ংকর নৈঃশব্দ, আর বনির জেদ, এলবার চোখ সব কেমন অতিশয় বিভ্রান্তিকর। মৃত্যু খুবই কাছে সবাই যেন টের পেয়ে গেছে। আর তখনই বনি ছইয়ের নিচ থেকে ছুটে বের হয়ে আসছে।

কি হল বনি। কি করছ। বনি বনি।

ছোটবাবু বনিকে ঠেলেঠুলে আবার ছইয়ের মধ্যে নিয়ে গেল। গরমে বনির পিঠে বড় বড় ফোস্কা। দুটো একটা গলে ঘা হয়ে গেছে। একটা খাটো প্যান্ট ছাড়া বনি শরীরে কিছু রাখতে পরছে না। সে বলল, এমন করছ কেন?

হাওয়া নেই কেন ছোটবাবু?

বিকেলে হাওয়া দেবে। ছোটবাবুর আর কিছু বলার নেই।

তোমাকে বাঁচাতে পারব না ছোটবাবু। সে এসে গেছে। তুমি টের পাচ্ছ না। কান্নায় ভেঙে পড়ল বনি।

কেউ আসে নি। তুমি যদি প্ল্যাংকাটন না খাও কাল থেকে আমি আর কিছু খাব না বলছি।

বনি ছইয়ের ভিতর থেকেই সহসা আবার চিৎকার করে উঠল, এলবা আর্চির ছলনায় পড়ে গেছে। ওই আমাদের এই অজানা সমুদ্রে নিয়ে এসেছে। আমরা আর ডাঙা পাব না ছোটবাবু। লেট মি কিল হার। আই শ্যাল কিল হার। পাগলের মতো বনি পাখিটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলে ছোটবাবু টেনে আনল। তারপর দু হাতে বুকে জড়িয়ে বলল, ওকে খুন করলে আমরা আরও একা হয়ে যাব। আমাদের সাহস দেবার মতো কেউ থাকবে না। না ঈশ্বর না শয়তান। এতসব ভাবতে ভাবতে তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল অতীশ জানে না।

আর সকালেই ঘুম থেকে উঠে অতীশ দেখল, মেঝেতে একটা চিঠি গড়াগড়ি যাচ্ছে। রাতে সে, আর্চির ভয়ে কিছুই লক্ষ্য করে নি। আর্চি, বনি ছোটবাবু সবাই মিলে তাকে জ্বালিয়েছে। চিঠিটার ওপর সে সারারাতে পায়চারি করেছে

অথচ টের পায় নি কোন নীল খামের চিঠি কেউ তাকে আর পাঠাতে পারে। সে তাড়াতাড়ি খামটা ছিঁড়ে ফেলতেই দেখল, লেখা আছে কল্যাণ বরেষু বাবা অতীশ, বাবার চিঠি, কিন্তু না, হাতের লেখা বাবার না। নিচে দেখল, তোমার বড় জেঠি মা। বেশ দীর্ঘ চিঠি। চিঠি পড়ে সে হতবাক হয়ে গেল! বড় কাতর প্রার্থনা। তুমি অনুমতি দাও অতীশ! সবার অনুমতি নিয়েছি। তোমার জ্যাঠামশাইর পারলৌকিক কাজে শেষ অনুমতি তোমার। তুমি দিলে আমার না করে উপায় থাকবে না।

গোটা চিঠিটাই মর্মান্তিক। পড়তে পড়তে সে বিমূঢ় হয়ে পড়ল! সে বুঝতে পারছে, বড় জ্যাঠাইমার আর জীবনে কোন অবলম্বন থাকবে না। সকালে উঠেই জ্যাঠাই মা, জানালায় দাঁড়ান, দূরের মাঠ দেখেন, যেন কোন সুপুরুষ কৃতী মানুষ মাঠ পার হয়ে দীর্ঘদিন নিরুদ্দিষ্ট থাকার পর ফিরে আসছেন। হাতে রাজার চিঠি। হাতে নীল লণ্ঠন। নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর সেই মুখ এবং অবয়ব নিয়ে জ্যাঠাইমার জীবন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু সংসারে ভারি বিপত্তি দেখা দিয়েছে। বড়দার গঞ্জনা, বৌদির গঞ্জনা, বড় অনাচার। জ্যাঠামশাইর পারলৌকিক কাজ না করায় সংসারে অসুখ বিসুখ ছাড়ছে না। দু যুগের ওপর যে মানুষ নিখোঁজ, তাঁর আত্মার সদগতি দরকার। পিণ্ডদানে প্রেতাত্মা মুক্তি পায়। সংসারে তবে অশুভপ্রভাব থাকে না। বড়দা, সোনা জ্যাঠামশাই, বাবা, ছোটকাকার সবারই ইচ্ছে আর অপেক্ষা করা ঠিক না। সংসারে কখন কোন দিক থেকে সেই অতৃপ্ত আত্মা প্রভাব বিস্তার করবে কে জানে। তার কুশপুত্তলিকা দাহ, পিণ্ডদান এবং পারলৌকিক কাজের জন্য জ্যাঠাইমার ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। জ্যাঠাই মা মনে করছেন, সেই শেষ মানুষ, যে অনুমতি দিলে, তিনি মুখ বুঝে জীবনে বৈধব্য মেনে নেবেন। চিঠিটা শেষ করেছেন, বাবা অতীশ শৈশবে তুমি ছিলে তাঁর জীবনের প্রিয় সঙ্গী। কেন জানি মনে হয়েছে হাঁ বা না করার প্রকৃত উত্তরাধিকার তোমার। তুমি আমাকে বল, এখন আমি কি করব।

তারও যে বিশ্বাস পাগল জ্যাঠামশাই আবার ফিরে আসবেন। হাতে তাঁর নীল লণ্ঠন। শুধু ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছেন বলে ফিরতে পারছেন না। যেমন ছোটবাবু আর বনি একবার পৃথিবীর ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছিল। মানুষের ঠিকানা না থাকলে কিছুই থাকে না। সে চিঠিটা সামনে নিয়ে বসে আছে। দূরের এক জগৎ, অর্জুন গাছ, তরমুজের খেত, সোনালী বালির নদী, ফতিমা এবং সেই সুপুরুষ মানুষের যাত্রা, কখনও হাতিতে চড়ে, যখন নীলনদ পার হয়ে. কখনও

কোন গভীর দ্বীপের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন। এখন সে দুজন পাশাপাশি মানুষ দেখছে। স্যালি হিগিনস আর পাগল জ্যাঠামশাই। তারা একই দ্বীপে দাঁড়িয়ে থেকে হাত তুলে যেন বলছেন, আমাদের সমুদ্র পার করে দাও।

॥ বাইশ ॥

শিবলাল ওর খাটিয়াতে শুয়ে আছে।

ভাঙা চালের নিচে একটুকুন ছায়া। ঝিরঝিরে হাওয়া কলকাতায় বয়ে যাচ্ছে। কাকের উপদ্রব বাড়ছে। ওর চারপাশে আজকাল কাক উড়ছে খুব। শরীরে পচা গন্ধটা ভুরভুর করছে। সেই গন্ধে কাকেরা সব উড়ে আসে। ওর চালে খাটিয়ার পাশে কা কা করে ডাকে। ভয়ে সর্বক্ষণ সে তার ঘা ঢেকে রাখে। কখন কোন ধান্দাবাজ কাক ঠুকরে দেবে—ভয়টা সেখানেই। বাইরে কল, কল থেকে জল পড়ছে। ওর রক্ষিতা গত মাসে মারা গেছে। সেই থেকে সম্বল তুলসীদাসী রামায়ণ। মনে হাবিজাবি চিন্তার উদয় হলেই সুর করে রামায়ণ পড়তে বসে যায়। মেয়েমানুষ বাদে জীবন রুক্ষ মাঠের মত। একটা মাস মনে হয় গোটা একটা সাল। শরীরে এত পোকামাকড় আর কুট গন্ধ মানুষের থাকলে মানুষ বাঁচে কি করে। খুব দার্শনিক ভঙ্গীতে চোখের উপর হাত রেখে জীবনের হরকিসিম কিস্‌সার কথা ভাবছিল।

তখনই দেখল, ম্যানেজারবাবু কারখানার অফিসঘরে ঢুকছেন। শিবলাল সম্মান দেখানোর জন্যে উঠে বসল। বলল, রাম রাম বাবুজী।

অতীশ ঘাড় বাঁকিয়ে দেখল শিবলালকে। বলল, রাম রাম। হাত পা ব্যাণ্ডেজ করা একটা রুগ্ন মানুষ তেজী ঘোড়ার মতো বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। সংসারে কেউ নেই। দেশে নেই, ঘরে নেই। অতীশ শুনেছে, কি করে লোকটা অনেক টাকার মালিক। দুপাঁচশ টাকা সহসা কারখানার দরকার হলে শিবলালকে বললেই দিয়ে যায়। সে কারখানার একটা শেড সেই কবে থেকে দখল করে আছে। আগের ম্যানেজার ওকে থাকতে দিয়েছিল। ডাইসপত্রের নিপুণ কারিগর বলে, লোকটা কোম্পানির পক্ষে খুবই দরকারী। এখনও খুব জটিল কোন ডাইসপত্রে কোন গণ্ডগোল দেখা দিলে শিবলালের ডাক পড়ে। এই একটা কাজে সে এখনও পৃথিবীর দরকারী মানুষ।

অতীশ ভাবল, আসলে শিবলাল একটা ঘাটের মড়া।

কিন্তু এটা টের পাবে বলেই শিবলাল জোরে জোরে হাঁটার চেষ্টা করে। সাবলীল থাকতে চায়। ভাড়া আদায়ের সময় গরম গরম কথা বলে। দুনিয়ায় যতক্ষণ বাস ততক্ষণ নড়েচড়ে বেড়াতে হবে! সে মোদ্দা কথাটা বুঝেই ঘরে বেড়া দেয়, চালে টালি দেয়, বিছানা রোদে দেয়, দোকান থেকে ঝাল খাবার আনিয়ে হুসহাস খায়। পাতে মাছি বসলে রাগ করে। জলে ফিটকিরি দিয়ে রাখে। সর্বোপরি গন্ধ দূর করবার জন্য ঘরে সব সময় আতর ছড়িয়ে দেয়।

অতীশ কেন জানি বলল, পচন, এই হচ্ছে পচন যাকে বলে সারাটা কালই মানুষ বয়স বাড়ার সঙ্গে শরীরে পচন ধরাচ্ছে। শেষে সেই নদীর পাড় এবং অগ্নিকুণ্ড। নিজের শরীর একসময় কেন জানি বিরাট এক অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছে বলে মনে হলো তার। সে বসল তার চেয়ারে, ড্রয়ার খুলল, কি দেখল নিজেও জানে না। অভ্যাসবশে সে কাজগুলি করে যায়। তার যেমন চেয়ারটায় বসলে হাই ওঠে, আজও উঠল, অবশ্য রাতে ঘুম হয়নি, শরীরে কেমন একটা জ্বর-জ্বর ভাব।

শিবলালের কথাবার্তা ধার্মিক মানুষের মতো। কথায় কথায় রামের বনবাস, সীতা হরণ, দুরাচারী রাবণের কথা বলে উদাহরণ দেবার মোক্ষম একটা প্রয়াস থাকে। পুণ্যের জয়, পাপের পরাজয় এই বোধটা লোকটার ভীষণ। রক্ষিতা সম্পর্কে সে কখনো চিন্তাশীল হয়নি। ভাড়া আদায় করা এবং কাক-পক্ষীকে খাওয়ানো তার ধর্মীয় কাজ। সে কালীঘাটে ফী হপ্তা রিকশা করে যায়। সেদিন একটা রিকশা দিনমান তার হেফাজতে থাকে।

কপালে লাল চন্দনের ফোঁটা পরে। গরম পড়লে মাথায় দেশী কায়দায় ফেটা বাঁধে, ফুল, বেলপাতাসহ একটা বড় ঠোঙা আনে মিষ্টির। সেটা সে ছোঁয় না। পাশের কার্তিক মল্লিকের সেজ ব্যাটা তখন তার সঙ্গী। সেই এসে ঘরে ঘরে প্রসাদী ফুল, বেলপাতা বিলোয়। আর বাকি ছয়-দিন ঘর আর খাটিয়া। সন্ধ্যায় দেশোয়ালী মানুষ আসে। সে মোমবাতি জ্বালিয়ে সুর ধরে রামায়ণ পাঠ করে শোনায়।

অতীশ একদিন এতো পুণ্যবান থাকার চেষ্টার বিষয়ে প্রশ্ন করলে যা বলেছিল তাতে বুঝেছে শিবলাল এখন যা করছে সবই পরকালের জন্য। ইহকালে তার আর করার কিছু নেই এবং সে ভেবে ফেলেছে পরকাল তার খুবই উজ্জ্বল। সে পরকাল থেকে আবার পৃথিবীতে আসবে, নতুন মানুষ, শরীরে কোন রক্তপুঁজ

নেই। ঘা নেই, ব্যথা-বেদনা নেই। সতেজ এবং সুশ্রী মানুষ। কোন এক অলৌকিক পৃথিবী থেকে সে সব জরা-ব্যাধি এমনকি মৃত্যুকেও জয় করে এসেছে।

অতীশের মনে হলো, শিবলালেরও ভরসা আছে, তার কিছুই নেই। সে এ' সময় খুব অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো। ঘরে কেউ নেই। ফোনটাও বাজছে না। ও ঘরে কুম্ভবাবু আসেন নি। সকালে কুম্ভবাবুর রাজবাড়িতে কি নাকি জরুরী কাজ আছে। সে বাসায় এসে বলে গেছে—অফিসে আসতে তার দেরি হবে। পাশের শেডে ঘটাং ঘটাং শব্দ। বোধহয় প্রিন্টিং মেশিনের প্লেট সেট করা হচ্ছে। বেলটিং তুলে দিচ্ছে কেউ এবং মোটর চালাবার আওয়াজে সে বুঝল কাজ পুরোদমে চলছে। এদিকে সে কম কথার মানুষ। অর্ডারপত্র বেড়েছে। কুম্ভবাবুর আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও অর্ডারের অভাব ঘটেনি। কিন্তু সে বুঝতে পারে বাঘকে উপোসী রাখার মতোই সে আগুন নিয়ে খেলা করছে। মনের মধ্যে এই বিষয়টা সহসা খচ্ করে কামড় দিল। কুম্ভবাবুর উপরি রোজগার একদম বন্ধ বলা যাচ্ছে না। এখনও কিছু হচ্ছে। এই কিছু হওয়াটা বন্ধ করতে না পারলে অতীশ স্বস্তি পাচ্ছে না। এবং আরেকটা কাঁটা মাধব। সে জানে মাধব শুয়ে আছে পুরোন বাড়ির রকে। রাস্তায় আসতে রকটা পড়ে। সে তার কারখানার কর্মীর এমন দুরবস্থা দেখবে বলেই পটিবাজারটা ঘুরে আসে। রাজরোগে আক্রান্ত তার কারখানার কর্মী শুয়ে আছে রকে। দেখলে মনে হবে ম্যানেজার পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

এখনও কিছু অতীশ করে উঠতে পারে নি। কুম্ভবাবু বলেছে, ঘুষ দিলে পরদিনই বেড পাওয়া যাবে। না দিলে পাবেন না। কলকাতায় না এলে অসুখ বিসুখের জন্য ঘুষ দিতে হয় অতীশ জানত না। কিছুক্ষণ পরেই কুম্ভবাবু এল। এসেই দু হাত ছড়িয়ে টেবিলে বসল—দাদা সুখবর।

অতীশ জানে পৃথিবীতে আর তার কোন সুখবর থাকতে পারে না। স্ত্রী অসুস্থ, টুটুলের জলের বাই, মিণ্টু বড় হচ্ছে, বাবা টাকার প্রত্যাশায় বসে থাকে, লেখার বিড়ম্বনা, মাথার মধ্যে আছে ঘায়ের মতো বিষণ্ণ এক পাপবোধ। সে ঘুষ দিয়েছে এবং তার যে সম্ভ্রমটুকু ছিল মনুষ্যত্বের, তাও এই কুম্ভবাবুরা হরণ করে নিল। সে কোন সুখবরের প্রত্যাশা করে না। গেল রাতে আর্চি তাকে জালিয়েছে। এই ক্লেশ থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় তার জানা নেই। শুধু একদিন টুটুলকে পিতা পিতামহের নাম বলার সময় কেন জানি মনে হয়েছিল এ বলার মধ্যে কোথাও তার পাপ খণ্ডনের পরিত্রাণ থাকতে পারে। কুম্ভবাবু তার

দিকে তাকিয়ে আছে এখনও। কুম্ভবাবু আশা করছে সে কিছু বলবে। অগত্যা কুম্ভই ফের বলল—আপনার মাইনে বাড়ছে।

—বাড়ছে কেন?

কোথায় খুশি হবে, কোথায় সারা মুখে তৃপ্তি দেখা দেবে, তা না প্রশ্ন।

—রাজা খুব খুশি।

অতীশ বলল, ঘুষ দিলে রাজা খুশি থাকে জানতাম না।

—জানলে ঘুষ দিতেন না?

—না।

—আপনি সত্যি একটা আবাল মানুষ দাদা।

আবাল কথাটা তাকে বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলে দিল।

সে বলল—আবাল মানে?

—ঐ নিজের কথা যে ভাবে না।

—আমি তো নিজের কথা ছাড়া আর কিছু ভাবি না কুম্ভবাবু। সব সময় নিজেকে নিয়ে বিপন্ন।

—কোথায় দাদা, মাইনে বাড়ছে, কত বাড়ছে, কবে থেকে বাড়ছে কিছুই বললেন না? শুধু বললেন, বাড়ছে কেন? এমন কথা কি কেউ বলে? আর কার বাড়ছে জিজ্ঞেস করলেন না? খুব গোপন দাদা, আমারো বাড়ছে।

—বা বেশ। খুশী আপনি?

—কি যে বলেন দাদা, খুশী হব না? এ কটা টাকায় চলে? কি মাগগি গণ্ডার বাজার। রাজা মাইন্‌সে যাবার আগে অর্ডার করে গেছেন।

কে খবর দিল এ প্রশ্নটা অবান্তর। ঠিক রাধিকাবাবুর খবর। সব সময়ই রাধিকাবাবু রাজবাড়ির খবর আগে পায়। তারপর পায় রাধিকাবাবুর ছেলে কুম্ভ। কুম্ভ সেইসব খবর বয়ে আনে কারখানায়। সব সময় অতীশকে ভয়ের মধ্যে রাখে। এখনও রাজার সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন হলেন তার বাবা রাধিকাবাবু। কুম্ভের পেছনে লাগতে গেলে সাপের ল্যাজে পা পড়বে। কথাবার্তায় কুম্ভ যেন অতীশকে এ বিষয়টাতে সজাগ রাখতে চেষ্টা করে।

অতীশ বললো—আজ একবার ই এস আই অফিসে যান, বেডের কি হলো দেখুন।

—আপনি দাদা বেড বেড করে পাগল হয়ে গেলেন। এদিকে মাধব কি করেছে জানেন?

অতীশ বললো—কি করেছে ?

—পয়সা রোজগারের ধান্দা। শালা মনুষ্য জাতটাই বেজন্মার বাচ্চা। অতীশ বুঝতে পারল না, ই এস আই-এর কথায় পয়সা রোজগারের ধান্দা এলো কোত্থেকে। সে নিজের ভয়ের কথা বললো না। রাস্তায় কালীবাড়ির সামনে পুরনো বাড়ির রকে মাধব বসে থাকে। ঝড় বৃষ্টি হলে পাশের শেডে গিয়ে বসে। নিমাই-এর বৌ খাবার দেয় দুপুরে। চাঁদা করে খাবারের পয়সা তোলা হচ্ছে। অতীশকেও দিতে হয়। কারখানার সব কর্মচারী পাঁচ পয়সা, দশ পয়সা করে দেয়। এবং ওষুধপথ্যি যা আসছে তার কিছু নাকি চুরি করে মাধব বিক্রি করে দিচ্ছে। আরো যা খবর কুম্ভবাবু দিল তাতে সে তাজ্জব বনে গেল। বলল, বেড পেলেও ও হারামজাদাকে নিয়ে যেতে পারবেন না। অতীশ কি বলবে বুঝতে পারছে না। সে ভয়ে অন্য রাস্তা ধরে আসে কারখানায়। কারণ রাস্তার দু পাশের মানুষগুলো দেখবে ঐ সিট মেটালের ম্যানেজার যায়। মাধব ওর কারখানায় কাজ করে বুকের ব্যামো বাধিয়ে বসেছে। অস্থানে কুস্থানে ফেলে রেখেছে এবং সব দায় যেন অতীশের। মানুষগুলো তাকে দেখে এমন ভাবতে পারে। এজন্য ভয়ে সে আজকাল ঘুরে আসে কারখানায়। সে দূর থেকেও দেখেছে, মাধব করুণস্বরে ডাকে, জোরে জোরে কাশে যদি মানুষের দয়া হয়। সে হাত পেতে থাকে। পয়সা ভিক্ষা করে। একদিন দুদিন করতে করতে স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে এখন এবং শিব মন্দিরের সব পুণ্যার্থীরা পুণ্য অর্জনের জন্য দু পয়সা পাঁচ পয়সা দিয়ে যায়। একটা পুঁটলি বানিয়ে ফেলেছে রেজগি পয়সার। এতসব খবর কুম্ভ এক শ্বাসে বলে গেল। অতীশ মাথা নীচু করে শুনল।

তারপর বলল—মাধব ইচ্ছে করে কারখানার অসম্মান করছে।

অতীশ ভেতরে ভেতরে রুক্ষ হয়ে উঠছিল। সে বলল—এটা ইজ্জতের প্রশ্ন কুম্ভবাবু।

কুম্ভ বলল—ইজ্জতের কথা বলছেন কেন ?

—মাধব সিট মেটালের কর্মী সবাই জানে। ওকে যেভাবেই হোক ওখান থেকে তুলে আনতে হবে।

—জানলে বয়ে গেল।

—সিট মেটালের একজন কর্মী রাস্তায় পড়ে থাকবে, বলছেন কি !

—তাহলে কোথায় পড়ে থাকবে, কোথায় রাখবেন ? কেউ ঘর দেবে না ওকে।

—রাস্তা থেকে তুলে নিন। দেখি কি করা যায়।

—রাখবেন কোথায়?

অতীশ উঠে দাঁড়াল, বলল—আসুন।

সদর রাস্তায় সিট মেটালের একজন কর্মী ভিক্ষা করছে। অতীশের মাথাটা কেমন গরম হয়ে উঠল। অসহায় অবস্থানের চেয়েও মারাত্মক ভিক্ষাবৃত্তি। যেন সারাটা কারখানার ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করছে মাধব। অতীশ লাফিয়ে পার হয়ে গেল দু নম্বর গেট।

ডান দিক ধরে ঘুরে গেল। লেদ শপের পাশ দিয়ে ঘুরে বার্নিশ ঘরে ঢুকে ডাকল—এই শক্তি, এই পঞ্চা এদিকে আয়।

কাঠের কিছু বাক্স প্যাকেজের জন্য রাখা। অতীশ সব নিজেই ঠেলেঠুলে সরিয়ে দিতে থাকল। কর্মীরা এই মানুষটাকে আর কিছু না করুক, বড় সমীহ করে। কোন দুষ্ট প্রভাবে না পড়লে তারা অতীশের সঙ্গে খারাপ আচরণ করে না। এবং কেউ কেউ ছুটে এসে দু হাতে সরিয়ে দিচ্ছে সব। কুম্ভের মনে হচ্ছিল পাগলামি। সে চুপচাপ দেখে যাচ্ছে। আসলে সে কোনো গোপন রন্ধ্রপথ খুঁজছে যদি কোন মওকা পাওয়া যায়—অতীশ নামক বেয়াড়া জেদী মানুষের হাত মুচড়ে দেবার। ফলে সে যেন তামাশা দেখার মত উপভোগ করছে। কোন প্রশ্ন করছে না।

অতীশ বলল—এই জায়গাটা খালি পড়ে থাকে। ওদিকের দরজা খুলে দিলে কারখানার সঙ্গে কোন যোগাযোগ থাকবে না। শিবলালের ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়া আসা করবে। আপনার কি মনে হয়?

কুম্ভ খুব গম্ভীর গলায় বলল, আচ্ছা হবে। অফিসে চলুন।

কুম্ভ জানে এখানে এই কর্মীদের সামনেই অতীশ কত বড় ইম্প্রাকটিক্যাল তা সে প্রমাণ করতে পারে। কিন্তু সবে মাইনে বেড়েছে এবং এত বড় অঙ্কের মাইনে রাজবাড়ির কনসার্নে কস্মিনকালে একসঙ্গে কারো বাড়েনি। এ বিষয়ে অতীশবাবুর পুণ্যফলই সব, সুতরাং এ সময়ে সে সবার সামনে মানুষটাকে নাকানি-চোবানি খাওয়াতে চায় না। কৃতজ্ঞতা বলে কথা। সে শুধু বলল—আসুন, আসুন না আপনি!

কুম্ভ আরো জানে লেবার জাতটাই নেমকহারাম। যত দেবে, তত দাবি বাড়বে। ওদের সামনে সে বলতেও পারে না, আপনি কি ক্ষেপেছেন মশাই! কার জায়গা! আপনার না আমার? কোম্পানির জায়গা, আপনি দেবার কে?

হ্যাঁ, হয় সবই হয়। বোর্ড মিটিং-এ রেজলিউশন নিন। প্রস্তাব পাস হলে আপনি থাকতে দিতে পারেন। কেউ জানল না, ডিরেকটররা সব বাইরে, রাজা গেছেন মাইনসে, আর তখন কিনা কথা নেই, বার্তা নেই একটা রাস্তার লোককে ধরে আনছেন। জায়গা দিচ্ছেন। জায়গা দিলে মৌরুসীপাট্টা পেয়ে যাবে না? আর উঠবে? ব্যাড প্রিসিডেন্ট তৈরী হবে না। এ সবই বলতে পারত কুম্ভ। কিন্তু চতুর মানুষদের যা হয়, সে অত আবাল লোক নয়, লেবারদের সামনে বলে অপ্রিয় হবে। সে অফিসে এসে বলল—আনবেন না।

—আনলে কি হবে। এমনিতেই জায়গাটা খালি পড়ে থাকে, পুরনো লোহা-লক্কড় কাঠের বাক্স গাদা মেরে পড়ে থাকে। একটা মানুষকে সেখানে রাখলে কি হয়?

—অনেক কিছু হয়। মানুষের যে দাদা দুষ্টুবুদ্ধি আছে। লোহালক্কড়ের তা নেই। পড়ে থাকবে কোম্পানির কোন অনিষ্ট করবে না, এরা অনিষ্ট করবে। থাকতে দিলে, উঠতে চাইবে না, মামলা মোকদ্দমা করলেও তুলতে পারবেন না। সাধে কে কবে ঝাড়ের বাঁশ সেধে নেয় বলুন।

অতীশ বললো—আমাদের কারখানার কর্মী তাই বলে রাস্তায় বসে ভিক্ষে করবে?

—করুক না। কতো লোক তো করে। সরকারই পারে না, আর আপনি তো কোন্ ছার।

অতীশ বুঝতে পারল কুম্ভবাবুর ভীষণ আপত্তি। এই মানুষটা তার সব কাজের বিঘ্ন। সে কিছুটা পরাজয়ের গ্লানি বোধ করতেই ভেতরের সেই মানুষ, এক গোঁয়ার মানুষ উঁকি দিয়ে যায়। অতীশ বলে ওঠে, এখন তো নিয়ে আসি। রাজা এলে কথা বলে নেব। সে সুধীরকে ডেকে বলল—মনোরঞ্জনকে ডাক।

তারপর কুম্ভর দিকে তাকিয়ে বলল—আপনিও রাজার কাছে চলুন। হাসপাতালে বেড যতক্ষণ না পাওয়া যাচ্ছে, এখানে এনেই রাখি।

কুম্ভ খুব বেশি আর আপত্তি তুলল না। ধর্মের দিক থেকে সে ঠিক আছে। সে বার বার বারণ করেছে। যখন সওয়াল হবে রাজার কোর্টে তখন সে বলতে পারবে, বার বার বারণ করা সত্ত্বেও অতীশবাবু অধমের কথা কানে তুললেন না। তখন সে রাজার আদালতে একজন বিচক্ষণ মানুষ বলে প্রমাণিত হবে এবং যা যা বলে রেখেছিল, তাই যে প্রমাণিত হলো, সেটাও রাজা দেখতে পাবে। এখন তাড়াতাড়ি অতীশের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্যই সে বলল—আপনার ওপর

কোন কথা নেই। নিয়ে আসতে চান নিয়ে আসুন। কিন্তু দাদা তখন বলবেন না, কুম্ভবাবু সঙ্গে ছিল। আমি আপনার আদেশ শুধু পালন করছি।

অতীশ বুঝতে পারে, ভেতরে কূট বুদ্ধি কুম্ভবাবুর। সব সময় তাকে পরাজিত করে মজা দেখার বাসনা। কুম্ভ বলেই রেখেছে, সরকারই পারে না। সরকার পারে না কথার অর্থ, সরকার তার ইজ্জত রক্ষা করতে পারে না। একটা সরকারের অধীনে মানুষ রাস্তায় ভিক্ষাবৃত্তি করে, পকেট মারে, ছিনতাই করে, রাস্তায় শোয় এসব বড়ই অস্বস্তিকর বিষয়। এত বড় সরকারের যখন চক্ষুলজ্জা নেই, তখন আপনার থেকে কি হবে।

অতীশ বুঝতে পারল, সে আর এক পা এগোতে পারবে না। কারখানার অতিরিক্ত ঘরটায় লোহা-লক্কড় পড়ে থাকবে, তবু একজন মানুষের ঠাঁই হবে না। আইন কার জন্য সে বুঝতে পারল না। লোহা-লক্কড়ের জন্য, না মানুষের জন্য।

॥ চব্বিশ ॥

সকালেই অতীশ ছুটির কথা বলল সনৎবাবুকে।

তিনি বললেন, হঠাৎ ছুটি।

অতীশ বলল, বাড়ি যাব। অনেকদিন বাবা মাকে দেখিনি।

—মা বাবাকে এখানে নিয়ে এস। ওদের কলোনিতে ফেলে রেখে কি হবে? সনৎবাবু খুব যত্নের সঙ্গে উপদেশ দিলেন।

—ওদের শহর পছন্দ নয়। এলে হাঁপিয়ে উঠবে।

আসলে অতীশ নিজের কথাই বলে যাচ্ছে। সে এখানে এই সময়ের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠেছে। নিরালম্ব মানুষের মতো, যেন কেউ নেই, আত্মীয় স্বজন অথবা আপনজন বলে আর কাউকে মনে হয় না। সেই নিরিবিলি প্রকৃতি তাকে টানে, সে-কথা সনৎবাবুকে বলতে পারল না। সে চুপচাপ পাশের চেয়ারে বসে থাকল।

—তুমি বস। ছুটির দরখাস্ত?

অতীশ ওটা বাড়িয়ে দিল।

তিনি ওটা পড়লেন। তারপর না তাকিয়েই বললেন, একমাস ছুটি। এত লম্বা ছুটি নিয়ে কি করবে?

অতীশ বলতে পারত, আমার একা ভয় করে বাসাটায়। পর পর দু'রাত ঘুম হয় নি। সারা রাত দুঃস্বপ্নের মধ্যে কেটেছে। একা থাকলে ভয়েই মরে যাব। সে অবশ্য জানে সনৎবাবুর কাছে এ-সব কথার কোন অর্থ হয় না। এমন শক্ত সমর্থ যুবকের অন্তর্গত পাপ থাকতে পারে, শঙ্কা থাকতে পারে বলে, বোঝানো যাবে না। সে এবারেও কোন কথা বলল না।

—বস, আসছি। বলে দরখাস্তটা হাতে নিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। বৌরাণীর কাছে যাচ্ছে। আসলে যে ছুটি দেবে, যাকে বলে অতীশের ছুটি করিয়ে নিতে হবে তার উদ্দেশে তিনি চলে যেতেই দেয়ালের চিত্রগুলি সে দেখতে থাকল। কতকালের কে জানে। কার আঁকা তাও সে জানে না। কিছু কাজ না থাকলে এই সব তেল রঙের ছবির দিকে তাকিয়ে অনায়াসে সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়। ঘরের ও-পাশে টাইপরাইটারের খটখট শব্দ কানে আসছে। মানুষটাকে দেখা যাচ্ছে না। ফাইলের পাহাড় টেবিলে। তার ও-পাশে যেন কোন মানুষ নিরবধিকাল ধরে খটাখট করে যাচ্ছে। শব্দটা মাথার মধ্যে টরেটক্কার মতো এসে বাজছে। সে যে এখানে বসে আছে কেউ দেখছে না। রাধিকাবাবু নেই। বোধহয় নিত্য হিসাবের খাতা নিয়ে বৌরাণীর সঙ্গে দেখা করতে গেছে। এই ঘরে কেন যে কিছু উলঙ্গ রমণীর ছবি সে বুঝতে পারে না। এবং ছবিগুলি ঝাড়পোঁছ কে করে তাও সে জানে না। ছবিগুলি টাঙিয়ে রাখা কার জন্য। সব বুড়ে হাবড়া মানুষ। তারা বোধহয় ভুলেই গেছে, তাদের চোখের সামনে কিছু উলঙ্গ নারীর ছবি আছে। কেউ জলে সাঁতার কাটছে। জলের ভেতর থেকে স্বচ্ছ নিতম্ব পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। শিল্পীর রসবোধের কথা সে এ-সময় তারিফ না করে পারল না।

সনৎবাবু ফিরে এসে টেবিলে বসলেন। বেল টিপতেই সুরেন হাজির। কি একটা ফাইল চাইলেন। ফাইলটা এনে দিলে, সেটা নিয়ে ছুটে গেলেন। আবার ফিরে এলেন, আরও দুটো ফাইল থেকে কি মিলিয়ে নিয়ে ছোট্ট একটা চিরকুটে নোট নিলেন। তারপর ফের অদৃশ্য। অতীশের যে কাজটা সেটা সম্পর্কে বিন্দু বিসর্গ উৎসাহ দেখাচ্ছেন না। যেন ভুলেই গেছেন, অতীশ ছুটির দরখাস্ত দিয়েছে। বৌরাণীর মতামতের প্রশ্নের অপেক্ষায় আছে সেটা। আবার ফিরে আসতেই সে বলল, বৌরাণী কিছু বললেন।

—বোস বলছি।

অতীশের বুকটা কেঁপে উঠল। তার তো ছুটি পাওনা অনেক। এতদিন

এসেছে, সে কোন ছুটিছাটা নেয় নি। তালে কি এখানে তার কোন ছুটিছাটা মিলবে না। এখন আর তার কাছে বৌরাণী অমল নয়, যেন অন্য পৃথিবীর কোন জার সম্রাজ্ঞী। দণ্ডমুণ্ডের অধিকারী। বইয়ে সম্রাজ্ঞীদের নানারকম কূট খেয়ালের কথা সে পড়েছে। এখন মনে হচ্ছে সেটা তাকে চাক্ষুস দেখতে হবে। যেন বলবে, ওকে বলে দিন, ছুটিছাটার বিষয়টা সে তার রাজেনদার কাছ থেকে চেয়ে নেবে। অথবা বলে দিন, অন্য কোথাও কাজ দেখে নিতে। ওকে দিয়ে আমাদের চলবে না। পরন্তু সে বৌরাণীকে একা ফেলে চলে এসেছিল। সেই থেকে এখন মর্জি যদি তিরিক্ষি হয়ে থাকে, দেখা করতেও ভয়। তা-ছাড়া ডেকে না পাঠালে তার এখনও যাবার নিয়ম নেই। কি বলেছে কে জানে, সে খুব অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, সনৎবাবু এখন কি বলে।

কিন্তু সনৎবাবু খুবই ব্যস্ত মানুষ। এ-বাড়ির নিয়মই এই যতক্ষণ রাজা খাতির করবে, ততক্ষণ তারও খাতির। খাতির গেলেই সবাই মুখ ফিরিয়ে নেবে। যেন কেউ চেনেই না। সে এ-বাড়ির আমলা তাও তাদের তখন মনে করিয়ে দিতে হবে। সে আর না পেরে বলল, বৌরাণী কি……।

—আরে শোন। কথা কি, কি শুনবে, যেন ইয়ার বন্ধুর মতো সনৎবাবুর কথাবার্তা। তিনি বললেন, যাও। তবে যাবার সময় কুম্ভকে চার্জ বুঝিয়ে দিও। কাল থেকে তোমার ছুটি।

ছুটি! অর্থাৎ তার আর দরকার নেই। সেটাও পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। সে বলল, কতদিন?

—ঐ দরখাস্তে যা লেখা আছে।

অতীশের ভেতরটা কেমন হাল্কা বোধ হল। অমলা তবে কোন আক্রোশ পুষে রাখেনি মনে। সে নিজের ওপরই কিঞ্চিৎ বিরক্ত হল। সর্বত্র সে আতঙ্কের ছায়া দেখতে পায়। এত আতঙ্ক নিয়ে সে বাঁচবে কি করে। তবু ছুটি পাওয়ায়, বেশ হাল্কা মেজাজ। অনেকদিন পর তার শিস দিতে ইচ্ছে হল। সে গাড়ি বারান্দায় নেমে যাচ্ছে, কুম্ভবাবুকে এখন তার দরকার।

তারপরই কূট কামড়। সে ছুটিতে কেন যাচ্ছে অমল একবার ডেকে জিজ্ঞেস করল না! সে অমলাকে ফেলে ফিরে এল একা, কি এত তাড়া ছিল, তাও ডেকে জিজ্ঞেস করল না অথবা এমন অপমান অমল জীবনেও বোধ করেনি, তাকে ডেকে দু চার কথা শোনাবে এ-সবই মনে মনে সে আশা করেছিল, সে-সবের কিছুই না। বরং অমলের আজ তার সঙ্গে আর দশজন আমলার মতোই ব্যবহার। রাজেন-

ঙ্গা না থাকলে সে অফিসে বসে। এত বড় এস্টেটের কত রকম সমস্যা। সে সনৎবাবুর পরামর্শ মতো সব সামলায়। অতীশ আশা করেছিল, অমল তাকে ডেকে ভৎর্সনা করবে। তুই কিরে, আমাকে একা ফেলে চলে এলি! তুই এত নিষ্ঠুর!

সঙ্গে সঙ্গে তার কেমন সব বিস্বাদ ঠেকছিল। অন্যমনস্ক সে। সে-রাতে অমলও ভাল ছিল না। মানসদা বলেছে, অমল ক্ষেপে গেলে ঝমঝম করে অর্গান বাজায়। পাগলা ঝড় সে তার অর্গানে বইয়ে দেয়। তার ক্ষিপ্তভাব সে এ-ভাবে সামলায়। রাতে মাঝে মাঝে সেই ঝড়ের সংকেত তার কানে এসে বেজেছে। আজ দেখা হলে বুঝতে পারত ক্ষিপ্তভাবটা কতদূর গড়িয়েছে। এক মাসের লম্বা ছুটি। এত বড় ছুটি নিয়েই বা সে কি করবে। স্ত্রী পুত্র ছেড়ে একা সে বাড়িতেও বেশিদিন থাকতে পারবে না। নির্মলার উপর একটা চাপা অভিমান ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। তার আর্থিক ক্ষমতা সীমিত। চেষ্টা করেও সে এর চেয়ে বেশি আর রোজগার করতে পারে না। বাবা মা ভাই বোনের দায় না থাকলে সে মোটামুটি সচ্ছল। কিন্তু এই দায়টা ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। পারলে বোধহয় নির্মলার সব অসুখ সেরে যেত। নির্মলা কেন যে বোঝে না তার বাবা মা অনটনে থাকলে সে মানসিক কষ্ট পায়। কেন যে বোঝে না-বাবার মাসহারা না পাঠাতে পারলে সে অস্বস্তি বোধ করে। এ-নিয়ে নির্মলা কোন খোঁটা দেয় না। অথবা, ঝগড়াও করে না। যা কিছু ক্ষোভ মনের মধ্যে চেপে রাখে। ফলে কেমন শীর্ণ হয়ে যায়। দুরারোগ্য ব্যাধির মতো চাপা বিষণ্ণতা সারা অবয়বে লেপ্টে থাকে। নির্মলা যে বাপের বাড়ি চলে গেল তার অনুমতি না নিয়েই সেটাও খুব বড় হয়ে বাজছে। একটা কাজের মধ্যে ঢুকে গেলেও সাংসারিক সাশ্রয় ঘটতে পারে। সে চেষ্টাও করছে। হবে হবে করেও হচ্ছে না। এমন কি যদি দূরে চলে যায় নির্মলা দুই শিশুর দেখাশোনার ভার নিতে সে রাজি। মা যদি না আসে, ধীরেনের মাকে নিয়ে আসবে ভেবেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কিছুই করে উঠতে পারছে না। এই অক্ষমতার জ্বালায় তার ভেতরে আগুনের ফুলকির মতো একটা করুণ দুঃখ কাঁটা হয়ে বিঁধে আছে।

নিজের অফিসঘরে বসে বুঝল, সারাটা রাস্তায় সে কিছুই খেয়াল করে নি। খুবই অন্যমনস্ক ছিল। সারাটা রাস্তা সে শুধু ভেবেছে কি করবে। হাতের কাছে এত দু নম্বরী সম্পদ, অথচ সে ছুঁতে ভয় পাচ্ছে। এই ভয়টা না থাকলে, তার বোধ হয় এতটা সাংসারিক নির্যাতন থাকত না। লেখার ব্যাপারেও সে

আর একটু কম্প্রমাইজ করলে, হাতে দু পয়সা আসে। কিন্তু স্বভাবে যা নেই সে তা পারে কি করে!

কুম্ভবাবু তখন এসে বলল, মাধবটা কি করছে জানেন?

—মাধা আবার কি করছে!

—শিব মন্দিরের পাশে বসে রাতে তাড়ি গিলছে।

ঠিক এ-সময়েই দরজার ও-পাশে মনোরঞ্জনের মুখ দেখা গেল। সঙ্গে ফণী যাদব। এরা উঠতি শ্রমিক নেতা। এরাও যেন কুম্ভবাবুর সহকারী। কিছু একটা হয়েছে। কিছু দাবি দাওয়া। মাধাকে দিয়ে আরম্ভ শেষ হবে কি দিয়ে সে জানে না।

কুম্ভ বলল, তোমরা আবার কেন?

মনোরঞ্জন বলল, কি করলেন জানতে এলাম।

—তোমরা যাও, আমি দেখছি।

ওরা বিনীত বাধ্য ছাত্রের মতো চলে গেল। কুম্ভ জমপেশ করে বসল। হাতের আংটি জ্বলজ্বল করছে। সোনার তিনটি আংটি। তিনটেয় তিন রকমের পাথর। নসিবের ঘরে বদলা আছে এই আংটিগুলি তার প্রমাণ। সে ভাগ্য ফেরাবার জন্য একের পর এক পাথর ধারণ করছে। এই সব পাথরের গূঢ় কোন ক্ষমতা আছে কি না সে জানে না। দ্রব্যগুণ কথাটা সে শুনেছে। রাহু শনি প্রভৃতি গ্রহের কোপ প্রশমনে তার এই সব পাথর ধারণ। স্ত্রীর শরীর ভাল যাচ্ছে না বললে, একদিন কুম্ভবাবু বলেছিল, একটা ছ' রতির প্রবাল ধারণ করান বৌদিকে। দেখবেন সব ভাল হয়ে যাবে। সে যেহেতু এর পক্ষে কোন যুক্তি খুঁজে পায় না, বরং মনে হয় মানসিক দুর্বলতার লক্ষণ সেই হেতু শুধু বলেছে, দেখি। এখন সে বুঝতে পারছে, এই পাথরের কোন গুণাগুণ না থাকুক, কুম্ভবাবুর পাথরের উপর প্রবল আত্মবিশ্বাস। যেমন ঈশ্বর, তেমনি এই পাথর। কেউ জীবনে তার কম যায় না। সহজেই সে সব কিছু করে ফেলতে পারে। তার জন্য কোনো অনুশোচনা বোধ থাকে না।

কুম্ভ বলল, আপনি কেন আর বাধা দিচ্ছেন?

অতীশ খুব অবাক হয়ে গেল।—কিসের বাধা?

—কেন জানেন না, ই এস আই অফিসে ঘুষ না দিলে কোন বেডের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না।

অতীশ বুঝল, মাধার কেসটা ঘোরালো হয়ে উঠেছে। মাধার জন্য সে সোজা

পথে তার অফিসে আসতে পারে না! মাধা সেই পুরোনো বাড়ির রোয়াকে পড়ে আছে, চাঁদা করে তার সেবা শুশ্রূষা চলছে। ই এস আইর ডাক্তার ওষুধ দিচ্ছে। মাধা চুরি করে তাও বিক্রি করে দিচ্ছে। এবং বস্তির কিছু বেয়াড়া ছোঁড়া রাতে সেই নিয়ে মাধার সঙ্গে জুয়া খেলছে। অতীশ একটা ফুটো কোম্পানির ম্যানেজার। তার কর্মীর এই জীর্ণ দশা। যেন সেই দায়ী মাধার জন্য। একদিন আসবার সময় দেখেছে, পাশের দোতলার রেলিং থেকে তার দিকে কিছু যুবতী তাকিয়ে আছে। রেলিং থেকে পুরানো বাড়ির রোয়াক দেখা যায়। ওর মনে হয়েছিল, ঐ যুবতী ক'জন তারই অক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করছে। অথবা ভাবছে, ম্যানেজারটা কি অমানুষ। নিজে খাচ্ছে দাচ্ছে, এমন কি সে সহবাস করে থাকে, তার যে স্ত্রীপুত্র ঘরবাড়ি আছে তাও তারা জানতে পারে। একজন ম্যানেজারের পক্ষে এটা সত্যি বড় অসম্মানের বিষয়। তার সেই থেকে কেন জানি সোজা পথে আসতে সংকোচ বোধ হত। রাস্তার দু-পাশে যারা যা কিছু নিয়েই কথা বলুক মনে হত, তাকে নিয়েই বলছে। সে একজন অতি মনুষ্যত্বহীন মানুষ এমন তারা ইঙ্গিত করছে। তা-ছাড়া বস্তি অঞ্চলে কানাঘুষা এমনও আলোচনা হচ্ছে আজকাল, এই নতুন ম্যানেজারই যত নষ্টের গোড়া। তার জন্যই হচ্ছে না। অক্ষম। কোন চেষ্টা নেই হাসপাতালে পাঠাবার। অথবা মনে করতে পারে সে তার ক্ষমতার অপব্যবহার করছে। ঘুষ না দেওয়াটাই এ-সময় তার কাছে ক্ষমতার অপব্যবহার মনে হচ্ছিল। অতীশ বাধ্য হয়ে বলল, আমি ছুটি নিচ্ছি একমাস কুম্ভবাবু। এই এক মাসে যাকে যা দিলে হয় দিন। মাধার কেসটা আটকে রাখবেন না। ওটাও করে ফেলবেন।

কুম্ভ যে খুব খুশী সে-ভাবটা সম্পূর্ণ গোপন করে ফেলল। বরং মুখে বেশ দুশ্চিন্তার ছাপ। এই অকপট অভিনয় অতীশ ধরতে পারে। সে হাসল। বলল, একটা তো মাস!

—এত লম্বা ছুটি!

—কিছু নিজের কাজ করব।

কুম্ভ বলল, এই এক দোষ আপনার। সব কাজটাই পরের ভাবেন। কোম্পানির কাজ নিজের কাজ না।

অতীশ কেমন বেয়াড়া জবাব দিল।—নিজের কাজ হলে ছুটি নেবার কথা উঠত না।

কুম্ভ বুঝতে পারছে, কর্পোরেশনের লোকটাকে ঘুষ দেবার পর থেকে খুব

কাহিল হয়ে গেছে। সতীপনা গেছে। সে ভারি উৎফুল্ল বোধ করল। বলল, কোথাও যাবেন ভাবছেন!

—দেখি।

আর যখন ক্যাশ বুঝিয়ে দিচ্ছিল, তখনই আবার ফোন কারো। টেবিলটায় দু দণ্ড বসে এক নাগাড়ে কাজ করা যায় না। কেবল এর ওর ফোন আসে। কুম্ভই ফোন ধরে বলল, হেলো সিট মেটাল। আর সঙ্গে সঙ্গে অতীশ দেখল কুম্ভবাবু কেমন বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে বসে আছে। মুখে কথা ফুটছে না। তোতলাতে আরম্ভ করেছে। ফিসফিস করে বলছে, বৌরাণীর ফোন।

অতীশ হাত বাড়িয়ে ফোনটা নিয়ে বলল, বল।

—তোর ঘরে কে?

—কুম্ভবাবু।

—কি করছে।

—ক্যাশ বুঝিয়ে দিচ্ছি।

—ওকে ক্যাশ বোঝাতে তোকে কে বলেছে?

—সনৎবাবু।

—তোকে চার্জ বুঝিয়ে দিতে বলেছে, ক্যাশ বুঝিয়ে দিতে বলেনি। সবটা না জেনে কাজ করতে যাস কেন?

অতীশ জানে চার্জ বলতে এই ক্যাশ। তার ইচ্ছে ছিল না ক্যাশ রাখে। বড় ঝামেলা। মাথার মধ্যে সব সময় দুশ্চিন্তা। সে হয় তো হা হা করে হাসছে কফি-হাউজে, আড্ডা দিতে দিতে, তখনই বুকে কামড়। চাবিটা পকেটে আছে ত! সঙ্গে সঙ্গে পকেটে হাত। কতদিন হয়েছে, টেবিলের ওপরই চাবি পড়ে আছে। কতদিন সে বাসায় ভুল করে চাবি ফেলে গেছে। ভুল করলে বাসায় সুধীরকে চিঠি দিয়ে পাঠত। নিচে সই। অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক! কারণ যে কেউ চাইলেই ত আর চাবিটা নির্মলা দিতে পারে না। একটা চাবি মানুষকে এত উতলা করে রাখতে পারে সে আগে জানত না। সিট মেটালের ক্যাশ নিতে সে প্রথমে রাজি হয় নি। আসলে যা হয় ফুটোফাটা কোম্পানি, পারলে সব কাজ একা অতীশকে দিয়ে চালিয়ে নিলেই যেন ভাল হয়। সনৎ-বাবুই বলেছিলেন, ছ্যাঁচড়ামি বন্ধ করতে হলে ক্যাশটা তোমার কাছে রাখা দরকার। সে ভেবেছিল, দরকার। পরে বুঝেছে, অর্থহীন।

—কি রে তুই কি মরে গেছিস!

অতীশ আচমকা সোজা হয়ে বসল। অনেক সুদূর থেকে তাকে কেউ জাগিয়ে দিল যেন। সে বলল, বল।

—ক্যাশ সনৎবাবু বুঝে নেবে। একটু বাদেই যাচ্ছেন।

অতীশ কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠল। সে মোটামুটি হিসাব রাখে। পাই পয়সা মেলাতে হলে, অতীশ সেদিন কুম্ভবাবুকে নিয়ে বসে। এক আধ টাকা কম বেশি হলে টিফিন খরচে ধরে দেয়। কিন্তু সে জানে এই সনৎবাবু এমন কড়া ধাতের মানুষ, এক পয়সার হিসেব গরমিল পছন্দ করেন না। এই সামান্য এক পয়সা থেকেই বড় রকমের অভিযোগ সৃষ্টি হতে পারে। তক্ষুনি ফোন ছেড়ে ক্যাশটা আর একবার ভাল করে চেক করে রাখা দরকার ভাবল। সে জানে খুব একটা বেঠিকের কিছু নেই, তবু কোথায় যে কি ধরা পড়ে যায় শেষ পর্যন্ত।

অমলা ফোন কেটে দিয়েছে। একটু বাদেই রাজবাড়ির গাড়ির হর্ন শুনতে পেল অতীশ। কুম্ভ তার সামনে বসে আছে। রাফ-ক্যাশ বুকের সঙ্গে ভাউচার মিলিয়ে টিক মার্ক দিয়ে যাচ্ছিল কুম্ভ। আগেই যোগটা সেরে রেখেছে। সাত আট দিন এক নাগাড়ে ক্যাশ মেলানো হয় নি। একটু সময় লাগছিল। এটা অতীশবাবুর কুঁড়েমি। এটা এক দিকে ভাল। যখন ফ্যাসাদে পড়বে তখন বুঝবে ঠেলা। প্রথম যোগ করতে গিয়ে পুরো এক হাজার তিনশ চোদ্দ টাকা সর্ট। সঙ্গে সঙ্গে জমার ঘরে দেখল এই অঙ্কের কোন চেক আছে কি না। এবং পেয়েও গেল। জমা করেছে কিন্তু খরচের ঘরে ব্যাংকে জমার কথা লেখা নেই। এই ধরনের কিছু এন্টির ভুল ঠিকঠাক করে ক্যাশ যখন মিলে গেছে তখনই গাড়ির শব্দ। রাজবাড়ির গাড়ি ঢুকলে বস্তিবাসীরাও খুব চঞ্চল হয়ে পড়ে। সবাই দাঁড়িয়ে যায়। রাজার গাড়ি বলতে। সনৎবাবু সোজা নেমে ঘরে ঢুকতেই কুম্ভ এবং অতীশ উঠে দাঁড়াল। কালো রঙের স্যুট, সাদা শার্ট, চকচকে সু, সাদা চুল, কালো রঙের মানুষটি ভারি গম্ভীর। অতীশ ওকে রাজবাড়িতেও এমনই গম্ভীর দেখে থাকে। তবে তার সঙ্গে সনৎবাবু কথাবার্তায় খুব একটা গাম্ভীর্য বজায় রাখেন না। অতীশ অন্য দশজন থেকে আলাদা—এটা তার ব্যবহারেও প্রকাশ পায়। কারণ ছেলেটার একটা জায়গায় পায়ের নিচে মাটি বড়ই শক্ত। হেলায় সব ছেড়েছুড়ে দেবার ক্ষমতা রাখে। দুঃখ করে একদিন কথায় কথায় তিনি বলেছিলেন, এ-কাজটা নেওয়া তোমার ঠিক হয় নি। তোমার লেখার বিঘ্ন ঘটবে। বিঘ্ন কথাটাই ব্যবহার করেছিলেন সনৎবাবু।

সনৎবাবু আজ আর আয়াস ভঙ্গীতে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন না। বয়েস হয়েছে। অথচ খুবই কর্মঠ, এবং সব সময় নিজের এই কর্মঠ জীবন কত মূল্যবান তার রক্ষার্থে পটুত্বের কৌশলটাও তার জানা। সব কিছুতেই ঠিক তিনি ভুল জায়গাটা ধরে ফেলেন। ফাঁকি কোন জায়গায় থাকে, যাকে বলে লুপহোল, তাঁর যেন সেটা আগেই জানা। ক্যাশ বুক নাড়াচাড়া করতে করতে দুটো একটা মাইনর ভুল ধরে ফেললেন। অতীশও সোজা হয়ে বলল, ফেয়ার ক্যাশবুকে তোলার সময় ঠিক করে নেওয়া হবে। তারপর অতীশ দেখল তিনি কুম্ভকেই চাবি বুঝিয়ে দিচ্ছেন। রাফ-ক্যাশ বুকের উপর তাঁর সই, অতীশের সই এবং কুম্ভ নিজেও সই করল। অতীশের মুখটা লাল হয়ে উঠছিল। সে বুঝতে পারছে বিষয়টা খুব সরল নয়।

তারপর তিনি টিনের স্টক কত দেখলেন। টিনের গুদামে ঢুকে স্টক ঠিক আছে কি না দেখলেন। কুম্ভকে বললেন, যা আছে সব বুঝে নাও। কোথাও গণ্ডগোল থাকলে এক্ষুনি বলতে হবে। অতীশ এখন আর একটা কথাও বলছে না। কুম্ভবাবু কি বলে সেটা শোনার অপেক্ষায় থাকল। যদি বলে স্টক মিলছে না, যদি বলে কোথাও বড় রকমের গণ্ডগোল আছে এই সব সাত পাঁচ তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। অমলের গুপ্ত নির্দেশেই এসব হচ্ছে। তাকে অমল অবিশ্বাস করছে। তার চোখ ফেটে অভিমানে জল আসতে চাইল। এবং সনৎবাবু চলে গেলে সে ফোন তুলে বলল, বৌরাণীকে দাও। এই প্রথম সে সরাসরি বৌরাণীর ফোন নম্বর ডায়াল করল।

—কে ?

—আমি। খুবই গম্ভীর গলা অতীশের।

—কিছু বলবি ?

—এ-সব নাটকের অর্থ বুঝছি না অমল।

—নাটক ! নাটকের কি হল !

—তুমি ভাব, তুমিই সব বোঝ, আমরা কিছু বুঝি না !

—ঠিকভাবে কথা বল।

—ঠিকই বলছি।

—নাটক আমি করছি না তুই করছিস !

ঘরে একা অতীশ। সুধীরকে বলে দিয়েছে, কেউ দেখা করতে এলে যেন বাইরে বসিয়ে রাখে। সে রাগে দুঃখে থরথর করে কাঁপছিল। এত কিছু করার

অর্থই তাকে অবিশ্বাস! সে জীবনে এই অবিশ্বাস চায়নি। সে নিতান্ত সরল সহজভাবে বেঁচে থাকতে চায়। সে বলল, তুমি সনৎবাবুকে কেন পাঠালে?

—তুই একটা মূর্খ।

—মূর্খ বলতে পার। নাহলে আমি এখানে মরতে আসব কেন?

—তোর আর কোথাও জায়গা হত না। এখানে এসে বেঁচে গেছিস।

—ভালই বলছ।

—ভাল বলছি না, মন্দ বলছি, মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভাবলে বুঝতে পারবি।

অতীশ বলল, তুমি আমার ভালর জন্য সনৎবাবুকে পাঠিয়েছ।

—তবে কার ভালর জন্য?

—তিনি এসে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। যেন চোরের দায়ে ধরা পড়েছি।

—চুরিটা কোনদিক থেকে হয় তুই জানিস না। কি-ভাবে কাকে জড়ানো যায় তুই জানিস না। তুই মনে করিস সবাই তোর মতো না!

—তা মনে করি না।

—সবাই তোর মতো আবেগে ভোগে না।

—জানি না।

—তোকে নিয়ে আমার সব সময় ভয়। আগে ছিল মানস, এখন তুই।

অতীশ কি বলবে আর ভেবে পেল না। সে বেশিক্ষণ এক নাগাড়ে কথাও বলতে পারে না। মানসদার কথা বলায় সে আরও যেন তলিয়ে যাচ্ছিল। মানসদাকে নিয়ে আগে অমলার ভয় ছিল। সেটা কিসের! সে কেন?

সে যেন কিছুটা সুযোগ পেয়ে গেছে। এ-সময় সে মানসদার সম্পর্কে দুটো একটা প্রশ্ন করতে পারে। এতদিন সে অমলকে বলবে বলবে করেও কথাটা বলতে পারে নি। কোন উপলক্ষ্য হয় নি। সে বলল, এখন মানসদার জন্য তোমার আর ভয় নেই! সে কি বাঘ। তার মুখে কি তুমি বাঘের ছবি দেখতে পেতে!

—কি বকছিস মাথামুণ্ডু। বাঘের কথা আসে কি করে!

অতীশ ভারি সংযত হয়ে গেল। সত্যি ত বাঘের কথা আসে কি করে। আর্চির মুখে ডোরাকাটা বাঘের অবয়ব দেখলেই সে ভয় পেত। সে বার বার চেষ্টা করেছে, প্রার্থনা করেছে—আর্চি তুমি ভাল হয়ে যাও। বাঘের মুখোশটা সরিয়ে ফেল। মানুষের মুখ দেখতে দাও। তাহলে আমি তোমাকে খুন করতে সাহস পাব না।

সে নিজেকে সংশোধন করে বলল, না বাঘ মানে, এই বাঘই তো মানুষকে খায়। বাঘ নরখাদক হলে ভয়ের না।

অমল কেমন আর্ত চিৎকার করে উঠল, অতীশ তুই কি পাগল। সত্যি বল, তোর কি মাথা খারাপ আছে!

—সত্যি কথা বললেই বুঝি মাথা খারাপ হয়!

—মাথা খারাপ না হলে বাঘের কথা আসে কি করে! মাথা খারাপ না হলে তুই আমাকে ফেলে একটা নষ্ট মেয়ের সঙ্গে চলে যাস কি করে! মাথা খারাপ না হলে তুই তার সঙ্গে রাজবাড়িতে ফিরিস কি করে!

—মতি বোনের কথা বলছ!

—মতি বোন!

—হ্যাঁ সুরেন তো তাই বলে। সেই বলেছে, মতি বোন এ-বাড়ির এক নম্বর সতী।

—সুরেনটার অসুখ আছে। ও যা খুশি বলতে পারে।

—ওর অসুখ করে কেন অমল!

সেই সুদূরে আর কোন সংকেত নেই। বোধ হয় বিষম খেয়েছে কথাটাতে। এ-সময় সে বেশ মজা উপভোগ করছিল।—তুমি অমল প্রশ্নের জবাব দাও।

—কুম্ভ ঠিকই বলেছে তোর রাজেনদাকে।

কুম্ভর কথা আসতেই সে আর মজা করতে সাহস পেল না! সে কুম্ভর মুখেও ডোরাকাটা বাঘের ছবি দেখেছে। তার কাছে এটা যে কি সংকট, কি যে ভয়াবহ ত্রাস বলে বোঝাবে কি করে।

—কুম্ভবাবু কি বলেছে!

—তুই নাকি বলেছিস ওর বৌকে লক্ষ্মীর পট কিনে দিবি!

—কিনে দিলে খারাপ হবে বলছ!

—কুম্ভ কি বলেছে তার বৌয়ের লক্ষ্মীর পট চাই।

—না তা বলে নি। তবে ওর বৌর সাজগোজ দেখে আমার এটা মনে হয়েছিল। লক্ষ্মীর পট কিনে দিলে হয়ত ঝাঁঝ মরে যাবে। তারপরই অতীশ বলল, তোমাদের বাড়িটায় কি আড়িপাতা থাকে। কিছু বললেই সব তোমরা জেনে যাও কি করে!

—খুব যে কথা ফুটেছে। সামনে বসে থাকলে কথা বলতে পারিস না কেন মেনিমুখো।

—আমাকে গালাগাল দিতে তোমার ভাল লাগে অমল!

—খুব ভাল লাগে। তোর গায়ের চামড়া ভারি। নাহলে তুই কখনও মতির সঙ্গে ফিরতে পারতিস না।

অতীশের মনে হল সবটা খুলে বলে। সে ইচ্ছে করে আসে নি। সে বলল, তুমি পালিয়েছিলে কেন? তোমাকে আর খুঁজেই পাওয়া গেল না।

সুদূরে খুটখাট শব্দ কানে এল। কথা এল না। অমল কি ফোন রেখে দিয়েছে। না অমল ওর কথা শোনার জন্য বড় আগ্রহ নিয়ে বসে আছে। সে-ত অমলের সঙ্গে এখন খুব খোলামেলা কথা বলতে পারছে। সে বলতে চাইল, রহস্যময়ী নারী তুমি এখন কি পরে আছ। তোমার একার ঘর। যা কিছু এখন পরে থাকতে পার। তারপরই সহসা মনে হল, তার আসল কথাটাই জানা হয় নি। সে বলল, মানসদাকে তুমি নাকি পাগল বানিয়ে রেখেছ।

—আমি রাখার কে?

—মানসদার ছবির একজিবিসন করব ভাবছি। কেমন হয়।

—ভাল হবে না এটুকু বলতে পারি। তোর রাজেনদা এসব পছন্দ করে না।

—তোমাকে একটা কথা বলি অমল।

—কি কথা!

—এবারে ফোন ছেড়ে দেব।

—এই কথা! না।

—কতক্ষণ।

—যতক্ষণ আমার খুশি।

—আমার বৌ আছে, ছেলেমেয়ে আছে।

—তোর কিছুই নেই।

অতীশ এবার আর না বলে পারল না, ব্যাঙ্ক থেকে ইন্সপেক্টর আসছেন। তার সঙ্গে কথা বলা দরকার।

—কুম্ভ আছে কি করতে।

অতীশ বুঝল, হল না। এখন এও বুঝল, আসলে পাগলটা কে! সে, না হরিশ, না মানসদা, না এই বৌরাণী। পাগলের সংজ্ঞা কি!

সে বলল, অমল পাগলের সংজ্ঞা কি?

—কেন জানিস না?

—না, এটা আমাকে খুব ভাবাচ্ছে। কালই আমি বাড়ি যাব। কত কাজ বাকি। আর তুমি কিনা ফোন ছাড়বে না। তাহলে আমি যাব কি করে?

—ছুটি নিয়ে বাড়ি যাবি?

—বাড়ি। বাবার কাছে। বাবা মাকে কতদিন দেখি না।

—বৌ ছেলেমেয়ে যাচ্ছে।

—না।

—ফুর্তিটা একাই করবি।

—কাল রাতে তুমি অর্গান বাজিয়েছ!

—শুনেছিলি!

—সারারাত শুনেছি।

—সত্যি।

—সত্যি।

—তবে যাস না। ছুটিটা আয় তুই আর আমি এক সঙ্গে কাটাই। খুব আরাম পাবি। বলেই ফোনটা ছেড়ে দিল অমল। তাকে কথা বলতে পর্যন্ত দিল না। সে কি সকালে মনে মনে এই আশা করেছিল! মনে মনে ভেবেছিল, এমন এক গোপন পৃথিবী সৃষ্টি করা যায় না যেখানে এই রমণীকে নিয়ে কোন সারমেয়র মতো সহবাস করা যায়। আকণ্ঠ। সমুদ্র যেমন ভরে থাকে তেমনি। অমলের আড়িপাতা তাহলে এতদূরেও এসে গেছে। সে বুঝে ফেলেছে এক গোপন আকাঙ্ক্ষা তাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে।

সঙ্গে সঙ্গে অতীশের ভেতরে এক ভয়ঙ্কর উত্তেজনা, আগুনের মতো গ্রাস, চোখ কান ঝাঁ ঝাঁ করছে, কেমন যেন অসার শরীর, সে ঠিক থাকতে পারছে না, এবং সেই ছবি, মানসদার আগুনে ছবি মাথার মধ্যে দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে। এক গোপন বধ্যভূমিতে সে দাঁড়িয়ে আছে। তার আর নিস্তার নেই।

তারপর সারাটা দিন সে হাতের বাকি কাজ করল ঠিকই; যেমন তার ফোন করে জানিয়ে দেওয়া দরকার ছিল নির্মলাকে—আমি বাড়ি যাচ্ছি। সেখান থেকে জেঠিমার কাছে। সেখানে আর এক লড়াই—প্রেতাত্মার সঙ্গে মানুষের। জ্যাঠামশাইর কুশপুত্তলিকা দাহ শেষ হলেই বড়দা এবং বৌদি এবং অন্য সব আত্মীয়স্বজন সবাই প্রেতাত্মার হাত থেকে মুক্তি পাবে। অতৃপ্ত আত্মা নাকি ঘোরাফেরা করছে—সংসারের অসুখ-বিসুখ ছাড়ছে না। বলা যায় না, কাজটা

হয়ে গেলে সেও অশুভ আত্মার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। ওর এখন সেখানে যাওয়া বড় জরুরী কাজ।

ফোনে কথা বলতেই নির্মলা বলল, বাসাটা খালি রেখে চলে যাবে?

সে বলল, তালা দেওয়া থাকবে। জুমবারকে বলব রাতে শুতে। তোমার শরীর কেমন? এ-কথা বলতেই মনে হল, শরীর নিয়ে প্রশ্ন করলেই যেন মনে হয়, কবে তুমি ভাল হবে নির্মলা। আমরা কবে আবার পাশাপাশি শুতে পারব। আমি আর পারছি না। সে বোধহয় ভয়ে পরে আর কিছুই বলতে পারত না। কিন্তু নির্মলাই বলল, ভাল। ডাক্তার দেখেছেন আবার। বলেছেন, কিছু ইনজেকসান নিলে সেরে যাবে। না সারলে হাসপাতাল। মাইনর অপারেশন। জায়গাটা স্ক্র্যাপ করে দেবে!

—স্ক্র্যাপ কি তোমার মণিকাদিই করবেন!

—ঠিক হয় নি।

—সাবধানে থেক। টুটুল মিন্টু যেন রাস্তায় নেমে না যায়।

নির্মলা এ-সব বোধহয় কিছুই শুনছে না। সে তার কথা বলে যাচ্ছে। যেমন সব সময়ই বলে থাকে, রাত জেগে লিখবে না। শরীর খারাপ হলে কে দেখবে। এটা অবশ্য একটা খোঁটা দেবার কৌশল। নির্মলা কলকাতায় আসার পরই কি-ভাবে যে বুঝতে শিখে গেছে, সংসারে বাবা মা ভাই বোন কেউ না। শুধু স্বামী স্ত্রী শুধু পুত্র কন্যা এই সম্বল মানুষের। কেউ কাউকে দেখে না। কিছু হলে কেউ পাশে এসে দাঁড়ায় না। মানুষেরা বড় একা।

নির্মলা আরও নানাভাবে সতর্ক করে দিল অতীশকে। এমন একটা জায়গায় যাচ্ছে, যেখানকার জল হাওয়া অতীশের আর সহ্য হবার কথা নয়। খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কেও সাবধান করে দিল। বাড়িতে ঝাল-টাল বেশি হয়—আলাদা ঝোল করতে বলল। পুকুরে স্নান করতে বারণ করল। বেশি রাতে শহর থেকে ফিরে আসতে বারণ করল। টর্চ নিতে বলল সঙ্গে। এই গরমে সাপের উপদ্রব খুব। অতীশ কথাবার্তা শুনেই বুঝতে পারছে, নির্মলার কাছে এখন বাবার বাসভূমিটা ঠিক তার সেই গোপন বধ্যভূমির মতো। কেউ হাঁ করে বসে আছে। সেখানে গেলেই পূর্ণগ্রাস।

অতীশ সব বিষয়েই বলল, আচ্ছা। হবে। ঠিক আছে। আসব।

তারপর স্টেশনে এসেই সে দেখল কাউন্টারের সামনে সিট মেটালের দু নম্বরী

খদ্দের পিয়ারিলাল। পাশে একটি শ্যামলা মেয়ে। ওকে দেখেই যেন লাইন ছেড়ে ছুটে এসে বলল, বাবুজী আপ।

—বাড়ি যাচ্ছি। অতীশ তার কাউন্টারের দিকে এগুতে থাকল। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেছে অতীশ, পিয়ারিলাল সব জানে। সে বাড়ি যাবে, রাতের গাড়িতে বাড়ি যাবে—এই স্টেশনে পিয়ারিলালের ভাইঝিও একই গাড়িতে সেই শহরে যাবে। বাবুজী যাবে জেনে তার একটা দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই। দাদার অসুখ। তারই যাওয়া উচিত, কিন্তু কাজ কারবারে ফেঁসে আছে, যেতে পারছে না, এমন কি সে অতীশের জন্য টিকিটও কেটে ফেলেছে। অতীশ টিকিটের দাম দিতে গেলে বলল, সে দেবেন বাবুজী। বলেই ডাকল, চারু চারু। সুন্দর সতেজ এবং লক্ষ্মীশ্রী দেখতে পবিত্র এক নারী এসে দাঁড়াল তার সামনে। পিয়ারিলাল বলল, এই বাবুজী। চারু হাত তুলে নমস্কার করল।

রাত এগারোটা দশে গাড়ি। পিয়ারিলালকে টাকা দিতে গেলে সে ফের জানাল, টাকাটার জন্য এত ভাবনা কেন। সেও আছে অতীশও আছে। টিকিট চারুর কাছেই আছে। অতীশ কিছুটা সংকোচের মধ্যে পড়ে গেছে। কিন্তু চারু তখন বলল, বাবুজী চলুন। প্লাটফরমে গাড়ি দিয়েছে।

চারু তার চেয়ে সবই বেশি জানে। চারু একসঙ্গে যাচ্ছে। যাত্রীদের মধ্যেও একজন পরিচিত কেউ থাকল, ভাবতে ভালই লাগছে। রাতের ট্রেন কতটা ভিড় হবে সে জানে না। রাতের ট্রেনে তার ঘুমও হয় না। চারুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে যাওয়া যাবে। কিন্তু একজন নারীর সঙ্গে সে কি নিয়ে কথা শুরু করবে বুঝতে পারছে না।

গাড়ি ছাড়ার সময়। চারু বলল, আসুন বাবুজী। এবং চারুকে দেখল একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠে যাচ্ছে। সে এখন আর বলতে পারছে না, চারু আমার এত টাকা নেই। পিয়ারিলাল ত জানে, আমার এত টাকা নেই। তবু সে চারুর পেছনে ঠিক কোন সারমেয়র মতোই অনুসরণ করল। সে জানে কিছু একটা ঘটবে। ফাঁকা কামরা। সে আর চারু বাদে কামরায় কেউ নেই। এমন কি একটা কীটপতঙ্গও না। আর তখনই একটা ষণ্ডা মতো লোক উঠে এল।

চারু বলল, রাম সিং। তারপর অতীশের দিকে তাকিয়ে বলল, বাবুজী।

রাম সিং প্রায় কুর্নিশ করার ভঙ্গীতে অতীশের দিকে তাকাল।

চারু বলল, ও সঙ্গে যাচ্ছে। একটু হাবলা আছে।

গাড়ি ছাড়ার সময় দেখা গেল সে নেই। অতীশ জানালা দিয়ে দেখল, পাশের একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় সে উঠে যাচ্ছে।

চারু বলল, চাচাজীর বান্দা লোক আছে। রাতে যাচ্ছি। কোথায় কখন কি দরকার হবে!

॥ পঁচিশ ॥

এই গাড়ি চড়ে কোথাও তবে যাওয়া যায়। গাড়ি ছাড়লে অতীশের এমন মনে হল। পাশাপাশি বসে আছে সে এবং চারু। কামরায় একটা ডিম আলো। ভারি নিস্তেজ—কেমন ম্রিয়মাণ এক সৌন্দর্য। চারুর পায়ে রুপোর চেলি। জরির জুতো। নোখে সবুজ নেল পালিশ। আর গায়ে আশ্চর্য সুঘ্রাণ। ঠিক অমলার মতো অথবা যে কোন সুন্দরী নারীর পাশে বসলেই এই আশ্চর্য ঘ্রাণ পায় অতীশ। তার তখন নেশা বাড়ে। কলকাতায় আসার পরই এটা হয়েছে, না নির্মলার অসুখের পর সে বুঝতে পারছে না! আসলে কি নির্মলা তাকে আর ভালবাসে না। শুধু সম্পর্ক জিইয়ে রাখছে। অথবা পাঁচজন কি ভাববে, এত সখ করে যে মানুষকে বরমাল্য পরালে, পাঁচ সাত বছর পার না হতেই বাজারের শস্তা মাল হয়ে গেল। অথবা মনে মনে কি নির্মলা তাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। অক্ষম মানুষের অত দায়-দায়িত্ব বোধ কেন! সে কিছুই বুঝতে পারছে না। শুধু বুঝতে পারছে, অমলা তাকে বাঘের থাবায় খেলাচ্ছে। ওর এ-সব ভাবতে ভাবতে হাই উঠছিল।

ইতিমধ্যে ট্রেনটা একটা ছোট স্টেশন অতিক্রম করে গেছে। সব স্টেশন ট্রেনটা ধরছে না। বড় বড় স্টেশন ধরবে সে এটা জানত। দু একজন যাত্রী উঠলে অস্বস্তি থাকত না। চারুর সঙ্গে সহজেই ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলতে পারত। চারু শুধু একবার বলেছিল, যখন চা খাবেন বলবেন। ফ্লাকসে চা আছে। যেন চারু জানিয়েই রাখল, দরকার মতো চাইলেই পাবেন। এবং যা হয়ে থাকে, সে এই নারীর ভেতরের শরীর স্পষ্ট দেখতে পেল। অথচ মুখে পরম সাধুভাব। মহান্ত গোছের মানুষ, যেন অন্ধকারে দু-পাশের গাছপালা মাঠ আবিষ্কার করা ছাড়া তার আর এখন কিছু করণীয় নেই।

চারু দেখল এবং দেখে মিষ্টি করে হাসল। বাবুজী লজ্জায় তার দিকে তাকিয়ে

কথা বলছে না। চারুর ভাল লাগছে। সে খুবই সতর্ক, কারণ পিয়ারিলাল বলেছে, বাবুজী সাচ্চা আদমী। সেই বাবুজী এখন বাইরে তাকিয়ে আছে। সে বলল, বাইরে মুখ রাখবেন না। চোখে কিছু উড়ে এসে পড়তে পারে।

চারু ভারি আপনজনের মতো কথা বলছে। অতীশ এবার মুখ তুলে তাকাল। মেয়েদের সম্পর্কে তার একটা সম্ভ্রমবোধ আছে। আচার আচরণে সেটা আজ আরও বেশি ফুটে উঠেছে। সে তাদের কাছে এলেই সংকুচিত হয়ে পড়ে। খুব খোলামেলা হতে পারে না। সে চারুর কাছেও খুব বেশি খোলামেলা হতে পারবে না। কারণ এটা তার স্বভাবে নেই। সে ভেতরে যতই খারাপ মানুষ হোক বাইরে একটা সম্ভ্রমবোধের সৌধ গড়ে তুলেছে। এবং কেন জানি কখনও মনে হয় এই মিছে আত্মতুষ্টি খুবই অর্থহীন। নিজেকে সে আসলে ঠকাচ্ছে।

তখন চারু বলল, ভোর হয়ে যাবে পৌঁছতে।

—ঠিক মতো গেলে হবে হয়ত।

আসলে কথার কেউ সূত্র খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু চারু জানে তাকে সূত্র খুঁজে বের করতেই হবে। মাত্র পাঁচ ঘন্টা সময়। সে মানুষটার সখ্যতা আদায় করতে এসেছে। তার এখন এটাই বড় দায়। গাড়ি লেট না করলে চারটে সাড়ে চারটায় পৌঁছানোর কথা। এই শ্রেণীগুলিতে যাত্রী ওঠে না। পিয়ারিলাল সব খবর নিয়েছে। এবং চারুর শরণাপন্ন হয়ে বলেছে, ব্যাওসা লাটে উঠল। বাঁচা।

চারু খুব একটা সেজে আসে নি। সে আসার আগে মানুষটার সব খবরা-খবর নিয়েছে। সব শুনে সে বুঝে ফেলেছে, আসলে মানুষটা রুচিবান। রুচিবান মানুষকে মজানো সহজ না। সে সেই বুঝে ঠোঁটে হাল্কা লিপস্টিক দিয়েছে। সেই ভেবে, চোখে হাল্কা কাজল দিয়েছে। সাদা সিল্ক পরেছে। ভ্রূ প্লাক করাই থাকে। সেটা না থাকলে ভাল হত ভেবেছে। আসলে সে এসেছে মানুষটার কাছে প্রকৃতির জলজগন্ধ নিয়ে। কামুক হয়ে লাভ নেই। চোখে মোটা কাজল দিয়ে লাভ নেই। সব হাল্কার ওপর পছন্দ মানুষটার—চারু সব শুনে এমনই ভেবেছে।

তা-ছাড়া সব শুনে চারুর মনটা প্রথম বেশ দমে গিয়েছিল। সুতোর বলের মতো, কোথায় যে গড়িয়ে যায়, কিন্তু সুতোর গিঁট অন্য এক দেয়ালের পাশে কেউ ধরে থাকে, সেটা কি চারু কোনদিন জানতে পারবে না। চারু পিয়ারিলালকে বলেছিল, তুমি একটা ভাল মানুষকে প্যাঁচে ফেলছ কেন?, পিয়ারিলাল হেসেছিল। কিছু বলে নি। চারু বুঝতে পেরেছিল, সে যে এতদূর উঠে এসেছে, এই

মানুষটার করুণায়। ঘরে কেউ এলে সাজানো প্লেটে সে এখন মিষ্টি ধরে দিতে পারে।

ফলে পিয়ারিলালের জন্য চারুর কিছু করতেই আটকায় না। তবু কি যে হয়, মানুষের কি যে থাকে, কোথায় যেন এক আবহমানকালের সংস্কার রক্তের মধ্যে থেকে যায়—খুব নিচে নামতে আটকায় চারুর। মানুষটাকে দেখে সে কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে তাকিয়েছিল। সব কিছুই দেখে, আবার কিছুই দেখে না মতো চোখ মুখ, যেন গত জন্মে কি হারিয়েছিল, এখনও তা খুঁজে বেড়াচ্ছে। চারু বলল, কুন্তবাবু আপনার খুব সুখ্যাতি করে।

কথার একটা যা হোক খেই পাওয়া গেল। সে বলল, কুন্তবাবুকে তুমি চেন।

—বারে চিনব না। আমাদের ঘরের মানুষ। কুন্তবাবু না থাকলে চাচাজীর লোটা কম্বল সার হত।

মেয়েটা ত বেশ কথা বলে। ঠোঁটে কি সবুজ লিপস্টিক আলতো করে দিয়েছে! কথা বলতে বলতে ঠোঁট ভিজে যাচ্ছিল চারুর। এবং ভারি তীক্ষ্ণ চাউনি। চোখ তুলে যখন তাকায় অতীশের ভারি মোহ সৃষ্টি হয়।

চারুই প্রায় কথা বলছিল—রাতের ট্রেন বেশ ভাল। আমার খুব ভাল লাগে।

অতীশ রাতের ট্রেনে যেতে ভয় পায়। বিশেষ করে নির্মলা বার বার বলেছিল, তুমি যাই কর রাতের ট্রেনে যাবে না। কত সব কাণ্ড হচ্ছে। ছিনতাই চুরি, ডাকাতি কি না! কিন্তু অতীশ জানে, ভিড়ের মধ্যে সে বসে থাকবে। কিছু টাকা পয়সা থাকবে এই পর্যন্ত। এমনকি সে হাতঘড়িও পরে না যে ছিনতাই হবে। জুতো জামা খুলে না নিলে তার যাবার কিছু নেই। যেটা সব চেয়ে অসুবিধা তার কাছে, রাতের ঘুম নষ্ট। রাতের ট্রেনে তার ঘুম হয় না। সে একটু ঘুমোবে বলেই বাসা ছেড়ে পালাচ্ছে। আর্চির তাড়া খেয়ে সে ছুটছে বাবা মার কাছে! দিনে দিনে গেলে হত, কিন্তু সব কাজ সামলে ট্রেন ধরা হয়ে উঠবে না ভেবেই, সে নির্মলাকে বলেছিল সাবধানে যাব। আর একটা রাত একা বাসায় কাটানো তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। আর্চি তবে আরও বেশি মজা পেয়ে যাবে। সে প্রায় নির্মলাকে এ-সবও বলতে যাচ্ছিল।

অতীশ চারুর সান্নিধ্যে বেশ উষ্ণতা অনুভব করছে। একবার রাম সিং এসে খবর নিয়ে গেছে, কোন দরকারে সে যদি লাগে। চারু বলেছিল, দরকার

পড়বে না। তুমি চা টা দরকার মতো খেয়ে নিও। বলে পার্স থেকে একটা টাকা বের করে রাম সিংকে দিলে, সে সেই যে চলে গেল আর এল না।

চারু নানাভাবে এখন কথা শুরু করে দিয়েছে। সে দু হাঁটুর ওপর মুখ ভাঁজ করে অতীশের সামনা-সামনি বসে আছে। বাবুজীর বহু কেমন দেখতে, খুব দেখতে ইচ্ছে করে জানাল চারু। অতীশ হেসে বলেছিল, এস না, কুম্ভবাবুর সঙ্গে আমার বাড়ি চলে এস। আলাপ হবে।

চারু ততোধিক চোখ ওপরে তুলে বলেছে, আরে বাপস, যাই আর যুদ্ধ লেগে যাক। কোথাকার কোন মেয়ে, ভাবিজীর পছন্দ নাও হতে পারে।

—কেন হবে না। তুমি তো খুব ভাল মেয়ে।

চারু কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। জানালায় তাকিয়ে থাকল। অতীশ ভাবল, কোন খারাপ কথা বলে ফেলেনি ত! যা সে অন্যমনস্ক, সে অনেকবার মনে করার চেষ্টা করল আসলে সে কি বলেছে! হাতড়ে হাতড়ে পেয়েও গেল। সে বলেছে, তুমি তো খুব ভাল মেয়ে। এ-কথায় রাগ হবে কেন। মুখ গম্ভীর হবে কেন। সে ডাকল, চারু।

চারু মুখ ফেরাল না। বলল, আপনি ঘুমোবেন বাবুজী?

—এ-কথা কেন?

—ঘুমোন না। আমি জেগে বসে থাকব।

—ট্রেনে যে আমার ঘুম হয় না চারু।

—কোথায় হয়।

—তাও জানি না। তারপরই মনে হল বুকের মধ্যে এমন কথায় খুব সুদূরে কে যেন দাঁড়িয়ে যায়। বনির মুখ। বনির মতো চারুও তাকে ঘুমাতে বলছে। কারণ সেই ক্লান্তিকর সমুদ্রে, কখনও সে, কখনও বনি কত সব মরীচিকা দেখতে পেত। অতীশ মরীচিকা দেখতে দেখতে কখনও ভুল বকত, কে আছেন, কে আপনি, আপনি কি সেই বিধাতা, অর দ্য ফেট—বনি বনি দেখ আর্চিটা মুখ ভেংচাচ্ছে!

বনি বলত, তুমি এত কষ্ট পাচ্ছ কেন ছোটবাবু? কোথাও কিছু নেই! আর্চি কোথায়! সব ত খাঁ খাঁ করছে।

প্রায় রাহুগ্রাসের শামিল। গিলছে। অতিকায় সমুদ্র দুই বিশাল থাবা মেলে বসে আছে। হাজার হাজার মাইল ব্যাপ্ত অকূল জলরাশি। বনি বুঝতে পারছে না অসীম সমুদ্রে সে তার সব হিসাব গণ্ডগোল করে ফেলেছে। পালে

বাতাস নেই। পাখিটা নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। আর আগের মতো উড়তে সাহস পাচ্ছে না। সেও ঝিম মেরে শুয়ে বসে থাকে। যে-সব পাত্রে খাবার মজুদ ছিল, তার দিকে তাকালে বুক হিম হয়ে আসে। জলের তলানিতে শ্যাওলা জমছে। সেই শ্যাওলাটুকু বনি তুলছে না। যা রোদের তাপ, শ্যাওলা তুলে ফেললেই সামান্য-যে জলটুকু আছে তা শুকিয়ে যাবে। বনি প্রায় কিছুই খাচ্ছে না। কখনও গলা জিভ কাঠ কাঠ ঠেকলে শ্যাওলা গলায় ফেলে দিচ্ছে। এবং সব সময় ভান করছে, সে তার ভাগ মতো ঠিকই খেয়ে যাচ্ছে।

ছোটবাবু জানে আসলে সে নিজের আত্মরক্ষার উপায় কিছুটা পেয়ে গেছে। প্ল্যাংকটন খেতে তার আর খুব বিস্বাদ লাগছে না। জলের দারুণ তেষ্টা মরে যায়। শরীর চাঙ্গা হয়ে ওঠে। জল, খাবার কিছু না থাকলেও তার ক্ষতি নেই। শুধু বোটটা জলের ওপর ভেসে থাকলেই সে বেঁচে থাকতে পারবে। কিন্তু বনি! সে তো প্ল্যাংকটন মুখে দিতে পারছে না। সব সময় বমি বমি ভাব। চোখ ঘোলা ঘোলা। কঙ্কালসার হয়ে যাচ্ছে। সেই মুহ্যমান চোখ নেই। সজীবতা ক্রমে কেউ রক্তচোষা বাদুড়ের মতো চুষে নিচ্ছে। যেন এটা আর্চিরই অভিসন্ধি। সে ছোটবাবুকে এক ভয়াবহ বিভীষিকায় নিয়ে যেতে চায়। যুবতী নারীর কঙ্কালসার মৃতদেহ সামনে। যেন প্রশ্ন, ও কে?

—আমি চিনি না আর্চি।

—আরে এই ত সেই রহস্যময়ী নারী বনি।

—তা হতে পারে।

—একে নিয়ে আর ভেসে বেড়াচ্ছ কেন?

—কি করব?

—ফেলে দাও। সমুদ্রে নিক্ষেপ কর। হাঙ্গরেরা খাক। দেখি—কি মজা?।

তখনই বীভৎস সেই ছবি আর্চির। আর্চির হাতের আঙুলগুলো সমুদ্র থেকে যেন সাপের মতো কিলবিল করে ভেসে উঠছে। মুখ আর মুখ নেই। নাক কান সব লম্বা হয়ে এক একটা অতিকায় অক্টোপাসের অজস্র শুঁড় হয়ে গেছে। আর সমুদ্রের জলে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কখনও সেই ডোরাকাটা মুখ নিয়ে অন্ধকার সমুদ্রে ছায়ার মতো তাকে ছুঁতে চেষ্টা করছে। কিন্তু একটা অদ্ভুত বিষয় সে লক্ষ্য করছে। আর্চি বোটে পা দিতে পারছে না। ক্রসটা দেখলেই আঁতকে উঠছে আর্চি। তবু প্রতিহিংসাপরায়ণ হলে যা হয়, জলের ওপর দিয়েই সে হেঁটে যেতে পারে। মেঘের মতো ভেসে আসতে পারে। অন্ধকার যত গভীর

হয়, যত শব্দহীন মৃত্যুহীন প্রাণ খেলা করে বেড়ায় চরাচরে তত তার আক্রোশ বাড়ে। ছোটবাবু বার বার চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত আর সামলে উঠতে পারেনি, চিৎকার করে বলছে, দেখ বনি আর্চিটা কেমন মুখ ভেংচাচ্ছে।

বনি কাত হয়ে শুয়েছিল। ছোটবাবুর চিৎকারে সে বুঝতে পেরেছে, কখন উঠে বের হয়ে গেছে পাটাতনে। ছোটবাবু ভয়ে চিৎকার করছে। সে কোন-রকমে হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে বলল, এদিকটায় এস। শিগগির। এলবা কোথায়?

—নেই।

বনির গলা ফ্যাসফ্যাসে হয়ে গেছে।—ভারি ক্ষীণ গলায় বলল, আমাকে ধরে বস। দাঁড়িও না।

—কি হবে বসে!

—বস না।

ছোটবাবু দেখেছিল, বনি এক হাতে ক্রসটা ছুঁয়ে রেখেছে। আর এক হাতে তাকে ছুঁতে চাইছে। এবং বনির হাত ছুঁয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজির মতো কেমন সব অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছু নেই। জলের মন্থর কলকল শব্দ। অন্ধকার আকাশের এক কোণায় করুণ বিষণ্ণ একফালি চাঁদ। ছায়া ছায়া হয়ে আছে—অথবা এক প্রগাঢ় নির্জনতা সমুদ্রের। কোথাও ঝুপ শব্দ। বড় মাছ-টাছ হবে। ভোঁস করে ভেসে উঠে ডুবে যাচ্ছে।

বনির গলা পাওয়া যাচ্ছে। বলছে, ছোটবাবু বাইবেলটা কি করলে!

—তোমার শিয়রে রেখে দিয়েছি।

—ওটা আমার আর লাগবে না। বলতে গিয়ে বনির কেমন বড় বড় শ্বাস উঠে আসছিল।

বনি কি মরে যাচ্ছে! আসলে বনির গলা শুকিয়ে কি কাঠ কাঠ হয়ে গেছে। জল, খাবার শেষ হয়ে যাবে বলে আগে থেকেই বনি কেটে পড়তে চাইছে! অথবা ছোটবাবুর জীবন রক্ষার জন্য বনি অভিনয়ের আশ্রয় নেয় নি ত। কোন খাবারই মুখে দিতে পারছে না। বলছে, ওক উঠে আসছে। সে একটা আলু-সেদ্ধ ভেঙে জোর করে মুখে পুরে দিয়েছিল দুপুরে। —খাও, না খেলে বাঁচবে কি করে! বনি খায় নি। গলায় আটকে যাচ্ছে। বিষম খেয়ে কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল পাটাতনে। উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে থাকতেই বলেছিল, ছোট-বাবু আমি পারছি না, সত্যি কিছু খেতে পারছি না।

অন্ধকারে ছোটবাবু বুঝতেও পারছে না। নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখল, না, নিশ্বাস পড়ছে। বুকে হাত দিল। টিপ টিপ শব্দ। স্যালি হিগিনস আপনি কোথায়। এ-কি করলেন! একটু আলো পর্যন্ত জ্বালতে পারছি না। আমাদের সব ফুরিয়ে আসছে। তারপর কি ভেবে বলল, আমাদের নয়। আমার। বনি কিছুই খাচ্ছে না কেন! আপনি এত ধর্মবিশ্বাসী মানুষ ছিলেন, কোন দৈববাণী করুন। কি করলে বনি আবার খেতে পারবে। বনির বমি পাবে না। বনি আর মরীচিকাও দেখছে না। এখন আমি শুধু মরীচিকা দেখছি।

ছোটবাবুর মনে হয়েছিল, মরীচিকা দেখলে বনি স্বাভাবিক আছে সে টের পেত। সে যেমন দেখছে। মৃত্যুভয় থেকেই সে এ-সব দেখছে। মৃত্যুভয় সব শিরা-উপশিরায় ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো কামড়ালেই সে মরীচিকা দেখতে পায়। তবে ঠিক মৃত্যুভয় কিনা জানে না, বোধহয় একা হয়ে যাবার ভয়, সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ভয়—বনি না থাকলেই সে যেন তাই হয়ে যাবে। জীবনের এক এক মুহূর্তে মানুষের জন্য অপার সব বিস্ময় অপেক্ষা করে থাকে। এই সেদিনও বনিকে সে চিনত না, জানত না। বনি এক সুদূর গ্রহের নারী সে বুঝতে পারত না। বনি মরিয়া হয়ে কেবিনে ঢুকে তার সব খুলে না ফেললে সে বুঝতেই পারত না, আসলে কাপ্তানের ছোট্ট ছেলেটা এক বালিকা। তারপরই কি যে সেই গভীর এক গোপন পৃথিবীর আবিষ্কার! তখনই বনি বলছে, ছোট-বাবু আমাকে নিয়ে শুইয়ে দাও। যে ক'দিন থাকি, শিয়রে বসে থাক। মরে গেলে আমাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিও। ক্রসটা জাহাজেই রেখ। তা না হলে আর্চি তোমাকে বিড়ম্বনায় ফেলে দেবে। বাইবেলটা সব সময় পকেটে রাখবে। ওটা তোমায় দিয়ে গেলাম।

চারু দেখল, বাবুজী জানালায় মুখ রেখে তাকিয়ে আছে। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে মাথাটা অল্প দুলছে। দু হাঁটুর মধ্যে মাথা। একবার মনে হল ঝিমুচ্ছে। মাথা নিচু করা। মুখটা দেখতে হলে হাঁটু গেড়ে নিচে বসতে হবে। যদি না ঘুমোন, তবে দেখবে, এক রমণী তাকে চুপি চুপি চুরি করে দেখছে। এত বেশি কৌতূহল বাবুজীর পছন্দ নাও হতে পারে। একটা দুটো কথা বলে দেখেছে জবাব নেই। সে তার ব্যাগ থেকে সাদা চাদর বের করে বাংকে বিছিয়ে দিল। একটা বালিশ। সে এখন ইচ্ছে করলে ডাকতে পারে। গায়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বলতে পারে—আপনি বড্ড ঘুম কাতুরে। উঠুন। শোবেন।

সে ডাকল, বাবুজী!

অতীশ দেখতে পাচ্ছে, আকাশ ফুটো করে এক ঝলক বিদ্যুতের মতো শীর্ণ ফ্যাকাসে লম্বা একটা হাত ওর দিকে এগিয়ে আসছে। বলছে, নাও। তোমাকে দিলাম। রাখ। যত্ন করে রাখ। তবে ব, পাবে না। হাতটা ওর জানালার কাছে বাড়িয়ে রেখেছে। সে যেন হাত পাতলেই টুপ করে কেউ কিছু তাকে দেবে বলে অপেক্ষা করছে।

—বাবুজী।

—হুঁ।

—উঠুন।

—কে? আচমকা ভূত দেখার মতো চারুর সজীবতা তাকে কাতর করে ফেলল। বলল, কিছু বলছ চারু?

—ঘুমোচ্ছেন যে!

—না ত।

—আপনি বড্ড মিছে কথা বলেন।

—আমি ঘুমোচ্ছিলাম!

—তা নয়ত কি?

হবে হয় ত! সে আর কিছু বলতে চাইল না। আবার কেমন নিজের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে গেল। এবং এই হয় অতীশের। সে বাড়ি যাচ্ছে। কত দিন আগেকার সব ঘটনা মাথার মধ্যে এখনও করাত চালায়। সে কিছুতেই স্বাভাবিক থাকতে পারে না। এতদিন পর আবার বনি কেন বাইবেলটার কথা বলছে! জোরজার করে বনি যে বিশ্বাস তৈরি করতে চেয়েছিল, মৃত্যুভয় মরীচিকা শেষ পর্যন্ত যা তাকে বিশ্বাস করাতে পারেনি আজ আবার তা কেন বহু রূপে দেখা দিচ্ছে সামনে। হাতের শিরা-উপশিরাগুলো পর্যন্ত নীল রঙের। কঙ্কাল সদৃশ হাতের মধ্যে কেউ যেন একটা চামড়ার গ্লাব্‌স পরিয়ে রেখেছে।

কি ভেবে অতীশ বলল, আমি ঘুমোব না চারু।

—না ঘুমোলে চা খান। বলে ফ্লাস্কটা পেড়ে নিল। আঁচলটা গা থেকে বার বারই আলগা হয়ে যাচ্ছে। পড়ে যাচ্ছে। সারাক্ষণ সে দেখেছে, চারু ওর আঁচল সামলাতেই ব্যস্ত। যখনই পাশাপাশি বসে থেকেছে, পায়ের পাতা বার বার শাড়ি টেনে ঢেকে দিচ্ছে। এত সব দেখলে অতীশ কেমন বিভ্রমের মধ্যে পড়ে যায়। দেখবে না বলেই, জানলায় মুখ রেখে চুপচাপ আকাশ নক্ষত্র এবং অন্ধকার দেখে যাচ্ছিল। দেখতে দেখতে সে হয়তো সত্যি ঘুমিয়ে

পড়েছিল। নতুবা লম্বা শীর্ণ ফ্যাকাসে হাতটা এত স্পষ্ট এখনও সে দেখে কি করে!

সে বলল, চারু তোমার পরজন্মে বিশ্বাস আছে?

এ-ত আচ্ছা মানুষ। চারু বলল, চাটা ধরুন। ভেবে বলছি।

চারু ফ্লাক্সের ঢাকনাতে চা নিয়ে খেতে থাকল। বলল, পরজন্ম বিশ্বাস থাকা ভাল।

—এ-কথা বলছ কেন?

—কিছু না থাকলে আর একটা জন্ম আছে, সাধ আহ্লাদ সেখানে মিটবে এমন আশা নিয়ে বসে থাকা যায়।

—এ-জন্য বলছ অন্যজন্মে বিশ্বাস থাকা ভাল?

—আমাদের দেশের মানুষ তো খুব গরীব বাবুজী। এটুকু না দিলে ওরা বাঁচবে কি করে?

—সে-কথা বলছি না। তুমি বিশ্বাস কর কি না বল?

—মুনি ঋষির কথা বিশ্বাস করতেই হয়।

—আবার করতেই হয়। সোজাসুজি হ্যাঁ বা না বল।

চারু কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল এ-কথায়। বাবুজী কি টের পেয়ে গেছেন, ট্রেনে উঠেই সে বাবুজীকে লোভে ফেলে দেবার নানারকম ছলাকলা প্রয়োগ করে যাচ্ছে। পরজন্মের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তাই ভয় ধরিয়ে দিচ্ছেন। তখনই ঘরের লক্ষ্মীর পট, এবং তেল সিঁদুর মাখা ঘট অথবা ছোট্ট জানালায় তার শিশু সন্তান বাড়ে দিনে দিনে এমন সব সাত পাঁচ চিন্তার জটিল গ্রন্থি মাকড়সার জালের মতো ঝুলতে থাকল সামনে। মাকড়সাটা জালের চারপাশে ছুটে বেড়াচ্ছে। কোথাও স্থির হয়ে এক দণ্ড দাঁড়াতে পারছে না।

অতীশ ফের বলল, তুমি বিশ্বাস কর না!

—করি। চারুর এবার সোজা সরল উত্তর।

—বিশ্বাস করলে এত দেরি হয় না জবাব দিতে। ভয়ে বলছ। তারপর চারুর মুখে গরীব মানুষ-টানুসের কথা মনে পড়তেই হা হা করে হেসে দিল অতীশ।

অকারণ অতীশের ভয়ংকর তীক্ষ্ণ হাসি চারুর অন্তরাত্মায় ঝড় তুলে দিল। সে ভয়ে ভয়ে বলল, বাবুজী আপনি……

অতীশ তখনও হাসছে।

—বাবুজী!

অতীশ বলল, চারু আমি মার কাছে যাচ্ছি।

চারুর মুখ কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল।

—কতদিন থেকে মা বাবাকে দেখি না!

চারু বোধ হয় দু হাতে মুখ ঢেকেই ফেলত। সে বলতে যাচ্ছিল, আপনার মাথায় গণ্ডগোল আছে কথাটা তবে সত্যি বাবুজী। তারপরই মায়ের কথা বলায় চারু ভেবেছিল, এই বুঝি সে ধরা পড়ে গেল। মার কাছে যাওয়ার অর্থই কোন তীর্থ দর্শনের মতো পবিত্র ব্যাপার ট্যাপার। এ-সময়ে চারু তাকে অপবিত্র করার যতই চেষ্টা করুক, সে কিছুতেই কাবু হবে না। সব অভিসন্ধি জেনে ফেললে পিয়ারিলাল আর সিট মেটালে ঢুকতেই পারবে না। ওর দু নম্বরী ব্যবসা লাটে উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে সে আবার আগেকার চারু হয়ে যেতে পারে। সেটা ত তার গতজন্মের কথা। সে-জন্মে সে কিছুতেই ফিরে যাবে না! পরলোক থাকুক না থাকুক, পরজন্মে বিশ্বাস করুক না করুক, গতজন্মে সে আর ফিরে যেতে পারে না। গতজন্মে ফিরে গেলে তাকে সব আবার হারাতে হবে। সে স্থির এবং বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা শুরু করে দিল। তাকে শৌখিন করে তোলায় পিয়ারিলালের যেমন আগ্রহ ছিল, তেমনি বিদুষী করে তোলারও আগ্রহ। কারণ এখন এমন একটা সময় যাচ্ছে, ব্যভিচারেও বিদুষীদের সুযোগ সুবিধা বেশি। সে বলল, আপনি কথামৃত পড়েছেন?

—না।

—কিছুই পড়েন না।

—তুমি পড়েছ।

চারু না পড়েও হুঁ করল। বাবুজীর যখন পড়া নেই তখন সে অনায়াসে হুঁ বলতে পারে।

—রামায়ণ মহাভারত।

—পড়া আছে।

—দেবতাদের কথাবার্তায় বিশ্বাস তৈরি হয় নি আপনার?

—ওতো সব মানুষ, দেবতা সেজে অপকর্ম ধর্মকর্ম সব করছে।

—আপনি নাস্তিক আছেন বাবুজী।

অতীশ উঠে দাঁড়াল। চা খাওয়া হয়ে গেছে। চারুর কথার জবাব দিল না। সে যে নাস্তিক নয়, সে যে প্রেতাত্মার শিকার এ-সব বলা যেত। কিন্তু

কাউকে সে বলতে পারে নি। বাবাকেও না। বাবা খুব জোরজার করলে বলেছিল, মানুষের দুর্গন্ধ পাই। মানসদাকে বলেছিল, আপনার ভূতে বিশ্বাস আছে? মানসদা বলেছে, সে আবার কি। সত্যি তার নিজেরও মনে হয়, সে আবার কি! তাহলে তার চারপাশে এত ভূতের উপদ্রব কেন! ঠাকুর দেবতার উপদ্রব কেন? ঠাকুর দেবতার প্রভাব যত দিন যাচ্ছে, বাড়ছে। আর্চি যেমন তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, তেমনি সব মানুষকে বিদঘুটে ঠাকুর দেবতা অষ্টপ্রহর তাড়া করে বেড়াচ্ছে। যার পয়সা নেই, সেও তাড়া খাচ্ছে, যার পয়সা আছে সেও তাড়া খাচ্ছে। ঈশমদা থেকে সারেং সাব, সেলি হিগিন্স থেকে তার বাবা সবাই তাড়া খেতে খেতে নিজের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করছে।—সবই তাঁর ইচ্ছে! ওর মনে পড়ছে, বাবার সে সব কথা।—আপনার পুত্র? বাবা হেসে বলতেন, আমার হবে কেন! ওঁর। অতীশের তখন ভারি রাগ হত। নিজের বললে, পাছে ঈশ্বর কুপিত হন, সেই ভয়ে বাবা তাকে নিজের পুত্র বলে স্বীকার করতেও ভয় পেত। সে ভাবত, মানুষের এর চেয়ে অবমাননা আর কি আছে। সে ভাবত, মানুষ যদি আত্মবল না পায় এবং স্বাধীন না হয়, তবে যে-ভাবেই হোক সে একজন ক্রীতদাস। তার নিজের আর কোন অস্তিত্ব নেই। যেটুকু আছে সবটাই ভূতের প্রভাব। তাহলেই সব যায়। থাকে কি। এই ভূতে পাওয়া বিষয়টাই তাকে আর্চির প্রেতাত্মার কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছে। আর্চিই তার এখন ঠাকুর দেবতা। সে ভাবছে, আর্চির একটা ডোরাকাটা বাঘের ছবি ঘরে রাখবে কি না। পূজা করবে কি না। ফুল বেলপাতা দিয়ে, এয গন্ধপুষ্প করবে কিনা। তেত্রিশ কোটি দেবতার সংখ্যা বেড়ে গিয়ে তেত্রিশ কোটি এক হবে কি না। কুম্ভবাবুকে যদি বলা যায়, শুধু কুম্ভ কেন, পিয়ারিলাল, শেঠজীর মতো ব্যক্তিরাও মানত করতে পারে। বলা যায় না, তেমন সাক্ষাৎ সিদ্ধিদাতা গণেশ হয়ে গেলে প্রচুর অর্থাগমেরও সম্ভাবনা আছে। অনেক দিন পর নবর কথা মনে হল। নব পারত। নবর কোন খোঁজখবর নেই। শনি ঠাকুরের পূজারী না হয়ে আর্চি ঠাকুরের হলে ল্যাং খেতে হত না। শনিঠাকুরের খদ্দের বেশি। আর্চি ঠাকুর একেবারে হাল আমলের। নতুন কিছু করা যেত—সঙ্গে ঢাকও বাজানো যেত। কমপিটিশনে নব তাহলে হেরে যেত না।

গাড়িটা বেশ দ্রুত ছুটছে। ঝমঝম রেলগাড়ি, দূরে অদূরে লাল নীল বাতি, ছায়া ছায়া অন্ধকার। গভীর আকাশের ছাদ ফুটো করে গাড়িটা এক অন্তহীন যাত্রায় যেন বের হয়ে পড়েছে। এ-সময়ে অতীশ চুপচাপ—চারু নিজের বিছানা

ঠিকঠাক করছে। ওর হাই উঠছিল। বাবুজীর ওপর সামান্য অভিমানও হয়েছে। কথা বললে জবাব দিচ্ছে না। বাইরের দিকে সেই যে তাকিয়ে আছে, কিছুতেই যেন আর চোখ ফেরাবে না। এত অহংকার তোমার বাবুজী। মনের মধ্যে কুট খেলা, সে নিজের ঠোঁট দাঁতে কামড়ে ধরল। আসলে প্রলোভনটা কি-ভাবে তৈরি করা যায়, শুয়ে হাত পা বিছিয়ে, ঘুমের ভান করে এবং সামান্য সায়া শাড়ি শরীরে আল্গা করে দিলে ঠিক থাকে কি করে সে একবার বাজী লড়ে দেখতে চায়।

সে শুয়ে পড়ার সময় বলল, বাবুজী আমি ঘুমোচ্ছি। আবার সে একটা হাই তুলল। পায়ের ঠিক নিচটায় ওর অ্যাটাচি। পাশ ফিরে শুয়ে বলল, একটু দেখবেন। টাকা পয়সা গয়নাগাটি আছে।

অতীশ বলল, ওটা বাংকে তুলে রাখ না! আমি তো আছি!

—আপনি বাবুজী আপনার মধ্যে থাকেন না। আপনাকে বিশ্বাস নেই। পায়ের নিচেই থাকুক। আরামও হবে। পাহারা দেওয়াও হবে।

অতীশ বুঝতে পারল না, চারু কেন পায়ের কাছে রেখে দিল অ্যাটাচিটা! পিয়ারিলালের বাড়ি গাড়ি আছে। ধন-দৌলত আছে। চারু পিয়ারিলালের ভাইঝি। বলেছে বহরমপুরে পাটের বড় মহাজন চারুর বাবা। দামী অলঙ্কার অ্যাটাচিতে থাকতেই পারে। সে কিছুটা অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল। চারু ইচ্ছে করলে শিয়রে রাখতে পারত, তা পর্যন্ত রাখল না। সব চেয়ে আশ্চর্য অতীশ, চারু তার দিকে পা মেলে শুয়েছে। রুপোর চেলি পায়ে। এবং সামান্য পা তুলে দিলেই শাড়ি সরে গিয়ে উরুর ডিম দেখা যাচ্ছে। অতীশ একবার তাকিয়েই চোখে জ্বালা এবং শরীরে জ্বরজ্বর বোধ করতে থাকল। এমন কি চারুকে বলতে পারল না, দোহাই চারু তুমি ও-ভাবে পা তুলবে না। দোহাই চারু তুমি পা আমার দিকে ঠেলে দেবে না। তবে সে উঠে ওদিকের বাংকটায় গিয়ে বসতে পারে। কিন্তু চারুর অ্যাটাচিটা! ওদিকের বাংক থেকে অ্যাটাচি চোখে পড়ে না। কারণ চারু পা তুলে দিলে ঢাকা পড়ে যায়। ঘুমের মধ্যে সে তা করতেই পারে।

চারু বলল, ইস্টিশন এলে ডেকে দেবেন বাবুজী। তারপর সহসা মনে পড়ার মতো বলল, এই রে! বলেই দরজার দিকে ছুটে গেল। ফিরে এসে বলল, দরজা লক করে দিয়ে এলাম। কেউ পীড়াপীড়ি করলেও খুলবেন না। রাতের ট্রেন। মাঠের যে কোন জায়গায় থেমে যেতে পারে।

তারপর চারু অতীশকে আর কোন কথা বলতে না দিয়েই রাবারের বালিশটা আরও ফুলিয়ে সাদা চাদরে তা ঢেকে দিল। শেষে রাজরানীর মতো. হাত পা বিছিয়ে সত্যি সত্যি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল। যেন সাড়া নেই। মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরছে। আর পা থেকে শাড়ি ক্রমেই উঠে যাচ্ছে। আঁচল পাশে লুটাচ্ছে। কি ঘন সবুজ চুল, নাকের বাঁশি ফুলে উঠছে। ঘুমের ঘোরে পা দুটো ভাঁজ করে দেবার সময়ই অতীশ বুঝতে পারল সে আর পারছে না। তার গায়ে সত্যি সত্যি জ্বর আসছে। উত্তেজনায় কাঁপছে। গরম নিশ্বাস পড়ছে। আর সামান্য তুলে ফেললেই সেই এক গভীর অন্তহীন সমুদ্র। বিপুল অন্ধকারের মধ্যে কোন ছোট্ট জোনাকি পোকা থিরথির করে কাঁপছে। সে পাগল হয়ে যাচ্ছিল, চারুকে সামান্য ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে। অথবা সারাক্ষণ অগ্নিদগ্ধ হওয়ার চেয়ে এক লাফে জায়গাটা পার হয়ে গেলে কেমন হয়।

অতীশ সব কিছুই এখন দেখতে পাচ্ছে। একবার সে ডেকে উঠল, চারু চারু।

চারু ঘুমের মধ্যেই জবাব দিল, হুঁ।

—ঠিক হয়ে শোও।

চারু শাড়ি ঠিক করতে গিয়ে পা তোলার সময় বাকি যা ছিল তাও দেখিয়ে দিল।

অতীশ চিৎকার করে উঠল, চারু।

চারু উঠে বসল। বলল, ভয় পাচ্ছেন!

অতীশ কোন কথা বলল না।

চারু এবার গা ঘেঁষে বসল।—ভয় কি!

অতীশ কথা বলতে পারছে না। সে আর কিছুই পারছে না। একমাত্র চারুকে নিয়ে লম্বা হয়ে যাওয়া ছাড়া তার এ-মুহূর্তে আর কিছু করণীয় নেই। সে জানে, এতে আর্চি আরও বেশি সুবিধা পেয়ে যাবে, সে জানে, এতে আর্চির ঘাঁটি আরও মাথার মধ্যে শক্ত হবে। তবু সব নস্যাৎ করে অতীশ দীপঙ্কর এক অপরূপ লাবণ্যময়ীর কাছে দু হাত তুলে প্রায় যেন ভিক্ষা চাইল। শরীরের প্রজ্বলিত দাবদাহ প্রশমনে এর চেয়ে আর কোন করুণ আধারের কথা তার জানা নেই।

॥ ছাব্বিশ ॥

চন্দ্রনাথ শেষরাতের দিকে ভয়াবহ এক দুঃস্বপ্ন দেখলেন। কোথাও ঢাক ঢোল বাজছে। ধূপদীপের গন্ধ। মুণ্ডমালা গলায় মহামায়া। তাঁর পায়ের কাছে চন্দ্রনাথ মৃগাসনে বসে। হোম হচ্ছে। প্রজ্জলিত হুতাশনে তিনি দেখলেন যজ্ঞের হবি জ্বলছে। তারপর দেখলেন, সেই হবি আর হবি নেই। মানুষের কাটামুণ্ডু হয়ে গেছে। এবং অগ্নি মধ্যে সেই মুণ্ডু বাপের সঙ্গে তর্ক করার জন্য চোখ পিটপিট করে তাকাচ্ছে। তিনি বললেন, এই হুতাশনে তোমার অবস্থান কেন?

কাটামুণ্ডু বলল, এত যে মন্ত্রপাঠ করলেন, দেবী কি আপনার প্রতি প্রসন্না হয়েছেন?

তিনি বললেন, দেখ অতীশ, তোমাকে এ-অবস্থায় আমি দেখব আশা করি নি।

কাটামুণ্ডু হেসে বলল, বলিদান কখন হবে?

—এক্ষুনি।

—কটি ছাগ শিশু?

—তা দেখতে হবে। বহু পুণ্যার্থী এসেছে।

—তাদের বিশ্বাস বলিদান হলেই মুক্তি। জরা ব্যাধি মৃত্যু থাকবে না।

তিনি বুঝতে পারলেন, অতীশ তার ঈশ্বরপ্রীতির প্রতি কটাক্ষ করছে। হুতাশনে থাকলে এমনই হবার কথা। তিনি একটা অতিকায় চিমটা দিয়ে যজ্ঞের প্রজ্জলিত অগ্নি থেকে কাটামুণ্ডুটি তুলে আনলেন। ঝলসে গেছে নাক মুখ। ফোসকা, চামসে গন্ধ। তারপর গঙ্গাজল ছিটিয়ে ওম মন্ত্র উচ্চারণ করতেই দেখলেন, অতীশ দীপঙ্কর অথবা সোনা। সোনা মাঠ পার হয়ে ছুটে যাচ্ছে। সেই মোষবলির দিনে যেমন অতীশ ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকত তেমনি, জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তিনি তরমুজের জমি পার হয়ে ডাকলেন, সোনা।

কোথাও কেউ সাড়া দিচ্ছে না। চারপাশে বাস্তুপূজা হচ্ছে। মেষ বলি মোষ বলি হচ্ছে। আতপ চাল ডালে খিচুড়ি, পায়েসের গন্ধ। তিনি সব ফেলে ছুটছেন। অবোধ এই বালকটিকে এক্ষুনি ধরে আনা দরকার। তাঁর ঈশ্বর-

প্রীতির প্রতি কটাক্ষ করার অর্থই হচ্ছে মহামায়ার প্রতি কটাক্ষ। তিনি বিরূপ হলে সংসার অসার অর্থহীন। কিন্তু ডেকে ডেকেও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি নিজে এবার গভীর বনের মধ্যে ঢুকে গেলেন। ঢুকে যেতেই বনটা কেমন অদৃশ্য হয়ে বড় এক দীঘি হয়ে গেল। দীঘির পাড়ে প্রাচীন সব মন্দির। মন্দিরের দরজা বন্ধ! কতকাল কেউ পূজা দেয় নি। তখনই দেখলেন সোনা পায়ে পায়ে হাঁটছে। মাথায় ঝুড়ি। বিল্বপত্র, গাঁদাফুল চন্দনের গন্ধ মাথায় করে বাপের সঙ্গে পূজা দিতে যাচ্ছে। পিতাপুত্র মন্দিরের সামনে হাজির। দরজা খুলে গেল। মহারোষে মহামায়া তাকিয়ে আছেন। পূজা চাই। দীঘিতে দু'জনই স্নান সেরে উঠলে দেখলেন হাজার লক্ষ পুণ্যার্থী। তারা তাঁকে খুঁজছে। তিনি মহাপূজা সাঙ্গ না করেই ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছেন। করজোড়ে সেই পুণ্যার্থীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, পূজার প্রকৃষ্ট জায়গা এই দেবীর মন্দিরে। আপনারা দীঘির ঘাটে অবগাহন করুন। মেষ মোষ বলি প্রদত্ত যা আছে সব পবিত্র করে নিন। দীঘি তখন দীঘিও নেই। এক স্রোতস্বিনী নদী হয়ে গেছে। বিরাট বিশালাকায় নদীর গর্ভে প্রকাণ্ড বালিচর। তাঁবু পড়েছে হাজার হাজার। তিনি প্রায় একজন কাপালিকের মতো ক্রমে আরও প্রবল হয়ে যাচ্ছিলেন। অতিকায় তার শরীর আকাশ ছুঁয়ে দিচ্ছে। যূপকাষ্ঠে বলি শুরু হয়ে গেছে। এবং বলির সময় উৎসর্গ করতে গিয়ে দেখলেন, যূপকাষ্ঠে অতীশ নামক এক বেয়াদপ ছোকরা গলা বাড়িয়ে আছে। মনের ভুল ভেবে, তিনি উচ্চারণ করলেন, একে ছেড়ে দাও, অপবিত্র পশু। বলিদানে বিঘ্ন ঘটতে পারে। পরে আর একটি। এ-ভাবে যতই যূপকাষ্ঠে বলি প্রদত্ত প্রাণীকুলকে নিয়ে আসছে ততই তিনি বিস্মিত। হাড়িকাঠে গলা দিলেই সে আর পশু থাকে না। তাঁর জাতক হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারলেন, দেবীর এমনই ইচ্ছে। তিনি আর না পেরে আজ সেই মহাবলিদান সমাপন করলেন। অতীশ বলি প্রদত্ত এক জীব হয়ে গেল। অথচ পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে সোনা। গলায় যজ্ঞোপবীত। মাথায় বিল্বপত্র। তিনি ফের ওম মন্ত্র উচ্চারণ করতেই সব সাফ সোফ হয়ে গেল এবং ঘুম ভেঙে গেল তাঁর!

ঘুম থেকে ধড়ফড় করে উঠে বসলেন চন্দ্রনাথ। গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে তার। দুর্গা দুর্গা বলে তিনি প্রথম আর্তনাদ করে উঠলেন। শেষ-রাতের স্বপ্ন। কোথাও সংসারে বড় অমঙ্গলের চিহ্ন প্রকট হয়ে উঠছে। বিছানা থেকে তাড়াতাড়ি খড়ম পায়ে বের হতেই ধনবৌ দরজা খোলার শব্দ পেল।

বয়স যত বাড়ছে, মানুষটার তত অস্বস্তি বাড়ছে। অতীশের চিঠি না পেলে এটা আরও বেশি হয়। ধনবৌ পাশের তক্তপোশ থেকে বলল, নিজেও ঘুমোও না, আমাদেরও ঘুমাতে দাও না।

আজ রাতে চন্দ্রনাথ এই নিয়ে তিনবার দরজা খুলেছেন। দরজা খুললেই শব্দ হয়। বয়স বাড়ার জন্য ধনবৌর ঘুম পাতলা। বার বার ঘুম ভেঙে গেলে কার না রাগ হয়। রোজই ভাবেন, দক্ষিণের ঘরে এবার থেকে একা শোবেন। শেষ পর্যন্ত আর হয় না। চোখে মুখে দুশ্চিন্তা, অতীশটা কেমন আছে, টুটুল মিণ্টু। বৌমার শরীর ভাল যাচ্ছে না। কারো কিছু যদি বিপদ হয়ে থাকে। ধনবৌর কথা গ্রাহ্য করলেন না। উঠোনে নেমে প্রথমে আকাশ দেখলেন। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের আবছা অন্ধকার। গাছের ছায়া বাড়িটাকে আরও অস্পষ্ট আঁধারে ডুবিয়ে রেখেছে। কিছু জোনাকি পোকা উড়ছিল। সামনে ঠাকুর ঘর। চন্দ্রনাথ দরজা খুলে প্রণিপাত হলেন। বললেন, ঠাকুর এমন দেখলাম কেন? অতীশের কি কিছু হয়েছে? বৌমার! আরও সব কথাবার্তা চলল গৃহদেবতার সঙ্গে। এবং মনে হল, এ-সময়ে গঙ্গাস্নানে যাওয়াই তাঁর প্রাথমিক কর্তব্য। নদী, ফুল, ফল এবং বৃক্ষের সঙ্গে কথা বলা দরকার। তিনি বারান্দায় উঠে হাতে লাঠি নিলেন, লণ্ঠন নিলেন। তাঁকে এখন বের হয়ে পড়তে হবে। রাস্তায় যেতে যেতে সব গাছপালা বৃক্ষকে, আকাশকে এবং নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে স্রোতস্বিনীকে এই দুঃস্বপ্নের কথা বললে, স্বপ্নের কুফল দূরীভূত হবে।

ধনবৌ বিছানা থেকে উঠে পড়ল। বাইরে এসে বলল, কোথায় যাচ্ছ?

—গঙ্গাস্নানে!

ধনবৌ ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে গেল।—সময় অসময় নেই।

—কুপিত হবে না। যেতে যেতে সকাল হয়ে যাবে।

ধনবৌ কাছে থাকলেই নানারকম অনুযোগ শুনতে হবে। তিনি তাড়াতাড়ি একটু তামাকু সেবন করে বের হয়ে গেলেন। বাড়ির আর কেউ জেগে নেই। কুকুর দুটো এখন চন্দ্রনাথের সঙ্গী। ধনবৌ নানারকম প্রশ্ন করবে ভয়েই তিনি যেন দ্রুত পালাচ্ছেন। কি জানি পাছে দুর্বল মুহূর্তে স্বপ্নের কথা ফাঁস করে দেন। তাহলে নির্ঘাত স্বপ্ন ফলে যাবে।

চন্দ্রনাথ রাস্তায় এসে আর একবার ব্যাগটা হাতড়ে দেখলেন। গামছা ধুতি সবই আছে। তিল তুলসী নিয়েছেন সঙ্গে। নাইজলে দাঁড়িয়ে তর্পণ করবেন। সূর্যার্ঘ্য দেবেন। পিতৃপুরুষের শুভাশুভই তাঁর জাতককে রক্ষা করবে। এমন

বোধে তিনি প্রায় আচ্ছন্ন ছিলেন। হাঁটছিলেন। বিশ্ব চরাচর প্রায় নিস্তব্ধ। বড় রাস্তায় উঠে তিনি দেখলেন, কুকুর দুটো পেছনে তেমনি আসছে। তাদের সঙ্গেই কিছুক্ষণ আলাপ করা যেতে পারে। দুঃস্বপ্নের ভয় থেকে আপাতত তিনি অব্যাহতি পেতে চান। এমন একটা অদ্ভুত নৃশংস স্বপ্ন তিনি দেখলেনই বা কেন। পুত্রের ওপর কি অবিশ্বাস জন্মাচ্ছিল! আগে তো তিনি এমন ছিলেন না। যত বয়স বাড়ছে অল্পতেই ঘাবড়ে যান। নিরাপত্তাবোধে তিনি কি ইদানীং বিপর্যস্ত হচ্ছিলেন। পুত্রের অশুভ কামনা করেছেন! তাঁর অন্তরাত্মা কেমন আর্তনাদ করে উঠল। বড় পুত্র সতীশের জন্য তার দুর্ভাবনা হয় না কেন! সে কি সর্বতোভাবে আলগা হয়ে গেছে বলে। অধিকার রক্ষার আর এতটুকু সুযোগ নেই বলে! মেজটিরও কি তাই হচ্ছে। দু বছরের ওপর দেখা নেই। মাসান্তে টাকা পাঠিয়ে সে কি শুধু কর্তব্য করে যাচ্ছে! নাড়ির টান তাহলে নেই! ভেতরে চন্দ্রনাথের টান ধরে গেল।

অনেককাল আগে তিনি এক দীর্ঘপথে পরিভ্রমণে বের হয়েছেন মনে হল। সেই জন্মকাল থেকে ইহকাল পার হয়ে পরকালের দিকে হাঁটা দিয়েছেন যেন। বয়স যত বাড়ছে ঈশ্বরভীতি তত বাড়ছে। একটুকুতেই মনে হয় তাঁর ঈশ্বর বুঝি ক্ষুব্ধ হলেন। সব কিছু ঠিকঠাক রেখে যেতে হলে তাঁর অপার করুণাই সম্বল। তিনি হাঁটছিলেন আর নক্ষত্রের শেষ আলোকিত রহস্যে উদ্ভাসিত হচ্ছিলেন। এই রাস্তায় এলেই দু-পাশে দিগন্ত প্রসারিত মাঠ পড়ে থাকে! গাছপালার ছায়ায় দুএক ঘর সাঁওতাল পরিবারের বাস। রেল-লাইন পার হলেই শহর আরম্ভ। জলের ট্যাঙ্ক পার হয়ে সদর জেলের পাঁচিল ঘেঁষে যেতে হয়। তারপর বাবলার ঘন বন। নদীর চড়া। এবং নেমে গেলে সেই পবিত্র জলধি। শত শত বর্ষের গ্লানি জননী জাহ্নবী বুকে শুষে নিচ্ছেন। তার এখন জননী জাহ্নবীই অবলম্বন। সেখানে তিনি স্নান করলেন। কুরুক্ষেত্র গয়াগঙ্গা বললেন। এহি সূর্য সহস্রাংশ তেজোরাশে জগৎপতে বললেন এবং বলে ডুব দেওয়ামাত্র কিছুটা হাল্কা হলেন। সেই দুশ্চিন্তার ভার তাঁর অনেকটা লাঘব হওয়াতেই তিনি কুকুর দুটোকে দেখতে পেলেন। পাড়ে তারা বসে আছে। এতক্ষণ এরা তাঁর পেছনে পেছনে এতদূর এসেছে ভুলেই গেছিলেন। শহরের মাথায় সূর্য উঠে গেছে। কিছুটা উঠে এলেই বিন্নির খৈ বাতাসা পাওয়া যায়। কিছু বিন্নির খৈ বাতাসা কিনে আজ তিনি কুকুর ভোজন করালেন। মনের মধ্যে মানুষের কত যে জটিল বিশ্বাস অবিশ্বাস থাকে। কুকুরের আহার হয়ে যাওয়ার পর তিনি

সামান্য প্রসন্নবোধ করলেন। যেন কিছুই হয়নি। পুণ্যকর্মই মানুষকে সব পাপ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। তাকে দীর্ঘজীবী করে। পুত্রের হয়ে আজ চন্দ্রনাথ প্রায়শ্চিত্ত করলেন ঈশ্বরের কাছে। কারণ কুকুর দুটো তার কাছে আর জন্তুর শামিল নয়। যেন সাক্ষাৎ ধর্মরাজ তাঁর সামনে হাজির।

কুকুর দুটির নাম ধরে এবারে ডাকলেন। বললেন, এস। পায়ে পায়ে আবার তারা চন্দ্রনাথের অনুসরণ করতে থাকল। পথে বড় বৃক্ষ দেখলেই তিনি থেমে যান। জল ঢালেন এবং স্বপ্নের আদ্যোপান্ত বলে যান। এই করে বাড়ি ফিরতে চন্দ্রনাথের বেশ বেলা হল। বাড়ি ফিরেই ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন, রান্নাঘরে কারো গলা পাওয়া যাচ্ছে। অতীশের গলা। তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না! বাবার খড়মের শব্দ পেয়ে অতীশ বাইরে বের হয়ে আসতেই তিনি আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু একি চেহারা করেছে অতীশ! চোখের নিচে রাত জাগার দুশ্চিন্তা। কেমন রোগা হয়ে গেছে। এক নজর দেখেই বুঝলেন অতীশ ভাল নেই। স্কুলের চাকরি ছাড়ার আগে অতীশের ঠিক এমনই চেহারা হয়েছিল। অতীশ তাহলে সেই এক মানুষের দুর্গন্ধে অস্থির হয়ে পড়ছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সামান্য কটি বাক্য তার সঙ্গে সমপান করা বিধেয় ভাবলেন। বললেন, ভাল আছ?

অতীশ কিছু বলল না।

—বৌমা, দাদু দিদা।

—টুটুল মিণ্টু ভাল আছে।

—সবাইকে নিয়ে এলে না কেন?

—আসার ঠিক ছিল না।

—ওদের একা রেখে এলে!

—না একা না। নির্মলা বাপের বাড়ি আছে।

—ক'টার গাড়িতে এলে!

—রাতের গাড়িতে।

—রাস্তায় কোন বিঘ্ন ঘটেনি তো?

অতীশের ভেতর কে যেন একটা কামড় বসাল। বাবা সত্যি কি সব বুঝতে পারেন। ওর চোখে মুখে কি কোন দুষ্কর্মের ছাপ ফুটে উঠেছে। কিন্তু সে তো অনেকদিন পর ট্রেনে আজ অঘোরে ঘুমিয়েছে। চারু বিছানা পেতে একবারে সতীসাধ্বী নারীর মতো বলেছে, এবারে ঘুমোন।

—ট্রেনে আমার ঘুম হয় না চারু।

চারু গম্ভীর গলায় বলেছিল, আজ হবে।

অতীশ হেসে বলেছিল, হবে না।

—শোন না। তারপর দেখি হয় কিনা। মানুষ না ঘুমালে বাঁচে?

—ঘুমাই না তোমাকে কে বলল।

—কে বলবে আবার, চোখ মুখ দেখলেই বুঝি। আপনার খুব ঘুমের দরকার। অতীশের তখন হাই উঠছিল। এবং আরও কি সব কথাবার্তা বলতে অতীশের চোখ জড়িয়ে আসছিল। ট্রেনটা অবলীলায় ছুটে যাচ্ছে। ঝমঝম শব্দ। কেমন এক শিশুর মতো কেউ যেন তার শরীরে ঝাকুনি দিচ্ছে। তার সত্যি কখন ঘুম এসে গিয়েছিল। কতদিন পর, কতরাত পর সে অঘোরে ঘুমিয়েছে ট্রেনে। জেগে উঠেছিল যখন, তখন আশ্চর্য, কামরায় কেউ নেই। চারু না। কেউ না। একটা ছোট্ট ইস্টিশনে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে। গাড়ি কোথাও খুব লেট করেছে। ঘুমের ঘোরে সে তাও টের পায় নি। সকাল হয়ে গেছে। চারপাশে সে চেয়ে দেখল সবুজ মাঠ, শস্যক্ষেত্র। ছোট্ট একটা ইস্টিশন। ইস্টিশনের পাশেই সেই ময়দার কল, সামনে রাস্তা, গাছপালার ভেতর দিয়ে রাস্তাটা আশ্রমের দিকে চলে গেছে। এ-স্টেশনে সে আরও এসেছে। এখানে লোক কম নামে, কম ওঠে। কালো কোট গায়ে লোকও বেশি দৌড়ঝাপ করে না। স্টেশনটার নামও সে জানে। কিন্তু চারু কোথায়! পরের স্টেশনে চারু নেমে যাবে। তারপরের স্টেশনে তার নামার কথা। কিন্তু চারু আশ্চর্য এক ভোজবাজির মতো কোথায় অন্তর্ধান করল। প্রথমে বিশ্বাস হয় নি। সে নাম ধরে ডেকেছিল। চারুর কাছে সে ধরা পড়ে গেছে। বড় দুর্বল এবং ভীরু মানুষ সে। তার সবই দরকার। ভীরুতার জন্য তার কিছু হয় না। সাধু সন্তের মতো মুখ নিয়ে চলাফেরা করে থাকে। আসলে সে আর্চি অথবা কুম্ভর মতোই পৃথিবীর একজন অনিষ্টকারী মানুষ। চারুর অনিষ্ট করেছে সে। বনির করেছে, নির্মলারও। সবার অনিষ্টের মূলে সে। সুতরাং তার মনে হয়েছিল, চারু তাকে আর মুখ দেখাতে চায় না। সে আগেই কোথাও নেমে গেছে। তারপর মনে হয়েছে, যদি এদিক ওদিকে থাকে। সে ডেকেছিল, চারু, চারু! সাড়া নেই। বাথরুমে যদি থাকে, সে গিয়ে দেখল, ভিতর থেকে লক করা নয় বাথরুম। সব ফাঁকা। চারু তাকে একা ফেলে গেল, না কি, সে এক স্বপ্নের রেলগাড়িতে চড়ে বসেছিল!

তখনই বাবা বললেন, চিঠি দাও না কেন ? আস না কেন ?

অতীশ বলতে পারত, আমি ভাল নেই বাবা। কিন্তু বাবা যদি বুঝে ফেলে, কিংবা যদি গন্ধটা পায়, সে আর চারু এবং নির্মলার প্রতি সে ভারি অবিশ্বাসের কাজ করেছে, সে কিছুটা বাবার সঙ্গে কথা বলার সময় বিচলিত বোধ করল। চন্দ্রনাথ কি ভাবলেন কে জানে, শুধু বললেন, ঠাকুর প্রণাম করেছ ?

অতীশ যেমন এ-সব করে না, আজও বাড়ি এসে তা করে নি। বাবা যেমন বার বার মনে করিয়ে দেন, এবং বাবার মন রক্ষার্থে যেমন দেব দ্বিজে ভক্তি রাখার চেষ্টা করে তেমনি আজও ভুল হয়ে গেছে মতো বলল, করছি।

—আগে করে এস।

অতীশ আর কি করে। বাধ্য ছেলের মতো চৌকাট ছুঁয়ে মাথা ঠেকাল। হাসু ভানু অলকা মজাটা দেখছে। মাও বের হয়ে এসেছে। বলল, নে কর। উদ্ধার হয়ে যাবি।

সবটাই খোঁটা। বাবার প্রতি মার খোঁটা। বাবা এ-দেশে আসার পরই বড় বেশি ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষ হয়ে পড়েছিলেন। সেই শৈশবকাল থেকেই দেখে এসেছে, কি করে তিনি বহু দেশ ঘুরে শেষপর্যন্ত গৃহদেবতা গলায় ঝুলিয়ে ফিরেছিলেন। কি করে ঘরবাড়ি করার সময় দেশের মানুষদের ঠিকানা সংগ্রহ করে বেড়াতেন। খেরো খাতায় সব ঠিকানা সংগ্রহ করা থাকত। এবং এই করে তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে গৃহদেবতার নামে কিছু মাসোহারাও ব্যবস্থা করেছিলেন। তখন অন্নসংস্থান করাই ছিল সংসারে পিতৃদেবের একমাত্র কাজ। অভাব অনটন ছিল প্রকট। বাবা কখনও কখনও উধাও হয়েও যেতেন। একবার একটা পঞ্জিকা নিবারণ দাস দিলে বাবা দিনরাত তাই নিয়ে পড়েছিলেন। তা কেনার সামর্থ্যও বাবার ছিল না। এবং যে দিয়েছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় বাবার চোখে জল এসে গিয়েছিল। মার তখনও বিরূপ কথাবার্তা—মার ধারণা মানুষটার আর একটু বুদ্ধি বিবেচনা থাকলে পরিবারে এত দুর্গতি থাকত না। এ-দেশে এসে যে বাবা নিরুপায় মানুষ হয়ে গেছিলেন, তাও মার কথাবার্তা থেকে বড় বেশি টের পাওয়া যেত। বাবার ঈশ্বর ঈশ্বর ভাব মা একদম সহ্য করতে পারত না। এই শেষ বয়সেও মার তা যায় নি। মা আজও বলল, নে কর, উদ্ধার হয়ে যাবি।

বাবা মার অহরহ কলহ তার ভাল লাগে না। বাবা তবু সয়ে যান। সময়

সময় বলেন, আমার কাছে সবই সংকল্প পাঠ। মার তখন ভীষণ অবস্থা। বাবার গায়ে এতটুকু হুল ফোটাতে পারছে না বলে মা কেমন নিরুপায় হয়ে পড়েন। তখন মার আরও খোঁটা দিয়ে কথা বলার প্রবৃত্তি বেড়ে যায়। এখনও এ-সব হবে ভেবে অতীশ হাসু ভানুকে ডাকল। একটু ঘুরে আসা যাক। অনেক দিন পর চাষের জমিতে তার হেঁটে যাবার ইচ্ছা হল। খালপাড় নেমে গেলেই বাবার এক লপ্তে কয়েক বিঘা জমি। এই জমির সঙ্গে বাবার মতো তারও বড় নাড়ির টান। শরৎ হেমন্তে অথবা বর্ষায় জমিতে বাবা কিছু না কিছু চাষ আবাদ করেই থাকেন। প্রহ্লাদকা সব দেখাশোনা করেন। সে এসেছে জানলে প্রহ্লাদকা যেখানেই থাক ছুটে আসত। যেতে যেতেই বলল, প্রহ্লাদকা কোথায় রে!

অতীশকে হাসু ভানু খুব সমীহ করে। কাকে প্রশ্ন করছে ওরা দু'জনের একজনও ধরতে পারল না। অতীশ বুঝতে পেরে বলল, প্রহ্লাদকাকে দেখছি না হাসু।

হাসু বলল, প্রহ্লাদকা কালীকে নিয়ে টিকটিকি পাড়া গেছে।

অতীশ বলল, কিছু হয়েছে কালীর।

হাসু কি বলবে ভেবে পেল না। কি করে বলবে ষাঁড় দেখাতে নিয়ে গেছে প্রহ্লাদকা। এই বয়সে এ-সব খবর রাখা দাদার সামনে সমীচীন কি না বুঝতে পারছে না। জমির আলে অতীশ উঠে দাঁড়ালে বলল, কালী ক'দিন খুব ডাকাডাকি করেছে।

অতীশ এখন কিছুই শুনছে না। এদিকের জমিতে বাবা আউস ধান বুনেছেন। সতেজ ধানের গাছ, মাঝে মাঝে তিল ফুলের গাছ। ধান ওঠার আগে তিল গাছে ফুল এসে যাবে। তিলের খুব দরকার এ-পরিবারে। তিলের অম্বল বাবা খুব খেতে পছন্দ করেন। তিলের বড়াও বাবার খুব প্রিয়। অতীশের মনে হয়, বাবার জীবন বড় নিরুদ্বেগ। চাষ আবাদ, বাড়ির গৃহদেবতা কিছু যজনযাজন আত্মীয়স্বজনের খোঁজখবর, সকাল হলে মানুষকে শুভ দিনক্ষণ বলে দেওয়া, বড়ই এক মুক্ত জীবন তাঁর। সে কেন বাবার মতো জীবন পেল না। তার কি উচ্চাশা আছে খুব! উচ্চাশা থাকলে মানুষের মধ্যে অহরহ দ্বন্দ্ব থাকে। অশান্তি থাকে। মনে হয় অন্ধকার কারাগারে কেউ তাকে যেন ছেড়ে দিয়েছে। সে পথ দেখতে পাচ্ছে না। সেই কারাগার কলকাতা নামক এক নগরী। আবার ফিরে যাবে ভাবতেই ভয় হয়। সেখানে কুম্ভবাবু, শেঠজীরা তাকে খুঁচিয়ে

মারার মতলবে আছে। সেখানেই আছে আবার তার প্রিয়জন। আছে অমলা। এই সবুজ শস্যক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তার কেমন জীবনে কোথাও বড় ভুল হয়ে গেছে এমন মনে হল। সে কোথাও আজীবন যেতে চেয়েছিল। সেটা কোথায় তার জানা নেই।

কটা দিন বাড়িতে বেশ হৈচৈ করে কাটাল অতীশ। সকাল হলেই মা মুড়ি দুধ পাটালি গুড় দেন খেতে এক থালা। সকাল হলেই বাবা বাজারে যান। কাচকি মাছ, বাতাশী মাছ, যা কলকাতায় পাওয়া যায় না, কলকাতায় বাঁচে কি করে মানুষ, কথায় কথায় বাবার এমন সব কথা, বাজার থেকে থলে হাতে বাবা ফিরে এলেই মা ডাকবে, অতীশ আয়! দেখে যা কি মাছ এনেছে তোর বাবা। কেমন এক শৈশবের অতীশ যেন। থালার তাজা মাছ কখনও লাফায়। মা এক হাতে সকাল থেকে সব কাজ করে যান। স্বামী পুত্র কন্যার মুখে দুটো সুস্বাদু খাবার তুলে দিতে পারলে জীবনে তার আর কিছু লাগে না। খেতে বসলেই মা বলবে, কিরে কেমন লাগল। নুন বেশি হয়নি ত। চোখে তো আগের মতো আর ভাল দেখি না।

আসলে মার হাতের রান্না অতীশের কাছে অমৃত সমান।

অফুরন্ত লম্বা সময়, ছুটির সময়, কখনও পুরানো বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে দেখা, দেখা হলেই ফিসফিস করে বলা, এদিকে কোথাও দু'জনের ইস্কুলে চাকরি হয় না লীলাময়? আর ভাল লাগছে না। আসলে সে যে কলকাতায় ত্রিশঙ্কুর মতো জীবন যাপন করছে, তার শেকড় আল্গা হয়ে যাচ্ছে, অথবা সে পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পাচ্ছে না এ-সব কথা বলার সময় বড় কাতর হয়ে পড়ে। কলকাতা মানুষকে দুর্ভোগে ফেলে দেয়। সে একদিন খেতে বসে ডাকল, বাবা?

চন্দ্রনাথ পুত্রের দিকে তাকালেন। এই পুত্রটির জন্য তাঁর আলাদা গর্ব আছে। অবশ্য মনে মনে। মুখে তার কোন প্রকাশ নেই। শক্ত মজবুত চেহারা। লম্বা, গৌরবর্ণ। চন্দ্রনাথের গায়ের রঙ শ্যামলা। এই পুত্রটি তার মায়ের রঙ পেয়েছে। আদল পেয়েছে বড়দার। কিন্তু কি যে দুশ্চিন্তা এই পুত্রটির চোখে মুখে। খুব কম সময়েই হাসে। বিষণ্ণতার এমন প্রতীক তার এই পুত্রটি কেন হল। শেষে মনে হয়, ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলে এমনই হয়। স্বাধীন মানুষ হতে চাইলে এমনই হয়। তিনি বললেন, কিছু বলবে?

—বড় জ্যাঠামশাইর শ্রাদ্ধের জন্য সবাই নাকি উঠে পড়ে লেগেছেন?

চন্দ্রনাথ ডালের সঙ্গে গন্ধরাজ লেবুর রস মাখিয়ে নিচ্ছিলেন তখন। পুত্রের

কথায় বুঝতে পারলেন, এই নিয়ে কোন সংশয় অতীশের মনে দানা বাঁধছে। তিনি বললেন, আরো আগে করা উচিত ছিল?

—তিনি যে মারা গেছেন তার প্রমাণ তো নেই।

—শাস্ত্রে বিধি আছে।

—সেটা কি বিধি।

—বার বছর কোন মানুষ নিখোঁজ থাকলে, তাঁর দাহকার্য থেকে পারলৌকিক সব কাজ সেরে ফেলতে হয়।

—যদি তিনি ফিরে আসেন। জ্যাঠিমার চিঠি পড়ে আমার এমনই মনে হয়েছে, তিনি আবার ফিরে আসতে পারেন।

—আমার মনে হয় না।

—আপনি তো অনেক দূরের খবর চোখ বুঝলে টের পান। এ-বিষয়ে কি কখনও ভেবে দেখেছেন।

—না।

—একবার ভেবে দেখুন না।

অতীশ তাকে ফ্যাসাদে ফেলতে চায়। আসলে এ-বিষয়ে তার আগ্রহের অভাব আছে কিছু। শাস্ত্রের বিপরীত চিন্তা করতে তাঁর ভয় হয়। যেন বিধিমতে কাজটা করে ফেললে সংসার থেকে সব রকমের অশুভ ঘটনা সরে যাবে। এমন কি অতীশ যে মানুষের দুর্গন্ধ পায় তাও দূরীভূত হতে পারে। তিনি বললেন, ফিরে এলেও করার কিছু নেই। ঈশ্বরের বিধির ওপর মানুষের বিধি হতে পারে না।

অতীশের খাওয়া প্রায় শেষ। সে খেতে বসে দ্রুত আহার করে থাকে। সব কিছুতেই মনে হয় তার বড় বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। যেন কোথাও তার যাওয়ার কথা। সময় হাতে বড় কম। তার চলা ফেরা, তার অস্বস্তি এবং চাঞ্চল্য দেখলে এমনই মনে হতে পারে। সে বাবার জবাব পেতেই বলল, কিছু না করলেই বা কি হয়?

চন্দ্রনাথ বলল, কিছুই হয় না। তবু মনের শান্তি বলে কথা। মানুষ তো নিজের আশ্রয়ের জন্য এই সব বিধি নিষেধ মেনে চলে।

অতীশ বলল, আসলে আপনারা মানুষের চেয়ে প্রেতাত্মাকে বেশি ভয় পান?

—কে বলেছে।

—জ্যাঠামশাই যদি নাই থাকেন, তবে তার অশুভ প্রভাব সংসারে পড়বে

কেন। আপনাদের ধারণা তিনি না থাক তাঁর প্রেতাত্মা আছে। সে ঘোরাফেরা করছে।

—করতেই পারে! তোমার সোনা জ্যাঠামশাই জানিয়েছেন, বড়দা নাকি জল খেতে চান। মাঝে মাঝেই স্বপ্নে তিনি বলছেন, আমাকে এ-ভাবে ফেলে রেখেছিস কেন, উদ্ধার কর। আমার বড় তেষ্টা।

—পারলৌকিক কাজ করলেই উদ্ধার পাবেন আপনারা ?

—তাইত হয়। চন্দ্রনাথ টকের ডাল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে বললেন।

ধনবৌ বাপবেটার তর্ক শুনছিল। এই সব তর্কে ধনবৌ স্বামীর ঈশ্বরপ্রীতির প্রতি বিদ্বেষ হেতু পুত্রের পক্ষ অবলম্বন করে থাকে। কিন্তু বড় ভাশুরঠাকুরের শ্রাদ্ধ হবে কি হবে না এই বিষয় নিয়ে এখন তর্ক চলছে। অতীশের এতটা নাস্তিকতা আজ কেন জানি ধনবৌরও ভাল লাগল না। সংসারের সুখ অসুখ এর সঙ্গে জড়িত। অতীশ কি সাহসে এমন কথা বলতে পারে ধনবৌ বুঝে উঠতে পারল না। ধনবৌ আর কিছু লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করতে এসে বলল, তাই বলে মানুষটার কাজ হবে না!

অতীশ বলল, আমি যদি না ফিরতাম মা? আমি যদি আবার কোথাও চলে যাই। চন্দ্রনাথ কেমন আতঙ্কিত গলায় তখন বলে উঠল, এ-সব অলুক্ষণে কথা বলবে না। ফিরবে না কেন? আমি তো ঈশ্বরের কাছে তেমন কোন পাপ করি নি। চলে যাবে কেন, তোমার সংসার নেই।

—তাহলে এটা পাপ থেকে হয়েছে বলছেন। জ্যাঠামশাইর পাগল হয়ে যাওয়া, নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া ঠাকুরদার পাপ কিংবা কর্মফলে হয়েছে!

চন্দ্রনাথ কি বলবেন ভেবে পেলেন না। তার যতদূর জানা আছে বাবা ছিলেন, বড় পুণ্যবান মানুষ। শতবর্ষ পরমায়ু পার করে তিনি তাঁর জীর্ণবাস ত্যাগ করেছেন। তবু পুত্রের আচরণে কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, আমরা যাই করি, গণ্ডির বাইরে যেতে পারি না। গণ্ডির বাইরে গেলেই সীতা হরণ হয়। সংসারে অপযশ হয়। তুমি তার চেষ্টা করছ। বৌমা টুটুল, মিণ্টুর দিকে তাকিয়ে আর গণ্ডির বাইরে যেতে চেও না।

অতীশ ঘাবড়ে গেল। চারুর সঙ্গে সহবাস করেছে সে। এ-জন্য মানসিক পীড়ন বোধ করে নি। বরং ভেতরে যে হাহাকার ছিল এই সহবাসের ফলে তা লাঘব হয়েছে। তারপরই চারুর রহস্যময় অন্তর্ধান কিছুটা ওকে চিন্তামগ্ন করে তুলল। বাবা কি-সব টের পান। তিনি কি জানেন, আর্চি নামে এক প্রেতাত্মা

তাকে তাড়না করছে! একবার প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হল, অপযশটা কি বাবা। কিন্তু যদি বাবা বলেই দেন এক নারী তোমাকে প্রলোভনে ফেলে দিচ্ছে। একজন হবে কেন। অমলাও তো চায়। সে বলল, বাবা আপনি মেজবাবুকে তো চিনতেন?

—কোন মেজবাবু?

—মুড়াপাড়ার!

—অঃ হাঁ, তা কি হল!

—মেজবাবুর বড় মেয়ে অমলার কথা মনে আছে।

চন্দ্রনাথ কি স্মরণ করার চেষ্টা করলেন, সেই জমিদার বাড়ির প্রাসাদ, দীঘি, নদীর পাড় এবং ঝাউগাছের শনশন শব্দ—সব কিছুর মধ্যে এক বালিকার অবয়ব খুঁজে পেতে বললেন, ওরা তো দু বোন ছিল।

—বড়জনের নাম অমলা।

—মনে পড়ছে।

—অমলা এখন কুমারদহের বৌরাণী।

এই খবরে চন্দ্রনাথের বিশেষ কৌতূহল দেখা গেল। খাওয়া শেষ। শেষ পাতে পিতা-পুত্র অনেকদিন পর যেন স্মৃতির মধ্যে ডুব দিতে চাইল। কারণ মানুষ স্মৃতির ভেতর নিজেকে বার বার খুঁজে পায়। চন্দ্রনাথ বলল, মেজবাবু ধার্মিক মানুষ ছিলেন। বিয়ে সুখের হয়নি। বড়কর্তার সঙ্গে মেজবাবুর বিয়ে নিয়ে বনাবনি ছিল না। তিনি কি বেঁচে আছেন?

—না।

—ওনার স্ত্রী তো আগেই গত হয়েছেন।

অতীশ বলল, অমলার মাকে দেখেছেন বাবা?

—দেখিনি। মুড়াপাড়া যাননি। ছবি দেখেছি। ইংরেজ মহিলা। চোখে মুখে আশ্চর্য বিষণ্ণতা ছিল। আসলে তিনি যেন এ-দেশে কাউকে খুঁজতে এসেছিলেন। ভেবেছিলেন, মেজবাবুর মধ্যে তা পাবেন। শুনেছি তা পাননি। বাড়ির ব্যালকনিতে বসে ফোর্ট-উইলিয়ামের দিকে কেবল তাকিয়ে থাকতেন। মেজবাবু প্রশ্ন করলেই বলতেন, কার যেন আসার কথা আছে বাবু। তার জন্য বসে থাকি।

—মাথায় গণ্ডগোল ছিল বলছেন? অতীশ চন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। তার যতদূর জানা আছে পাগল-জ্যাঠামশাইও এমনি

করেই পাগল হয়ে যান। তারও মনে হত কোথাও নীলকণ্ঠ পাখিরা উড়ে বেড়াচ্ছে। হাতে তালি বাজালেই তারা নেমে আসবে।

চন্দ্রনাথ বললেন, মানুষের যে কি হয়। মেজবাবু বুঝতে পারতেন, তাঁর প্রতি সেই মহিলার কোন আগ্রহ নেই। তবু তিনি সারাজীবন স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে গেছেন। শেষ দিকে শুনেছি আলাদা ঘরে থাকতেন। গীর্জা থেকে ফাদাররা আসতেন। বাইবেল পাঠ করে শোনাত। অমলার মার বিশ্বাস ছিল, যে আসবে কথা আছে সে আসবেই। এ-জন্মে না হয় অন্য কোন জন্মে। মানুষটার জন্য তার নিরন্তর অপেক্ষা ছিল।

—সেই মানুষটা কে বাবা?

—বোধহয় ঈশ্বর। আর এ-ভাবেই মানুষের ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটে। আসলে নিজের জন্যই মানুষের সেই ঈশ্বর—যা আমরা খুঁজে মরি। সংসারে থেকেও মানুষের মনে হয়, সে কিছু হারিয়েছে। যতই ঐশ্বর্য থাকুক, যতই সুখ থাকুক, মানুষ সব সময় কিছু না কিছু হারায়। তার মনে হয় সে আবার সব ফিরে পাবে। সে আশায় বসে থাকে। আবার এও মনে হয়, সে যা পাবে বলে বসে আছে তা পেয়ে গেছে। পেয়ে গেলে মনে হয়, না ঠিক পাওয়া হল না। আরও কি যেন বাকি থেকে গেল। তার আশা রোজই কোন না কোন নীল খামে চিঠি আসবে, আসেও। কিন্তু সে চিঠিতে সব খবরই থাকে, আসল খবর বাদে। মানুষের এই প্রতীক্ষাই হচ্ছে ঈশ্বর প্রতীক্ষা। কখন কে যে পেয়েও যায়।

অতীশ বলল, বাবা এই নীলখামের চিঠির প্রত্যাশায় সবাই বসে থাকে যদি তবে এত কুকাজ করে কেন মানুষ?

—কুকাজ? সেটা আবার কি?

—আপনার ধর্মের বিষয়েই আসা যাক। ঈশ্বরকে আপনি বলেছেন, মনের মধ্যে ধরে রাখা যায়। মনই তাঁকে ধারণ করতে পারে। আপনি যদি তাই ভাবেন, তবে কোন কুকাজ করেও তাকে পাওয়া যেতে পারে।

—ঈশ্বরের কাছে কুকাজ সুকাজ বলে কিছু নেই। সবই তার পৃথিবীতে ঘটে। যা কিছু ঘটে তিনিই নিমিত্ত মাত্র।

—তাহলে বলছেন আমাদের রামলাল পিয়ারিলালরা যে ভেজাল তেল, ভেজাল গন্ধ সাবান চালাচ্ছে তাতে ঈশ্বর ক্ষুব্ধ হন না।

—সে নিজে ক্ষুব্ধ না হলে ঈশ্বর ক্ষুব্ধ হবেন কেন?

—তাহলে তেনার পৃথিবীতে সব কাজেরই এক রকমের ফলাফল। আপনারও যা হবে, তাদেরও তাই হবে।

—নিশ্চয়। এক চুল ফারাক নেই। জরা ব্যাধি মৃত্যু সবাইকে গ্রাস করে।

—তাহলে পরজন্ম বিষয়টা?

—এখানেই অতীশ মানুষ আটকে যায়। সে-ভাবে এক-ভাবে না এক-ভাবে জালজুয়াচুরি করে ইহকালটা কেটে গেল। কিন্তু পরকাল। সেই ভেবে নিরস্ত হয়। বুঝতে পারে ভুল রাস্তায় সে গাড়ি চালিয়েছে। অনুশোচনা আসবেই। আসতে বাধ্য। তারই নাম পাপ। অনুশোচনাই পাপ, তার দাহ নিরন্তর।

সে একবার ভাবল বলবে, যার পরকালে বিশ্বাস নেই, ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই তার কি হবে? কিন্তু তা না বলে, অতীশ বাবার কথাবার্তার মধ্যে কিছুটা নিমগ্ন হবার চেষ্টা করল। বাবা ঠিক কি বলতে চান, বাবার ধর্মাধর্ম কতটা জীবনে গুরুত্ব পেতে পারে ভাবতে গিয়ে মনে হল, সরল বিশ্বাস ছাড়া মানুষের মুক্তি থাকতে পারে না। তার সেই সরল বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। দেশভাগ, পৃথিবী পরিভ্রমণ, আর্চির মতো দুরাত্মার নির্যাতন, স্যালি হিগিনসের ঈশ্বর এবং পাপ সম্পর্কিত সত্যাসত্য এবং সমুদ্রের সেই রুদ্ররোষ তাকে ঈশ্বর থেকে ক্রমে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। ফতিমার চোখ জলে ভার, চোখ দুটো সে স্পষ্ট মনে করতে পারে। প্রায় বনির মতো জেদি এবং নিষ্পাপ ছিল সে। তাকে ছুঁয়ে দিলে সোনাকে স্নান করতে হত। তার এখন হাসি পায় ভাবলে। সে ভাবল, বাবাকে এবারে সেই নিষ্ঠুর প্রশ্নটি করবে কিনা। বলবে কিনা, বাবা দেশ ছেড়ে এসেছিলেন, অভক্ষ্য ভক্ষণ করতে হবে ভয়ে। গোমাংস কথাটা বাবা উচ্চারণ করেন না। এই শব্দ উচ্চারণে বাবার অপবিত্র হবার ভয় থাকে। হয়ত শোনামাত্র তিনি আবার গঙ্গাস্নানে ছুটবেন। ঠিক খাওয়ার পরই এ-কথা বলতে অতীশের বাধছিল। গলার কাছে এসেও কথাটা আটকে গেল। কথাটা এই রকমের। অতীশের মনের মধ্যে গুরগুর করছে। সেই এক সমুদ্রযাত্রা। বাঙ্কারে অমানুষিক পরিশ্রম। তিন টনের ওপর কয়লা টানা, স্টকহোল্ড থেকে ছাই হাপিজ করা—বয়লার থেকে উত্তপ্ত কয়লার চাঙ টেনে বের করা এবং জলে নির্বাপিত করলে সারা স্টকহোলডে দম বন্ধ করা গ্যাসের মধ্যে তার ক্রীতদাসের ভূমিকা এবং ওয়াচ শেষে ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত অবসন্ন এক তরুণের সামনে আহারের থালা—ভাত আর গোস্ত। সেই অভক্ষ্য ভক্ষণ। ধর্মের নামে তার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা হয়নি অভক্ষ্য ভক্ষণ করতে।

প্রথম সে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করেছিল—এই পর্যন্ত। বলতে ইচ্ছে হল, সব জানলে বাবা আপনি আমার ফের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়াই পছন্দ করতেন। তা-ছাড়া আপনার জাতক একজন সাদা কথায় খুনী। সে মানুষ খুন করেছে। তার মধ্যে সেই অনুশোচনা। মানুষ খুনের অনুশোচনাতেই তার এখন ভারি প্রেতাত্মার ভয়। মানুষেরা তার অমঙ্গল চাইলেই মনে হয় সব সেই দুরাত্মা আর্চির কাজ। সব মানুষের পাগল হয়ে যাওয়ার মধ্যেই বোধহয় দুরাত্মার ভূমিকা থাকে। সেই দুরাত্মা ঈশ্বর হতে পারেন, আবার আর্চির প্রেতাত্মাও হতে পারে। পাগল জ্যাঠামশায় সেই ঈশ্বরের বলি। দেশভাগ সেই ঈশ্বরের বলি। মানুষের ভূমিকার চেয়ে ঈশ্বরের ভূমিকা বড় হয়ে গেলে যে সর্বনাশ হয়, তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ, দেশভাগ আর আমার সেই পাগল জ্যাঠামশাই। এর থেকে মানুষের পরিত্রাণ আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। প্রেতাত্মার হাত থেকে বাবা আমি নিষ্কৃতি পেতে চাইছি। ঈশ্বর এবং প্রেতাত্মা আমার কাছে সমান!

অতীশ মাথা গোঁজ করে বসে আছে। বাবা উঠে যাচ্ছিলেন। সে আবার প্রশ্ন করল, যার পরকালে বিশ্বাস নেই।

—পরকালে বিশ্বাস না থাকলে ফাঁকা মাঠ। ধু-ধু বালিরাশি। কোন গাছই গজায় না যে ছায়া দেবে।

অতীশ তখনই দুম করে প্রশ্ন করে বসল, আচ্ছা বাবা, প্রেতাত্মা বড় না ঈশ্বর বড়।

বাবা বললেন, ঈশ্বরই প্রেতাত্মা, প্রেতাত্মাই ঈশ্বর। তোমার আরও জেনে রাখা দরকার যে ঈশ্বর মানুষের অনিষ্ট করে তিনি প্রেতাত্মা। যে-ঈশ্বর মানুষের হিত করে তিমি প্রকৃতপক্ষেই ঈশ্বর।

—তা হলে বলছেন, ঈশ্বর কখনও প্রেতাত্মা হয়ে যায়।

—ইতিহাসে অনেকবার হয়েছে শুনেছি।

—দেশভাগ প্রেতাত্মার কাজ?

—ঈশ্বর তখন প্রেতাত্মার রূপ পরিগ্রহ করেছিল বোধহয়। মানুষই ঈশ্বরকে তৈরি করেছে। মানুষই ভূত প্রেতের স্রষ্টা। মানুষ নেই, ঈশ্বরও নেই। ভূত প্রেতও নেই।

—তবে বিশ্বাস করেন মানুষের সুবিধার্থেই তার সৃষ্টি।

—তা করব না কেন।

—তাহলে ওটা না থাকলে কিছু আসে যায় না। আত্মবিশ্বাসই বড় কথা।

তিনি এবার গম্ভীর গলায় বললেন, আসে যায়।

অতীশ এবার উঠে পড়ল। বলল, কি আসে যায়?

—তিনি আমাদের আশ্রয়। তিনি আছেন বলেই আমরা আছি।

—তাহলে বলছেন, ঈশ্বর থাকবে, প্রেতাত্মাও মানুষের জন্য থাকবে।

—ঈশ্বর থাকলে সেও থাকবে। তবে একজন মানুষকে আশ্রয় দেয়, অন্যজন শুধু তাড়া করে। এরপর বাবা কলপাড়ে চলে গেলেন হাত-মুখ ধুতে। বাবার কথাগুলি ভারি গোলমেলে। একটার সঙ্গে আর একটা বড়ই সঙ্গতি-বিহীন। তবু বাবার মতো মানুষের পক্ষে সে বুঝতে পারে, ঈশ্বর দরকার। তারও দরকার। খুব দরকার। কিন্তু চারপাশে এত প্রেতাত্মার উপদ্রব থাকলে তার মহিমা বোধহয় টের পাওয়া যায় না। তারপরই মনের দুর্বলতা ভেবে সে হেসে ফেলল। এবং বিকেলেই গেল সেই শস্যক্ষেত্রে। আকাশ মেঘলা হয়ে উঠেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। ঝড় বৃষ্টি আসবে। মাঠে দাঁড়িয়ে ঝড় বৃষ্টিতে তাঁর মহিমা টের পাবার জন্য অতীশ কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠল। তারপর ঝড় বৃষ্টিতে ভিজে সে যখন ফিরে এল, তার আরও হাসি পেল। এও এক পাগলামি। ঈশ্বর ঈশ্বর পাগলামি। আত্মপ্রত্যয়ের অভাব থেকেই মানুষের এই ক্ষ্যাপামি।

সেদিন সন্ধ্যার মুখে যজমান বাড়ি থেকে ফিরে শুনলেন, অতীশ শহরে গেছে। অতীশকে একটা কথা তাঁর বলা হয় নি। বাড়ি ফিরেই ভেবেছিলেন, বলবেন। কিন্তু কখন ফিরবে কে জানে! কথাটা না বললে ভারি দুশ্চিন্তা থেকে যাবে। চারপাশে বিপদসঙ্কুল বার্তা কানে আসছে। তা-ছাড়া খারাপ স্বপ্নটার অস্বস্তিও কাটছে না। বৈকালি দিতে গিয়ে মনে হল, অতীশ ফিরেছে। ভুলে যাবেন ভেবে ঠাকুরঘরে বসেই ডাকলেন, অতীশ এলি?

অতীশ বারান্দায় উঠেছিল সবে। বাবার ডাকে সে আর ঘরে না ঢুকে ঠাকুরঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। প্রদীপ জ্বলছে, ধূপ জ্বলছে। এবং এই ঘরের কাছে এলেই আশ্চর্য এক সুঘ্রাণ পায়। ফলমূলের গন্ধ, চন্দনের গন্ধ, চরণামৃতের ঠাণ্ডা তুলসীপাতা তার একসময় বড় প্রিয় ছিল। কোথায় যেন এর মধ্যে সে এক পবিত্র বারিধি আছে টের পায়। আজও দরজার সামনে যেতে সব ঠিকঠাক নাকে এসে লাগল। বাবা মুখ না ফিরিয়েই টাট থেকে সামান্য চরণামৃত নিয়ে অতীশের গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। যেন কথা বলার আগে পুত্রকে পবিত্র করে নেওয়া। তারপর মন্ত্রপাঠের মতোই বললেন, কলকাতায় থাকিস, রাস্তাঘাট দেখেশুনে চলিস ত!

বাবার এ সব কথায় সে বিস্মিত হল না। বলল, চলি।

—আমার কিন্তু মনে হয় না।

অতীশ বলল, কি করে জানলেন।

—কলকাতায় যে এত বিপত্তি যাচ্ছে তার ত কোন খবরই রাখিস না!

অতীশের মনে হল, সত্যি সে একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে গেছে। আগে বাবাকে কলকাতার খবর দিত। ইদানীংকার চিঠিতে তা কিছুই থাকত না। যেন কলকাতাটাই এই রকমের। মিছিল, ছিনতাই, খুনখারাপি, বাস দুর্ঘটনা, যাত্রা নাটক শোভাযাত্রা, পরেশনাথের মিছিল—এই সব নিয়েই কলকাতা। আঁস্তাকুড়, বস্তি, যুবতীদের বেলাল্লাপনা, হা-অন্ন মানুষ, কোটিপতি মানুষ, ট্রাম বাস, বড় বড় হাসপাতাল, নিত্য মহামারীর মতো মুখ হাঁ করে রেখেছে। দু-বছরের মধ্যে আগের মতো সব কিছু চোখে আর তত ঠেকে না। আঁস্তাকুড়ে মানুষের আহার সংগ্রহ দেখলে প্রথম প্রথম আর্চি কি যে মাথার মধ্যে দাপাদাপি করত। এখন আর তা করে না। ঘুষ দেবার পর থেকে কিছুদিন আবার আর্চির ঘোরে পড়ে গেছিল। ট্রেনে চারুর সঙ্গে সহবাসের পর একদিনও আর আর্চি এসে জ্বালাতন করে নি।

অতীশ উত্তর না দেওয়ায় বাবা ফের বললেন, তোমাকে একটা কথা বলা হয় নি। মনে রেখ কথাটা খুব দরকারী। এখানে কেউ এসে দেয়ালে লিখে দিয়ে যাচ্ছে, আগুনে ফু দিন। ক'দিন এই নিয়ে হৈচৈ গেছে খুব। যে লিখত সে ধরাও পড়েছিল। তোমার মা তাকে সেবাযত্ন করে খাইয়েছিল। সকালে প্রহ্লাদ জানাল নেই। কোথায় আবার ভেগে গেছে। এরা কারা তুমি জান?

সে বুঝতে না পেরে বলল, কি করে বলব?

—তুমি তো কলকাতায় থাক। অনেক খবর রাখার কথা।

—এখন ত কত রকমের আন্দোলন হচ্ছে। দু তিন বছর আগে চীন প্রশ্নে কম্যুনিস্টরা দু-ভাগ হয়ে গেল। অতীশ বলল।

—কেন হয়ে গেল?

—আদর্শের লড়াই! অতীশ বিরক্ত হয়ে বলল, ঠাকুরঘরে বসে থাকলে বুঝতে পারবেন না।

চন্দ্রনাথ পুত্রের বিদ্রূপ মন্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন না। ঠাণ্ডা মাথায় বললেন, সে বুঝতে না পারি—তোমাকে বাবা কিন্তু বলে দিচ্ছি. এ-সবে থেক না। নিজে ঠিক থেক। নিজে ঠিক থাকলে আদর্শের কোন লড়াই থাকে না

কলকাতা যাবার আগে তোমার ভাই দুটোকেও বুঝিয়ে দিয়ে যেও। ওরা আমার কথা গ্রাহ্য করে না। নিবারণ দাস তোমার ভাইদের সম্পর্কে অভিযোগ করেছে। এটা নাকি বড়ই ছোঁয়াচে রোগ। প্লেগের চেয়েও ভয়াবহ। বাড়িতে মহামারী শুরু হোক আমি চাই না।

অতীশ বলল, বলে যাব।

—আর শোন, তারপর কি-ভেবে পুত্রের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, ভিতরে এসে বস। কথা আছে।

অতীশ বুঝতে পারল বাবা আরও কিছু তাঁর সংশয়ের কথা বলবেন। অথবা মনে হল মার বিরুদ্ধে হয়ত অভিযোগ আছে বাবার। মার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে, কাছে গিয়ে শুনতে হয়। মার মধ্যে নাকি অভাব অনটনের বাই আছে। সব সময় অভিযোগ, এটা নেই, ওটা নেই। নিষ্কর্মা মানুষের হাতে পড়লে যা হয়। আপাত মনে হয় মার এ-সব কথা বাবা আজীবন অগ্রাহ্য করেছেন। কিন্তু বাবার চোখের দিকে তাকালে সে বুঝতে পারে বাবা এতদূর যে হেঁটে এসেছেন, সে একমাত্র মাকে সুখী করার জন্য। এবং যখন রেষারেষি শুরু হয় দু'জনে তখন বাবার কি হতাশ চোখ মুখ। অতীশের তখন বাবার কষ্টটা ভিতরে বড় বাজে। সে দরজার কাছে গিয়ে বলল, বলুন না।

—ভিতরে আসতে এত ভয় কেন? এখানে আর যাই থাক ভূত নেই।

সে বলল, হাত পা ধোয়া হয় নি।

বাবা হেসে দিলেন।—তাহলে ঈশ্বর ভীতি আছে।

অতীশ চীৎকার করে বলতে চাইল, না নেই। কিন্তু কিছুই বলতে পারল না।

চন্দ্রনাথ বললেন, ঈশ্বরের করুণা তোমার শরীরে আছে। তুমি নির্ভয়ে ভিতরে আসতে পার। তোমার পাপপুণ্য বোধ তীক্ষ্ণ। তাঁর মহিমা না থাকলে এটা হয় না। এটা যখন থাকবে না, তুমি পাপ-পুণ্যের ফারাক বুঝতে কষ্ট পাবে।

অতীশের ভিতরে ঢুকতে গিয়ে মনে হল, তবে কি সে চারুর সঙ্গে সহবাস করার পর গণ্ডার হয়ে গেছে। তাকে আর আর্চি তাড়া করছে না। আর্চি শেষ পর্যন্ত কাজ হাসিল করে উধাও। নির্মলার প্রতি অবিশ্বাসের কাজটা সেরে আর্চি প্রমাণ করতে চাইল, প্রেম ভালবাসা, স্ত্রীপুত্র সংসার সবই নিজের আত্ম-সুখের জন্য। এর বাইরে পৃথিবীতে আর কিছু নেই। আত্মসুখের জন্যই আর্চি বনির প্রতি বিরূপ আচরণ করেছিল। আর্চি আর সে এক।

চন্দ্রনাথ পাশে এক ফুলতোলা আসন পেতে দিয়ে বললেন, বস।

অতীশ বসল।

চন্দ্রনাথ বললেন, তোমার শত্রুপক্ষ প্রবল।

অতীশ খুব ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। সে-ত বাবাকে তার বিপর্যস্ত জীবন সম্পর্কে কিছু লেখেনি।

বাবা আবার ফিসফিস করে বললেন, বেঁচে থাকতে গেলে মানুষকে পাপ কাজ করতেই হয়। ঈশ্বর বল অবতার বল, কেউ পাপ কাজ করেন নি গলা উঁচু করে বলতে পারবেন না। যদি আমি তুমি ঈশ্বরের অংশ হয়ে থাকি, সেই পরমব্রহ্মের যদি আমরা ক্ষীণ অস্তিত্ব আমাদের মধ্যে আছে বিশ্বাস করি, তবে সব পাপ পুণ্যের দায়-ভাগও তার। তাঁর ইচ্ছাই তুমি পূর্ণ করেছ। তোমার অন্য নারীতে গমন কিংবা অকাজ কুকাজের প্রলোভন যদি হয়ে থাকে তাও তাঁরই ইচ্ছে। সুতরাং মনঃকষ্টে ভুগবে না। তোমার স্ত্রীপুত্রকন্যার জন্য তোমাকে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। মানুষকে সুখে রাখার কাজটা ঘর থেকেই আরম্ভ করতে হয়। সবাই যদি তোমার মতো হয়, ঈশ্বরের সৃষ্টি তবে থাকে কি করে।

অতীশ খুবই বেয়াড়া জবাব দিল, অন্য নারীতে গমন বলছেন কেন?

—হয়। এই বয়সে সব হয়। নির্মলাকে সুস্থ করে তোল।

—হবে কেন?

—ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হয়। তুমি মনে কর সবটাই তোমার। আমি মনে করি সবটাই তাঁর?

অতীশ বলল, যা আমার নয়, তার দায়ভাগ আমি নেব কেন?

—জন্মেছ বলে নিতে হবে।

অতীশ নিজেকে ঈশ্বরবিহীন প্রতিপন্ন করার জন্য বলল, অন্য নারীতে আমার গমন হয় নি!

চন্দ্রনাথ বিগ্রহের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বললেন, গমন হলেও কোন দোষের না।

বাবা এ-সব কি বলছেন! এ একেবারে উল্টো কথা। আসলে বাবা বুঝি টের পেয়েছেন, অনুশোচনা মানুষকে পাগল করে দেয়। বাবা তাঁর পুত্রের মঙ্গলার্থে পৃথিবীটাকে এখন বিপরীত প্রান্ত থেকে দেখছেন, সে বলল, যা হয়নি তাই নিয়ে অযথা মাথা ঘামাচ্ছেন বাবা। সে আজ প্রথম বাবাকে ছলনা করল। বাবার অনুমান নির্ভর কথাবার্তা তাকে বড় বেশী পীড়া দিচ্ছিল। বাবার সঙ্গে

ছলনা করা ছাড়া এ-সময় হাতের সামনে অন্য কোন উপায় খুঁজে পেল না অতীশ। চন্দ্রনাথ বললেন, তোমার মঙ্গল হোক। তারপর বিগ্রহের ফুল বেলপাতা কিছুটা তুলে নিলেন। অতীশ বুঝতে পারল বাবা এই ফুল বেলপাতা তার পকেটে এবং অ্যাটাচিতে ভরে দেবে।

অতীশ বলল, উঠি বাবা।

চন্দ্রনাথের এক মাথা চুল দাড়ি প্রদীপ শিখায় কেমন এক অলৌকিক প্রবাহ তৈরি করছে। ধূপদীপের গন্ধ, চন্দনের গন্ধ, থালায় বৈকালির নকুলদানা বাতাসা, ময়ূরের পালকের তৈরি বিগ্রহের রুপোর মুকুট সবই কেমন এক রহস্যময় জগৎ। অতীশ প্রবল আকর্ষণে বোধ হয় তলিয়ে যাচ্ছিল। সে জোর করে উঠতে চাইল। কিন্তু উঠতে পারছে না। হাতে পায়ে সে কেমন চলৎশক্তি হারিয়েছে। সে চিৎকার করে বলতে চাইল, বাবা আমি উঠতে পারছি না কেন, জোর পাচ্ছি না কেন?

চন্দ্রনাথ বললেন, পাবে। তারপরই ঘণ্টা নাড়তে আরম্ভ করে দিলেন। অতীশ বলে তার কোন জাতক অথবা স্ত্রী পুত্র পরিবার কেউ আছে এখন আর বাবার নিমগ্ন অবস্থা দেখলে বোঝা যায় না। অতীশের মনে হল বাবা যেন তাকে উৎসর্গ করে বলি দেবার নিমিত্ত এই বিগ্রহের সামনে এনে বসিয়ে রেখেছেন। ফুল বেলপাতা দিয়ে তার শেষ অর্চনা শুরু। অতীশ প্রায় একলাফে চৌকাঠ পার হয়ে বের হয়ে গেল। বাবাকে সত্যি কোন কাপালিক পুরুষের মতো মনে হচ্ছিল তার।

॥ সাতাশ ॥

অতীশ চুপি চুপি চোরের মতো পাতাবাহার গাছগুলোর সামনে এসে দাঁড়াল। আবছা অন্ধকার। অন্দর মহলের গাড়িবারান্দায় একটা আলো জ্বালা থাকে—আজ তাও জ্বলছে না। রাজবাড়িতে ঢুকতেই কেমন ভয় করছিল তার। একমাস ছুটি কাটিয়ে সে রাতের ট্রেনে ফিরে এসেছে! এই একমাস নির্মলার একটা চিঠি ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ তার কোন খোঁজখবর করেনি। রাজার সিট মেটালের, চার্জে সে আছে, সে না থাকলে কারখানা অচল, এমন একটা ধারণা কারা যেন ষড়যন্ত্র করে তার মাথা থেকে সাফ করে দিয়েছে। সে

ফালতু এই বোধটা অহরহ পীড়া দিচ্ছিল। আশঙ্কা বার বার, কাজটা তার আছে ত! সনৎবাবু রাধিকাবাবু মিলে যদি রাজার কানে তুলে দেয়, একটা গোঁয়ার লোককে দিয়ে আপনি কারখানাটাকে রসাতলে দিচ্ছিলেন, কুম্ভ কত সহজে তা একমাসেই কব্জা করে এনেছে! কারখানা চালাবেন, অথচ কারচুপি থাকবে না সে কখনও হয়! কুম্ভ হয়ত এ-মাসের স্ক্রাপ বিক্রির সবটা টাকাই রাজার হাতে দিয়েছে। রাজাকে আবার লোভে ফেলে দিতে পারলেই তার মজা। সারাটা ট্রেনে এমন এক আশঙ্কা কুট কুট করে কামড়াচ্ছিল। পাতা-বাহার গাছগুলির পাশে এসে দাঁড়াতেই ভয়—এখুনি বুঝি আর্চির প্রেতাত্মা খিল-খিল করে হেসে উঠবে।—কেমন, বোঝ এবার।

গাছগুলি তেমনি সজীব। সে পাতাগুলো ছুঁয়ে দেখবে ভাবল। এই গাছ-গুলোতেই এক রাতে আর্চির ঘোলাটে কুয়াশার মতো অবয়ব জল হয়ে মিশে গিয়েছিল। সেই জল হাতে লাগে কিনা, জলটা থাকলেই মনে হবে, সে এখনও আছে, তাকে সারাজীবন তাড়া করবে বলে পোকামাকড়ের মতো পাতার গায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে—এবং পোকামাকড় মনে হতেই গাটা তার শিরশির করে উঠল! পাতাগুলো ছুঁয়ে দেখার সাহস পর্যন্ত হারিয়েছে। সে ভাবছিল তালা খুলে কি দেখবে কে জানে! একমাস একটা বাসা খালি পড়ে থাকলে কত কিছুর উপদ্রব দেখা দিতে পারে। তক্ষুনি বারোটার ঘণ্টা বাজল রাজবাড়ির। সে যে ভয় পেলে ছুটে পালাবে তার পথও এখন বন্ধ। রাজবাড়ির বড় ফটক, ছোট ফটক সব বন্ধ হয়ে গেল। এত উচু পাঁচিল টপকে সে শত মাথা কুটলেও আর পালাতে পারবে না। আর্চির প্রেতাত্মা আজ তাকে একা পেয়ে আবার নাচানাচি শুরু করে দেবে।

নির্মলা টুটুল মিণ্টু কাছে থাকলে তার এতটা ভয় লাগত না। একটা মাস সে বাড়িতেও খুব ভাল ছিল না। এক জীবন থেকে অন্য জীবন, এক জীবনে বাবা মা ভাই বোনেই তার চারপাশটা ভরে থাকত। অন্য জীবনে এরা। বাড়িতেও সে বড় নিঃসঙ্গ বোধ করেছে। কি যেন নেই। টুটুল নেই- মিণ্টু নেই, কেউ বাবা বাবা করে না। কেমন আল্গা মনে হচ্ছিল সব কিছু। সে যেন শেষ দিকে জোরজার করে বাড়িতে কটা দিন কাটিয়ে দিয়েছে। কতক্ষণে স্ত্রী পুত্র কন্যার মুখ দেখবে এই এক আকাঙ্ক্ষায় কোনরকমে চুপচাপ কালাতিপাত করেছে। আরও একটা রহস্য তাকে পীড়া দিচ্ছিল। চারুর অন্তর্ধান এখনও রহস্যই হয়ে আছে। স্বপ্নের মতো। সে বিশ্বাস করতে পারছে না সত্যি চারু নামে এক

যুবতী তাকে ট্রেনে সঙ্গ দিয়েছিল। ঘোরের মধ্যে পড়ে গেলে যা হয়—নির্মলার কাছ থেকে তার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হচ্ছিল না, চারুর মতো কোনো যুবতীর স্বপ্নে সে বিভোর ছিল। পিয়ারিলালকে দেখলেও সে বলতে পারবে না, চারুর খোঁজ পেয়েছেন তো? স্টেশনে নামার আগে দেখলাম কামরায় নেই—কি যে হল! যদি পিয়ারিলাল ভাবে, বাবুর মাথায় গোলমাল আছে। চারুটা কে? সে কি যে করে! এবং এভাবে সে একটা ছায়া হয়ে যাচ্ছিল দরজাটার সামনে। রাজবাড়ির ভেতরে একটা কুকুরের ডাক শুনতে পেল। বাঘের মতো গর্জন করছে। সে সংবিৎ ফিরে পেয়ে এক লাফে সিঁড়িতে উঠে গেল, তালা খুলতেই আশ্চর্য একটা সুন্দর গন্ধ নাকে এসে লাগল। মনে হল ভিতরে কেউ সুগন্ধ ধূপবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। সে আলো জ্বালতে পর্যন্ত ভয় পাচ্ছে।

আলোটা জ্বালতেই করিডোর স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার এই বাসাবাড়িতে খুব বেশি কিছু আসবাবপত্র নেই। নতুন সংসার হলে যা হয়। কিছু স্টিলের বাসনকোসন। দুটো তক্তপোশ, একটা চেয়ার টেবিল। বাক্স পেঁটরা যৎসামান্য। নির্মলার দামী জামাকাপড় সঙ্গেই নিয়েছে। ওর যৎসামান্য অলঙ্কারও। ডুপ্লিকেট চাবি রাজবাড়ির অফিসে জমা রাখার নিয়ম। সেই মতোই সব করা আছে। আলো জ্বালাতেই কেমন আর এক বিভ্রমে পড়ে গেল। সে ঠিকমতো ঠিক জায়গায় এয়েছে তো? এই বাসাবাড়িটা তার না অন্য কারোর। সে এটা কি দেখছে! দেয়ালের রঙ পাল্টে গেছে। মেঝে অন্যরকম। ছেঁড়া ইলেট্রিকের তার ঝুলছে না। একেবারে এইমাত্র রাজমিস্তিরা কাজ সেরে বাড়ি গেছে মতো। যেন এই মাত্র কেউ কোন গন্ধ স্প্রে করে দিয়ে গেছে। আর তক্ষুনি মনে হল গন্ধটা সে রাজবাড়ির অন্দরে ঢুকলেই পায়। সে ধীরে ধীরে এগুচ্ছে। করিডোর ধরে যেতে যেতে সব খুঁটিয়ে দেখছিল। সামনের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। ঘরের আলো জ্বেলে আরও তাজ্জব হয়ে গেল। তার পুরানো চেয়ার টেবিল তক্তপোশ কিছু নেই। নতুন সোফাসেট, বাতিদান, খাট একেবারে রাজসিক কাণ্ড। সে বিশ্বাস করতে পারছিল না—বাঁ দিকের দরজাটা খুললে একটা চাতাল, সেটা ঠিক আছে কি না, যেন না থাকলে বুঝতে হবে, সে অন্য কারো বাড়িতে ঢুকে গেছে। দরজা খুলতেই চাতালে আলোটা লাফ দিয়ে পড়ল। পাশে করগেটেড টিনের বেড়া। না আগের মতোই জায়গাটা। তারই বাসা। বসার ঘরটা পার হয়ে শোবার ঘরটায় ঢুকে দেখল তার পুরানো আসবাবপত্র সব ওখানে স্তূপীকৃত করা আছে। তার বসার ঘর

পর্যন্ত, শুধু বসা কেন, রাতে পাশের তক্তপোশে শোয়—তক্তপোশটাও নির্মলার ঘরটায় রেখে দেওয়া হয়েছে। সেখানে কিছুতেই হাত পড়েনি।

সোফায় নীল রঙের ভেলভেটের পর্দা। সানমাইকার সেন্টার টেবিল। একটা নতুন কারুকাজ করা বাতিদান। পাশে কোণায় ছোট্ট টিপয়, তাতে কালো পাথরের একটা ছোট্ট দেবীমূর্তি। তারই ফাঁক ফোকরে চারটে ধূপবাতির কাঠি। পুড়ে শেষ হয়ে আছে। দরজা জানালা বন্ধ বলে একটা চাপা গন্ধ ঘরে করিডোরে ওড়াউড়ি করছে। গন্ধে কেমন তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। উঠে গিয়ে সব জানালা খুলে দিতেই দেখল করিডোর বরাবর অন্দরমহলের দিকে যে দরজা আছে—সেটা হাট করে খোলা। এতদিন ওটা ওদিক থেকে বন্ধ থাকত। তার দিক থেকে কোন বন্ধ করার ব্যবস্থা নেই। অন্দর থেকে ইচ্ছেমতো খোলা যায় বন্ধ করা যায়। তার অনুপস্থিতিতে সেটা কে খুলে দিয়েছে। যে আসে সবার অলক্ষে ঐ দরজা দিয়েই আসে। এবং সেটা ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

সে দরজায় মাথা গলিয়ে রাজবাড়ির অন্দরমহল দেখার চেষ্টা করল। এদিকটা সে কোনদিন দেখেনি। গাড়ি বারান্দায় কলাপসিবিল গেট। বড় তালা ঝুলছে। অন্দরমহলে ঢোকার মুখে একটি লাল রঙের অল্প আলোর বাতি জ্বলছে। দেখল ওদিকে ঠিক সিঁড়ির মুখে বড় পেল্লাই দরজা। ওটা দিয়ে সোজা অনেকগুলো ঘর পার হয়ে গেলে রাজেনদার ড্রইংরুম। ড্রইংরুমের ভেতর দিয়েই শঙ্খ তাকে দোতলায় দু'বার অমলার ঘরে নিয়ে গেছিল। এদিকের সিঁড়ি ধরে উঠে গেলে বোধ হয় সেই ঘরটা আরও কাছে। সে খুব সন্তর্পণে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

এতটুকু শব্দে কেউ জেগে যেতে পারে। দরজা বন্ধ করে ফিরে আসবে ভাবল। অবাক, আবার দরজার পাল্লা ফাঁক হয়ে গেল। কেউ যেন ওদিক থেকে সামান্য ঠেলে দরজাটা খুলে দিচ্ছে। এত রাতে কে আসবে! ভুমবার এদিককার কোন ঘরে থাকে। শঙ্খও থাকতে পারে। কিংবা অন্য কোন ঝি চাকর। তারা গোপনে দরজা ঠেলে দিয়ে সরে যাবে কেন। সে ফের দরজায় মাথা গলাল। না কেউ নেই। আবছা মতো অন্ধকারে অন্দরের রান্নাবাড়ির পথে দুটো বড় থাম বাদে কিছু চোখে পড়ল না। বাতাসে হতে পারে। গাল ঠেকিয়ে হাওয়া ঢুকছে কিনা পরখ করল। কম বেশি হাওয়া সব সময়ই থাকে। হাওয়ায় জোর নেই বললেই চলে। সে ফের দরজার পাল্লা ঠেলে বন্ধ করে

দাঁড়িয়ে থাকল। না আর খুলছে না। বন্ধই আছে। না থাকলে আবার কপালে ঘাম দেখা দিত। মিনিট কয়েক দাঁড়িয়ে থাকার পর সে কিছুটা নিশ্চিন্ত। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়া। শোবার ঘরের দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে শোবে ভাবল। নাহলে করিডোর ধরে যে কেউ তার দরজার সামনে হাজির হতে পারে। কেন জানি মনে হচ্ছে চারুর ঘটনার পর আর্চির প্রেতাত্মার চেয়ে সেটাও কম মারাত্মক না। উত্তেজনার মুহূর্তে সে নির্মলার প্রতি বড় অবিশ্বাসের কাজ করেছে।

বাথরুমের দরজাটা করিডোর বরাবর। বাথরুমে করিডোর দিয়েও ঢোকা যায়, ওদিকে চাতাল দিয়েও ঢোকা যায়। সে পাজামা গেঞ্জী বের করার আগে সোফায় এলিয়ে দিল শরীর। কেমন আর যেন পারছে না। করিডোরের দিকের দরজা বন্ধ করে দিল। চাতালের দিকের দরজাটা খোলা। করোগেটেড টিনের উঁচু পাঁচিল তোলা আছে বলে ওদিকের বাগান, পুকুর কিছুই চোখে দেখা যায় না। কান পাতলে ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যায় পর্যন্ত। ঘরে বাতিদানে চুরকমের ডুম। সে নীল রঙের আলোটা জ্বালতে পারছে না। মায়াবী যা কিছু সবই মনে হয় দূরাতীত কোন রহস্যে ঢাকা। আর যা হয় একা থাকলেই—পৃথিবীর সুদূরতম প্রান্তের কে যেন কথা কয়ে ওঠে। তার এখন এ-সব থেকে দূরে থাকা দরকার। আর কারো জন্য না হলেও মিণ্টু টুটুলের জন্য।

একমাস ছুটি ভোগ করে কিছুটা চাঙ্গা হবে ভেবেছিল অতীশ। অথচ চোখ মুখ দেখলে তার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রায় মরা মানুষের মতো সোফার ওপর উবু হয়ে পড়ে আছে। মাথার মধ্যে কেবল অপরাধবোধ ঢুকে গেলে যা হয়। ঘিলু ক্রমেই ভারি হয়ে যাচ্ছে। একটা মানুষের ঘিলুতে যদি ক্রমাগত ওজন চাপিয়ে দেওয়া হয় তবে সে স্বাভাবিক থাকে কি করে। চারু তাকে আর এক রহস্যের মধ্যে জড়িয়ে গেছে। এখানে এসে ভেবেছিল, সব ঠিকঠাক দেখবে। তাও নেই। মানসদার অস্বাভাবিক আচরণের জন্য কে দায়ী! এই যে তার অনুপস্থিতিতে অমলা ঘর দোরের চেহারা পাল্টে দিল, সেটা কি জন্য! অমলার মা হবার অস্বাভাবিক আগ্রহ। দরজা কে খুলে রাখে! এটাও এক বিপত্তি। সে ফের উঠে গিয়ে যে দেখবে, দরজাটা কেউ খুলে দিয়ে গেল কিনা তারও আর সাহস নেই। দেখতে হবে ভয়ে সামনের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। যা হয়, সকালে দেখবে। রাতটাই তাকে যত বিড়ম্বনার মধ্যে

ফেলে দেয়। কাল অফিস করেই নির্মলাকে আনতে চলে যাবে। এখন শুধু ভাবছে কোনরকমে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারলেই সবার জারিজুরি শেষ। সে উঠে বাথরুমে ঢুকে গেল। ভাল করে চান করল। তারপর গা মুছে পাজামা পরতেই করিডোরের দরজার ঘুলঘুলিতে কী চোখে পড়ল! আর ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে কেমন সিঁটিয়ে গেল। করিডোরের শেষপ্রান্তে অন্দরমহলের দরজাটা ফের হাট করে খোলা। তার দু হাঁটুতে কারা যেন হাতুড়ি ঠুকছে। আর এ সময়ে কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে গেল সে। বার বার অলক্ষ্যে কে সে দরজা ঠেলে দিচ্ছে!

সোজা ঘরে এসে সেন্টার টেবিলটা তুলে নিল। এদিকের দরজা খুলে ছুটে গেল। তারপর অন্দরমহলের দরজা বন্ধ করে সেন্টার টেবিলটা চাপা দিয়ে দিল। ফিরে আসতে না আসতেই ওটা হড়কে পড়ে গেল। ভয়ঙ্কর শব্দে বুঝি সারা বাড়ি জেগে যাচ্ছে। সে বলল, সব তোমার কাজ—ঠিক আছে—কত নির্যাতন করবে! সে সোফাটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। গায়ে কোত্থেকে অসুরের মতো প্রবল এক দানব জেগে উঠেছে। সেন্টার টেবিলটার ওপর সোফাটা দমাস করে ফেলে দিল। আর পারবে না। পারতেও পারে। সে ছুটে গিয়ে পাশাপাশি রাখা কোচ দুটো তুলে আনল একে একে। ওগুলো চাপিয়ে বলল, এবার! খোল! দেখি কত মুরদ। দু-পা ফিরে আসতেই মনে হল না, সে সব পারে। সঙ্গে সঙ্গে খাট থেকে তোষক জাজিম তুলে নিল। দরজার ওপর সব ভার চাপিয়ে দরকার হয় সারারাত নিজে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। তবু দরজাটা মর্জিমতো খুলে যাবে সে হতে দেবে না। একসময় দেখা গেল, ঘরে আর কিছু নেই। সব ফাঁকা। শুধু দেবীমূর্তিটা। ধীরে ধীরে ওটা বনি হয়ে তার হাত ধরে ফেলল, ছোটবাবু প্লিজ, প্লিজ।

অতীশ কেমন স্বাভাবিক হয়ে গেল, সত্যি এ-সব সে কি করছে! সে শুধু দু-হাতে মুখ বুজে বনির পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল—বনি আমি কি হয়ে যাচ্ছি। বনি চারু আমাকে নষ্ট করে দিয়ে গেল! নির্মলাকে মুখ দেখাব কি করে!

বনির মুখে আশ্চর্য হাসি। সে ধীরে ধীরে বলল, ছোটবাবু লাভ ইজ এ ম্যাগনিফিসেন্ট এগজিলারেটিং ট্রিপ, অ্যাণ্ড হোয়েন ইট ডাইজ—ইট ইজ ওর্স দ্যান অলমোস্ট এনি আদার কাইণ্ড অফ ডেথ।

অতীশ বলল, নির্মলা কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে! আমাকে একা কাছে দেখলে ভয় পায়। ও আমাকে একা ফেলে বাপের বাড়ি চলে গেল। অতীশ যেন

এক নিরুপায় বালকের মতো বনির দু হাঁটুর মধ্যে মুখ রেখে কথাগুলো বলে যাচ্ছে। আমি কি করব বনি। ওর অসুখ সারছে না কেন।

বনি এবারেও মৃদু হাসল। তারপর গভীর ঘন এক সবুজ পৃথিবী থেকে যেন তার কথা ভেসে আসছে।—ভিক্টরি ডিফিট, জয়, পেইন, বার্থ, ডেথ—লাইফ ইজ অল অফ দিজ। তুমি ঘাবড়ে যেও না ছোটবাবু। তোমার মিণ্টু, টুটুল আছে'। তোমার কিছু হলে ওরা যে একা হয়ে যাবে।

—চারুটা কে ?

—তোমার প্রত্যাশা।

—চারু বলে তবে কেউ আসে নি ? আমার কিছু হয় নি ! বাবা যে টের পেয়ে বলল, অন্য নারীগমনেও কোন দোষের হয় না।

বনি গাঢ় স্বরে বলল, ছোটবাবু নো ওয়ান লাইটস এ ল্যাম্প অ্যাণ্ড হাইডস ইট। ইনষ্টিড, হি পুটস ইট অন অ্যা ল্যাম্পস্ট্যাণ্ড টু গিভ লাইট টু অল হু এনটার দ্য রুম।

কেউ যেন অলক্ষ্যে তখন বলছে, ঘুমের মধ্যে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতে পার। তার প্রতি তোমার নেশা জন্মেছে।

এ-কথা বলছ কেন ? কে এমনভাবে কথা বলছে !

যাবতীয় সুন্দরীরা তোমার মাথায় নাচানাচি করে। অন্য নারীগমনে স্পৃহা বাড়ছে।

না বাড়ছে না। মিছে কথা। তুমি কে, কে !

নিজের সঙ্গে তঞ্চকতা। ছোটবাবু এ-মুহূর্তে চারু দরজায় টোকা মারলে কি করবে ?

দরজা খুলব না। তুমি কে, কে ?

তুমি পারবে ? তুমি কে নবীন সন্ন্যাসী ? আই অ্যাম দ্য স্যালি হিগিন্‌স।

আমাকে পারতে হবে। ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষা করতেই হবে ! হিগিনস্ আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

আসলে এই ব্যভিচার শব্দটাই অতীশের হয়েছে কাল। আজীবন যে এক সংস্কার তার মাথা নেড়া করে ভুতুড়ে ছায়া তৈরি করে গেছে সে থেকে মুক্ত হতে পারছে না। সে বলল, আমি খুন করেছি, আমি জানি শরীরের এই পীড়ন আমাকে একদিন মুক্তি দেবে। নানাভাবে মুক্তির পথ খুঁজছি। বাবা কিছু টের পেয়ে গেছেন, বাবা এখন আমার সব কাজই সমর্থন করে যাবেন। এমনকি মানুষ হত্যার

পাপও। বাবার কাছে আমার সব কাজই তেনার ইচ্ছেতে হয়। তিনিই করিয়ে নিয়েছেন। নিজের সব দায় বাবা তাঁর উপর অর্পণ করার কথা বলছেন। আমার জন্মলাভ থেকে বেঁচে থাকা বড় হওয়া, কাজ অকাজ সবই তাঁর ইচ্ছায়। যাতে আমি নিরালম্ব হয়ে না পড়ি বাবা তার জন্য প্রাণপণ যুঝে যাচ্ছেন। নিরালম্ব মানুষের কোন আশ্রয় থাকে না। সে বৃক্ষহীন হয়ে বাঁচে! বাবা সেটা টের পেয়ে গেছেন। আসার সময় বলেছেন, পবিত্র হও। দৃঢ়ব্রত হও। ব্রহ্মপরায়ণ হও। শরীরের ভেতর দিয়ে তোমার অনেক ভার চলে গেছে। তাই ঐ রকম হয়েছ। যে ব্রহ্মবিজ্ঞান সবাইকে জ্ঞানদান করে তার তুমি অনুসরণ কর। এই যে তার লীলাখেলা, আকাশ পৃথিবী জলবায়ু, শস্যক্ষেত্র, নদীর ঢেউ, ঝড়ের গর্জন, জন্মমৃত্যু, কাম ক্রোধ কোনটাই তার আস্ফালন নয়, সবই তার নিরন্তর প্রকাশ। মনে রেখ মৃত্যুর অতীতেও অমৃত আছে। সেই অমৃত জীবনে আছে। জীবন ভোগেও আছে। তুমি তোমার সংসারে সেই অমৃতকে বহন কর। বাবার এইসব কথার মধ্যে কোথায় যেন জাদু আছে। তার পীড়ন এবং উত্তেজনা দুই-ই কমে গেল। ঘর একেবারে ফাঁকা। চারুর কাছে তার নির্লজ্জ বেহায়া চেহারাটা আবার এখানে ফুটে উঠুক সে তা চায় না। আসলে তার অপরাধবোধ তীব্র তীক্ষ্ণ হচ্ছিল। বাড়িতে শেষদিকে অসহায় বোধ করেছে এই ভেবে—নির্মলার কাছে তার দাবি করার মতো কিছু থাকল না। চারু তার সব অধিকার হরণ করে নিয়েছে। এবং মানুষের যা হয় বার বার নিজের কাছেই নিজের কৈফিয়ত। তার আত্মশক্তি এমনিতেই আর্চি দিন দিন দুর্বল করে দিচ্ছে। তার ওপর যদি অন্য অপরাধবোধ তাকে প্রবলভাবে আক্রমণ করে তবে সে স্থির থাকতে পারবে না। এবং এসবের সঙ্গে কেন জানি মনে হয় সংসারের মঙ্গল-অমঙ্গল নিহিত আছে। আর যা হয় সব প্রলোভন তৈরি করে দেয় যেন—আর্চির প্রতিশোধ স্পৃহা। সে এ-সব থেকে তাকে, নির্মলাকে, মিণ্টু টুটুলকে রক্ষা করতে চায়। অমলা সোজাসুজি তার ঘরের সামনে কোন গভীর রাতে চলে আসতে পারে, এবং দরজায় টোকা মারতে পারে, বড় ভয় তার। ও-ঘরে নির্মলা টুটুল মিণ্টু শুয়ে থাকবে, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকবে, পালিয়ে সে অমলের সঙ্গে ফের আবার কোনো শেওলা ধরা পিচ্ছিল ঘরে সহজেই প্রবেশ করতে পারে। এমনিতেই চারু তার কিছুটা অস্থির করে রেখে গেছে। বাকিটা অমলার কাজ হবে তাকে উন্মত্ত করে তোলা। এই সব ভাবনাই তাকে মাথার মধ্যে পেরেক ঠুকে দিচ্ছিল। সে যে এতক্ষণ উন্মত্তের মতো দরজায় নিয়ে ও-সব ফেলে রেখে এসেছে

এটা তারই প্রতিক্রিয়া। দরজাটা বন্ধ করে দিতে পারায় কিছুটা আরাম বোধ করছে। কারণ সে জানে, অমলা কাছে এসে দাঁড়ালে, তার ক্ষমতা নেই নিজেকে সামলে রাখে। নির্মলার অসুস্থতা তাকে যে দৈহিক পীড়নের মধ্যে ফেলে দিয়েছে অমলা ঠিক টের পেয়ে গেছে। সোফা কোচ দিয়ে বাড়িঘর সাজিয়ে দেওয়াটাই তার প্রথম সংকেত।

তারপরই তার নিজের সঙ্গে কথোপকথন শুরু হয়ে যায়।—যাক নিশ্চিন্ত। তাহলে অতীশবাবু তুমি এখন শুয়ে পড়তে পার।

তা পারি। ঘুম আসবে তো।

ভয় কি। দরজা বন্ধ।

সে শুয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল বেলা করে। ঠুক ঠুক করে কেউ কড়া নাড়ছে। দরজা বন্ধ বলে শব্দটা তত তীব্র নয়। দরজা খুললে লম্বা বারান্দা। কিছুটা হেঁটে গেলে বাইরে বের হবার দরজা। জানালায় পাতাবাহারের গাছ হাওয়ায় দুলছে। সে বলল, কে?

—আমি কুম্ভ।

ঠিক খবর পেয়ে গেছে। দরজা খুলতেই মনে হল লোকটাকে ঢুকতে দেওয়া এ-মুহূর্তে ঠিক হবে না। বড় ধূর্ত। টের পাবে সে কাল রাতে ভাল ছিল না। সোফা কোচ বাতিদান খাট জাজিম তোষক সব অন্দরের দরজায় গাদা মেরে রাখা আছে। ভেতরে ঢুকলেই বুঝতে পারবে, সর্বত্র ঘরের লণ্ডভণ্ড অবস্থা। দেখলেই দশটা প্রশ্ন। সে বলল, আমি যাচ্ছি।

কুম্ভ মুখে ব্রাশ দিয়েই চলে এসেছে। পরনে নীলরঙের লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি। মুখ ভর্তি পেস্টের ফেনা। কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না বলে সিঁড়ির পাশের নর্দমায় থুথু ফেলছে। কুম্ভ যাতে ভেতরে ঢুকতে না পারে সেজন্য দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে অতীশ।

—শোনলাম অনেক রাতে ফিরেছেন!

—ট্রেন লেট ছিল।

—কি খেলেন এসে?

—কিছু না।

—হাসি আপনার জন্য চায়ের জল বসিয়ে দিয়েছে।

অতীশের মনে হল সে অযথা মানুষ সম্পর্কে কিছু খারাপ ধারণা পুষে রাখে।

সে রাতে খেয়েছে কিনা কুম্ভবাবু কত আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল। হাসিরাণী তার জন্য সকাল সকাল চায়ের জল বসিয়ে রেখেছে। আপাতত কুম্ভবাবুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য দরজা বন্ধ করে দেবার আগে বলল, হাত-মুখ ধুয়ে যাচ্ছি। আপনি যান। আমি আসছি।

কুম্ভ বলল, অনেক কথা আছে। তাড়াতাড়ি আসুন।

দরজা বন্ধ করে ঘুরে ডানদিকে তাকাতেই সে বিস্ময়ে হতবাক। ওখানে কিছু পড়ে নেই। সব ফাঁকা। দরজাটা সেই আগের মতো অন্দর থেকে বন্ধ। ওর মাথাটা কেমন করতে থাকল। কাল রাতে সে ঠিক ছিল তো। সব কিছু অতর্কিতে অদৃশ্য হয়ে যায় কি করে! চারুর মতো খাট জাজিম তোষক সব অদৃশ্য হয়ে গেল। সে কেমন বোকার মতো তাকিয়ে থাকল। সকালে উঠে কুম্ভবাবুর সাড়া পেয়েই সে ভেবেছিল—এটা তার বাড়াবাড়ি। এ-বাড়িতে অমলাই তার নিজের মানুষ। সে যদি তার সুখ-সুবিধার জন্য একটু কিছু করে থাকে তবে তা দোষের হবে কেন। অমলার এটা অন্য এক জীবন। তাকে দেখলে সে শৈশবের স্মৃতির মধ্যে ঘুরে বেড়াতে পারে। এতে এক রকমের নাড়ির টান সৃষ্টি হবারই কথা। আজীবন মানুষ রুপোর কৌটায় সোনার ভ্রমর পুরে শৈশব থেকে বড় হয়। সেই সোনার ভ্রমর মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখারও সখ মানুষের। ওকে দেখলে বোধহয় অমলার সেই ইচ্ছেটা জাগে। তখনই অমলার জন্য তার কেমন মায়া বাড়ে। সে ভেবেছিল, যেখানে যা আছে, সব আবার ঠিক সাজিয়ে রেখে দেবে। দরজাটা খুলে যায়, অফিসে জানালেই বাড়ির মিস্ত্রি এসে ঠিক করে দিয়ে যাবে। কুম্ভকে সে-জন্য দরজায় আটকে রেখেছিল। কিন্তু এখন এটা কি দেখছে! সে ছুটে গেছে। কোন মরীচিকা দেখছে না তো। দরজা টানাটানি করে দেখল, বিন্দুমাত্র সেটা আল্গা করা যাচ্ছে না। আগের মতো নিথর নিঃশব্দ এবং সঙ্গে এক ভয়াবহ দৈব যেন দরজাটায় ভর করে দাঁড়িয়ে আছে।

সে কেমন চিৎকার করে উঠল, আমার অমন হয় কেন? আমি কি? আমার কি হচ্ছে! মরীচিকা আমাকে গ্রাস করে কেন! তারপরই মনে হল, রাজবাড়ির অন্দর থেকে কেউ ছুটে আসতে পারে। ওদিকের দরজায় একটা মুখও দেখা গেল। ঝুমবার দরজায় ধাক্কা মারছে। সে নিজেকে সংযত করে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ঝুমবার অপলকে ওকে দেখছে। দেখতে দেখতেই বলল, হল্লা ভেতরে?

সে বলল, না তো।

—কে চিৎকার করছিল যেন সব।

—এদিকে কিছু হয় নি।

প্রাসাদটা এমন যে শব্দের প্রতিধ্বনি বড় বিচিত্রভাবে দিক পরিবর্তন করে। ঝুমবার চলে গেল। কিছুটা গিয়ে আবার কি ভেবে ফিরে এল।

অতীশ দরজায় ঘোলা চোখ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ঝুমবার বলল, বৌরাণী মাইজীকে আজই নিয়ে আসতে বলেছে।

অতীশের চোখ মুখ অমলার উপর কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। কিন্তু যদি সত্যি হয়, রাতে যা দেখেছে, সে মরীচিকা না হয়ে সত্যি হয়, হতেও তো পারে—ঘুমিয়ে পড়লে অমলা লোকজন দিয়ে সব দরজা থেকে সরিয়ে নিয়ে থাকে যদি—ছিঃ ছিঃ অমলা কী না ভাবল—অতীশ তুই এত ছোট হয়ে গেছিস! নিজের উপর তোর এতটুকু ভরসা নেই। অথবা যদি ভাবে, তোর এত অহংকার—আমার কিছুই তুই নিবি না। তোর দম্ভ একদিনে সোজা করে দিতে পারি জানিস।

অতীশ বিড়বিড় করে বকতে বকতে যাচ্ছিল, তুমি সব পার অমলা। পার বলেই তোমাকে আমার এত ভয়। তোমার সম্পর্কে কেউ একটাও ভাল কথা বলে না। আমার বড় কষ্ট হয়। জমিদার বাড়ির ছাদে, ফুলপরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকতে, কী পবিত্র চোখ মুখ আমিই প্রথম ছুঁয়ে দেখেছিলাম, এবং নিরন্তর এক পাপবোধ সেই থেকে—পাপবোধ থেকে ভালবাসা—গভীর গোপন প্রেম—এক পাটাতন থেকে অন্য পাটাতনে, বনি থেকে নির্মলা, এক জাহাজ থেকে অন্য এক জাহাজে—কলকব্জা সব এক, নাট বোল্ট, ডেরিক উনইচ, মাস্তুল, ইনজিনরুম সব এক—সেই চুল চোখ নাভিমূলে সেই দিব্য আলো—তবু ভয় তোমাকে—আমার আবার না জাহাজডুবী হয়। যদি ঘোরে পড়ে না থাকি, আর চারু যদি সত্যি হয় সেও এক অদৃশ্য হিমবাহ। অলক্ষ্যে যে কোন মুহূর্তে আমার জাহাজের তলাটা ফাঁসিয়ে দিতে পারে। আমার ঈশ্বর নেই, বড় বৃক্ষ নেই—মিণ্টু টুটুল বড় হচ্ছে—চারপাশে কেবল দুর্ঘটনার খবর, মৃত্যু হত্যা ধর্ষণ রাহাজানি, মিণ্টু টুটুল বড় হচ্ছে, ওদের নিরাপত্তার কথা অহরহ আমাকে কাতর করে। ভেতরে আর এক ফ্রন্ট—একটা মাস গেল একটা লাইন লেখা হয়নি, আমি যে কি হয়ে যাচ্ছি! বুঝতে পারি মানুষের জন্য একজন ঈশ্বর বড় দরকার। আমার শুধু প্রেতাত্মা সম্বল।

—দরজায় কে দাঁড়িয়ে! অ হাসি, এস এস

—চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। কখন থেকে আমরা বসে আছি।

অতীশ জামাটা গলিয়ে বাইরে বের হয়ে এল। চোখ মুখ অস্বাভাবিক দেখাতে পারে। সে বলল, যাচ্ছি। মুখ ধুয়ে যাচ্ছি। ফের সে ফিরে বাথরুমে ঢুকে ভাল করে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিল। মুখ মুছে আয়নায় মুখ দেখে যখন বুঝল, না তার চোখে মুখে কোন অস্বাভাবিক দাগ লেগে নেই—বরং প্রশান্ত দেখাচ্ছে। সে নিজেই চেষ্টা করলে এটা পারে। অহেতুক দুর্বলতা আসলে তাকে দিন দিন পেয়ে বসেছে। সে বাইরে এসে দরজা টেনে দিল। তারপর পাতাবাহারের গাছগুলি পার হয়ে যাবার সময় দেখল কাবুলবাবুর জানালা খোলা। ভিতরে ফুল ভলিয়ুমে রেডিও চলছে। এরা কত সহজে বাঁচে। বাবার কথাই ঠিক—পাপপুণ্য বড় আপেক্ষিক ব্যাপার। মন থেকে সব মুছে ফেল। যদি একটা খারাপ কাজ করেই থাক জীবনের মহাভারত তাতে অশুদ্ধ হয়ে যায় না। দশটা ভাল কাজে তা পুষিয়ে যায়। সেই পাখি জোড়া খুন না করলে তিনি রামায়ণ লিখতে পারতেন না।

আসলে সে বুঝেছে মগজটা তার শান্ত থাকে না। কত চেষ্টা করেছে—একদণ্ড সে কিছু চিন্তা না করে থাকবে। শজারুর মতো মগজের কাঁটা গুটিয়ে রাখার চেষ্টা করে—কিন্তু কখন যে কাঁটাগুলো সোজা হয়ে যায় আর বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে সব পাখি উড়ে এসে মগজে গেঁথে যায়। তারা পাখা ঝাপ্টায়—সে দেখল তখন মেসবাড়ির দরজায় কুম্ভবাবুর বাবা দাঁড়িয়ে। অফিসে বের হচ্ছেন। সাদা হাফ শার্ট গায়ে, আর পাটভাঙা ধুতি, পাম্পসু চকচক করছে। মাথায় টাকের আড়ালে যে কখানা চুল আছে ভারি সযত্নে তা পরিপাটি করা। বিপত্নীক প্রৌঢ় মানুষটা এখনও কত সৌখীন—কিসের আশায়!

তার দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসলে, অতীশ বলল, দাদা ভাল আছেন?

—তুমি কেমন আছ আগে বল?

এমন প্রশ্ন কেন? সে যে ভাল নেই তবে কি চাউর হয়ে গেছে। কাল সে রাতে যা হুলোস্থুল করে বেড়িয়েছে ঘরে, তা কি মানুষটার কানে উঠে গেছে। সে বেশ জোর দিয়ে বলল, ভাল আছি।

—মা বাবা?

—ভাল আছেন।

—যাও ভিতরে যাও। ওরা বসে আছে।

অতীশ মাথা নুয়ে মেসবাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। বাঁ-দিকে মেস, ডান-

দিকের বারান্দায় উঠে গেলে কুম্ভবাবুর ঘরের দরজা। ঢোকার ঘরটাতেই কুম্ভবাবুর বাবা থাকে। দেয়ালে সর্বত্র ফটো। সবই মহারাজবাহাদুরের সঙ্গে। জীবনের সব গৌরব এবং অহংকার এই ফটোতে লটকে আছে। যে কেউ এই ঘরে ঢুকলেই যেন বুঝতে পারে আমরা এ পরিবারের তিন পুরুষের সঙ্গী। তুমি সেদিনের ছোকরা, এসেই সব তছনছ করে দেবে সেটা আমাদের সহ্য নাও হতে পারে।

দরজাগুলো এদিককার ছোট। সে ঢোকার আগেই ভেতর থেকে কে যেন সাবধান করে দিল, লাগবে। মাথা নুয়ে ঢুকুন। সে লম্বা বলে আগে দু একবার এ-বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে কপালে ঠেক খেয়েছে। একবার তো কপাল পটলের মতো ফুলে উঠেছিল। সে বেশ মাথা নিচু করে ঢুকতেই কুম্ভবাবু ভিতর থেকে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। এত খাতির যত্ন, সে কিছুটা ফের দ্বিধায় পড়ে যাবে অবস্থায় দেখল হাসি ওর ঘর থেকে একটা মোড়া টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

—এদিকে আসুন।

ভেতরে অনেকটা খোলামেলা জায়গা। বাড়িটার ছাদ অনেকটা এগিয়ে এদিকটায় একটা ছাউনি করে দিয়েছে। তার নিচেই হাসিরাণীর রান্নাঘর—নীল রঙের মিভসেফ, গ্যাসের উনুন, দেয়ালে সানমাইকার আলমারি—একেবারে হাল ফ্যাসনের রান্নাঘর। হাসির যাতে কোন কষ্ট না হয়, কারণ সংসারে হাসিরাণীর উপরই সব চাপ—দু-ভাই কলেজে যায়, বাড়িতে দিদি বোন মেসো মাসি দেশ থেকে এসেই এখানে থাকে খায়। হাসিরাণীকে এক হাতে সামলাতে হয়। কুম্ভবাবু বাবার সুপুত্র, হাসিরাণী বাবার লক্ষ্মী বৌমা—সংসারটা আগলে রাখায় কৃতজ্ঞতা বাড়ে—এবং কুম্ভবাবু জানে, বাবাকে খুশি রাখতে পারলে, একটা বড় অঙ্কের হিসাব তার মিলে যাবে। এগুলো মনের মধ্যে ক্রিয়া করতেই সে দেখল হাসিরাণী সকালেই বেশ সেজেছে। দেখতে হাসিরাণী সুন্দর। একটু গোলগাল এই যা। একটু ছোট মাপের শরীর—তবু এই হচ্ছে কুম্ভবাবুর অলৌকিক জলযান। বিয়ের পরই সফরে বের হয়ে পড়েছে। কত বন্দর, আর বর্ণমালা হাসিরাণীর নাকছাবির মধ্যে না জানি অদৃশ্য হয়ে আছে। সেই এক পাটাতন—সেই এক স্ক্রু বোল্ট নাট, সেই এক ইনজিন, এবং নাভিমূলে রহস্য। সকালবেলায় মুখে পাউডার কেন? চা আর মিষ্টির থালা সামনে নিয়ে কথাটা ভাবল অতীশ। কুম্ভবাবু এক নাগাড়ে কারখানার খবর দিয়ে যাচ্ছে। ই এস আই থেকে বেড পাওয়া গেছে। টিনের কোটার পারমিট পেয়ে গেছে। কারখানার

পতিত জমিতে নতুন বিল্ডিংয়ের প্ল্যান হয়েছে। কেনাস্তারা বানাবার জন্য মেশিন খোঁজা হচ্ছে—এক কথায় কুমার বাহাদুর দুহাতে টাকা ঢালতে রাজি হয়ে গেছেন। একমাসে এতটা—কুম্ভ আশা করেছিল অতীশবাবু খুব বাহবা দেবে। আসলে সবই হচ্ছে একজনের জন্যে—পেছনে বৌরাণী না থকলে নতুন শেয়ার ফ্লোট করার কথা যে আকাশকুসুম ভাবা তাও সে বলে গেল।

অতীশ নিমকি খাচ্ছিল আর মাঝে মাঝে চোখ তুলে হাসিরাণীকে দেখছিল। এমন চোখে তাকাচ্ছিল যে হাসিরাণী সেটা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে নি। যেন মানুষটা শুধু তাকে দেখছে না, তার অভ্যন্তর পর্যন্ত দেখছে। শরীরটা কেমন ঝিমঝিম করছিল। মানুষটাকে দু বছর ধরে জানে বলেই ভয় কম—কুম্ভ টের পেলে ফের হয়ত সেই লক্ষ্মীর পট কেনার মতো শোরগোল তুলবে। সে অতীশকে অন্যমনস্ক করার জন্য বলল, চায়ে মিষ্টি ঠিক হয়েছে দাদা।

অতীশ বলল, তুমি খুব সুন্দর হাসি।

এ কি কথারে বাবা! অতীশ এবার কুম্ভর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি ভাগ্যবান কুম্ভবাবু। আপনার পাটাতন বড় মজবুত। হড়কাবার ভয় কম।

অতীশের কথায় কুম্ভ প্রথমে সামান্য ঘাবড়ে গেল। সে অতীশবাবুর মুখ সবটা দেখতে পাচ্ছে না। ওরা দু'জনই পাশাপাশি বসেছে। দু'জনেরই মুখ হাসিরাণীর দিকে। অতীশের মুখের একাংশ চোখে পড়ছে। অতীশ ওর দিকে তাকিয়েও কথা বলছে না। দুটো করে মিষ্টি, ডিমের ওমলেট দু পিস পাঁউরুটি—হাসি নিমকি খেতে খুব পছন্দ করে, সঙ্গে সেজন্য তাও সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে এতক্ষণ যে কারখানার কথা বলে গেল তার একটা কথাও বুঝি কানে যায় নি! সে একা একমাসে কত করেছে তার একটা ফিরিস্তি দিচ্ছিল। অতীশবাবু খুশি হলে বৌরাণী খুশি হবে। অতীশবাবুর একখানা সার্টিফিকেট তার এখন বড় জরুরী দরকার। কুম্ভ বুঝেছে বৌরাণী থাকতে পেছনে লেগে কোন কাজ হবে না। অতীশের অনুপস্থিতিতে সে যেখানে যা দিতে হয় দিয়ে-থুয়ে কাজ বাগিয়ে এনেছে। তাতে তারও কিছু থাকে। থাকে বলেই দৌড়-ঝাঁপ করা। সে দৌড়ঝাঁপ করার সময় আকারে ইঙ্গিতে এমন সাধু থাকার চেষ্টা করেছে যে, অতীশের মতো ওপরয়ালার সঙ্গে কাজ করতে গেলে এ-ছাড়া তার উপায় নেই। বৌরাণীর সঙ্গে তার কোন হটলাইন নেই। সে কাবুলবাবুর মারফত হটলাইন একটা তৈরি করে নিয়েছে। একমাসে কম করে হলেও একশবার বলেছে, রাজার কপালগুণ ভাল, নাহলে এমন সৎ ভালমানুষ মেলা

ভার। সে এ-ছাড়া কাজ বাগাতে পারত না। কারখানা যে লাভের মুখ দেখেছে সেটা মানুষটার সৎ আন্তরিক স্বভাবের জন্য এমন বলেছে কাবুলবাবুকে। সুতরাং রাজা চোখ বুজে টাকা ঢাললেও সব ঠিক ঠিক থাকবে এই ফুসলানোটা ক্রমাগত একমাস ধরে চালিয়ে গেছে। এখন ভয় সব না লোকটা তছনছ করে দেয়। যা একখানা এক বগ্‌গা স্বভাব, যে কোন মুহূর্তে বলে দিতে পারে—পতিত জমিটায় নতুন বিল্ডিং করে কি হবে? ক্যাপিটেল ইনভেস্টমেন্টের চেয়ে কারখানার এখন দরকার ওয়ার্কিং ক্যাপিট্যালের। তা হলেই গেছে। নতুন বিল্ডিংয়ে যে টাকা লোটার ফন্দি করে রেখেছে সেটা যাবে। পুরানো বাতিল মেসিন কিনতে যে কমিশন থাকবে তাও যাবে। নতুন শেয়ার ফ্লোট করে টাকা হাতানোর ফন্দিটা লোকটা গোলমাল করে দিতে পারে। তক্কে তক্কে ছিল কখন আসবে। এবং জপানোর কাজটা হাসিরাণীকে সামনে রেখেই শুরু করা গেছিল। লোকটার মাথায় ভূত চেপে আছে সে সেটা বুঝবে কি করে। কারখানার কথায় পাটাতনের কথা আসে কি করে। সে বলল দাদা আপিসে যাবার আগে এখানেই দুটো ডালভাত খেয়ে নেবেন। একসঙ্গে খেয়ে বের হয়ে যাব। সে বুঝতে পারছিল, লোকটাকে সহজে কাবু করা যাবে না। ধীরে ধীরে করতে হবে। সে আর কারখানার কোন কথাতেই গেল না।

অতীশ বলল, আচ্ছা কুম্ভবাবু চারু বলে কাউকে আপনি চেনেন!

কুম্ভ ভূত দেখার মতো কথাটাতে আঁতকে উঠল। লাইনে আনার জন্য একটা নর্দমার মধ্যে ঠেলে ফেলে দেবার ফন্দি বুঝি ধরা পড়ে যাচ্ছে। এই নিয়ে যদি কথা ওঠে, এতো সহজেই সব বলে দিতে পারে—কিছু বিশ্বাস নেই। কাবুলটাও জানে তার মাথার মধ্যে কূটবুদ্ধির একটা আড়ত আছে। বললেই বিশ্বাস করবে—পিয়ারিলালকে দিয়ে একটা বেশ্যা মাগী ধার করে এনে ষড়যন্ত্র করতে চেয়েছিল কুম্ভ। বেবাক ফাঁস করে দিলে দোষটা বৌরাণী তাকেই দেবে। এমন কি তার চাকরিটাও খতম হয়ে যেতে পারে। বৌরাণীর পেয়ারের লোককে একটা বেশ্যা মাগী ধরিয়ে দেওয়া এ-বাড়িতে কেউ বরদাস্ত করবে না। অতীশবাবুর স্ত্রী রুগ্ন—মুখে চোখে সব সময় অধীর ভাব—এই ভাবটার ফাঁকে সে একটা রন্ধ্রপথ আবিষ্কারের চেষ্টায় ছিল। সেটা এমনভাবে হাঁ করে মুখ ব্যাদান করবে কল্পনাও করতে পারে নি। চারুর ব্যাপারে ঠিক তাকে সন্দেহ করছে। সে বলল, চারুটা আবার কে!

—সেই। পিয়ারিলালের কাছে আজ একবার যাব। চারু সত্যি আছে

কিনা, না চারু······আর কিছু না বলে সেই মরীচিকা বুঝি, ভাববার সময় সে দেখল হাসিরাণী ঘরে ঢুকে মেয়ের কাঁথা পাল্টে দিচ্ছে। মেয়েটা বড় বেশি চেঁচাচ্ছিল। কুম্ভবাবু শুধু বলল, ও-সব বলতে যাবেন না। ছিঃ ভাবতে শেষে কি ভাববে। পিয়ারিলাল লোকটা সুবিধের নয়।

—কিন্তু চারুকে যে আমার সঙ্গে তুলে দিল।

—হতেই পারে না।

—ওর ভাইজি বলল।

—ওর ভাইজি আছে কখনো শুনিনি!

অতীশ বলল, বহরমপুরে ওর কে আছে!

কুম্ভ এবার হা হা করে হেসে উঠল। বলল, দাদা আপনি ঠিক ছিলেন তো!

অতীশ বলল, সেই। সে ওঠার সময় বলল, আপনার ঈশ্বরও আছে, শক্ত পাটাতনও আছে। বুঝতে পারছি আমার কিছু নেই। আমার সব কিছু ঠিক না থাকারই কথা।

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥